# ভ্রমণ ও সাধুসঙ্গ

( তৃতীয় খণ্ড )

শিবশংকর ভারতী

।। ভাস্বতী ।।
১০৩সি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা- ৭০০ ০০৯

প্রকাশক : ৯. ২.৫৭
কে. ব্যানার্জী
ভাস্বতী
১০৩সি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ অলংকরণ : রতন সেন
ছবি : দীপক ভট্টাচার্য
লেখকের ছবি : ডাঃ প্রদীপ দাস
'ইনসেট' ছবি : শ্যামগোপাল বসাক

মুদ্রাকর :
পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য
লক্ষ্মী প্রেস
১/৭বি, প্যারীমোহন সুর লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

আমার চরম আর্থিক দৈন্যের দিনে বছরের পর বছর বিনা
পারিশ্রমিকে বিদ্যালয় জীবনে বিদ্যালাভে সহায়তা
করেছিলেন মধ্যমগ্রাম উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের
শিক্ষক পূজনীয় শ্রীমুরারিমোহন চট্টোপাধ্যায়
এবং শ্রীযামিনীরঞ্জন মল্লিক—তাঁদেরই
পাদপদ্মে অর্পণ করলাম।

—শিবশংকর

একজন সংসারী মানুষের ভ্রমণ আর শিবশঙ্কর ভারতীর ভ্রমণে অনেক তফাত। সংসারীর ভ্রমণকাহিনী বড় বৈষয়িক। লেখকের প্রচ্ছন্ন গর্ব মণ্ডিত দর্শনীয় স্থান ও প্রকৃতির বর্ণনা। কি খেয়েছি, কি দেখেছি, কোন হোটেলে থেকেছি, সঙ্গের সঙ্গীরা কে কি করেছেন, বলেছেন, ছোটখাটো কল্পিত প্রেম, কাব্যিক উচ্ছ্বাস, আত্মীয় তুচ্ছতায় ভরা হাজার হাজার শব্দ। ভ্রমণ কাহিনীর প্রচলিত ছকের বাইরে বেরিয়ে আসা কঠিন।

কে ভ্রমণ করে? ভ্রমণ করে মন। ভ্রমণ করে মানুষের জিজ্ঞাসা। দর্শনেই শেষ নয়, থাকা চাই প্রশ্ন। পাহাড়, নদী, অরণ্য দেখলেই শুধু হবে না দেখতে হবে মানুষ। জীবনের কাছাকাছি যেতে হবে। তামসিক ভ্রমণ মানুষের বিলাস। আধ্যাত্মিক ভ্রমণ মানুষের আত্মিক অনুসন্ধান। মৌন পর্বত ভৌগোলিক বিস্ময় নয়, স্তব্ধ সাধনা। ছুটে চলা পাহাড়ী নদী হল অনন্তের ভাষা, উপলখণ্ড হল কালের স্মৃতি চিহ্ন।

পরিব্রাজক দেশ-দেশান্তরে ঘোরেন নিজের উন্মোচনের জন্যে - নিজের বিশ্বাসকে দৃঢ় করার জন্যে। কথায় আছে - রমতা সাধু, বহতা পানি। কুটিচক ও বহূদক। বহূদক সাধক তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে ভ্রমণ করেন নিজের বিশ্বাসকে দৃঢ় করার জন্যে। যদ হরেব বিরজেৎ তদ হরেব প্রব্রজেৎ। কোন বিশ্বাসে স্থিত হওয়ার জন্যে এই প্রব্রজ্যা। সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টাকে দর্শনের মানসে। নিজের অহং ও ক্ষুদ্রতার মোচনে। অনন্ত এক বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে। সমর্পিত হওয়ার জন্যে। আমি নয় তুমি এই বোধোদয়ের জন্যে। এই বোধোদয়ে বহূদক হন কুটিচক। তিনি আসন করে বসে পড়েন এক স্থানে। তখন আর ছোটাছুটি নেই, তখন উপলব্ধির সাধনা, নিমজ্জনের প্রয়াস। সিন্ধুতে বিন্দুর পতন। তোমাতে আমাতে একাকার হওয়া।

শিবশঙ্কর সাধক। এখন তাঁর বহূদক অবস্থা। তাঁর ভ্রমণ সংসারীর ভ্রমণ নয়। তাঁর অন্বেষণ দৃশ্য-গন্ধ-বর্ণ নয়। তাঁর অন্বিষ্ট হল বিশ্বাস। কোন আকর্ষণে মানুষ ধন-জন-গৃহসুখ বিসর্জন করে পথকেই জীবনের সম্বল করেন, সেই রহস্যই জানতে চান। 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে' - সে কোন্ অতিপ্রাকৃত ঝড়! আমরা জানি না, জানতে চাই না। আমরা রূপ ও রসের জগতের অধিবাসী। সেই ঝড়ের সন্ধান পেয়েছেন শিবশঙ্কর। সাধক আর তাঁর সাধনার আলোকে লেখক বারে বারে আলোকিত হতে চান। তাঁর প্রশ্ন - কি পেলেন? নিজেকে জয় করতে পেরেছেন কী! মন থেকে গৃহ আর সংসারকে কি তাড়াতে পেরেছেন! অনেক সময় এমন উত্তরও পেয়েছেন - কমলি নেহি ছোড়তা। সংসার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে।

এই ভ্রমণ আধ্যাত্মিক ভ্রমণে অপূর্ব। ভোগ আর যোগ জীবনের দুই মেরু। এই ভ্রমণ সেই মেরুভ্রমণ। আন্তরিক মন দিয়ে প্রাচীন ধাঁধা বোঝার চেষ্টা - সব ছুট যায় না সব ঠিক যায়!

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

একজন সাধারণ মানুষের ভ্রমণ আর শিবশঙ্কর ভারতীর ভ্রমণে অনেক তফাৎ। সাধারণ ভ্রমণ কাহিনী বড় বৈষয়িক। লেখকের প্রচ্ছন্ন গর্বমণ্ডিত দর্শনীয় স্থান ও প্রকৃতির বর্ণনা। কি খেয়েছি, কি দেখেছি, কোন হোটেলে থেকেছি, সঙ্গের সাথীরা কে কি করেছেন, বলেছেন, ছোটখাটো কল্পিত প্রেম, কাব্যিক উচ্ছ্বাস, যাবতীয় তুচ্ছতায় ভরা হাজার হাজার শব্দ। ভ্রমণ কাহিনীর প্রচলিত ছকের বাইরে বেরিয়ে আশা কঠিন।

কে ভ্রমণ করে? ভ্রমণ করে মন। ভ্রমণ করে মানষের জিজ্ঞাসা। দর্শনেই শেষ নয়, থাকা চাই প্রশ্ন। পাহাড়, নদী, অরণ্য দেখলেই শুধু হয় না দেখতে হবে মানুষ। জীবনের কাছাকাছি যেতে হবে। তামসিক ভ্রমণ মানুষের বিলাস। আধ্যাত্মিক ভ্রমণ মানুষের আত্মিক অনুসন্ধান। মৌন পর্বত ভৌগোলিক বিস্ময় নয়, স্তব্ধ সাধনা। ছুটে চলা পাহাড়ী নদী হল অনন্তের ভাষা, উপলখণ্ড হল কালের স্মৃতি চিহ্ন।

পরিব্রাজক দেশ-দেশান্তরে ঘোরেন নিজের উন্মোচনের জন্যে—নিজের বিশ্বাসকে দৃঢ় করার জন্যে। কথায় আছে, রমতা সাধু, বহতা পানি। কুটিচক ও বহুদক। বহুদক সাধক তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে ভ্রমণ করেন নিজের বিশ্বাসকে দৃঢ় করার জন্যে। যদ হরেব বিরজেৎ তদ হরেব প্রব্রজেৎ। কোন্ বিশ্বাসে স্থিত হওয়ার জন্যে এই প্রব্রজ্যা! সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টাকে দর্শনের মানসে! নিজের অহং ও ক্ষুদ্রতার মোচনে! অনন্ত এক বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে! সমর্পিত হওয়ার জন্যে! আমি নয় তুমি এই বোধোদয়ের জন্যে! এই বোধোদয়ে বহুদক হন কুটিচক। তিনি আসন করে বসে পড়েন একস্থানে। তখন আর ছোটাছুটি নেই, তখন উপলব্ধির সাধনা, নিমজ্জনের প্রয়াস। সিন্ধুতে বিন্দুর পতন। তোমাতে আমাতে একাকার হওয়া।

শিবশঙ্কর সাধক। এখন তাঁর বহুদক অবস্থা। তাঁর ভ্রমণ সাধারণের ভ্রমন নয়। তাঁর অন্বেষণ দৃশ্য গন্ধ বর্ণ নয়। তাঁর অভিষ্ট হল বিশ্বাস। কোন্ আকর্ষণে মানুষ ধন-জন-গৃহসুখ বিসর্জন করে পথকেই জীবনের সম্বল করেন, সেই রহস্যই জানতে চান। 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে'—সে কোন্ অতিপ্রাকৃত ঝড়! আমরা জানি না, জানতে চাই না। আমরা রূপ ও রসের জগতের অধিবাসী। সেই ঝড়ের সন্ধান পেয়েছেন শিবশঙ্কর। সাধক আর তাঁর সাধনার আলোকে লেখক বারে বারে আলোকিত হতে চান। তাঁর প্রশ্ন—কি পেলেন? নিজেকে জয় করতে পেরেছেন কী! মন থেকে গৃহ আর সংসারকে কি তাড়াতে পেরেছেন! অনেক সময় এমন উত্তরও পেয়েছেন—কমলি নেহি ছোড়তা। সংসার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। এই ভ্রমণ আধ্যাত্মিক প্রশ্নে ভরপুর। ভোগ আর যোগ জীবনের দুই মেরু। এই ভ্রমণ সেই মেরু ভ্রমণ। আধুনিক মন দিয়ে প্রাচীন ধারাকে বোঝার চেষ্টা—সব ঝুট হ্যায় না সব ঠিক হ্যায়!

—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

## দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

আমরা যা ভাবি তা অনেক সময়েই সত্যে পরিণত হয় না, আবার অনেক সময়েই যা ভাবিনি, ভাবিনা—তাই-ই দেখা যায় বাস্তবে পরিণত হয়েছে। এই গ্রন্থের বেলায়-ও ব্যাপারটা সেই রকমই ঘটেছে। নিঃশেষিত হয়েছে প্রথম মুদ্রণ।
সাধুমুখের কথা, শারীরিক ও মানসিক কল্যাণ এবং বিভিন্ন তীর্থ ও স্থান ভ্রমণে জাগতিক কর্মক্ষয়ের একটি সহজ সরল পথই হল ভ্রমণ। ভ্রমণ গ্রন্থ পাঠে কর্মক্ষয় হয় কিনা জানি না তবে মানসিক আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ যে হয় তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এক্ষেত্রে পাঠক-পাঠিকাদের এই আনন্দলাভই যে 'ভ্রমণ ও সাধুসঙ্গ' গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণে সহায়তা করেছে এ বিষয়েও কোন সংশয় নেই। এর জন্য সকলকে জানাই আন্তরিক সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন।
যাইহোক প্রথম মুদ্রণে ভাষাগত কিছু ত্রুটি ছিল, যা পরিমার্জনা করা হয়েছে। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ভ্রমণপর্বে কিছু নতুন তথ্য সংযোজিত হয়েছে। প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর ইতিমধ্যেই দেশ, সানন্দা এবং আনন্দ বাজার ও যুগান্তর পত্রিকার সমালোচনায় 'ভ্রমণ ও সাধুসঙ্গ' উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে, যেটা ছিল ভাবনার বাইরে। প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্যে সমালোচনাগুলি সংযোজিত হয়েছে একেবারে গ্রন্থ-শেষে। পরিশেষে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছাসহ—

**শিবশংকর ভারতী**

## যেটুকু না বললেই নয়

এবার শুধু ভ্রমণ নয়—ইতিহাসের কাঁধে চড়ে ঐতিহাসিক জায়গাগুলি যেমন ঘুরেছি তেমনই করেছি সংসারী ও সাধুসঙ্গ। মানুষ যখন মনের আগল খুলে কথা বলে তখন তাকে সঙ্গ বলে।

এতদিন ভ্রমণ পথে সাধারণ সংসারী মানুষের সঙ্গলাভের কথা ভাবিনি, সে সুযোগও হয়নি কখনও। কারণ বেশীর ভাগ সময়েই কখনও কয়েকজন বন্ধুদের সঙ্গে, কখনও বা একা বেরিয়ে পড়েছি বিভিন্ন তীর্থ ও ভ্রমণপথে। দ্বারকা রাজস্থানে আমি আগেও ঘুরেছি। একবারে সব কিছু জানা যায় না—দেখাও হয় না ভালোভাবে। তাই আবারও যেতে হয়েছে।

আমরা ভ্রমণ করি ঠিকই তবে সংসার নিয়েই ভ্রমণ করি। এবার এ উপলব্ধি হলো প্রতিটি পদক্ষেপে—যা আগে হয়নি কখনও। অবাক হয়ে দেখলাম, সত্যিই মানুষের মনের আগল খুলে যায় সংসারের বাইরে বেরোলে। সযত্নে লুকিয়ে রাখা মনের আসল রূপটা যেন বেরিয়ে পড়ে সীমিত গণ্ডির বাইরে পা দিলে। তাই এবার এ-গ্রন্থে এসেছে সাধু-ভাবনার পাশাপাশি সংসার-ভাবনার কথা। এখানে কোথাও কল্পনার আশ্রয় না নিয়ে ভ্রমণপথে ভ্রমণ-সঙ্গীদের বলা কথাই লিখেছি। কারণ কেউই আমরা সংসারগণ্ডির বাইরে নই বলে! সাধুদের মনের কথা, অন্তরঙ্গ জীবন-কথা জানতে তাদের অনুরোধ করতে হয়েছে—কখনও পায়ে ধরতে হয়েছে। এখানে সংসারীদের কথা জানতে আমাকে তা করতে হয়নি। এটাই সুখের কথা। পথে বেরোলে পথই বোধ হয় তার নিয়মে আমাদের বাইরে আরোপিত সুন্দর মুখোশটা সরিয়ে দেয়—বের করে দেয় মনের প্রকৃত কদাকার চেহারাটা।

এবার ভ্রমণে একদিকে সাধুসঙ্গ ও বৈচিত্র্যেভরা প্রকৃতি, আর একদিকে সংসারীদের অদ্ভুত চরিত্র-বৈপরীত্যের সমাবেশ—এ-দুয়ের সম্মিলিত রূপ নিয়েই বোধ হয় মানুষের জীবন, গড়ে ওঠে প্রাসাদ-দুর্গহীন ইতিহাস, যে ইতিহাসের কিছুটা দেখেছি আমি দ্বারকা রাজস্থানের পথে। এই গ্রন্থে যা পাঠক-পাঠিকারা অবগত হবেন পর্যায়ক্রমে।

এবার আসি সাধুদের কথায়। এখানে তাঁরা যা বলেছেন—দেখেছি, কোন কথাই নতুন কোন কথা নয়। সবই আমাদের শাস্ত্র-পুরাণের কথা। তবুও পুরনো কথা শুনতে ভালো লাগে, নতুন করে। তাই হয়তো পুরনো দিনের কথা, অতীত স্মৃতি মানুষের কাছে এত প্রিয়। সেইজন্যেই বোধ হয় মায়ের দেয়া পুরনো দিনের গয়নাটা ভেঙে নতুন করে গড়িয়ে নিতে মন চায় না—প্রাচীনদের স্পর্শের মূল্য অনেক বেশী বলে।

এখন আসা যাক এই গ্রন্থে উল্লিখিত ইতিহাসের সাল তারিখ প্রসঙ্গে। একই স্থাপত্য-কীর্তিগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন ইতিহাসকারের লেখা বিভিন্ন গ্রন্থে সাল তারিখ এবং ঘটনার বিভিন্নতা ও প্রতিষ্ঠাতার একাধিক নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

এ-ক্ষেত্রে আমার কিছু করার নেই। শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাই বলতে ইচ্ছে করে,

'হায় রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল,
পণ্ডিতেরা তর্ক করে লয়ে তারিখ সাল।'

এখানে একটা কথা উল্লেখ না করে পারলাম না, সাধুসঙ্গের সময় বহু সাধুর মুখেই শুনেছি ট্রেন ভ্রমণকালীন একশ্রেণীর পুলিশ এবং টিকিট কালেক্টার তাঁদের উপর নানাভাবে পীড়ন করেন জন-সমক্ষে—টিকিট না থাকার অপরাধে। এ-যুগে এটা বড়ই মর্মান্তিক এবং দুঃখের কথা। রিক্ত নিঃস্ব সাধুদের কি এর হাত থেকে নিষ্কৃতি দেয়া যায় না?

সাধুসঙ্গের সময় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনুভব করেছি, সহায়-সম্বল আশ্রয়হীন আকাশ-বৃত্তিতে জীবন-ধারণকারী সাধু-সন্ন্যাসীরা সম্মান-শ্রদ্ধা—এসব কোন কিছুই প্রত্যাশা করেন না আমাদের কাছে, তবে সংসারের বাইরে আছেন বলে অবহেলিত, ঘৃণিত এবং অসম্মানিতও হতে চান না তাঁরা।

পরিশেষে বলি, ভারতের অতীত সংস্কৃতি, ইতিহাস, দর্শন এবং প্রাচীন ঋষিদের অতীত-ধারাবহনকারী আজকের পথ-চলতি সাধুদের অতীত-ভাবনার কথা নতুন ভাবে উপলব্ধি করার সময় এসেছে—যাতে আমরা শুধুমাত্র পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুগামী হয়ে নিজেদের গৌরবমণ্ডিত ঐতিহ্যকে অবহেলা না করি অর্থাৎ নিজস্বতার বিস্মৃতি যেন না হয় কারও।

—শিবশংকর ভারতী

## মাত্র কয়েকটি কথা

এবারের ভ্রমণ কাহিনীর মূল আকর্ষণের মধ্যে বিচিত্র মনের সাধুদের অন্তরঙ্গ জীবন-কথা তো আছেই—আর আছে সংসারীদের মনের কথা। তবে দর্শনীয় স্থানগুলির অধিকাংশই নিরেট পাথরের দুর্গ ও প্রাসাদ-ভিত্তিক তাই পৌরাণিক ও আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের চেয়ে ঐতিহাসিক পশ্চাদপটই বেশী। তা সত্ত্বেও ভারতের অতীত ইতিহাসের একটা অধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে এমনভাবে ভ্রমণ-আলেখ্য পরিবেশন করা হয়েছে, যাতে ভ্রমণের সময় ভ্রমণপিয়াসী পাঠক পাঠিকারা সহজেই ফিরে যেতে পারেন সুদূর অতীতে, লেখকের হাত ধরে।

এই গ্রন্থে লেখক অক্লান্ত পরিশ্রম করে নতুন আঙ্গিকে ভ্রমণ এবং পথচলতি সাধু-সমাজকে পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ভ্রমণ সাহিত্যের এক নতুন দ্বার উন্মোচিত করে দিয়েছেন। একইসঙ্গে নিজেকে নিয়ে নিজেদের নতুন করে ভাবাবার প্রচেষ্টা করেছেন। সেদিক থেকে গতানুগতিক ধারায় লেখা ভ্রমণ গ্রন্থগুলিকে অনায়াসেই এই 'ভ্রমণ ও সাধুসঙ্গ' ছাপিয়ে যাবে বলেই আমার মনে হয়।

এ-ছাড়াও এই গ্রন্থে আছে যাত্রাপথের যথাসম্ভব বিশদ বিবরণ, পথের দূরত্ব, সড়ক পরিবহন ও রেল যোগাযোগ ইত্যাদি—যা পর্যটক এবং তীর্থযাত্রীদের ভ্রমণের 'গাইড' হিসাবে সহায়তা করবে আগের দুটি খণ্ডের মতো।

স্বয়ংসম্পূর্ণ এই ভ্রমণ কাহিনীতে ভ্রমণপথের ঐতিহ্যময় স্থানগুলি এবং বিচিত্র ধরনের সব সাধুদের অনুভূতি ও উপলব্ধির অজানা অজ্ঞাত কথা পাঠক-মনকে বিশেষভাবে আলোড়িত করবে বলেই আমার বিশ্বাস। আর সেই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই এগিয়ে চলেছি পরবর্তী চতুর্থ খণ্ড প্রকাশের পথে।

—প্রকাশক

কোন পাতায় কি আছে

## যাঁদের কাছে ঋণী রইলাম

এই গ্রন্থ রচনায় যে সব লেখকের গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম আন্তরিকভাবে। একইসঙ্গে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে রইলাম তাঁদের কাছে অসাবধানতায় কোন গ্রন্থ বা লেখকের নাম যদি বাদ পড়ে গিয়ে থাকে।

মহাভারত—রাজশেখর বসু ( সারানুবাদ )
মহাভারতম্—হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য ( অনুবাদক )
শ্রীমদ্ভাগবত—হরফ প্রকাশনী
আমার ভ্রমণ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ
ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার
বিশ্বকোষ—সাক্ষরতা প্রকাশন
সচিত্র তীর্থ ভ্রমণ কাহিনী—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর
শ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়াবাবার জীবনচরিত—
মহন্ত মহারাজ সন্তদাস বাবাজী ব্রজবিদেহী
রেগিস্থান রাজস্থান—শতদল ভট্টাচার্য
ভারত দর্শন—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
চিতোর দুর্গ—জি. এস. আচার্য
উদয়পুর—অশোক সিংঘল
তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী—অনুবাদক সুধা বসু
জয়পুর এবং আজমীর—লালচন্দ্র এণ্ড সন্স ( প্রকাশক )
শ্রীনাথদ্বারা—নারায়ণলাল শর্মা
দিলওয়ারা জৈন মন্দির—শ্রীপ্রতাপ সিং চৌধুরী ( সম্পাদনা )
শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা—ডাঃ নির্ভয়রাম পূজারী
ভারতের সাধক—শ্রীশঙ্কর নাথ রায়
Meherangarh Museum Fort, Jodhpur—Published by Maharaj Prahlad Singh, Manager, Mehrangarh Museum Trust, Umaid Bhawan, Jodhpur.

নিজের চেষ্টা আর অন্যের সাহায্য—এ-দুই এক না হলে কারও পক্ষে কোন কিছু করা কখনও সম্ভব হয় না। এর ব্যতিক্রম আমিও নই। এই গ্রন্থ রচনায় এঁরা দৈহিক ও মানসিক শ্রম দিয়ে একান্তভাবে সাহায্য করেছেন—এঁদের ঋণ কোনদিন পরিশোধ হবার নয়—

সর্বশ্রী অমিত কুমার লাহা, অন্নপূর্ণা লাহা, চন্দ্রশেখর রায়চৌধুরী, ডাঃ প্রদীপ দাস, শিখা রায়চৌধুরী, বরুণ কুমার হাজরা, কালীপদ দাস, সুজিত সরকার, সরমা ভারতী, উমা ভারতী।

সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাজা মানসিং নির্মিত আরাবল্লী পর্বতের উপর দুর্ভেদ্য অম্বর দুর্গ-প্রাসাদের একটি বহির্দৃশ্য—জয়পুর।

—ডাঃ প্রদীপ দাস

মধ্যকালীন শিল্পের শিল্প-সৌন্দর্যে মণ্ডিত মানসিং-এর এক অনবদ্য অবদান জয়পুরের অম্বর প্রাসাদ—প্রবেশ দ্বার।

—ডাঃ প্রদীপ দাস

জয়পুরের অম্বর প্রাসাদে 'ভারতীয় এই শীশ মহলটি শীতলতা কমনীয়তা এবং সুরুচির এক আশ্চর্যজনক মিশ্রণ।'—এলডস্ হাক্সলে।

—ডাঃ প্রদীপ দাস

জয়পুরের হাওয়া দেখে বিস্ময়ে অভিভূত স্যার এডুইন এনরোল্ড বলেন, 'আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপও এত সুন্দর প্রাসাদ বানাতে পারতো না।'

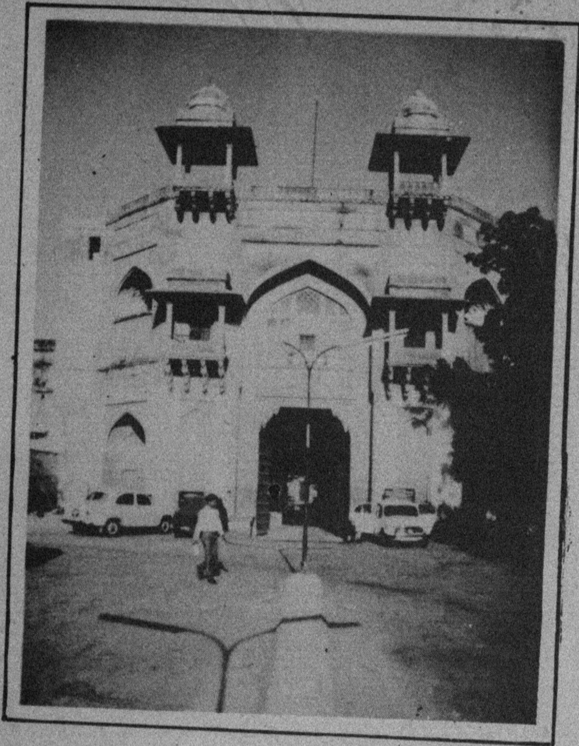
—লেখক

নাম যন্তর মন্তর, আসলে এটি মানমন্দির। জয়পুরের নিষ্প্রাণ ইট পাথরের সমন্বয়ে তৈরী এই মানমন্দিরের মাধ্যমে জানা যায় সময় তিথি নক্ষত্র ইত্যাদি।

—লেখক

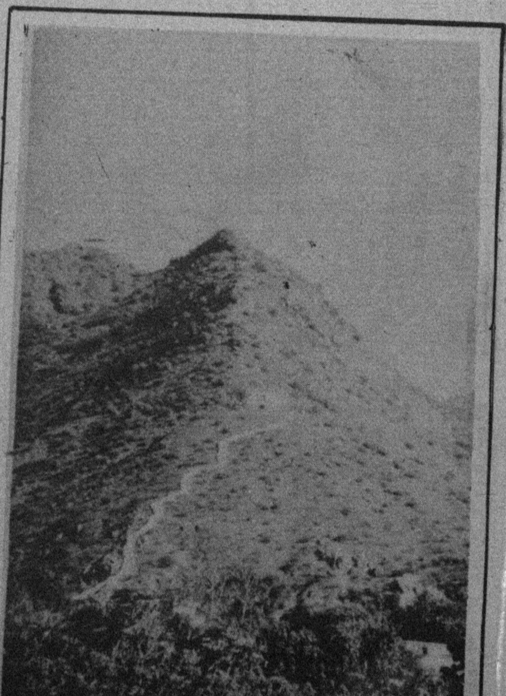
তীর্থগুরু পুষ্কর সরোবর এবং পিছনে সাবিত্রী পাহাড়ে—সাবিত্রী তীর্থ। একদা এই তীর্থে বিশ্বামিত্রের তপস্যাভঙ্গ করেছিলেন উর্বশী মেনকা।

—বরুণ কুমার হাজরা



১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবর নির্মিত আজমীরের পর্বত-প্রাসাদ —যেখানে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে প্রথম মিলিত হন ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত টমাস্ রো।

—বরুণ কুমার হাজরা



'ছবির মতো সুন্দর শহর আজমীর'

—ডাঃ আর·এইচ·আরভিন।

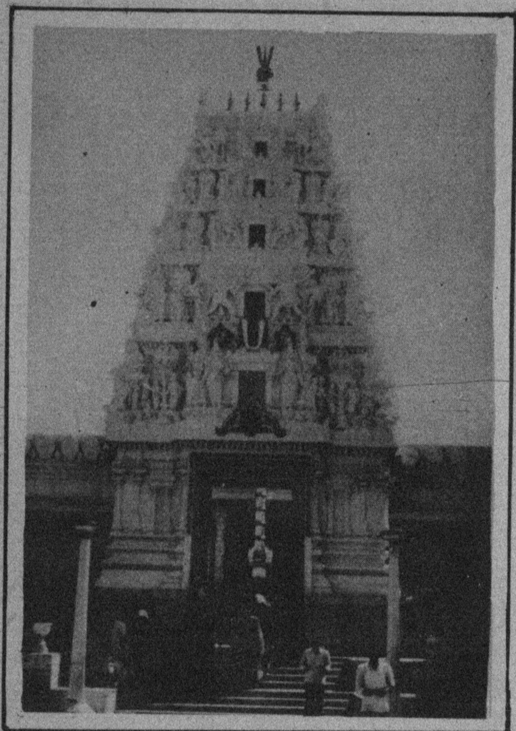
তারাগড় পাহাড়ে স্থাপিত একটি

১০৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিমলশাহ নির্মিত স্থাপত্য কলাশিল্পের চমক আবু পাহাড়ে দিলওয়াড়া জৈন মন্দিরের একটি অন্তর্দৃশ্য।

—বরুণ কুমার হাজরা

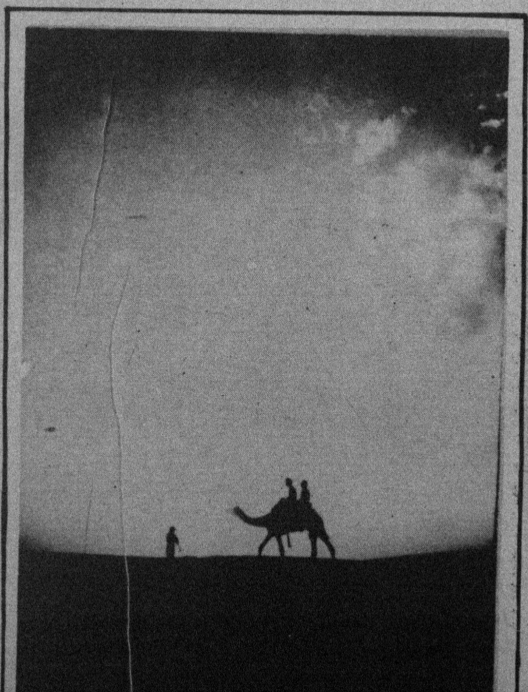
চিতোরগড়ের রাণা কুম্ভ-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ—একদা যেখানে রাণী পদ্মিনীসহ অসংখ্য রাজপুত রমণীরা আত্মাহুতি দিয়েছিলেন জহরব্রতে।

—লেখক



১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ-ভারতের মন্দির-আদলে নির্মিত পুষ্করতীর্থে রঙ্গনাথ মন্দির।

*—বরুণ কুমার হাজরা*



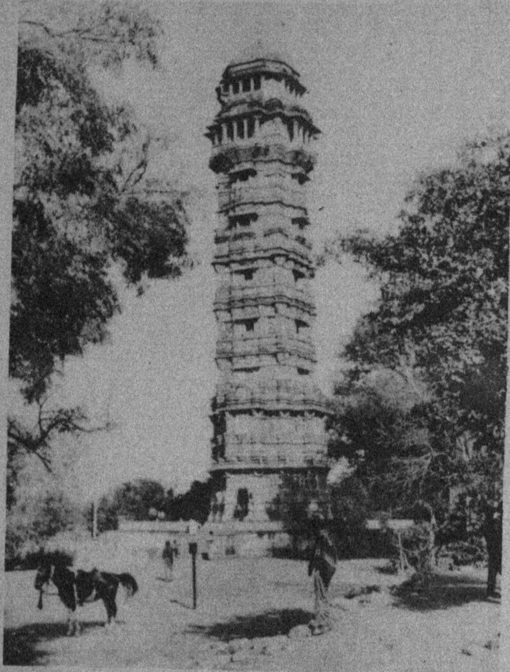
জয়সলমীর থেকে ৪৮ কি·মি· দূরে সীমান্ত নগর শমগাঁও। এখান থেকেই মরুভূমির শুরু। সূর্যাস্তের একটি দৃশ্য।

মরু-শহর জয়সলমীর ১১৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজপুত মহারাজা রাওয়াল জয়সল সিং নির্মিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ দুর্গ—সোনার কেল্লার প্রবেশ দ্বার।

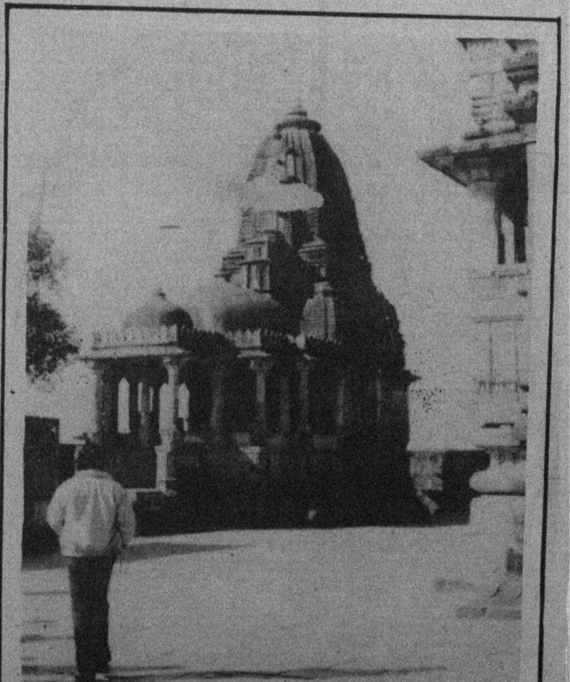
—বরুণ কুমার হাজরা

গদিসর লেক—জয়সলমীর মহারাজের গ্রীষ্মকালীন আবাস।

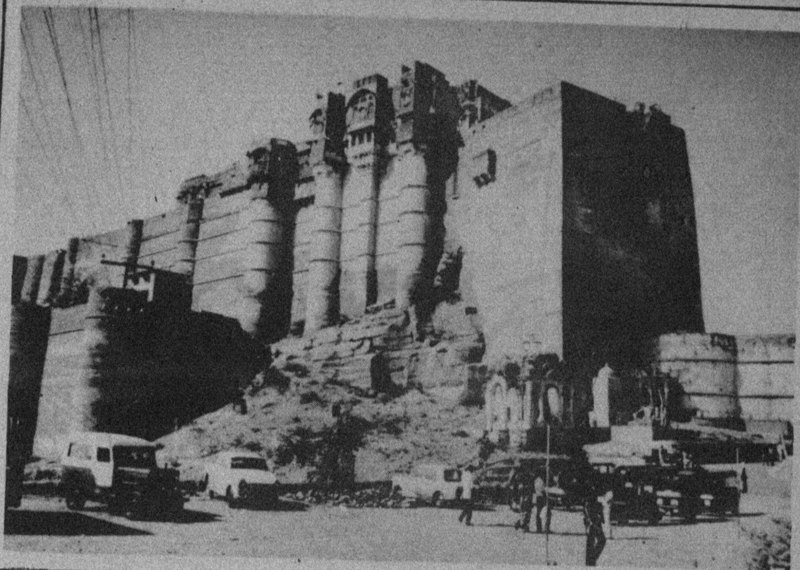
—লেখক



ভারতীয় স্থাপত্য-কলার এক অনবদ্য কারিগরীর প্রতীক চিতোরগড়ের বিজয়স্তম্ভ। ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন মহারাণা কুম্ভ। —লেখক

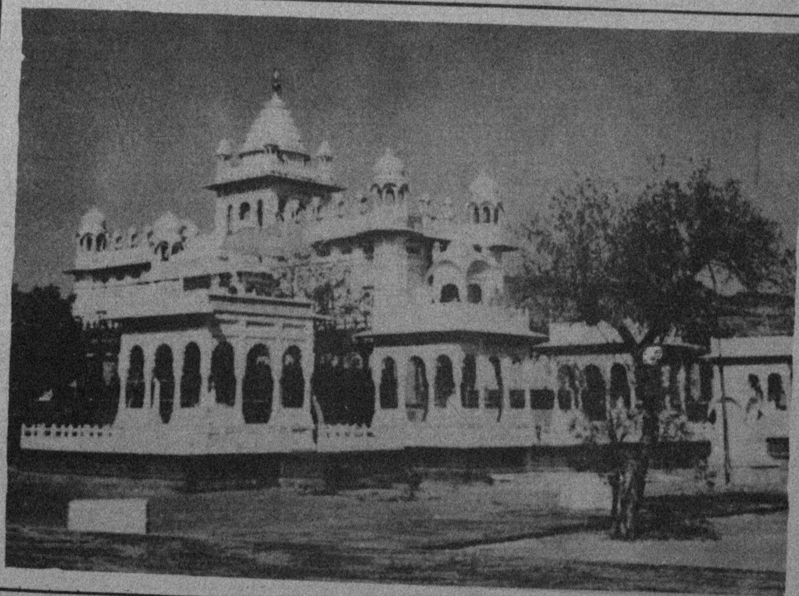


চিতোর দুর্গের এই মীরা মন্দিরে বসে একদা কৃষ্ণপ্রিয়া মীরা করেছিলেন কৃষ্ণের ভজন, দোঁহাবলী রচনা এবং বিষ পান।



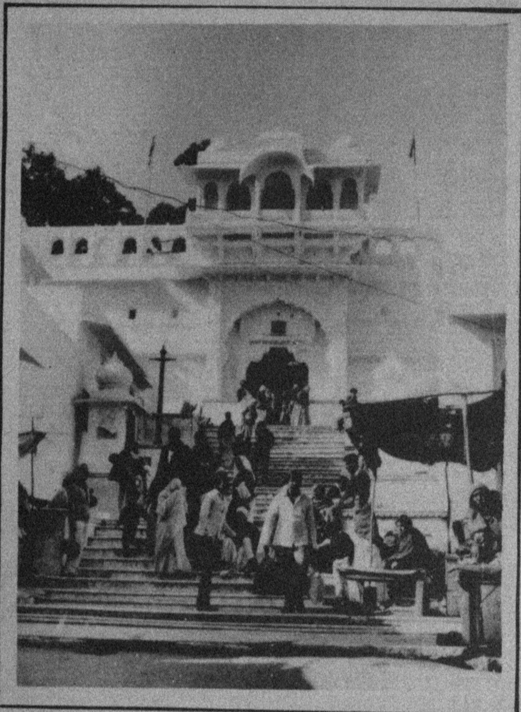
১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে যোধারাও নির্মিত ভারতের ঐতিহ্যমণ্ডিত ও পুরাতাত্ত্বিক সৌন্দর্যে ভরা যোধপুর দুর্গ।

—বরুণ কুমার হাজরা

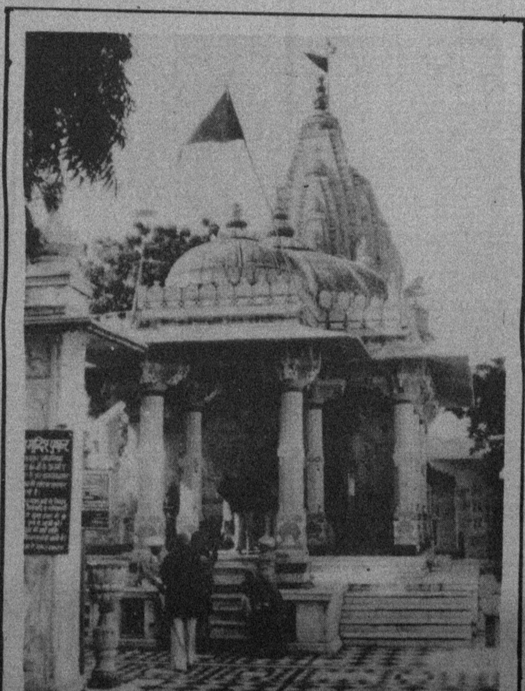


যোধপুরে শিল্প-নৈপুণ্যে ভরা শ্বেতপাথরে নির্মিত রাজপুত রাজাদের সমাধি মন্দির—যশোবন্ত সিং স্মারক মন্দির।

—লেখক



কালের প্রভাবে অনেক কিছু হারালেও প্রাচীন তীর্থ ব্রহ্মার যজ্ঞভূমি পুষ্কর এখনও হারায়নি তার মাহাত্ম্য। ব্রহ্মা মন্দিরের প্রবেশ দ্বার। —লেখক



ভারতের বহু লুপ্ত তীর্থের একটি পুষ্কর—উদ্ধার করেন শংকরাচার্য। সর্বশেষে এই ব্রহ্মা মন্দিরটি নির্মিত হয় ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে।



'ভেনিস দেখো এবং মারা যাও, কিন্তু উদয়পুর দেখো এবং বেঁচে থাকো বার বার দেখার জন্য।'—জনৈক পর্যটক। উদয় সিং-এর রাজপ্রাসাদ।

—লেখক

'উদয়পুর হলো সুন্দরের মধ্যে সুন্দরতম।' —লর্ড কার্জন। পিছোলা হ্রদে ভাসমান প্রাসাদ—লেক প্যালেস।

—লেখক

লোক বিশ্বাস , মথুরা ছেড়ে কৃষ্ণ এসে প্রথম বসবাস করেন আদি দ্বারকায়। এখানে তাঁরই পুণ্য স্মৃতি বহন করে চলেছে কৃষ্ণ মন্দির।

—লেখক



উদয়পুরের হলদিঘাটি—১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুন যেখানে প্রভুভক্ত চৈতক প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল মহারাণা প্রতাপের প্রাণ রক্ষার্থে।

—লেখক

সোমনাথের প্রাচীন মন্দির আর নেই। গুজরাটের আরবসাগর-তীরে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে নবনির্মিত অমরতীর্থ সোমনাথ মন্দির।

—লেখক

নবনির্মিত সোমনাথ মন্দিরের অদূরেই ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী অহল্যাবাঈ নির্মিত অহল্যেশ্বর মহাদেবের মন্দির।

—লেখক

মহাভারতীয় যুগের কাম্যক বন আজকের ভালকা তীর্থে কৃষ্ণমন্দির—যেখানে জরা ব্যাধের তীরে বিদ্ধ হয়েছিলেন বসুদেব-পুত্র বাসুদেব কৃষ্ণ।

—লেখক

পঞ্চপাণ্ডবের স্মৃতিবিজড়িত—শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম এবং মহাত্মা বিদুরের দেহত্যাগক্ষেত্র প্রভাসতীর্থের ঘাট।

—লেখক

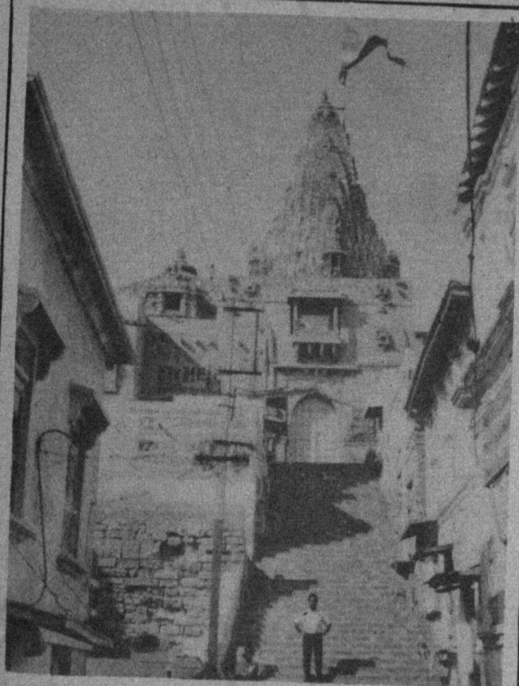


শ্রীকৃষ্ণ তীর বিদ্ধ হলেন ভালকা তীর্থে—দেহত্যাগ করলেন প্রভাসের দেহোৎসর্গ ক্ষেত্রে—কৃষ্ণের স্মৃতি মন্দির।

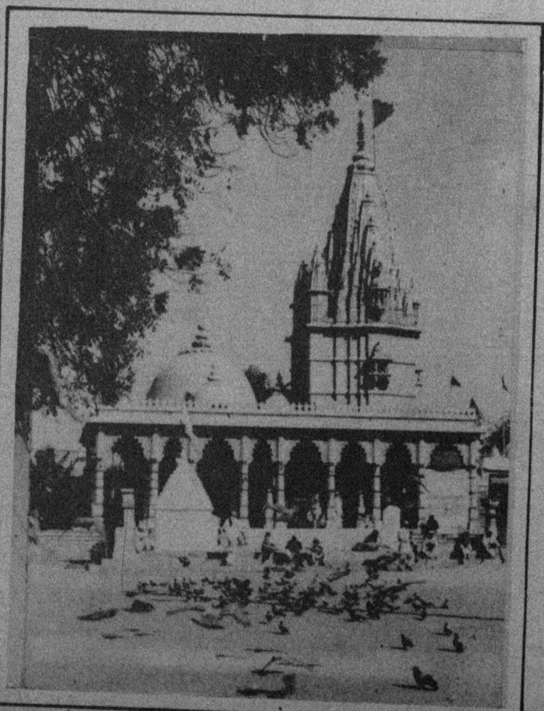
—লেখক

দ্বারকাধীশ মন্দির থেকে ২ কি·মি· দূরে শ্রীকৃষ্ণ-পতী রুক্মিণী দেবীর প্রাচীন মন্দির—দ্বারকা।

—লেখক



দ্বারকাধীশ কৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকায় গোমতী তীরে কৃষ্ণেরই পুণ্য স্মৃতি বহন করে চলেছে দ্বারকাধীশ মন্দির। —লেখক



পৌরাণিক সুদামাপুরী — আজকের পোরবন্দরে সুদামার অতীত স্মৃতি বুকে ধরে রেখেছে সুদামা মন্দির। —লেখক

# রাজস্থানের মরু থেকে
# দ্বারকার সাগরে

'জানেন মশাই, বাড়ীতে ছেলে, ছেলের বউ, মেয়ে, নাতি-নাতনি, সকলের কাছেই আমার একটা স্থান আছে—নেই শুধু আমার বউ-এর কাছে। আমাকে ভাবে, আমি একটা আকাট মুখ্যু।'

বেডিংটা ট্রেনের উপরের বার্থে রেখে ছোট্ট ব্যাগটা সিটের নীচে ঢোকাচ্ছিলাম। কথাটা শুনে পিছন ফিরে দেখলাম জীবনের শেষ প্রান্তে আসা এক বৃদ্ধকে। আমি আসার আগে স্বামী-স্ত্রীতে কি কথা হয়েছে—জানি না। আমাকে উদ্দেশ্য করেই কথাটা বললেন তাঁর স্ত্রীকে। বৃদ্ধের রোগা পাতলা চেহারা। সামান্য ফরসা। স্ত্রীর চেহারা মাঝারী। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। পরে দেখেছিলাম, ডান পা-টা একটু ছোট। সামান্য খুঁড়িয়ে চলেন। কথাটা শুনলাম। কোন উত্তর দিলাম না। এঁরা আমার ভ্রমণসঙ্গী।

এখনও ট্রেন ছাড়েনি। চলেছি রাজস্থান, গুজরাট। এর আগেও একবার গেছি। তখন আমার এক বন্ধুর সঙ্গেই গিয়েছিলাম। এবার যাচ্ছি কলকাতার এক নামকরা ভ্রমণকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। টিকিট কাটা, থাকা খাওয়ার কোন চিন্তা নেই। সব দায়িত্ব তাদের। যাত্রীরা সবাই টাকা দিয়েই খালাস। চলেছি তুফান এক্সপ্রেসে। ট্রেন ছাড়লো হাওড়া থেকে ঠিক সময়েই। সকাল—৯/৪৫ মিনিটে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি একাই চলেছি। তবে এ-পথের সহযাত্রী মোট বত্রিশজন। নারী পুরুষ মিলিয়েই বত্রিশ। আটজন পুরুষ। বাদ বাকি সব মহিলা। উপর থেকে নোটিশ এসেছে, এ-যাত্রায় এমন যাত্রীর সংখ্যাই বেশী। সঙ্গে তাদের সঙ্গী এ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক কারও বা চ্যবনপ্রাশ। এই নিয়েই চলেছে প্রায় সকলেই—হয়তো পরপারের পাথেয় সংগ্রহ করতে।

ভ্রমণকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গেলে একটা অসুবিধে ভোগ করতেই হবে—বিশেষ করে অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েদের। সমবয়স্ক মনের মতো সঙ্গী পাওয়া খুবই কঠিন। প্রায় সকলেই বয়স্ক। অধিকাংশ মহিলাদের বয়স ৫০-এর উপর। পুরুষদের প্রায়ই ৬০-এর নীচে নয়। ব্যবসায়ী আছে। তবে অবসরপ্রাপ্ত চাকুরীজীবীদের সংখ্যাই বেশী।

এ-অভিজ্ঞতা আমার একবারের নয়, বহুবারের। সারাজীবন ছেলেমেয়ে বউ করতে করতেই যৌবন শেষ—জীবনও। অবসর হয়নি বেরিয়ে পড়ার, তাই হয়তো শেষ বয়সের অবসরে বেরিয়ে পড়া।

আমার সঙ্গীদের মধ্যে অল্প বয়সের বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর জুটি আছে একটা। মাঝ বয়েসীও কয়েকজন আর সব বাঁধানো দাঁতের। বিধবা, বিপত্নীক এবং ভীষ্মও

আছেন কয়েকজন। বত্রিশজনের এই সংসারে একমাত্র আমারই বয়েস কম। এই সংসারটাকে তুফান টেনে নিয়ে চলেছে হু-হু করে।

একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি, তীর্থদেবতা না টানলে যেমন তীর্থদর্শন হয় না, তেমনই পথ না টানলে ভ্রমণপিয়াসীর ভ্রমণ হয় না। আবার অর্থ থাকলেই যে ভ্রমণ হয়— এমন নয়। অর্থের উপর লোভ আর মায়া বাধ সাধে ভ্রমণে। অর্থ না থাকলেও ভ্রমণ হয় যদি পথে পড়ে থাকে মনটা। অর্থ আপনিই জোটে।

একটা শ্রেণী আছে যারা পথে পা বাড়াতে নারাজ। সহায় সম্বল যেটুকু তা আগলাতে, না হলে লোকসানের হিসাবটা তারা আগেই করে ফেলেন। তাই নারাজ। শাহজাহান নামক কে একব্যক্তি তাজমহল নামক কি একটা করেছিল, তাই দেখতে একগাদা টাকা খরচ করে কি হবে? বাদশা কি মাথার দিব্যি দিয়ে কবরে গেছে যে, তাজ দেখতেই হবে? তার চাইতে বইতে ছবি দেখো, টিভি দেখো, তাতেই তাজ দেখা হবে। দোকানের মিষ্টি শো-কেসেই দেখায় ভালো। কি হবে খেয়ে, অকারণ অর্থ নষ্ট। আর পুণ্যির কথা বলছো, ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন ঘরে বসে ডাকলে তাঁকে পাওয়া যায়, তারজন্য দ্বারকা মথুরায় ছুটোছুটি কেন?

সব ফেলে বেরিয়ে পড়া যে কি কঠিন, যে বেরোয় সেই-ই বোঝে। তারমধ্যে রুগ্না পত্নী আর মূর্খ পুত্র—যম সমতুল্য এই বস্তু দুটি যার বঁড়শীতে গেঁথে আছে, তাকে খেলিয়ে ছাড়বে। এ-দুটোকেও যে উপেক্ষা করে বেরোতে পারলো তারই দেখা হলো।

আর একটা শ্রেণী আছে, যেকোন ভাবে তারা বেরিয়ে পড়ে। তারপর সারাপথে রোগ, বউ আর বাচ্চা সামলাতে সামলাতেই তাদের ভ্রমণ শেষ। চোখ খুলে দেখার অবকাশ হয় না। এদের নামেই দেখা, নামেই ঘোরা।

বন্ধু এবং বন্ধা পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছি। ট্রেনের গতি বাড়লো, সকলের প্যাকেট খোলাও শুরু হলো। কেউ ব্লাড সুগার, কেউ প্রেসার, কেউ হার্ট, কেউ বা গালে জল দিয়ে টুক্ করে গিলে নিচ্ছেন একমাত্র সম্বল—অম্বলের বড়ি। এক একজনের কাছে এক এক ওয়াগান ট্যাবলেট। দেখছি, প্যাকেটের গায়ে হাতে লেখা অম্বলের ট্যাবলেট, পেট খারাপ, কোমর ব্যথা, সর্দিজ্বর, মাথা ধরা, বুক ধড়ফড়, কাটাছেঁড়া, বমি বমি ভাব, নাক্স ৩০, ব্রায়োনিয়া ৬, রাস টক্স ৩০ থেকে শুরু করে আর্নিকা টু হাণ্ড্রেড পর্যন্ত। একনজরে দেখলে মনে হবে পাড়ার 'মেডিসিন কর্নার'। আমি যেন চলেছি এক ভ্রাম্যমান হাসপাতালের সঙ্গে।

আমার ডানপাশে যিনি বসে আছেন—বয়স্কা বিবাহিতা। স্বামী আসেননি। এসেছেন একাই। মাথার বেশীরভাগ চুলগুলোই সাদা। বয়েস পঞ্চাশের উপরেই মনে হলো। সিনথেটিকে মোড়া দেহ। কপালে সিঁদুর জ্বলজ্বল করছে। সাদার মধ্যে লাল বেশ ফুটে উঠেছে। ফরসা গায়ের রঙ। মাঝারী চেহারা। ঠোঁটে হালকা রঙের লিপস্টিক। সামনে বসা ভদ্রমহিলা যাঁর পা-টা সামান্য ছোট, তাঁকে বললেন,

—জানেন দিদি, আমাকে দেখতে বুড়িবুড়ি লাগে। আসলে অত বয়েস হয়নি আমার। রোগেই আমাকে বুড়ি করে দিয়েছে। বিয়ের আগে কোন রোগই ছিল না। গতর ছিল লোহার মতো। বিয়ের পর থেকেই ভুগছি। বিয়ে হয়েছে সেই ষোল বছর বয়েসে। তারপর থেকে একটা না একটা লেগেই আছে। তিন তিনবার পেট কেটেছে। বাত হয়েছে। কোমরটা সব সময়েই কন্‌কন্‌ করে। হাইপ্রেসার—হার্টের ট্রাবলও দেখা দিয়েছে। কিছুদিন হলো সুগার ধরা পড়েছে। ডাক্তার বলেছে এই খাবেন না, ওই খাবেন না। আমি ওসব শুনিনা দিদি। সব খাই। স্বামী আমার সদাশিব। মাসে হাজার টাকার ওষুধ এনে দেয়। কি আর করবো দিদি, কপালে ছিল, তাই হয়েছে। উনি ব্যবসা নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকেন তাই যখন তখন কোথাও বেরোতে পারেন না। আমি একাই বেরিয়ে পড়ি। এই যে দেখছেন ওষুধগুলো, আসার সময় উনিই এনে দিয়েছেন।

দেখেছি, এমন কিছু মহিলা আছেন যারা কোথাও বেড়াতে কিংবা কারও বাড়ীতে গেলে মুখ থেকে অনর্গল বেরোতে থাকে ঝুড়িঝুড়ি রোগের কথা। 'আমার এ-দেহটার উপর দিয়ে দিদি বহুবার পোস্টমর্টেম করা হয়ে গেছে। এই তো সেদিন ইউট্রাসটা বাদ দিয়ে এলাম। কয়েকবার মরতে মরতে বেঁচে গেছি।' এমন হাজার রোগের কথা। মুখটা ব্যথাও হয় না। ভারতীয় সমস্ত ওষুধ কোম্পানী আর ওষুধের নাম এদের কণ্ঠস্থ। একজন নামী ডাক্তারও বোধহয় জানেন না—এরা যত ওষুধের নাম জানে।

আমার বাঁপাশে যিনি—তিনি এসেছেন একা। হাইপ্রেসারের মানুষ। ব্যবসা করেন। সদাশিবের স্ত্রীর কথা শুনলেন মন দিয়ে। এবার ওয়াটার বোতল থেকে মুখে একটু জল দিয়ে একটা ট্যাবলেট গালে ফেলে জানালেন, তাঁর স্ত্রী রুগ্না। ইয়া মোটা চেহারা। রোগের পিছনে দিন মাস বছরে কত টাকার ওষুধ লাগে, কি কি ওষুধ—কলকাতার কোন্‌ কোন্‌ বড় ডাক্তার দেখেছেন, কোন্‌ নার্সিংহোমে কত টাকার বেড ভাড়া করে স্ত্রীকে অনন্ত শয্যায় রেখে চিকিৎসা করেছেন তার এক বিশাল ফিরিস্তি দিলেন তিনি। একথা বলেই বললেন,

—ওঁরও আসার খুব ইচ্ছে ছিল। পথে যদি কিছু হয়ে যায়, সেই ভয়েই সে এলো না।

ভাবলাম, এটাও একটা শ্রেণী। এরা নিজের রোগের কথা বলেন না। স্ত্রীর রোগের কথাই লেগে থাকে মুখে যেখানে যাবেন সেখানে। এছাড়াও উনি বলে গেলেন, কোন্‌ ডাক্তার কোথায় থাকেন, ঠিকানা কি, ক-টা থেকে ক-টা পর্যন্ত, কোথায় কত ফিস্‌, কোন্‌ নার্সিংহোমের ব্যবস্থা কেমন—ভারতীয় ডাক্তার, নার্সিংহোম আর তাদের টেলিফোন গাইড ইনি।

শ্রোতা আমি। শুনছি আর ভাবছি নানা কথা। কোন কথা বলছি না। পরিস্থিতি আর ভাব বুঝেই কথা বলবো। কারণ দেখেছি, সংঘবদ্ধ এই ভ্রমণে প্রথম প্রথম একে অপরের সঙ্গে পিরিতে গলায় গলায়। পরে এক হোটেলে, এক

কোচে, একইসঙ্গে থেকে কেউ কাউকে সহ্য করতে পারছে না। কথা বন্ধ। সারাটা পথই চললো মুখ গোমড়া করে। অনেকে আবার রসিকতাও বোঝে না। সামান্য কথা, উল্টো বুঝলি রাম। তাই কোন কথা না বলে বসে রইলাম।

একভাবে বেশীক্ষণ বসে থাকা যায় না। মাঝে মাঝেই উঠছি। পরিচয় করে আসি আর সব সহযাত্রীদের সঙ্গে, এ যাত্রায় আমার সঙ্গী যাঁরা।

একের পর এক স্টেশন পার হয়ে ছুটে চলেছে তুফান। দেখতে দেখতে দিন পার হয়ে গেল। রাত হলো। শুয়ে পড়লাম সকলে। শীতের রাত। মাঝ রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। উঠে জানালার কাছে মুখ রেখে দেখি, লেভেল ক্রসিং-এর গেটম্যান আর কেবিনম্যান দাঁড়িয়ে আছেন কনকনে শীতের মধ্যে কম্বল মুড়ি দিয়ে। বাঁশি বাজিয়ে দেখিয়ে চলেছেন সবুজ বাতি। সারা ভারতে এঁরা আছেন বলেই তো রেল চলছে সারাদিন রাতই, কোথাও না কোথাও।

ট্রেনে ওঠার পর থেকে এর মধ্যেই চুকে গেছে পরিচয়ের প্রথমপর্ব। সহযাত্রীরা এসেছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে। আমার সামনে বসা তিনজনের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী দুজন আর একজন ভদ্রলোক এসেছেন একাই। এরা তিনজনেই এসেছেন পরপারের চিঠি হাতে করে। স্বামী ভদ্রলোকটির দু-পাটিই বাঁধানো। বয়েস পঁচাত্তরের উপরেই হবে। অদ্ভুত লোক। ট্রেনে ওঠার পর থেকেই শুরু করেছিলেন—কি নাম আপনার? চ্যাটার্জী—বামুন। আপনার নাম? বসাক—তন্তুবায়। আপনি চন্দ্র না চন্দ? চন্দ্র—তাহলে সোনার বেনে। আপনি কি বললেন—সাধুখাঁ? তিলি। আপনি তো রায় বললেন? রায় বামুন, কায়েত, বদ্যি, বারুই, সাহা, নমশূদ্দুর, নাপিত, উগ্রক্ষত্রিয়, বেনে, মুচি সব আছে—আপনি কি? আপনি তো ঘোষ—গোয়ালা না কায়েত? এদেশী না ওদেশী? এইভাবে সমস্ত সহযাত্রীর জাতের খবর নিয়ে এসে বসলেন নিজের সিটে। আত্মতুষ্টির একটা মধুর হাসি ফুটে উঠলো বাঁধানো দাঁতে। তবে এই জাতবাবুর দুর্ভাগ্য, নিজের জাতটা বামুন কায়েত বদ্যির এক্তিয়ারভুক্ত হলো না। যদিও সুন্দর পোশাকের জাত গোপন করার প্রথা একটা প্রচলিত আছে ভ্রমণপথে, অপরিচিতের মধ্যে। এবার জাতবাবু বললেন, —আমি ব্যাঙ্কে চাকরী করতুম…

চাকরী জীবনে অবসর গ্রহণের পর যারা ভ্রমণে বেরিয়েছেন আর যারা কখনও কোথাও বেরোননি, তাদের কাছে বসলে আর কোন কথা নেই—সারাজীবনের ওই দশটা পাঁচটার গল্প। আমি এই করতুম সেই করতুম। অফিসের জন্য এই করেছি সেই করেছি। অফিসের সকলেই আমাকে ভালোবাসতো—শ্রদ্ধা করতো। কাজে কখনও ফাঁকি মারতুম না। যার জন্য আজও অফিসটা টিকে আছে। আজকাল কি আর কেউ কাজ করে? সব ফাঁকিবাজ। ফাঁকি মেরে পয়সা নেয়। আমাদের সময় ওসব ছিল না…

কথাগুলো শুনে ভাবলাম, সমাজে জাতবাবুর মতো যারা এমন অফিসের গল্প করেন তাদের দেখেছি, সবই করেছেন ভালো ভালো। দেশের জন্যে দশের জন্যে,

এমনকি সারা জগৎ সংসারের জন্যে। যা কিছু করেছেন তিনি ( ছেলেকে নিজের অফিসে ঢুকিয়ে ) সবই নিঃস্বার্থভাবে। নিজের ফাঁকির কথা একবারও বলেন না—বলেন না অন্যের পিছনে লেগে অতিষ্ঠ করে তোলার কথা।

সঙ্গীদের কথা শুনতে শুনতে সকালটা পার হয়ে গেল। গড়িয়ে গেল দুপুর। টুণ্ডলা জংশনও পেরিয়ে এসেছে তুফান। একরাত ট্রেনে কাটিয়ে পরদিন বিকেল পাঁচটায় এলাম আগ্রা ফোর্ট স্টেশনে। কলকাতা থেকে তুফান এলো ১২৬৪ কি. মি. পথ অতিক্রম করে।

রাজস্থান যেতে তুফান এক্সপ্রেসেই সুবিধা বেশী কলকাতার যাত্রীদের। দিল্লী থেকেও যাওয়া যায়। কলকাতা থেকে আসা যায় দিল্লী মেল আর দিল্লী এক্সপ্রেসে। নামতে হবে টুণ্ডলা জংশনে। তারপর প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধরে আগ্রা ফোর্ট।

## সাধুসঙ্গ—তুলসী-রুদ্রাক্ষের মাহাত্ম্যকথা

আগ্রা ফোর্ট স্টেশনের দুটো ভাগ আছে। একটা ব্রডগেজ—দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবনের লাইন। যে পথে এলাম কলকাতা থেকে। আর একটা হলো মিটার গেজ—যে পথে যাবো জয়পুর, আজমীর, চিতোরগড় ইত্যাদি হয়ে আমেদাবাদ। সংরক্ষিত বগিতে ঘুরবো। তাই কোন চিন্তা বা উদ্বেগ নেই। জয়পুরের ট্রেন রাতে। এখন অঢেল সময় রয়েছে হাতে। সময় কাটাতে স্টেশনের বাইরে কাছাকাছি একটু ঘুরে আবার এলাম স্টেশনে। লম্বা প্ল্যাটফরমে পায়চারী করতে গিয়ে নজর পড়লো এক সাধুবাবার উপর। বেঞ্চিতে বসে হেলান দিয়ে ঘুমোচ্ছেন পরম নিশ্চিন্তে। লম্বা একখানা লাঠি রয়েছে দু-হাঁটুর ফাঁকে। পাশেই জবুথবু করে গায়ের সঙ্গে লাগানো আছে ছোট্ট ঝুলিটা। আর কিছুই নেই।

সাধুবাবার পরনে গেরুয়া নয়, সাদা একখানা কাপড়। ময়লা হতে হতে সাদা ভাবটা আর নেই। ময়লা রঙটাই সৃষ্টি করেছে আর একটা রঙের। গায়ে ফতুয়া একটা, তার দশাও ওই কাপড়টার মতো। গাল ভর্তি পাকা দাড়ি। মাথাটা বেঞ্চে হেলান দেয়া তাই মুখটা হয়ে আছে একটু উপরমুখো। ভাঙা গালের জন্য নাকটাও বেশ উঁচিয়ে আছে উপর দিকে। বেঞ্চের মাঝে নয়, এক কোণে বসে আছেন সাধুবাবা। বয়েসে বৃদ্ধ। ৭০/৭৫-এর কম হবে বলে মনে হলো না। চওড়া কপাল। সামনের দিকটার চুল বেশ কিছুটা উঠে যাওয়ায় কপালটা যেন আরও চওড়া হয়ে গেছে। মাথায় জটা-টটা কিছু নেই—আছে মাঝারী লম্বা চুল। দীর্ঘকাল তেল না পড়লে চুলের রঙটা যেমন হয়, তেমনই খয়েরী সাদাটে ভাব। কপালে গোপীচন্দনের তিলক। বৈষ্ণবসাধু বলেই মনে হলো। আবার গলায় দেখছি রুদ্রাক্ষের মালা। ঘুমোচ্ছেন বিভোর হয়ে।

একেবারে কাছে দাঁড়িয়েই এসব দেখছি। গলা খাকারী দিয়ে একটু কাশলাম। ঘুম ভাঙলো না সাধুবাবার। দাঁড়িয়ে না থেকে পাশেই বসলাম। এবার সরাসরি পায়ে হাত দিতেই একটু চমকে উঠলেন। ঘুম ভেঙে গেল সাধুবাবার। দুহাত

—বাবা, আপকো কাঁহা জানে কা ট্রেন পকড়না হ্যায় ?
চোখদুটো দুহাতে কচলাতে কচলাতে লম্বা একটা হাই তুলে বললেন,
—মেরা বৃন্দাবন জানা হ্যায়। অভি ক্যা ট্রেন আয়া ?
হেসে বললাম,
—না বাবা, অভি বহুত দের হ্যায়।
সুযোগ হলো কথা বলার। এটাই চেয়েছিলাম আমি। তখন প্রণাম করিনি।
এবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই বৃদ্ধ সাধুবাবা বললেন,
—বেটা, প্রণাম নেওয়ার মতো যোগ্যতা আর ক্ষমতা, কোনটাই আমার নেই। তবুও বলি, 'সদা খুশ রহো বেটা, সদা খুশ রহো।'
আমরা দুজনেই বসে আছি বেঞ্চে আর কেউ নেই। আপাতত এখন কোন ট্রেনও নেই—না আপ-এ, না ডাউনে। তাই স্টেশনে ভীড়টা এখন কম। ইতস্তত লোক চলাচল করছে। কেউ কেউ বসে আছে বাক্স প্যাটরা নিয়ে আমরা যেখানে, তার থেকে থেকে একটু দূরে। জানতে চাইলাম,
—বাবা, এখন কোথা থেকে এসেছেন, যাবেনই বা কোথায় ?
প্রসন্ন মনেই সাধুবাবা বললেন,
—গেছিলাম দ্বারকাতে। ওখান থেকেই এসেছি। যাবো বৃন্দাবনে। ওখানে থাকবো কিছুদিন। তারপর গুরুজী যেখানে নিয়ে যায় সেখানেই যাবো। কয়েক রাত ভালো ঘুম হয়নি। তাই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এখানে।
কথাটা বলে ক্লান্তি মেশানো একটা হাই তুললেন। আমিও ধীরে ধীরে ঢুকতে লাগলাম সাধুবাবার ভিতরে,
—বৃন্দাবনেই কি আপনার ডেরা, না অন্য কোথাও ?
সঙ্গে সঙ্গেই হাতটা নাড়িয়ে মুখে বললেন,
—না না বেটা, কোথাও কোন ডেরা নেই আমার। এত খোলা জায়গা পড়ে থাকতে আর ডেরার দরকার কি ?
প্রথম দেখার কৌতূহল মেটাতে এবার জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা, কপালে আপনার তিলকস্বরূপ দেখে মনে হচ্ছে আপনি শ্রী সম্প্রদায়ের সাধু। বৈষ্ণবদের কোন্ সম্প্রদায় কি ধরনের তিলকস্বরূপ করেন তা আমার একটু জানা আছে বলেই বললাম।
কথাটা শুনে ঘাড়টা একটু নেড়ে বললেন,
—হাঁ বেটা, আমি শ্রী সম্প্রদায়ের সাধু।
সঙ্গে সঙ্গেই বললাম,
—এই প্রসঙ্গে একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে আমার। সেটা হলো, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধু আপনি। অথচ দেখছি গলায় তুলসীমালা না পরে ধারণ করেছেন রুদ্রাক্ষের মালা—কেন ? বৈষ্ণব সাধুদের কাউকেই তো কখনও দেখিনি রুদ্রাক্ষের

মালা ধারণ করতে।
আমার প্রশ্নটা শুনে হেসে ফেললেন সাধুবাবা। উল্টে জিজ্ঞাসা করলেন,
—কেন বেটা, বৈষ্ণবদের কি রুদ্রাক্ষ ধারণ করতে নেই? এমন কথা কি কোন শাস্ত্রে লেখা আছে?
আমিও হাসি হাসি মুখ করে বললাম,
—ধারণের ব্যাপারটা আমার ঠিক ধারণায় নেই। আপনার মধ্যে বিপরীত ভাব দেখেই কৌতূহলবশত জিজ্ঞাসা করেছি।
এতক্ষণ পা ঝুলিয়েই বসেছিলেন সাধুবাবা। এবার বেঞ্চের উপর পা তুলে বসলেন বাবু হয়ে, আমার দিকে মুখ করে। ডান পা মুড়ে আর বাঁ পা ঝুলিয়ে আমিও একটু ঘুরে বসলাম সাধুবাবার দিকে। যাত্রীদের অনেকেই আমাদের দিকে তাকাতে তাকাতে চলে যাচ্ছেন। এ-ব্যাপারে সাধুবাবার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। এবার সাধুবাবার উজ্জ্বল চোখদুটো আমার দু-চোখে রেখে বললেন,
—তোর বাড়ী কি ইউ. পি.? থাকিস্ কোথায়, এখান থেকে যাবিই বা কোথায়?
কথাটা শুনে মনে হলো, সাধুবাবা আমাকে হিন্দী ভাষাভাষির লোক ভেবেই কথাটা বললেন। তাই প্রথমে আমার উদ্দেশ্যের কথাটা বলে পরে বললাম,
—না বাবা, আমি ইউ. পি-র লোক নই। থাকি কলকাতায়। আমি বাঙালী।
হাসিমাখা মুখেই বললেন,
—তুই 'বঙ্গাল' থেকে এসেছিস্। তা ভালো। আমি একবার গেছিলাম তোদের 'বঙ্গালে' গঙ্গাসাগর মেলায়। প্রায় ত্রিশ বছর আগে। 'বহুত' কষ্ট হয়েছে। ওখানে সাধুদের থাকা খাওয়ার কোন ভালো ব্যবস্থাই নেই। কেউ নজর দেয় না সাধুদের দিকে, কেউ ভাবেও না তাঁদের কষ্টের কথা।
সাধুবাবার অভিযোগকে স্বীকার করে নিয়েই বললাম,
—হ্যাঁ বাবা, ঠিকই বলেছেন আপনি। তখন ব্যবস্থাটা মোটেই ভালো ছিল না। এখন যে খুব একটা ভালো, তাও বলবো না। তবে আগের থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থা আর অন্যান্য অবস্থার উন্নতি হয়েছে বেশ কিছুটা। কারণ আমি নিজেও গেছি বেশ কয়েকবার।
মূল প্রসঙ্গ থেকে সরে আসায় আমি আর দেরী না করেই বললাম,
—বাবা, কথা হচ্ছিলো রুদ্রাক্ষ ধারণের বিষয় নিয়ে। ওই বিষয়ে কিছু বলবেন দয়া করে?
'হ্যাঁ বেটা, বলবো' বলে তিনি বললেন,
—জাতিধর্ম নির্বিশেষে যেকোন সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসী, যেকোন সম্প্রদায়ের নারীপুরুষই রুদ্রাক্ষ ধারণ করতে পারে। এতে অশেষ কল্যাণ হয়। বিশ্বাস করে ধারণ করলেও ফল হবে, অবিশ্বাস করে ধারণ করলেও এর ফল হবে। বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব বা গাণপত্য সম্প্রদায় বলে কোন কথা নেই। এই রুদ্রাক্ষের যে কি মাহাত্ম্য তা তোকে বলেও শেষ করতে পারবো না।

তবে আমার বিড়ির মাহাত্ম্য যে কি—সাধুসঙ্গের সময়েই বুঝেছি। পকেট থেকে বের করে একটা এগিয়ে দিতেই তিনি কোন অনিচ্ছা প্রকাশ না করেই নিলেন। ঠোঁটে ধরতেই ধরিয়ে দিলাম আমি। ফুক্ ফুক করে টানলেন কয়েকবার। তারপর লম্বা একটা টান দিয়েই বৈষ্ণব সাধুবাবা বললেন,
রুদ্রাক্ষের গুণ আর মাহাত্ম্যকথা শুনেছি আমি গুরুমুখেই। বৈষ্ণব হলেও রুদ্রাক্ষে ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস। এই রুদ্রাক্ষ প্রসঙ্গে তিনি আমাকে শাস্ত্রীয় কথাই বলেছেন আর আদেশও দিয়েছেন ধারণ করতে। সেইজন্যেই তো ধারণ করেছি।
এই পর্যন্ত বলে তিনি আবার টান দিলেন বিড়িতে। কোন কথা বললাম না। বললেন সাধুবাবাই,
—বেটা, রুদ্রাক্ষ ধারণ করতে যে লজ্জা পায় তার পার্থিব বন্ধনমুক্তি হয় না। বহুবার তাকে জন্ম নিতে হয় এই সংসারে। আর রুদ্রাক্ষ দেখে অথবা ধারণকারীকে দেখে যে নিন্দা বা অবজ্ঞা করে, গুরুজী বলতেন, শাস্ত্রে তাকে জারজ বলা হয়েছে। যেকোন জায়গায়, যেকোন নারীপুরুষ শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধায়, ইচ্ছা বা অনিচ্ছায়, মন্ত্রপূত অথবা মন্ত্রপূত না হলেও কিছু যায় আসে না, রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে সমস্ত পাপ দূর হয়ে ধীরে ধীরে ভগবদ্‌জ্ঞান লাভ হয়। একইসঙ্গে তাকে আর কোন পাপই স্পর্শ করে না। মৃত্যুকালে কোন ব্যক্তির রুদ্রাক্ষ ধারণ করা অবস্থায় যদি মৃত্যু হয়, তাহলে তার পুনর্জন্ম হয় না। বেটা, এ-কথা শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই নয়, কোন পশুর গলায়ও রুদ্রাক্ষ থাকাকালীন মৃত্যু হলে সেও মুক্তিলাভ করে। তবে একটা কথা আছে, একমাত্র গুরু ছাড়া অন্যের ব্যবহার করা রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে কোন ফলই হয় না, আর ফল হয় না মেয়েদের রজস্বলা অবস্থায় ধারণ করলে। রজস্বলা মুক্ত হয়ে ধারণ করলে আর কোন নিয়ম নেই।
আমাদের কথায় এসে বিরক্ত করছে না কেউই। অনেকেই পাশ দিয়ে যাচ্ছে দেখতে দেখতে। আমরা তাদের দেখেও দেখছি না। বিড়িতে দুটো টান দিয়েই বললেন,
—যেকোন দিন যেকোন সময়েই রুদ্রাক্ষ ধারণ করা চলে। তবে দেবপর্ব তিথি, যেমন অক্ষয় তৃতীয়া, গুরুপূর্ণিমা, দশহরা, জন্মাষ্টমী, দুর্গাপুজোর বোধন থেকে দশমী, কালীপুজো, দোলপূর্ণিমা, রামনবমী ইত্যাদি এবং অমাবস্যা, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ চলাকালীন রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে রুদ্রাক্ষ দ্রুত ফলপ্রদ এবং সমস্ত পাপ দূর হয়। বেটা, গুরুজী বলতেন, শাস্ত্রে আছে সমস্ত মুনিদের মধ্যে কশ্যপ, গ্রহদের মধ্যে সূর্য, নদীর মধ্যে গঙ্গা এবং দেবীর মধ্যে যেমন দুর্গাই শ্রেষ্ঠ তেমনই সমস্ত মালার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো রুদ্রাক্ষ। কেউ যদি ১০৮টা রুদ্রাক্ষের মালা সর্বদা ধারণ করে তবে সে প্রতিদিন অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করে।
একটু থামলেন সাধুবাবা। বিড়িটা নিভে গেছে। অন্যমনস্কভাবেই ফেলে দিয়ে বললেন,
—বেটা শুনলে তুই অবাক হবি, গুরুজীর মুখেই শুনেছি, যেকোন নারী বা পুরুষ সে সাধু-সন্ন্যাসীই হোক অথবা গৃহী—১০০০ রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ

করলে মন তার এমনিতেই বৈরাগ্যময় হয়ে উঠবে, আর দেবতারাও তাকে আনন্দিত হয়ে প্রণাম করে।

সাধুবাবার কথাটা শোনামাত্রই মনে পড়ে গেল তিনজনের কথা। কাশীতে তৈলঙ্গস্বামীর আশ্রমে তৈলঙ্গস্বামী, পুরীতে গির্ণারীবস্তে অদ্বৈত ব্রহ্ম আশ্রমে নাঙ্গাবাবা (তোতাপুরী) এবং উত্তরপ্রদেশের নৈমিষারণ্যে স্বামী নারদানন্দ তীর্থ ১০০০ রুদ্রাক্ষের মালা জপ এবং ধারণ করতেন। যে মালাগুলি দেখেছি আজও যত্নের সঙ্গে রাখা আছে ওই সব আশ্রমে। ভাবলাম, সত্যিই এঁরা দেবতার প্রণাম পাওয়ার যোগ্য। ভাবলামই মাত্র, কোন কথা বললাম না। কথায় ছেদ পড়লে কথার খেই হারিয়ে যায়—তাই। সাধুবাবাই বললেন,

—বেটা, স্নান দান কিংবা জপের সময়, হোম শ্রাদ্ধ অথবা দেবতার পুজোয়, দীক্ষা বা প্রায়শ্চিত্তের সময়ে দেহে রুদ্রাক্ষ ধারণ করা কর্তব্য। মাথায় রুদ্রাক্ষ রেখে প্রতিদিন স্নান করলে নিত্য গঙ্গাস্নানের ফললাভ হয়। রুদ্রাক্ষ ধারণকারীকে কেউ যদি ভক্তিভরে বস্ত্র অথবা অন্নদান করে কিংবা তার পা ধুয়ে জল পান করে—তাহলে মৃত্যুর পর সে শিবলোক প্রাপ্ত হয় সমস্ত পাপ মুক্ত হয়ে। রুদ্রাক্ষ ধারণ করে আছে এমন কোন ব্যক্তিকে যদি কেউ শ্রাদ্ধের ভোজন করায় তবে সেও শিবলোকে গমন করে। বেটা, রুদ্রাক্ষ দর্শন করলেও পুণ্য হয়। স্পর্শে কোটি পুণ্য—ধারণে ফল দ্বিগুণ আর অনন্ত ফল এবং মুক্তিলাভ হয় প্রতিদিন জপ করলে। একেবারে ভক্তিহীন এবং সর্বদা পাপ কাজে লিপ্ত আছে এমন ব্যক্তিও পার্থিব জীবনের বন্ধনমুক্ত হয়, যদি সে কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ ধারণ করে থাকে।

সাধুবাবার মুখে রুদ্রাক্ষের মাহাত্ম্য কথা যত শুনছি, ততই বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিহীন বলে মনে হচ্ছে। ভাবছি, অন্যায় আর পাপ কাজ করবো আমি আর রুদ্রাক্ষ ধারণমাত্রই তা থেকে মুক্ত হয়ে যাবো—এ-কেমন কথা! এমন যদি হয় তাহলে তো যমালয় ফাঁকাই পড়ে থাকবে। কোন লোকই হবে না দণ্ড পাবার। যমরাজের চাকরীটাও যে চলে যাবে। এই কথাগুলো যেইমাত্র ভেবেছি, সঙ্গে সঙ্গেই সাধুবাবা যেন অন্তর্যামী, বললেন,

—বেটা, এই বিশ্বসংসারে ভগবান যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে একটা কার্যকরী শক্তিও নিহিত করে দিয়েছেন। যারজন্য সংসারে কোন জিনিষই উপেক্ষা বা অবজ্ঞার বস্তু নয়। প্রতিটি দ্রব্যেরই কিছু না কিছু গুণ আছে। বিছুটি গাছ দেখেছিস্? পথের ধারে, জঙ্গলে এখানে সেখানে হয়। ওই গাছের এমনই কার্যকরী শক্তি যে গায়ে লাগলেই চুলকাবে, জ্বালা করবে। এ-কাজটা কেউ বিশ্বাস করলেও হবে, বিশ্বাস না করলেও হবে।

একটু থেমে গেলেন সাধুবাবা। একবার এদিক ওদিক তাকালেন। কি যেন ভাবলেন। কাটলো মিনিটখানেক। তারপর আবার শুরু করলেন,

—নিমপাতা তো দেখেছিস্। দেখলে বোঝা যায় না, খেলেই বোঝা যায় ওটা তিতো। ওটা গাছেরই গুণ। আখেরেও ওতে অনেক কাজ হয়। রক্ত পরিষ্কার

করে। নিমপাতার জল দিয়ে স্নান করলে চুলকানি ভালো হয়। প্রকৃতির বুকে এমন অসংখ্য গাছ, ফল, ফুল আর বস্তু আছে—যার কিছু না কিছু গুণ আছেই। ব্যবহার করলেই তা বোঝা যায়। আবার এমন অনেক দ্রব্য আছে যার গুণ বা অন্তর্নিহিত শক্তির কথা সাধারণ মানুষের জানা নেই। অথচ তার এমনই শক্তি যা মানুষের বুদ্ধির অগম্য। এসব শক্তির কথা মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না। এ-শক্তির কথা প্রাচীন ভারতের ত্রিকালদর্শী ঋষিরা প্রত্যক্ষ করেছেন ইন্দ্রিয়াতীত শক্তির মাধ্যমে। তাঁরা বলেছেন জীবের কল্যাণের জন্য। ও শক্তি তোরও নেই—আমারও নেই। তাই নতুন করে আমরা কেউ কিছুই করতে পারছিনা—পারছি না কিছু বলতেও।

এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। তারপর তাকালেন আমার মুখের দিকে। বললেন,

—বেটা, যার জন্যেই তো প্রাচীন ঋষিবাক্যকে বলে আপ্তবাক্য। ভ্রম ও প্রমাদশূন্য অথচ প্রামাণিক বাক্যকেই তো আপ্তবাক্য বলে। তাঁদের কথা যারা বিশ্বাস করে, তাঁদের বলা পথ অনুসরণ করে যারা চলে, তাদের লাভ ছাড়া ক্ষতি কিছু হয় না। যারা শোনে না—চলে না, তারা যেমন চলছিল তেমনই চলে। লাভটুকু আর হয় না। এবার বলি, রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। প্রশ্ন করবি, তাই যদি হয় তাহলে রামজী অত ঝামেলা করে অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে গেছিলেন কেন? একটা রুদ্রাক্ষ ধারণ করলেই তো সমস্যাটা মিটে যেত, ঠিক কিনা বল্?

যুক্তিপূর্ণ কথাটা বেশ মনে ধরলো। সজোরে ঘাড়টা নেড়েও দিলাম। প্রসন্ন অথচ গম্ভীরভাবেই সাধুবাবা বললেন,

—ভগবান যাকে যে ক্ষমতা এবং গুণ দিয়েছেন তা সৃষ্টির প্রয়োজন এবং বিকাশের জন্য। গুণ, সামর্থ্য এবং কর্মভেদে তোর যে কাজ শোভা পায়, অন্যের তা পায় না। আবার অন্যের যে কাজ শোভা পায়, তোর তা পায় না। রাম রাজা। তার অশ্বমেধ যজ্ঞই শোভা পায়। রুদ্রাক্ষ ধারণ করে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভে শোভা পায় না বলেই তো তিনি ওই যজ্ঞ করেছিলেন মহাসমারোহে। বেটা, দীক্ষিত হয়েও গৃহীরা এমন সব কর্মে লিপ্ত হয় যা কোনমতেই শোভনীয় নয়। তবুও তারা করে—গৃহী বলেই করে। কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসীদের কি সে আচরণ বা কাজ শোভা পায়? অথচ দেখ, উভয়পক্ষই কিন্তু গুরুশক্তিতে শক্তিমান। মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও এক। ফললাভ যেটা হবে সেটাও কিন্তু এক ও অভিন্ন। অথচ উভয় পক্ষেরই জীবনপ্রবাহ সম্পূর্ণ আলাদা।

এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা চুপ করে রইলেন। আমি শুনলাম, জিজ্ঞাসা করলাম না কিছু। কেটে গেল মিনিটকয়েক। তবুও কিছু বলছেন না দেখে বললাম,

—বাবা, আপনি কি আমার প্রতি অপ্রসন্ন হয়েছেন? সামান্য জ্ঞানটুকুও আমার নেই। অজ্ঞানতাবশত কোন মানসিক অপরাধ যদি করে থাকি, নিজগুণে ক্ষমা

করে আপনি আবার আগের কথায় ফিরে যান দয়া করে।

বলেই প্রণাম করলাম পায়ে হাত দিয়ে। প্রণাম করলাম এই কারণে, নইলে আলোচনাটা বন্ধ হয়ে যাবে। জানা যাবে না অনেক কথাই। ভাবলাম, একজন সাধু—তাঁর বক্তব্য সত্য মিথ্যা যাই হোক না কেন, তাঁর সারাজীবন চলার পথের যে অভিজ্ঞতা, তার মূল্য কি কম? এই মুহূর্তে তা হারাতে আমি রাজী নই। তাই প্রণাম করলাম। আমার মুখের দিকে এক পলক তাকিয়েই সাধুবাবা বললেন,

—বেটা, তোকে উদ্দেশ্য করে বলছি না। তবে মনে রাখবি, বাহ্যত দেহ কোন কাজ না করলেও, দেহকে কোন কাজে না লাগালেও মনে কোন কামনা বাসনা বা ভাবনার উদয় হলেও জানবি তা ইন্দ্রিয়েরই একটি কর্ম। বাইরে সংযমী দেখা যায় একশো জনের মধ্যে একশো জনকেই। বাইরে সংযম দেখালেও মনে বা অন্তরে কোন শুভবিরুদ্ধ ভাবনা বা বাসনার উদয় হলে সে মানুষ মিথ্যাচারী হয়।

এ-কথা যে কাকে বললেন তা বুঝতে আমার আর বাকি রইলো না। এই মুহূর্তে আর কিছু ভাবলাম না। তাহলে শুনতে হবে আরও অনেক কথা। বাদ পড়ে যাবে মূল প্রসঙ্গ। ট্রেন এসে গেলে তো উঠতেই হবে। তাই চুপ করে রইলাম কথা না বাড়িয়ে। সাধুবাবাই বললেন,

—ছাড়্ ওসব কথা। শোন্ রুদ্রাক্ষ ধারণ করে পান এবং খাওয়া দাওয়া যা কিছু করলে তা স্বয়ং মহাদেবই করেন জানবি। শুধু তাই নয় বেটা, যেসব বস্তু দেখা উচিত নয়, যে কথা বলা বা স্মরণ করা একেবারেই অনুচিত, যে দ্রব্য খাওয়া এমনকি যার ঘ্রাণ নেয়া ঠিক নয়, যে কাজ কখনও কোন মানুষেরই করা কর্তব্য নয়—এ-রকম সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায় যদি রুদ্রাক্ষ ধারণ করা থাকে। ভগবান শংকরকে সরস্বতী ভেবে কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে বিদ্যালাভের বাধা দূর হয়। শুনলে অবাক হবি, রুদ্রাক্ষ ধারণকারী ব্যক্তি অর্থ অন্ন আর বস্ত্র কষ্ট পায় না কখনও। মানুষ আর্থিক দৈন্যতা থেকেও মুক্ত হতে পারে রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে।

এক নাগাড়ে এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা একটু থামলেন। এক মনে শুনে যাচ্ছি সাধুবাবার কথাগুলো। এমন সহজে সাধুবাবাকে, পেয়ে এসব কথা শুনতে পাবো, ভাবিনি। তাই মনটা আমার আনন্দে ভরে উঠেছে। আবার শুরু করলেন,

—বেটা, সমস্ত পাপ আর ক্লেশ দূর হয় রুদ্রাক্ষ ধারণ করার সময় মুখে মহাদেবের নাম উচ্চারণ করলে। সাংসারিক এবং পারমার্থিক কল্যাণ যারা চায়, তাদের রুদ্রাক্ষ ধারণ করা একান্ত কর্তব্য। রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে মানুষ ভগবদ্ ভক্ত হয়। অসাধারণ তেজ বৃদ্ধি পায়। আর ধারণকারী ব্যক্তির সঙ্গে মহাদেব সর্বদাই থাকেন, কারণ রুদ্রাক্ষ তাঁর অত্যন্ত প্রিয়বস্তু যা ছেড়ে তিনি কখনই থাকতে পারেন না। রুদ্রাক্ষের মধ্যেই তিনি অবস্থান করেন। সেই শিবমন্দিরে তিনি কখনই বিরাজ করেন না, যেখানে রুদ্রাক্ষবিহীন শিব প্রতিষ্ঠিত আছে। শিবলিঙ্গ অথবা শিবমূর্তিহীন গৃহে, মন্দিরেও তিনি নিত্য অবস্থান করেন যদি সেখানে একটি মাত্রও রুদ্রাক্ষ পড়ে থাকে।

আমার সঙ্গীরা সব বসে আছেন মিটারগেজ প্ল্যাটফরমে। আমি বসে আছি সাধুবাবার সঙ্গে ব্রডগেজ প্ল্যাটফরমে। এখন মনটা আমার কোনদিকেই নেই। সাধুবাবাও কথা বলছেন স্থিরভাবে বসে। এবার বললেন,

—বেটা, রুদ্রাক্ষের মুখ থাকে অনেকগুলো। তবে পঞ্চমুখ রুদ্রাক্ষই পাওয়া যায় বেশী। ভগবান শংকরের সবচেয়ে প্রিয় হলো পঞ্চমুখ রুদ্রাক্ষ। আসলে তিনি যে নামেও পঞ্চানন।

কথাটা বলে সাধুবাবা একটু খুশীর হাসি হাসলেন। হাতজোড় করে কপালে ঠেকিয়ে একবার নমস্কারও করলেন। মনেই হলো, বৈষ্ণবসাধু নমস্কার জানালেন পঞ্চানন মহাদেবের উদ্দেশ্যে। আবার শুরু করলেন,

—রুদ্রাক্ষের মাহাত্ম্যকথা যে সব বললাম তা জানবি, সব ধরনের রুদ্রাক্ষের ক্ষেত্রেই, সেটা একমুখীই হোক আর পাঁচ সাত আট দশমুখীই হোক, ফল আর মাহাত্ম্য সবেরই এক। তবে বিভিন্ন রুদ্রাক্ষের মুখভেদে অতিরিক্ত ফল কিছু আছে। যেমন ধর্ একমুখী রুদ্রাক্ষের কথা। কোন মানুষ যদি একমুখী রুদ্রাক্ষ ধারণ করে সে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে। গুরুজীর মুখে শুনেছি এ রুদ্রাক্ষ অতি দুর্লভ। এত বছরের এই পরিভ্রমণ জীবনে আমি নিজেও দেখিনি কখনও। আমার গুরুজীও দেখেননি। দাদা গুরুজীও নয়। একমুখী রুদ্রাক্ষ হয় না বলবো না—না হওয়ারই মতো। তবে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে আজকাল দেখতে পাবি, ওগুলো সব নকল। হাতে তৈরী করে নিখুঁতভাবে। গৃহীদের কাছে দু-দশটাকার বিনিময়ে বিক্রি করে নিজের পথ খরচা সংগ্রহের জন্যে।

একটু থামলেন। মিনিট কয়েকমাত্র। তাকালেন একবার ডাইনে বাঁয়ে সামনে। তারপর বললেন,

—দুটো মুখ আছে এমন রুদ্রাক্ষ কেউ ধারণ করলে তার প্রতি সমস্ত দেবদেবীরা প্রসন্ন হন। ধারণকারীও থাকে সদা প্রসন্নচিত্তে। তিনমুখী রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে প্রীত হন স্বয়ং ব্রহ্মা। এই রুদ্রাক্ষ ধারণে ধারণকারীর কখনও অগ্নিভয় থাকে না। সাধারণ এবং সচরাচর পাওয়া যায় যে রুদ্রাক্ষ, তার থেকে চারটে অতিরিক্ত গুণ বেশী আছে চারমুখী রুদ্রাক্ষে। এই রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে ধারণকারীর লক্ষ্মীলাভ, রোগ-আরোগ্য, ভগবদ্‌জ্ঞান লাভ আর মন অতি শুদ্ধ নির্মল ও পবিত্র হয়। একই ফল পাওয়া যায় সাতমুখী রুদ্রাক্ষতেও। পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে স্বয়ং মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে সদা সর্বদাই বিরাজ করেন তার সঙ্গে।

এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন,

—বেটা, এই পর্যন্তই থাক্। আরও বহুমুখী রুদ্রাক্ষ আছে যেগুলো সচরাচর পাওয়া যায় না। সেগুলোর কার্যকরী শক্তির কথা জেনে তোর কোন লাভ নেই।

সঙ্গে সঙ্গেই সাধুবাবার পায়ে দুটো হাত রেখে বললাম অনুরোধের সুরেই,

—বাবা, এখন হয়তো আমার কোন কাজে লাগবে না, ভবিষ্যতেও তো কোন কাজে লাগতে পারে। আর আপনাদের মতো মহাত্মারা যদি এ-বিষয়গুলো না বলেন

তাহলে জানবো কি করে? হয়তো পুরাণের কোথাও না কোথাও লেখা আছে। সব শাস্ত্র-পুরাণ পড়ে সব কথা জানা কি একটা মানুষের পক্ষে সম্ভব? আর শাস্ত্র পড়ে কোন বিষয় জানা এক জিনিষ, আর শাস্ত্র পড়ে ব্যক্তিগতভাবে সাধন-জীবনে থেকে তা উপলব্ধি করে বা গুরুমুখ থেকে শুনে বলা আর এক জিনিষ। দয়া করে বলুন না বাবা।

কথাটা শুনে সাধুবাবা একটু দমে গেলেন মনে হলো। পা থেকে আমার হাতদুটো আলতোভাবে সরিয়ে দিয়ে আবার শুরু করলেন,

—বেটা, যে রুদ্রাক্ষের ছটা মুখ আছে সেই রুদ্রাক্ষের মধ্যে মহাদেবের সঙ্গে সর্বদাই অবস্থান করেন গণেশজী। যিনি এই রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন, তার প্রতি গণেশজী অত্যন্ত প্রসন্ন ও প্রীত হন। সমস্ত কাজেই তিনি সিদ্ধি দান করেন সর্বদা সঙ্গে থেকে। শুধু সাংসারিকজীবনে ভোগের সিদ্ধিই নয়, অধ্যাত্মজীবনের সিদ্ধিলাভেও সহায়তা করেন। আটমুখী রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে প্রীত হন গঙ্গাদেবী। গঙ্গা স্নান না করলেও নিত্য গঙ্গাস্নানের ফল পাওয়া যায়। বিশেষ তিথি নক্ষত্র ও যোগে (করতোয়া স্নান, গোসহস্রী, দশহরা, ব্যতীপাত স্নান, মহাজয়া স্নান, রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত প্রতিপদি, গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান, রটন্তী চতুর্দশী স্নান, মাকরী সপ্তমী স্নান) গঙ্গাস্নানের যে ফল, আটমুখী রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে ওই একই ফললাভ হয় স্নান না করেও। একইসঙ্গে ধারণকারী থাকে সর্বদা সন্তুষ্টচিত্তে, আনন্দে। বেটা, নয়মুখী রুদ্রাক্ষ জানবি সাক্ষাৎ যম। ধর্মরাজ যম সর্বদা সঙ্গী হয়ে থাকেন ধারণকারীর। অধর্মের কোন কাজেই লিপ্ত হতে দেন না তাকে। অসীম ক্ষমতালাভও করে থাকে। ধারণকারীর মৃত্যুভয়ও থাকে না। পার্থিব জীবনে ভোগ এবং পরে মুক্তি, উভয়েরই অধিকারী হয় নয়মুখী রুদ্রাক্ষ ধারণকারী।

একটু থামলেন। মিনিট খানেক। তারপর আবার বললেন,

—বেটা, দশমুখী রুদ্রাক্ষও বড় দুর্লভ। এই রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে দশদিকের সকল দেবদেবীরা প্রীত হন ধারণকারীর উপর। দশদিকের বাধা আর বিপদমুক্ত করে দেবতারা সকল কাজেই জয়লাভ করান। ধারণকারীর উপর গ্রহ ভূতপ্রেত পিশাচের উপদ্রব হয় না কখনও। তারা খুশী হয়ে রক্ষা করে, যে ব্যক্তি দশমুখী রুদ্রাক্ষ ধারণ করে।

এবার থামলেন। অনেক বয়েস হয়েছে, তাই বলতে বলতে মনে হলো হাঁপিয়ে উঠছেন। নিঃশব্দে একটা বিড়ি বের করে ধরিয়ে দিলাম সাধুবাবার হাতে। নিলেন তবে কোন কথা বললেন না। আমিও নয়। বেশ আমেজের সঙ্গে কয়েকটা টান দিয়ে বললেন,

—বেটা, কোন রোগব্যাধির ভয় থাকে না কেউ যদি এগারোমুখী রুদ্রাক্ষ ধারণ করে। কোন কঠিন ব্যাধিতে সে ভুগবে না কখনও। বেঁচে থাকবে যতদিন, নিরোগ হয়েই বেঁচে থাকবে। আর কোন বিষয়েই কোন মনোকষ্ট পায় না এগারোমুখী রুদ্রাক্ষ ধারণকারী ব্যক্তি। একমাত্র সুখই তার নিত্যসঙ্গী। বারোটা মুখ আছে

এমন রুদ্রাক্ষও অতি বিরল। সাক্ষাৎ মহাবিষ্ণু। এই রুদ্রাক্ষের মধ্যে মহাদেবের সঙ্গে অবস্থান করেন স্বয়ং মহাবিষ্ণু। ধারণকারীর সঙ্গে সর্বদাই সঙ্গী হয়ে থাকেন তিনি। বারোমুখী রুদ্রাক্ষের চেয়েও দুর্লভ হলো তেরোমুখী রুদ্রাক্ষ। বেটা, পার্থিব এবং অপার্থিব উভয় জীবনের সর্বপ্রকার কাম ও সিদ্ধিপ্রদ এই রুদ্রাক্ষ। শুনলে তুই ভেবেও কুলকিনারা পাবি না, এই রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে যোগ ধ্যান জপ তপস্যা কিছু না করলেও আপসে অষ্টসিদ্ধিলাভ হয়। বারোমুখী রুদ্রাক্ষ ধারণকারীর উপর সর্বদাই প্রসন্ন থাকেন কামদেব। আর চোদ্দটা মুখ আছে এমন রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে সমস্ত রোগ আরোগ্য এবং চোখ থেকে উৎপন্ন সমস্ত ব্যাধি থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা বললেন,

—বহুমুখী রুদ্রাক্ষের বহুফলের মধ্যে আমার জানা আছে এইটুকুই। আর কিছু মনে পড়ছে না এখন।

তবুও অনেক কথাই জানতে পারলাম। আপাতত এতেই আমি খুশী। তবে একটা কথা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, চোখ থেকে উৎপন্ন ব্যাধি বলতে কি আপনি চোখ খারাপ, ছানি বা অন্ধত্বের কথা বলছেন?

কথাটা শুনে সাধুবাবা হেসে ফেললেন। কুঁচকে যাওয়া গালে শিশুর মতোই হেসে উঠলেন খিল্‌খিল্ করে। হাসির রেশটা মিলিয়ে গেল না। ওই রেশটা সারামুখে নিয়েই বললেন,

—বেটা, বেশ সহজেই মানেটা তুই ধরে ফেলেছিস্ দেখছি!

বলে আবার হাসলেন। তারপর হঠাৎ বেশ গম্ভীর হয়ে উঠলেন। এ-গম্ভীরতায় মোটেই চাপা পড়লো না মুখ ও মনের প্রসন্নতা। তা পরিষ্কারই ফুটে রয়েছে সারা মুখখানায়। এবার বললেন,

—বেটা, সব রোগ থেকে আরোগ্য বা মুক্ত হলে কি চোখটা বাদ দিয়ে হবে? চোখ থেকে উৎপন্ন ব্যাধি বলতে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট বা ছানি পড়া এসব কিছু নয়। প্রতিটি নারীপুরুষেরই চোখ থেকে প্রায় প্রতি মুহূর্তে নানা ব্যাধি উৎপন্ন হয়ে রোগগ্রস্থ ও মলিন করে রেখেছে তাদের দেহ মন বুদ্ধি ও চিত্তকে। যেমন ধর্ যেকোন দ্রব্য, বিষয় বা বস্তু দেখামাত্রই খেতে বা পেতে ইচ্ছা করা, সুন্দর নরনারী একে অপরকে দেখে আকর্ষিত হওয়া বা দেহকে দেখে মনে মনে ভোগমূলক চিন্তা করা, কারও শ্রী—সে ভালো বা খারাপ যাই হোক না কেন, তা দেখে বিরূপ হওয়া বা ঘৃণা করা, এক কথায় বেটা এই সংসারে দেখামাত্র সুস্থ ও সত্ত্বগুণচিন্তার বাইরে যেসব চিন্তাভাবনা মানুষের দেহমনকে কলুষিত করে, সেগুলোকেই চোখ থেকে উৎপন্ন ব্যাধি বলে। এই ব্যাধিতে আক্রান্ত সংসারের প্রায় প্রতিটি মানুষই। মনের ব্যাধির জন্মই তো চোখ থেকে। দেখে বলেই তো পাওয়ার বাসনা। সে বাসনা অতি ক্ষুদ্র অথবা বড় যাই হোক না কেন, আর তা পূরণের জন্যই তো মানুষ সর্বদাই

ছুটে চলেছে সত্ত্বগুণের বিসর্জন দিয়ে। নষ্ট করে চলেছে পরম শান্তি, আর এই-ই তো চলেছে সারা জগৎসংসার জুড়ে।

এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, রুদ্রাক্ষ ধারণের আর কোন নিয়ম বা অন্য কোন গুণ আছে কি?

মাথাটা একটু নেড়ে বললেন,

—না, এমনি আর কোন নিয়ম নেই। তবে আর একটু কথা আছে। স্তোত্রপাঠ এবং ব্রত উপবাস ইত্যাদি করলে যে ফল পাওয়া যায়, একমাত্র রুদ্রাক্ষ ধারণে ওই একই ফললাভ হয়। যজ্ঞ, দান, ধ্যান, তপস্যা, শাস্ত্র গ্রন্থাদি পাঠ করলে যে পুণ্য হয়, একমাত্র রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে সেই ফল পাওয়া যায় সদ্য। কোন ভূতপ্রেত পিশাচ আর অশুভ আত্মার দৃষ্টি পড়ে না, যদি দেহে রুদ্রাক্ষ ধারণ করা থাকে। মোটামুটি এ-টুকু জেনে রাখলেই তোর কাজ চলে যাবে। আসলে কি জানিস্ বেটা, ভগবান শংকরের চোখের জল থেকেই সৃষ্টি হয়েছে রুদ্রাক্ষ। যারজন্যেই তো এর এত মাহাত্ম্য।

রুদ্রাক্ষের গুণ আর মাহাত্ম্যকথা শোনার পর মাথায় এলো তুলসীকাঠের মালার কথা। বৈষ্ণবসাধু নিশ্চয়ই এ সম্পর্কে কিছু জানেন। মনে মনেই ভাবলাম কথাটা। মুখের ভাবটা লক্ষ্য করে দেখলাম, বলাটা ঠিক হবে কিনা? দেখলাম, ভাবটা প্রসন্নই আছে সাধুবাবার। তাই নিঃসংকোচেই বললাম,

—বাবা, রুদ্রাক্ষের মতো তুলসী কাঠের মালারও কি এমন কোন গুণ আছে, যাতে সংসারীদের কল্যাণ হতে পারে। যদি থাকে আর দয়া করে যদি বলেন, তাহলে সারাজীবনই কৃতজ্ঞ থাকবো আপনার কাছে।

কথাটা শুনে একমুহূর্ত দেরী না করেই বললেন,

—গুণ তো কিছু আছেই তবে অত কৌতূহল ভালো নয়।

সাধু-সন্ন্যাসীদের কোন প্রশ্ন করার পর তার উত্তর দিতে না চাইলে আমার একটা রোগ প্রকট হয়ে পড়ে—পায়ে ধরা। ধরেই ফেললাম। একটা কথাও বললাম না। সাধুবাবা বুঝে গেলেন, না শোনা পর্যন্ত আমি ছাড়বো না। এমন সময়েই সামনে এসে দাঁড়ালো চা-ওয়ালা কেটলী হাতে। ভালোই হলো। মাটির ভাঁড়ে চা নিলাম দুটো। সাধুবাবার একটা, আর একটা আমার। পান শেষ হতেই আবার সাধুবাবা শুরু করলেন প্রশান্তচিত্তে,

—বেটা, তুলসীগাছের গুণ আর মাহাত্ম্যকথা তোকে বলেও শেষ করতে পারবো না, কারণ স্বয়ং বিষ্ণুই যে তুলসীগাছ। তাঁর কথা কি কখনও বলে শেষ করা যায়! এক নজর আমার মুখের দিকে কি যেন দেখলেন, বুঝলাম না। বললেন,

—দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে শুদ্ধাচারী হলেন নারায়ণ। যার তার ছোঁয়াছুঁয়ি পছন্দ করেন না। পবিত্রভাবের অভাব হলেই তিনি অন্তর্হিত হন। স্বয়ং নারায়ণই যে তুলসীগাছ তা পরীক্ষা করেই দেখতে পারিস্। বাড়ীতে তুলসীগাছ পুঁতে একটু অশুদ্ধ অবস্থায় স্পর্শ করলেই কিছুদিন পরে দেখবি গাছটা মরে যাবে। কোন

মানুষ কখনই ভাবতে পারবে না, এটা কেমন করে হয়? কিন্তু হয়, এটাই প্রমাণিত সত্য। বেটা, আমার কথায় বিশ্বাস হবে না তোর। প্রমাণ করতে ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই। একদিন পায়খানা করে এসে হাত পা গামছা না ধুয়ে বাড়ীতে তুলসীগাছ থাকলে একটু স্পর্শ করে রাখবি। দেখবি কিছু দিনের মধ্যেই তরতাজা গাছটা শুকিয়ে মরে যাবে।

কথাগুলো শুনছি। এই মুহূর্তে কিছু ভাববার অবকাশ নেই। সাধুবাবাই বলে চললেন,

—বেটা, যে তুলসীকে ভালোবাসে, জানবি নারায়ণও তাকে ভালোবাসে। তুলসীমালা বা গাছ কিংবা শুধু তুলসীপাতা স্পর্শ করলেই গঙ্গাস্নান এবং তপস্যার ফললাভ হয়। বিষ্ণু তার সমস্ত কামনাই পূরণ করেন কেউ যদি তুলসী গাছ রোপণ, দর্শন কিংবা পবিত্রভাবে স্পর্শ করে। তুলসীগাছ প্রদক্ষিণ করলে স্বয়ং বিষ্ণুকেই প্রদক্ষিণ করা হয়। তুলসীমালা ধারণ করলে বৃদ্ধি পায় সত্ত্বগুণ। নাশ হয় তমো আর রজোগুণের। বিষ্ণু সেখানে কখনই অবস্থান করেন না, যেখানে তুলসী নেই। তুলসীমালার যে ফল, পাতারও একই ফল জানবি।

এতক্ষণ পর এবার সাধুবাবা পা-টা ঝুলিয়ে বসলেন। আমি যেমন ছিলাম তেমনই রইলাম। আর কোন দিকে মন না দিয়েই সাধুবাবা বললেন,

—গঙ্গা ও গোদাবরীস্নান এবং মোক্ষদানদী নর্মদা দর্শন করলে যে ফল হয়, শুধু তুলসীগাছ দর্শনে ওই একই ফল। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই তুলসীগাছ দর্শন করলে সমস্ত তীর্থদর্শনের ফললাভ হয়। শুধু তাই নয় বেটা, তুলসীগাছের গোড়ায় মাটি আর যতদূর পর্যন্ত তার ছায়া পড়ে, ততদূর পর্যন্ত মাটিও শুদ্ধ ও পবিত্র। যেকোন শুভ কাজেই তা ব্যবহার করা চলে। একেবারে গঙ্গামাটির মতোই পবিত্র জানবি। স্বয়ং রামচন্দ্রও তুলসীগাছ রোপণ এবং পূজা করতেন। এই মালা যে ধারণ করে সে ভগবদ্‌ভক্ত হয়। তাকে কখনও প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না। দেহও তার অশৌচ হয় না কখনও। দুঃস্বপ্নও বন্ধ হয়ে যায়।

একনাগাড়ে এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা থামলেন। মিনিটখানেক চুপ করে থেকে বললেন,

—সমস্ত দ্রব্য এবং খাদ্যবস্তু শুদ্ধ হয় তুলসীস্পর্শে। দেহমন চিত্ত শুদ্ধ ও পবিত্র হয় মালা ধারণে। বাড়ীতে তুলসীগাছ থাকলে সংসারের কল্যাণ হয়, দূর হয় আর্থিক দৈন্যতাও। শিশু যেমন পিতাকে অনুসরণ করে চলে, ঠিক তেমনই তুলসীমালা ধারণকারীকে অনুসরণ করেন স্বয়ং নারায়ণ। দেহে বীর্য বৃদ্ধি আর নানা রোগ আরোগ্য হয় তুলসীমালা ধারণে। বেটা, অনন্ত ফললাভ হয় তুলসীমালা জপ করলে। ঘুম থেকে উঠে তুলসী দর্শন করলে সেইদিনের সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়ে যায়। বাড়ীতে তুলসীগাছ রোপণ করলে কখনও দারিদ্র্য আসে না। দেহে তুলসীমালা থাকাকালীন দেহত্যাগ হলে সে দেহ যমেরও ক্ষমতা নেই স্পর্শ করে। এতে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়। বেটা, তুলসীমালার এমনই গুণ, দেহমন এবং বাক্যের দ্বারা

অর্জিত সঞ্চয় করা সমস্ত পাপ একেবারে নষ্ট হয়ে যায়।

মাঝে মাঝেই হাঁপিয়ে উঠছেন সাধুবাবা। এটা অতি বয়সের ধর্ম। তবে মুখখানায় প্রসন্নতার কোন ঘাটতি নেই। কখনও আমার মুখের দিকে আবার এদিক ওদিক তাকিয়ে সাধুবাবা বলে চললেন তুলসীমাহাত্ম্য,

—বেটা, তুলসীপাতার ডগায় অবস্থান করেন ব্রহ্মা, মাঝে বিষ্ণু আর পাতার বোঁটায় অবস্থান করেন ভগবান শংকর স্বয়ং।

এই পর্যন্ত বলে কেমন যেন ভাবে বিভোর হয়ে গেলেন সাধুবাবা। কপালে একবার হাতজোড় করে কারও উদ্দেশ্যে নমস্কার জানালেন। তারপর ওইভাবেই স্থির থেকে বললেন,

—তুলসীর যে ফুল হয়, সেই ফুলের মধ্যে অবস্থান করেন লক্ষ্মী, সরস্বতী, দেবী চণ্ডী, একইসঙ্গে দেবতাদের পত্নীরা। ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, পবন এবং অন্যান্য দেবতারা বাস করেন তুলসীগাছের শাখা-প্রশাখায়। প্রতিদিন অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় যদি প্রতিদিন তুলসীগাছকে স্নান করানো যায়। আর লক্ষ্মী কখনই গৃহত্যাগ করেন না দুধ দিয়ে স্নান করালে। তুলসীমালা ধারণ করলে ধারণকারীর দেহে পাপ স্পর্শ করে না। দেহ পবিত্র হয় মালা স্পর্শ করলে। নারায়ণের পায়ে প্রতিদিন তুলসী দিলে মুক্তিলাভ হয়। তুলসীমালা ধারণকারীকে দেখে মনে অবজ্ঞার ভাব উদয় হলে নরকবাস তার অবধারিত। সমস্ত অকল্যাণও দূর হয় তুলসী কাঠ গৃহে থাকলে। মৃতদেহ দাহ করার সময় চিতায় এক টুকরো তুলসী কাঠ থাকলে মৃতেরও কোটি পাপ দূর হয়ে লাভ করে মুক্তি। নিত্য দ্বারকাবাসের ফললাভ হয় এই মালাধারণকারীর। তুলসীমালা কখনই অশুদ্ধ হয় না মলমূত্র ত্যাগ, স্নান এমনকি স্ত্রী সহবাসের সময় দেহে থাকলে। তুলসীর জন্ম হলো রাসপূর্ণিমাতে। কলিযুগে নারায়ণ পাপপ্রভাবে অতিষ্ঠ হয়ে সমস্ত তীর্থ পরিত্যাগ করলেও তুলসীগাছ কখনও পরিত্যাগ করেন না। তুলসীমালা পূর্ণিমা তিথি আর বৃহস্পতিবারে ধারণ করাই শ্রেয়।

এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা একটু থামলেন। জলখাবার খাওয়ার পর একটু চা যেমন তৃপ্তি দেয়, তেমনই চা পানের পর বিড়ি পিয়াসীদেরও আলাদা একটা তৃপ্তি আসে বিড়ি পেলে। চা পানের পর সাধুবাবাকে বিড়ি দিয়েছিলাম কিনা আমার খেয়াল ছিল না। তাই আবার একটা বিড়ি ধরিয়ে দিলাম। বেশ খুশীর মেজাজে টান দিয়ে সাধুবাবা বললেন,

—বেটা, রুগ্না পত্নীর যেমন রমণে রুচি হয় না, তেমনই যেসব কথা তোকে বললাম, এসব কথায় রুচি হয় না, শুনতেও চায় না বিষয়কীটের দংশনে রুগ্ন যারা। স্ত্রীর বশ যারা, তাদের মানুষ আর দেবতারা যেমন ঘৃণা করে তেমনই শাস্ত্রীয় কথায় অবিশ্বাসীদের ঘৃণা করেন দেবতারাও।

কথাটা শুনে একটু অসন্তুষ্ট হলাম মনে মনে। অবিশ্বাসের ব্যাপারটা আমার মধ্যেও আছে। কেউ একটা কথা বলবে অথচ বাস্তবের সঙ্গে একেবারেই সঙ্গতিহীন, সেকথা

দ্বিধাহীন চিত্তে সব সময় মেনে নেয়াটা আমার পক্ষে যেমন অসম্ভব, তেমন সম্ভব নয় অন্যের পক্ষে। তাই মনে একটু ক্ষুণ্ধ হলেও কথায় একটা আন্তরিকতার সুর রেখেই বললাম,

—অপরাধ নেবেন না বাবা, একটা কথা বলি। আপনার কথার কিছু কিছু কথা আমার কাছেও অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়েছে। যেমন ধরুন, রুদ্রাক্ষ বা তুলসীমালা ধারণ করলে পাপ স্পর্শ করে না। এসব ধারণ করার পর যদি কেউ পাপকর্মে লিপ্ত হয়, তাহলে তাকে পাপ স্পর্শ করবে না—এ কেমন কথা? এটা কি বাস্তব সম্মত কথা হলো? আপনার কি মনে হয়? কারও কোন কথায় নিশ্চিত বিশ্বাসের ফল যে মারাত্মক হয়, তা আমি নিজেও বিশ্বাস করি সমস্ত অবিশ্বাসের ঊর্ধ্বে উঠে। কিন্তু মন যে কথায় অবিশ্বাস করে, মেনে নেয় না, সে কথায় বিশ্বাসের উপায় কি?

চোখ মুখ দেখে মনে হলো বেশ মন দিয়েই কথাগুলো শুনলেন সাধুবাবা। উত্তরের অপেক্ষায় বসে রইলাম মুখ চেয়ে। কেটে গেল মিনিটখানেক। তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন বেশ করে। তাকানো দেখে মনে হলো, এতক্ষণ সাধু-বাবার সামনে বসে থাকলেও তিনি ভালো করে দেখেননি আমাকে। এবার একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। শুরু করলেন এইভাবে,

—বেটা, দ্রব্যগুণের কথা তো তোকে আগেই বলেছি। এবার আরও একটু বলি শোন্। জীবজগতে সকলক্ষেত্রে সমস্ত বিষয় ও বস্তুতেই বিরাজ করছেন ভগবান। তবে বিরাজ করলেও কিন্তু প্রকাশের ভেদ আছে সর্বক্ষেত্রেই। কোথাও তিনি প্রকাশিত হয়েছেন উৎকৃষ্টরূপে, কোথাও প্রকাশিত হননি সেভাবে। রুদ্রাক্ষ আর তুলসীমালার যে মাহাত্ম্য বা গুণকথা তোকে আমি বললাম, ভগবান এরই মধ্যে বিশেষভাবে, বিশেষ গুণ নিয়েই প্রকাশিত হয়েছেন মানুষের কল্যাণের জন্য। রুদ্রাক্ষ বা তুলসীমালা ধারণ করলে পাপ স্পর্শ করবে না, একথার অন্তর্নিহিত অর্থ হলো দ্রব্যগুণে আর ভগবানের নিহিত বিশেষ শক্তিতে পরিপূর্ণ ওই দুটি ধারণ করলে দেহমনে এমন এক সত্ত্বগুণসম্পন্ন ভাব ক্রিয়া করবে, যার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ধারণকারী অজ্ঞাতেই সকল পাপকর্ম থেকে বিরত হতে থাকবে ধীরে ধীরে। তারপর এমন একটা সময় আসবে, যখন পাপকর্মের কোন স্পৃহাই জাগবে না মনে। সুতরাং কোন পাপই তাকে স্পর্শ করবে না। ফলে এর থেকে দেহমন ও চিত্তের কলুষভাব মুক্ত হয়ে যে গুণ বৃদ্ধি পাবে, তার ফল অনন্ত, যা অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এটা হলো তোর প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত মোদ্দা কথা, বুঝলি?

হঠাৎ একটা ট্রেন আসার আওয়াজ পেলাম। সাধুবাবা আর আমি, তাকালাম দুজনেই। দেখলাম একটা মালগাড়ী আসছে ধীরে ধীরে। অন্যমনস্ক মন আবার ফিরে এলো যে আলোচনায় ছিলাম যেখানে। এবার গেলাম অন্য প্রসঙ্গে,

—আচ্ছা বাবা, অনেক সাধু-সন্ন্যাসীকেই দেখেছি, তিনি দেখামাত্রই আমার অতীত জন্মের কথা বলে তার ফল হিসাবে এ-জন্মে কি করবো, কি হবে, এমন অনেক কথাই বলে দিয়েছেন। আর কারও জীবনে এমন জানার ভাগ্য ঘটেছে কিনা আমার

জানা নেই। তবে আমার জীবনে সেসব কথার অনেক কথাই মিলেছে হুবহু। আমার বিশ্বাস, বাদ বাকি কথাগুলোও মিলবে নিশ্চিতভাবে। এসব কথা সাধু-সন্ন্যাসীরা বলেন কি করে, আপনি কি বলতে পারেন?

কথাটা শোনামাত্রই সাধুবাবা বললেন,

—হাঁ হাঁ বেটা, এটা বলা সম্ভব। তবে সব সাধু-সন্ন্যাসীদের পক্ষে তা বলা সম্ভব নয়। উচ্চমার্গের যোগী কিংবা কঠোর তপস্বী সাধু-সন্ন্যাসী যাঁদের জ্ঞাননেত্র খুলে গেছে অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়েছে, তাঁদের পক্ষেই একথা বলা সম্ভব। আমার গুরুজী অতীত তিনজন্মের কথা বলতে পারতেন। পুনর্জন্ম হবে কিনা, বর্তমান জন্মে কি হবে—তাও বলতে পারতেন। এমন বলতে পারা সাধুসন্ন্যাসীর সংখ্যা বিরল নয় তবে সংখ্যায় খুব, খুবই কম পাওয়া যায়।

বলে একটু থামলেন। চলমান মালগাড়ীটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। শেষ ওয়াগানটা চলে যাওয়ার পরই শুরু করলেন,

—বেটা, এই বিশ্বসংসারে জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই সময়কালের মধ্যে আমরা যা কিছু করি, বলি, ভাবি—প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে, সেটা যাই হোক না কেন, একেবারে নিশ্চিত জানবি তা কখনও লয় হয়ে যায় না। অনন্তকালের জন্যে তা অক্ষয় হয়ে থাকে মহাশূন্যে, মহাকাশে ছাপা হয়ে যায় চিরদিনের জন্যে। অতীত জন্মে যা করে এসেছি তা ছাপা হয়ে আছে। এখন যা করছি তা ছাপা হয়ে যাচ্ছে, একইসঙ্গে ছাপা হয়ে যাচ্ছে অতীতের এবং বর্তমান কর্মের ফলের ফল যা হচ্ছে—সেটা। এবার শক্তিধর সাধু-সন্ন্যাসী যোগী যারা—যাদের জ্ঞাননেত্র খুলে গেছে, তারা ইচ্ছা করলে পূর্ব পূর্ব জীবনের কথা, বর্তমান জন্মের, এমনকি পরবর্তী জীবনের কথাও বলে দিতে পারেন একেবারে নির্ভুলভাবে। কোন মানুষের পূর্ব বা বর্তমান জন্মের কথা বলার সময় তাদের দৃষ্টির সামনে অতীত বা বর্তমান বিষয়গুলি প্রতিভাত হয়। টিভিতে যেমন মানুষ ছবি দেখে, কথা শোনে, তেমনটা তাঁরাও দেখতে পান, শুনতেও পান।

কথাটা শুনেই জানতে চাইলাম,

—বাবা, এমন দৃষ্টিশক্তি কি আপনার লাভ হয়েছে?

হাসতে হাসতে সাধুবাবা বললেন,

—বেটা, অতই সস্তা! বহু জন্মের সুকৃতি, কঠোর তপস্যা আর অসীম গুরুকৃপা না থাকলে অমন দৃষ্টিশক্তি লাভ হয় না কারও। মহাভারতের যা কিছু ঘটনা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে দেহসংবরণ পর্যন্ত যা কিছু লীলা তা সবই মহাকাশে আঁকা আছে। জ্ঞাননেত্র খুলে গেলে সাধক ইচ্ছা করলেই এইসব অতীত লীলা, ভগবানের বিচিত্র কার্যকলাপ দেখতে পারেন অনায়াসে। কটা লোকের ভাগ্যে এমন ঘটে! আমার গুরুজী মাত্র ন-বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে বারো বছর বয়সে সমগ্র বৃন্দাবনলীলা দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন জ্ঞাননেত্রে। যেসব কথা তোকে বললাম, আমার কথা নয়। গুরুমুখে যা শুনেছি তাই-ই বললাম। ওসব দেখার

দরকার নেই আমার। 'বহুত' ভাগ্যবান আমি, আমার গুরু 'মিলেছে'। আর কিছুই চাই না আমি। যেদিন গুরুলাভ হয়েছে, সেদিনই ইহকাল পরকালের সব পাওয়াই আমার হয়েছে।

গুরুর কথা উঠতেই প্রশ্ন করলাম,

—বাবা, গুরুবাক্য, সাধুবাক্যকে এত প্রাধান্য দেয়া হয়েছে কেন?

কথাটা শুনেই একটু পুলকিত হয়ে উঠলেন সাধুবাবা। এতক্ষণ বসেছিলেন একভাবে। এবার একটু নড়ে বসে বললেন,

—বেটা, গুরুবাক্য আর সাধুবাক্য জানবি একটা তীব্রশক্তিসম্পন্ন শব্দবাণ। মুখ থেকে নিক্ষিপ্ত হওয়ামাত্রই চলে যায় দূরে—বহুদূরে—দূরান্তরে। মনের পরেই তীব্রগতিসম্পন্ন হলো গুরু, সাধু-সন্ন্যাসী আর মহাপুরুষদের মুখের কথা—বাক্যবাণ। এই বাণ যার কানে পৌঁছায়, সে সংসারে থেকেও সমস্ত বিষয়ে রক্ষা পেয়ে পায় মুক্তি। আর সংসারে যে ঘুমিয়ে আছে, এই শব্দবাণ তাকে জাগিয়ে তোলে। যারজন্যেই তো এঁদের কথাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এত। তবে ব্যক্তি-জীবনে এই শব্দবাণের প্রয়োগ কার্যক্ষেত্রে না করলে, যেমন ধর্ দীক্ষিত হয়ে জপতপ না করলে, গুরুবাক্য পালন না করলে সুন্দরী বন্ধ্যার মতোই এদের দশা হয়। বেশ্যার কাছে নিত্য গেলেও যেমন তার স্নেহলাভ করা যায় না, তেমনই কেউ গুরুর নিত্যসঙ্গীও যদি হয়, তাৎক্ষণিক আনন্দ কিছু লাভ হয় তবে তাঁর কৃপালাভ হয় না। বেটা, সদ্‌গুরুর বাক্যবাণে মন বিদীর্ণ না হলে মনের ভোগ-বাসনার কালি কখনও মোছে না।

সময় কেটে যাচ্ছে হু-হু করে। স্টেশনের সমস্ত আলোই জ্বলে উঠেছে অনেকক্ষণ আগে। খেয়ালই করিনি এতক্ষণ। বাইরে নেমে এসেছে অন্ধকার। গাড়ী ধরার সময়ও এগিয়ে আসছে ক্রমশ। তাই ভাবলাম, যতটা পারি জেনে নিই। বললাম,

—বাবা, সংসারে দেখেছি অনেক মেয়েরা নানা দেবদেবীর ব্রত উপবাস করে। ধর্মমনা অনেক ছেলেকেও দেখেছি করতে। এইসব ব্রত উপবাসের ফলটা কি হয় বলবেন দয়া করে?

দেখলাম, এ-কথায় সাধুবাবার মনটা যেন আরও প্রসন্ন হয়ে উঠলো। বেশ খুশী মনেই বললেন,

—হাঁ বেটা, বিভিন্ন দেবদেবীর নানা ব্রত উপবাস আছে। যেকোন দেবদেবীর ব্রতপালন করলে সেই দেব বা দেবী ব্রতকারীর উপর প্রসন্ন হয়ে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন। এতে দেহমনও পবিত্র হয়। আর উপবাসের ফলও বড় সুন্দর। একাদশ ইন্দ্রিয়ের সমস্ত বিকারই দগ্ধ হয় উপবাসে।

একটু থামলেন। পরেই বললেন অন্যমনস্ক হয়ে,

—বেটা, সংসারে নিজের যা কিছু অকীর্তি—তারই নাম মৃত্যু। বিষয়ে অনুরক্ত যে, তার চেয়ে বড় দুঃখী আর কেউ নেই। প্রিয় সন্তানের মৃত্যুতেও মানুষ যতটা না দুঃখী হয়, তার চেয়েও কঠিন দুঃখী যে নারীপুরুষ বিষয়ে অনুরক্ত। মানুষের

মনকে ইন্দ্রিয় পরিচালনা করে বলেই সংসারে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যু হয় মানুষের, আসে বিষয়ে আসক্তি। ব্রত-উপবাসে এর থেকে মুক্তি পাওয়া যায় সহজেই আর এর ফলও হয় দ্রুত। ব্রত-উপবাসে মানুষ শীতল হয়। এই শীতলতা কালক্রমে আনে ঈশ্বরে অনুরাগ। ঈশ্বরে অনুরাগী মানুষই শীতল, বুঝলি ?

আবার থামলেন। সাধুবাবা এদিক ওদিক তাকালেন এমনভাবে যেন কিছু খুঁজছেন। জানতে চাইলাম,

—বাবা, আপনি কি কিছু খুঁজছেন ?

মুখে হালকা হাসির প্রলেপ মাখিয়ে বললেন,

—হাঁ বেটা, একটু চা হলে ভালো হতো।

কোন কথা না বলে উঠে গেলাম। দু-ভাঁড় চা নিয়ে এলাম স্টল থেকে। চায়ে চুমুক দিয়ে সাধুবাবা বললেন,

—বেটা, সংসারে ইন্দ্রিয় শিথিল হয়েছে এমন বয়স্ক স্বামী যারা, তাদের স্ত্রীর বয়স যদি বেশ কম হয়, তাতে যদি রূপ-যৌবন দুই-ই থাকে তাহলে সে স্বামী স্ত্রীকে যেমন ভালোবাসে তেমনই সন্দেহ করে। ঠিক সেই রকম, সংসারে বিষয়ী মানুষ ভালোবাসে অর্থ আর বিষয়কে। সন্দেহ করে মানুষকে আর ঈশ্বরের অস্তিত্বকে।

এবার সাধুবাবার কাছে জানতে চাইলাম,

—বাবা, আপনি তো তীর্থে তীর্থেই ঘুরে বেড়ান। তীর্থ বা স্থান মহাত্ম্যের কথা জানতে চাইছি না আমি। জানতে চাই, দীর্ঘ এই পরিভ্রমণ জীবনে তীর্থ সম্পর্কে কি ধারণা হলো আপনার ? যারা সংসারে থেকে হাজার কাজের মধ্যেও বেরিয়ে পড়ে তীর্থ পরিভ্রমণে, তাদেরই বা কি হয় ?

ইতিমধ্যেই তিন চার চুমুকেই চা শেষ হয়েছে। ভাঁড়টাও ফেলে দিয়েছেন রেললাইনের উপরে। আমার কথাটা শুনে মিনিটখানেক চুপ করে থেকে পরে বললেন,

—বেটা, যারা ভক্ত, সাধু বা গৃহী যাই হোক না কেন, এরা সর্বদাই থাকেন তীর্থের মুখাপেক্ষী হয়ে। তীর্থ থাকে ভগবানের মুখাপেক্ষী হয়ে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী লাভ হয় কার জানিস্—ভক্তের। কারণ, ভগবান থাকেন ভক্তের মুখাপেক্ষী হয়ে। সুতরাং ভক্ত যেখানে যায়, ভগবানও যায় সেখানে। যেখানে ভক্ত নেই সেখানে কোন তীর্থ নেই, ভগবানও নেই। সারাজীবন তীর্থপরিক্রমা করে এই ধারণাই আমার হয়েছে।

ভাবলাম, প্রশ্নের শেষ নেই আমার। একটা শেষ হতে না হতে মাথায় ঢোকে আর একটা। সাধুবাবা যে বিরক্ত না হয়ে উত্তর দিচ্ছেন তাড়িয়ে না দিয়ে, এটাই আমার ভাগ্য। আবার প্রশ্ন এলো মনে, করেই ফেললাম,

—বাবা, যেখানে যেসব মন্দির মিশন বা আশ্রমে দেবদেবীর মূর্তি স্থাপিত আছে, সেখানে পুজোর পর আরতি করার প্রথাও একটা প্রচলিত আছে। এটা কেন করা হয়, এর ফলই বা কি ?

আমার ভাবনাটা ধরে ফেলেছেন সাধুবাবা। বড় অদ্ভুত লোক। বললেন,

—তাড়িয়ে আমিও দিতাম, যদি তুইআমার সঙ্গে সংসারের বিষয়মূলক কথা বলতিস্। তোর কৌতূহল আছে, প্রশ্নগুলোও ভালো, নিজের স্বার্থসিদ্ধির চিন্তা নেই তাই উত্তর দিচ্ছি। আরতি করলে, যে করে তার যেমন কল্যাণ হয় তেমনই কল্যাণ হয় দর্শনকারীর। আরতির সময় মূর্তির মধ্যে নিজ মূর্তির প্রকাশ করেন ভগবান। যিনি আরতি করেন এবং দর্শনকারী, উভয়ের উপর কৃপাদৃষ্টি পড়ে ভগবানের। এতে দেহ ও মনের অশেষ কল্যাণ হয়। যারা নিত্যপূজার পরে গুরু বা ইষ্টের আরতি করে, তারা নিজেরই কল্যাণ করে। যেমন ধর্ ধূপ, দীপ, জলশঙ্খ, চামর, বস্ত্র, ফুল ইত্যাদি দিয়ে আরতি করা হয়। কেন করা হয়, কারণটাই বা কি? শুনলে অবাক হবি এর অন্তর্নিহিত সত্য বিষয়টা জানলে। ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে ভগবানের আরতি করলে নিজের মনের অন্ধকার নাশ হয়। সত্ত্বগুণের আলোকে আলোকিত হয় মন। ফুল দিয়ে আরতি করলে আরতিকারী ভক্তের মন ফুলের মতো সুন্দর হয়। ফুলসৌরভের মতো প্রিয় হয়ে ওঠে সংসারে সকলের কাছে। সুগন্ধি ধূপ দিয়ে করলে তার গন্ধ বাতাসে মিশে যেমন বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, তেমনই ভক্তের যশরূপ সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে দূর থেকে দূরান্তরে। মঙ্গলের প্রতীক হলো শঙ্খ। শঙ্খের আরতিতে আরতিকারীর সংসারের সমস্ত প্রকার মঙ্গল হয়। চামরের আরতিতে রোগমুক্ত হয় দেহমনের। ক্রমে ক্রমে কমে যায় ইন্দ্রিয়ের বেগ। আর নতুন বস্ত্র পরলে মন যেমন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে, তেমনই নতুন বস্ত্র দিয়ে আরতি করলে ভক্তের মন সদা প্রফুল্ল আর চিত্ত থাকে প্রসন্ন, বুঝলি। এই হলো আরতির মূল কথা। এসব কথা আমার গুরুমুখেই শোনা। তবে যার জ্ঞানলাভ হয়েছে, দিব্যদৃষ্টি খুলেছে, সেই-ই এসব পরিষ্কার দেখতে পায়। আর অনুভব করে প্রকৃত ভক্ত যারা আন্তরিকভাবে নিত্য আরতি দেখে বা করে। এসব ফল নিত্য কাজ না করলে পাওয়া যায় না।

এই পর্যন্ত বলে খানিক থেমে আবার বললেন,

—বেটা, বাহ্যত আমরা মনে করি এসব করি মানে ভগবানের সেবা করি। আসলে তা করি না। নিজের দেহমন চিত্তের কল্যাণ সাধন পরোক্ষে নিজেরই করে থাকি। যারা করে তারা ভালো থাকে। যারা করে না, তারা না করলে যেমন থাকার তেমনই থাকে।

এবার জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, আপনি তো সাধু। আছেনও এ-পথে বহুকাল ধরে, পরমানন্দে। সাধু-জীবনে থেকে সাধুজীবন সম্পর্কে আপনার কি ধারণা হলো বলবেন দয়া করে?

কথাটা শুনে সাধুবাবা একেবারে আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠলেন। মুহূর্তে বৃদ্ধের উজ্জ্বল মুখখানা যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। 'আহ্ বেটা' বলে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,

—দীর্ঘকাল এপথে থেকে আমার মনে হয়েছে, প্রকৃত সাধু যারা এপথে আছেন,

তাদের জীবনমন পদ্মের গন্ধের মতোই হালকা। আর সাধুজীবনের গতি—বেটা, এ-গতি একেবারে হিমালয়ের গঙ্গার নির্মল জলধারারই মতো।
সাধুবাবার ট্রেন কটায়, জানি না। তবে ক্রমশ এগিয়ে আসছে আমার ট্রেনের সময়। অন্তরে প্রশ্ন অনেক, সময় কম। জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা, এখনকার কথা বলছি না আমি, বলছি অনেক অ-নে-ক আগের কথা, গৃহত্যাগের পরের কথা, যখন এলেন এপথে তখনকার কথা। প্রথম প্রথম জীবনের বেশ কয়েক বৎসর পর্যন্ত মা বাবার কথা তো নিশ্চয়ই মনে পড়তো। তখন কি করতেন মন খারাপ হলে? কেমন করে কাটাতেন তাৎক্ষণিক মন খারাপের সময়টুকু, অনুগ্রহ করে বলবেন?
কথাটা শোনামাত্রই 'ছ্যাৎ করে' মুখখানা কেমন যেন হয়ে গেল সাধুবাবার। 'কেমন যেন' ভাবটা দেখলাম মুহূর্তমাত্র। তারপর আবার ফিরে এলেন আগের অবস্থায়। বললেন,
—হাঁ বেটা, গৃহত্যাগের পর প্রথম অবস্থায় মন খারাপ হতো ঠিকই তবে তা স্থায়ীও হতো না। গৃহত্যাগ করলেও মা বাবার স্পর্শ আমি অনুভব করতাম, আনন্দে মনটা আমার আবার ভরিয়ে তুলতাম, কেমন করে জানিস্?
এই মুহূর্তে দেখছি সাধুবাবার দুচোখ জলে ভরে উঠলো। আমার চোখে চোখ না রেখে নামিয়ে নিলেন। এবার একটু সামলে নিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, (মনেই হলো যেন ভিতরে কাঁদছেন সাধুবাবা।)
—মন খারাপ হলে কাঁদতাম। মনের দরজা খুলেই কাঁদতাম। চোখ থেকে যে জল বেরোত তা আমি মিশিয়ে দিতাম গঙ্গার জলধারার সঙ্গে। কারণ সেই জল তো নিশ্চয়ই স্পর্শ করতো মা বাবাকে। আমি গঙ্গাজল স্পর্শমাত্রই স্পর্শ পেতাম বাবা মায়ের। তারা তো এই জল দিয়েই পুজো করতো। সুতরাং তারাও আমার স্পর্শ পেতো আমারই মতো, যেমন আমি পেতাম। আমরা উভয়ে একে অপরকে ছেড়ে বহু দূরে থাকলেও আমাদের যোগাযোগটা অটুট ছিল ওই 'গঙ্গামাঈ'-এর মাধ্যমে। অতএব বলতে পারিস্ আমরা কেউ কাউকে ছেড়ে থাকিনি কখনও।
এবার ভাবাবেগে একেবারে ডুকরে কেঁদে ফেললেন সাধুবাবা। আবেগজড়িত কণ্ঠে তিনি বললেন,
—বেটা, গঙ্গা—এ-এমনই এক আশ্চর্য নদী, প্রিয়জনের মৃত্যুতেও কোনদিন বিচ্ছেদ হতে দেয় না প্রিয়জনের সঙ্গে। মৃত্যুর পর ভস্ম, নাভি সবই তো গচ্ছিত রাখি 'গঙ্গামাঈ'-এর কাছে। গঙ্গা স্পর্শ করলে তো প্রিয়জনেরই স্পর্শ পাওয়া যায়। বেটা, যে দেশে গঙ্গা বয়ে চলেছে, সে দেশের মানুষের কিসের শোক, দুঃখই বা কিসের? বেটা, মন খারাপ হলে গঙ্গামাঈ-ই আনন্দে মনটা আমার ভরিয়ে দিত।
সাধুবাবা এমন অপূর্ব এক দৃষ্টিকোণ থেকে গঙ্গাকে দেখেছেন যা ভুল করেও ভাবিনি কখনও। অন্তরের অবস্থাটা কোন্ পর্যায় পৌঁছালে তবেই এমন এক অনুভূতি শক্তির সৃষ্টি হয়—এই ভেবেই বিস্মিত হয়ে গেলাম। কোন কথা সরলো

না মুখ থেকে। এবার দুহাত দিয়ে ঝরে পড়া চোখের জল মুছলেন সাধুবাবা। এমন সময়েই সঙ্গীদের কয়েকজন এসে পড়লেন আমাদের সামনে। ট্রেনের সময় হয়েছে তাই এসেছেন খবর দিতে। ইসারায় বললাম—যান, যাচ্ছি। চলে গেলেন তারা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি ট্রেন ছাড়তে আরও মিনিট বারো বাকি। এবার উঠতে হবে আমাকে। শেষ প্রশ্ন করলাম উঠে দাঁড়িয়ে,

—বাবা, এতদিন তো কাটালেন ঈশ্বরের নামে পড়ে থেকে। তাঁকে লাভ করার সহজ উপায় কি কিছু জানা আছে আপনার ?

খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে সাধুবাবা বললেন,

—হাঁ হাঁ বেটা, আছে। ভক্তির বীজ কারও দেহে একবার পড়লে তা কখনই নষ্ট হয় না, যেমন নষ্ট হয় না বিষ্ঠার মধ্যে সোনা পড়লে। ভিতরে ভক্তির বীজ যখন পড়েছে তখন প্রেমের রেশমী কাপড় পরে ধৈর্যের কাজল চোখে দিয়ে পড়ে থাক্—তাঁকে পেয়ে যাবি।

প্রণাম করলাম সাধুবাবাকে। কোন কথা বললেন না। শুধু হাতদুটো মাথায় রেখে আশীর্বাদ করলেন। অনেক কথায় কথা হলো অনেক। একটা আপশোস নিয়েই এগিয়ে চললাম ধীর পায়ে। জানা হলো না সাধুবাবার গৃহত্যাগের কাহিনী, অন্তরের কোন ক্ষোভ, দুঃখ বেদনা আর আনন্দের কথা, যদি কিছু থেকে থাকে।

## অতীতের মৎস্যদেশ—রূপসী রাজস্থান

আগ্রা-আমেদাবাদ এক্সপ্রেস ছাড়লো আগ্রা থেকে—কাঁটায় কাঁটায় রাত ৮/১৫ মিঃ। সংরক্ষিত কামরা তাই বন্ধ করে দেয়া হলো দরজা। ক্রমশ বাড়তে লাগলো ট্রেনের গতি। কোন্ কোন্ স্টেশনের উপর দিয়ে চলছে, বুঝতে পারছি না কিছুই। যখন ট্রেন থামছে, বুঝতে পারছি কোন স্টেশন এলো। কোলাহল শুনছি কামরায় বসে। যাত্রীদের ওঠানামা, আবার চলছে ট্রেন। শীতকাল। উঠে গিয়েও দেখছি না। তাছাড়া জানলা দরজাও বন্ধ।

ক্রমশ রাত বাড়তে লাগলো। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি ঘুমের কোলে, কিছুই জানি না। ঘুম ভাঙলো একেবারে জয়পুর স্টেশনে এসে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাত তিনটে। আমাদের কামরা এখানে খুলে দিয়ে চলে গেল আমেদাবাদ এক্সপ্রেস। কামরাসমেত আমরা রয়ে গেলাম স্টেশনে। আগ্রা থেকে জয়পুর এলাম ২৩০ কি. মি.।

ভ্রমণকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ভ্রমণ করলে দর্শনীয় স্থানগুলি দেখার জন্য আলাদা গাড়ীভাড়া দিতে হয় প্রতিষ্ঠানের তরফে যিনি ম্যানেজার থাকেন তার হাতে। গাড়ীর ব্যবস্থা করে তিনি ঘুরিয়ে আনেন সকলকে।

এই আলাদাভাবে টাকা দেয়াতে কোন ক্ষোভ নেই যাত্রীদের, ক্ষোভ নেই আমারও। ঘুরতে যখন গেছি, খরচা হবে জেনেই গেছি। সকলেই তা জানে, যারা যায় ভ্রমণে। ক্ষোভের একটা কারণ হলো আমার মতো আর সকলের—স্থান বা ভ্রমণের

পরিকল্পনা অনুসারে ক্ষেত্রবিশেষে দুশো, চারশো বা ছশো টাকা নিয়ে নেন ম্যানেজার প্রতিটি যাত্রীর কাছ থেকে। এটা দর্শনীয় স্থানগুলির গাড়ীভাড়া বাবদ। এবার যেখানে যে গাড়ীভাড়া করা হয় তা ম্যানেজার বা প্রতিষ্ঠানের লোকই করেন। ভ্রমণকারীদের কাউকেই সঙ্গে নেয়া হয় না। সমগ্র ভ্রমণপর্ব শেষ হলে প্রতিটি ভ্রমণকারীর হাতে দু-পাঁচ দশ টাকা ধরিয়ে দিয়ে বাদ বাকি খরচা—সততার পরিচয় দেন প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারসাহেব। এতে কিন্তু কারও মন মানে না। ভদ্রতার খাতিরে সামনাসামনি মুখে কেউ কিছু বলেন না ঠিকই, তবে পিছনে যে এ বিষয়ে আলোচনা হয়, ক্ষোভে ফেটে পড়ে—এ-খবর ম্যানেজারসাহেব কিংবা কোন ভ্রমণকারী প্রতিষ্ঠানের মালিকই রাখেন না। যাত্রীদের প্রশ্ন থাকে, দুশো টাকার অটো বা ট্যাক্সী ইত্যাদি ভাড়া করে, বাড়িয়ে তিনশো টাকা যে বলা হচ্ছে না এমনও তো হতে পারে। এ-কথাই বলেন সব যাত্রীরা। আমি নিজে জানি। এতে যে পরোক্ষে ভ্রমনকারী প্রতিষ্ঠানের সুনাম কলঙ্কিত হয়, এ খবর প্রতিষ্ঠানের মালিক রাখেন কিনা আমার জানা নেই। এমনও শুনেছি যাত্রীদের মুখে, 'আসলে মালিক এই সব কর্মচারীদের মাইনে কম দেয়। এই ব্যবস্থাটা রাখা হয়েছে কর্মচারীদের স্বার্থে, যাত্রীদের কাছ থেকে পুষিয়ে নেয়ার জন্যে।'

ভ্রমণপথে গাড়ীভাড়া করলে কোথাও লিখিত রসিদ দেয়া হয় না—একথা সত্য। তবে দু-দশ টাকা ফেরৎ না দিয়ে ভ্রমণকারীদের কাউকে সঙ্গী করে গাড়ীভাড়া করলে আমার মনে হয় ম্যানেজার বা প্রতিষ্ঠানের সততা বজায় থাকে নিশ্চিতভাবে। আমার অভিজ্ঞতায়, 'চলুন, একসঙ্গে গিয়ে গাড়ীভাড়া করে আনি' এমন কথা কোন ম্যানেজার কোনও যাত্রীকে বলেছেন, শুনিনি কখনও। ভ্রমণ শেষে দশ বিশ টাকা ফেরৎ পেলেও ভ্রমণকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং কর্মচারীদের সম্পর্কে যাত্রীদের মনে একটা ক্ষোভ, সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। এমনটা চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানের সুনাম কলঙ্কিত হতে বাধ্য।

যাইহোক, এখন সকাল ৯টা। ট্যাক্সীও এসে হাজির। সকলে বেরিয়ে পড়লাম জয়পুর দেখতে। স্টেশনের কাছ থেকেই ছাড়লো ট্যাক্সী। চললো মির্জা ইস্মাইল রোড ধরে।

রাজস্থানের রাজধানী জয়পুর। মহারাজা জয়সিং যেমন নির্ভিক যোদ্ধা তেমনই ছিলেন প্রজা প্রতিপালক। অগাধ জ্ঞান ছিল সংস্কৃতে। পারদর্শীও ছিলেন জ্যোতিষ শাস্ত্রে। আরও নানা গুণের আধার ছিলেন মহারাজা জয় সিং।

তখন দিল্লীর বাদশা ঔরঙ্গজেব, যখন জয়পুরের রাজা ছিলেন জয় সিং। মাত্র তেরো বৎসর বয়েসেই, ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জয় সিং রাজা হয়ে বসেছিলেন সিংহাসনে। বাদশা ঔরঙ্গজেব এমনই এক বাদশা, যিনি ভুল করেও কারও প্রশংসা করেছেন এমন কথা শোনা যায়নি কখনও। কথিত আছে, এ-হেন বাদশা জয় সিং-এর মধ্যে বহুগুণের সমন্বয় দেখে একদা মুগ্ধ হয়ে ছোট্ট একটি কথা বলেছিলেন, 'জয় সিং একাই আমার সওয়া গুণ।' ব্যস, এর থেকেই মহারাজা জয় সিং খ্যাতিলাভ

করলেন 'সওয়াই জয় সিং' নামে।
পুরনো জয়পুরের রাজধানী ছিল অম্বর, ছেড়ে চলে এলেন রাজা। ভাবলেন এক নতুন নগর আর রাজধানী নির্মাণের কথা। রাজা জয় সিং-এর পার্ষদ ছিলেন কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্যের ভাগ্না বিদ্যাধর। শহরের নকশা করলেন তিনি রাজার পরিকল্পনা অনুসারে। ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর জয় সিং ভিত্তিস্থাপন করলেন নতুন নগরী জয়পুরের। সম্পূর্ণ নগর নির্মাণ শেষ হলো ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। অম্বর থেকে সরিয়ে আনলেন রাজধানী। মূল শহরকে সাতটি ভাগে ভাগ করে তার একটি ভাগ নিয়েই গড়ে তুললেন বিশাল রাজপ্রাসাদ। দক্ষিণের প্রবেশ পথটির নাম দেয়া হলো ত্রিপোলিয়া গেট।
সমান মাপের সুপরিকল্পিত সুন্দর শহর এই জয়পুর। প্রধান রাস্তা এর তিনটে। ১০৮ ফুট রাস্তা সমান ভাগে ভাগ করেছে পূর্বে সুরজপোল দ্বার থেকে পশ্চিমে চাঁদপোল দ্বার পর্যন্ত। উত্তর থেকে দক্ষিণে দুটি সমান রাস্তা একে ছেদ করে চলে গেছে। পূর্বদিকের রাস্তাটা গেছে দেউড়ি হয়ে শিবপোল দ্বার পর্যন্ত। এর মধ্যেই পড়বে আবার জহুরী বাজার। আর পশ্চিমের রাস্তাটা গেছে সোজা কিষণপোল দ্বার বা আজমের গেট পর্যন্ত। বিস্তৃত এই পথের মধ্যেই রয়েছে গঙ্গোরী এবং কিষণ পোল বাজার। এই রাস্তার ক্রসিং-এর নাম চৌপড়, শহর জয়পুরের প্রাণকেন্দ্র।
ট্যাক্সী চলেছে শহরের মধ্যে দিয়ে। যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখি গোলাপী রঙে একাকার হয়ে আছে সারা জয়পুর শহর। রাজা দ্বিতীয় রাম সিং ভালোবাসতেন গোলাপী রঙ। তাঁরই আদেশে শহরের প্রতিটা বাড়ী, দোকান-পাটের রঙ হয়েছে গোলাপী। তখন ছিল, আজও আছে। তাই শহর জয়পুরের নাম দেয়া হয়েছে 'পিংক সিটি' বা গোলাপী শহর।
স্টেশন থেকে প্রায় ৭ কি. মি. একটানা চলে ট্যাক্সী এসে থামলো 'হাওয়া মহল'-এর সামনে। জয়পুরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এই মির্জা ইস্‌মাইল রোডের সংক্ষিপ্ত নাম এম. আই. রোড। এই রাস্তার পাশেই হাওয়া মহল। জয়পুরের দর্শনীয় স্থান বা বিবরগুলির মধ্যে এটি পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ।
নেমে এলাম ট্যাক্সী থেকে। ঘুরে ঘুরে দেখছি আমি, আর সকলে। বিচিত্র শিল্প নৈপুণ্যে ভরা এই হাওয়া মহলের পাঁচটি তলা আছে। উপরের দিকটা গোলাকার। প্রতিটি তলায় রয়েছে সারি সারি জানলা। প্রায় আটকোণা এর ঝুলন্ত জানলাগুলি দেখার মতো। দূর থেকে হাওয়া মহল দেখলে একেবারে মনে হয় যেন বিশাল একটা মৌচাক। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন সওয়াই প্রতাপ সিং। সুবিস্তৃত এই অট্টালিকাটির সুন্দর স্থাপত্যশিল্প দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। এটি স্থাপিত হয়েছে বেশ উঁচু একটি জায়গার উপরে। স্যার এডুইন এন্‌রোল্ড অভিভূত হয়েছিলেন হাওয়া মহলের স্হাপত্য শিল্পের বিন্যাস দেখে। মুগ্ধ সাহেব মন্তব্য করেছিলেন, 'আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপও এত সুন্দর প্রাসাদ বানাতে পারতো না। মণিমুক্ত সোনা দিয়ে তৈরী করলেও কোন প্রাসাদ এত আকর্ষণীয় হতো না।'

সুন্দরী রাণীরা বাইরে না বেরিয়ে মহলে বসেই যাতে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান জানলা দিয়ে দেখতে পায়, এমনভাবেই তৈরী হয়েছিল হাওয়া মহল। এর পিছনে আছে ৩৬০টি জানালা যেখান থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে যায় মহলের ভিতর দিয়ে। পাঁচতলা এই মহলটির প্রথম তলায় আছে সুন্দর ফোয়ারাযুক্ত একটি স্নানকুণ্ড। রাজা প্রতাপের নামানুসারেই রয়েছে প্রতাপ মন্দির, যার দরজায় টাঙানো আছে ১৮৭ বছরের পুরনো কারুকার্যখচিত কাপড়ের পর্দা। হাওয়া মহলের দোতলাটিও বড় সুন্দর। এর অর্ধগোলাকৃতি বারান্দা, যেখানে বসে রাজা দেখতেন একতলায় স্নানরতা রাণীদের জলকেলী। তিনতলায় রয়েছে রাজাদের স্থাপিত বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দির, যেখানে প্রতিদিন পুজো হতো। প্রকাশ মন্দির চারতলায়। শেষতলার নাম হাওয়া মন্দির। এটি তৈরী হয়েছে জয়পুরের আশপাশের প্রাকৃতিক আর নগরের রূপ-সৌন্দর্য দেখার জন্যে। এখন হাওয়া মহল পরিবর্তিত হয়েছে সরকারী সংগ্রহশালায়। এর নিপুণ শিল্পকলা যার দেখা হয়নি, অনেক ঘুরলেও অনেক কিছু দেখলেও তার ভ্রমণ সার্থক হয়নি।

এবার ট্যাক্সী চললো বত্রিশজন সহযাত্রীকে নিয়ে জয়পুর-দিল্লী রোড ধরে। চললো পরিচ্ছন্ন চওড়া বাঁধানো রাস্তা ধরে জয়পুরের বিখ্যাত গোবিন্দজী মন্দিরের উদ্দেশ্যে।

দ্বিতীয় সওয়াই জয় সিং এক অবিস্মরণীয় নাম। এই শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য সুদূর পাশ্চাত্য দেশগুলির ভাস্কর্য নিয়ে পড়াশুনা করেছেন তিনি। একইসঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছেন ইউরোপীয় নগরগুলির গঠনের নক্সা। তারপর তৎকালীন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী আর স্থপতিদের সঙ্গে আলোচনা করে রুচিপূর্ণ শিল্পকলার সহায়তায় পত্তন করেন এই জয়পুর শহর। একমাত্র দক্ষিণ ছাড়া এর তিনদিকেই রয়েছে অসমতল পাহাড়, যার উপরে স্থাপিত আছে কয়েকটি কেল্লা আর স্তম্ভ।

বিশ্বের সুন্দরতম নগরগুলির মধ্যে আজও অন্যতম রাজস্থানের জয়পুর। যেসব পর্যটক রাজকীয় বৈভব দেখতে উৎসুক, তাদের কাছে প্রিয় নগরী এই জয়পুর। সারা ভারতের সঙ্গে জয়পুরের যোগাযোগ আছে রেল বাস আর বিমানের। কলকাতা থেকে রেলপথে জয়পুর ১৪৭২ কি. মি. দিল্লী থেকে ৩০৭ কি. মি. বোম্বাই থেকে ভায়া আমেদাবাদ ১১১৪ কি. মি. আর মাদ্রাজ থেকে ২১৮৭ কি. মি. দূরে মনোরমণকারী গোলাপী নগর জয়পুর।

ট্যাক্সী এসে থামলো গোবিন্দজী মন্দির থেকে একটু দূরে। পর পর বড় দুটো তোরণ পেরিয়ে ঢুকলাম মন্দির প্রাঙ্গণের সুন্দর বাঁধানো রাস্তা ধরে।

এসে দাঁড়ালাম মন্দিরে রাধাগোবিন্দের মুখোমুখি হয়ে। কালো কষ্টিপাথরের সুন্দর মূর্তি। ঠিক আর সব কৃষ্ণমন্দিরে যেমন দেখা যায় তেমনই। এখানে ঝাঁকি দর্শনেই দর্শন করতে হয় কৃষ্ণের। দর্শনার্থীরা মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে দর্শন করেন কিছুক্ষণ। তারপর বন্ধ করে দেয়া হয় মন্দির। অনেকক্ষণ পর আবার খোলা হয়। এই সময়ের মধ্যে গোবিন্দজীর সাজপোশাকেরও পরিবর্তন করা হয়ে

যায়। এইভাবে মন্দির বন্ধ, খোলা আর সাজের পরিবর্তন চলতে থাকে সারাদিন ধরে বহুবার। মন্দির বন্ধ থাকার সময় অপেক্ষা করতে থাকে দর্শনার্থীরা। খোলার সঙ্গে সঙ্গেই অল্প সময়ের মধ্যে ঝাঁকেঝাঁকে মানুষ দেবমূর্তি দর্শন করে বলেই নাম হয়েছে এর ঝাঁকিদর্শন। এইভাবেই গোবিন্দজীর দর্শন হলো বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর। মন্দিরটি স্থাপিত হয়েছে জয়পুর রাজপ্রাসাদের বাগানের মধ্যেই।

তখন দিল্লীর বাদশা ঔরঙ্গজেব। প্রথমশ্রেণীর হিন্দুবিদ্বেষী বাদশা। তাঁর ঢালাও আদেশে কাশী থেকে শুরু করে মথুরা বৃন্দাবন—সর্বত্রই চলছিল মন্দির আর দেবদেবীর মূর্তি ভাঙার কাজ। সেই সময় জয় সিং গোবিন্দজীর মূর্তিটি নিয়ে এলেন বৃন্দাবন থেকে, নিত্যপূজার জন্য কয়েকজন ব্রাহ্মণকেও। সযত্নে রাখলেন নিজের প্রাসাদমন্দিরে—অম্বরে। পরে স্থাপন করলেন জয়পুরে। সেই থেকে গোবিন্দজীর নিত্যপূজা চলে আসছে আজও। রাজস্থান ভ্রমণে এসে কোন ভ্রমণকারীই অন্য কোথাও যান না জয়পুরের এই মন্দির মূর্তি দর্শন না করে। তবে পুরীর মতো এই মন্দিরেও বিদেশী পর্যটকদের প্রবেশ নিষেধ।

সতেরো শতাব্দীর কথা। উড়িষ্যা থেকে বৃন্দাবনে এলেন পরম বৈষ্ণব সিদ্ধ কৃষ্ণদাস। অধ্যাত্মপথে আশ্রিত হলেন বৃন্দাবনেরই ব্রজকুণ্ডবাসী বৈষ্ণব চরণদাস বাবাজীর চরণে। গুরুজীর তিরোধানের পর একদা কৃষ্ণদাসের প্রাণ আকুল হয়ে উঠলো জয়পুরের গোবিন্দজীর বিগ্রহ দেখার জন্যে।

বিগ্রহ দেখার আগ্রহে একদিন ছুটে এলেন জয়পুর শহরে। ভক্তের কাছে পাথরের বিগ্রহ যেন জীবন্ত হয়ে উঠলো। দর্শন করে আশ যেন আর মেটে না। চোখ থেকে ঝরতে থাকে কৃষ্ণপ্রেমের অশ্রুধারা। দিনের পর দিন পড়ে থাকেন প্রভুরই অঙ্গনে। এর ফলে ধীরে ধীরে কৃষ্ণদাসের মন হয়ে উঠলো বিগ্রহের সেবালুব্ধ। বার বার ভাবেন, প্রভুর কৃপায় যদি অষ্টকালীন সেবার ভার পান, তবে এ জীবন ধন্য হয়ে যাবে।

জয়পুরের মহারাজার স্থাপিত বিগ্রহ। তাঁর অনুমতি ছাড়া সেবায় অধিকার পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। রাজাই বা তাঁর কথায় কর্ণপাত করবেন কেন? এইসব ভেবে অস্থির হয়ে ওঠেন কৃষ্ণদাস।

একদিন ভক্তের ইচ্ছা পূরণ করলেন ভগবান। মহারাজা স্বয়ং মন্দিরে এলেন বিগ্রহ দর্শনে। হঠাৎ চোখ পড়লো দৈন্যের প্রতিমূর্তি কৃষ্ণদাসের উপর। দেখলেন, ভাবাবেশে তাকিয়ে আছে বিগ্রহের দিকে। তারপর সেভাব কাটতেই মহারাজকে জানালেন মনের কথা। বিগ্রহ সেবার জন্য কৃষ্ণদাসের দৈন্য ও আর্তির কথা শুনলেন মহারাজ। এতে এক অপূর্ব ভাবের সঞ্চার হলো মহারাজের মনে। গোবিন্দসেবার ভার দিলেন তরুণ বৈষ্ণবের উপর। আনন্দের আর সীমা রইলো না কৃষ্ণদাসের। দেখতে দেখতে দশটা বছর কেটে গেল প্রভুর সেবায়।

সেদিন ছিল রাজপ্রাসাদে এক বিশেষ পূজার দিন। মহাসমারোহে লাগানো হয়েছে গোবিন্দজীর ভোগ। পূজা শেষে উৎসাহভরে আকণ্ঠ প্রসাদ গ্রহণ করলেন ভক্ত সেবক

কৃষ্ণদাস। কিন্তু প্রসাদ গ্রহণের পরেই ঘটে গেল এক অদ্ভুত কাণ্ড। সেবানিষ্ঠ পরমভক্তের সারাদেহ ও মনে জেগে উঠলো তীব্র কামাবেগ। কোনমতেই এ-চাঞ্চল্য দূর হতে চাইলো না। মহাসংকটে পড়লেন তিনি।

কৃষ্ণদাসের বয়েস তখন মাত্র ত্রিশ। অনন্যোপায় কৃষ্ণদাস জয়পুর ছেড়ে ফিরে এলেন ব্রজমণ্ডলের কাম্যবনে। মহাত্মা জয়কৃষ্ণদাসের খ্যাতির কথা জানা ছিল আগেই। সোজা উপস্থিত হলেন তাঁর ভজনকুটিরে।

প্রণাম করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, প্রভু, বৈষ্ণব চরণদাস বাবাজীর কাছ থেকে যে শিক্ষা, যে সাধন আমি পেয়েছিলাম তাই নিয়েই পড়ে আছি একাগ্রচিত্তে। জ্ঞানত কোন অন্যায় বা অনাচার তো করিনি আমি। তবে কেন গোবিন্দজী এ-শাস্তি দিচ্ছেন আমায় ?

উত্তরে মহাত্মা জয়কৃষ্ণদাস বাবাজী বললেন,

—আচ্ছা বাবা, একটা গাছকে তাজা অবস্থায় কেটে, জলে কিছুদিন ভিজিয়ে রেখে তারপর যদি কেউ তাকে আগুন দেয়, তখন কি তা জ্বলে উঠবে ? শুকনো না হওয়া অবধি তো তাতে আগুন ধরবে না ? জন্ম জন্ম ধরে সব তলিয়ে আছে সংসারসাগরে। বিষয়-মোহ আগে ত্যাগ করিয়ে তাকে শুকনো করে দিতে হবে, তবে তো তাতে জ্বলে উঠবে ভক্তির আগুন। জানো তো বাবা, বৈষ্ণব ভজন যিনি জীবকে শিখিয়ে গেছেন, সেই মহাপ্রভু স্বয়ং কি রকম সাধন কঠোরতা দেখিয়ে গেছেন। তাঁর ছিল তিনবার শীতে স্নান আর মাটিতে শয়ন। আর তাঁর মহাভক্ত রঘুনাথদাস ? আজন্ম তিনি রসের স্পর্শই দিলেন না জিভে।

একথা শুনে কাতর কৃষ্ণদাস বললেন,

—কিন্তু প্রভু, আমার দুর্দশা যে হলো মহাপ্রসাদ থেকে। প্রসাদ গ্রহণের পর থেকেই তো শুরু হলো এই দুর্দৈব। অথচ চিরদিন জেনে আসছি মহাপ্রসাদই চিন্ময় বস্তু। তবে কেন এই ব্যতিক্রম ?

সহজ সুন্দরভাবে মহাত্মা বললেন,

—বাবা, এর উত্তর তো মহাপ্রভুর নিজের কথাতেই রয়েছে, "বিষয় অন্নে হয় রাজস নিমন্ত্রণ।" মহাপ্রসাদ চিন্ময় হয় প্রভুর নিজের জিহ্বায়, জ্ঞানহীন সাধকের জিহ্বায় তার স্বরূপ ধরা দেবে কেন ?

একথা বুঝতে না পেরে কৃষ্ণদাস বললেন,

—বুঝতে পারলুম না প্রভু, কৃপা করে আরও একটু বিশদভাবে বলুন।

শান্ত ধীর কণ্ঠেই উত্তর দিলেন বৈষ্ণব সাধক জয়কৃষ্ণদাস,

—দেখো, ঠাকুর চিন্ময় বিগ্রহ! চিন্ময় ছাড়া তার কাছে তো আর কিছুই নেই। তাছাড়া তিনি যে মহাসমর্থ, বৈশ্বানরের মতো সবকিছু যে তিনি আত্মসাৎ করতে পারেন। বিচার বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হয় আমাদের মতো অজ্ঞানদের ক্ষেত্রে। বাবা, নিবেদিত প্রসাদ তো গ্রহণ করতেই হবে তবে সদাই নেবে তার কণিকামাত্র তুলসী দিয়ে স্পর্শ করে। জৈবদেহের খোরাক হিসাবে নিলে যে তার ফল ভুগতেই হবে।

চিন্তিত ও বিষাদগ্রস্ত কৃষ্ণদাস চাইলেন সমাধান,

—তাহলে প্রভু, এবার আমার উপর কি আদেশ হয় ?

অভয় দিয়ে বললেন সিদ্ধমহাত্মা জয়কৃষ্ণ,

—কোন ভয় নেই বাবা, ভক্ত যে প্রভুর আপনজন। এ দেহমনের চাঞ্চল্য দিয়েছেন তিনি, আবার তিনিই দেবেন তাতে নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি এনে। তুমি এখানকার ওই দোমন-বনে লেগে যাও কঠোর ভজনে। দেখবে, অচিরেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

এরপর অরণ্যেই বসে চলতে থাকে কৃষ্ণদাসের বিস্ময়কর তপস্যা।

গোবিন্দজীর মন্দির থেকে এবার ট্যাক্সী সোজা চললো জয়পুর-দিল্লী রোড ধরে অম্বর প্যালেসের দিকে।

জয়পুরের শিল্পকলা এত সুন্দর এত প্রাণবন্ত যে, দেখলে মনে হয় যেন পর্যটকদের ডাকছে হাতছানি দিয়ে, যেন কিছু বলতে চাইছে। শিল্পী মন যার, সে-ই বোঝে এই শিল্পকলার নীরব ভাষা। এখানকার মূর্তিগুলি সবই প্রায় মিনে করা, কারুকার্যখচিত। হাতির দাঁত আর চন্দনকাঠের শুধু নয়, পিতল ও ধাতুর তৈরী বিভিন্ন দ্রব্যগুলিও অত্যন্ত আকর্ষণীয়। ছাপা কাপড়ের উপর কারুকার্যগুলি এত সুন্দর, এত মনোরম, না কিনে যেন পারার উপায় নেই। এখানকার প্রতিটি হস্তশিল্পই যেন প্রশংসার দাবী রাখে। তার মধ্যে মসলিনের তৈরী কার্পেট, হাতির দাঁত আর পিতলের তৈরী নানা আকর্ষণীয় খেলনা ও দ্রব্যই প্রধান। জয়পুরের শিল্পকলাকে আরও উন্নত ও আকর্ষণীয় করার জন্য একদা রাজা মানসিং অম্বরের সিংহাসনকে অলংকৃত করতে লাহোর থেকে এনেছিলেন পাঁচজন সুদক্ষ ধাতুশিল্পীকে। ফলে রাজকীয় দাক্ষিণ্যে ধাতুর উপর মিনে করা শিল্পের আরও ব্যাপক প্রসারলাভ হয়। ধাতব বস্তুর উপরে সুন্দর মিনে করা নিখুঁত শিল্পের ক্ষেত্রে জয়পুরের আগে বা পরে আর কারও স্থান হয়নি আজও। বেশ কিছু মূল্যবান পাথরও পাওয়া যায় জয়পুরে। সুতিবস্ত্র ছাপার শিল্পে রাজস্থান আজও অদ্বিতীয়।

এখানকার বসবাসকারীদের পোশাকও বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। পথে চোখ পড়ছে পুরুষদের মাথায় জরির কাজ করা পাগড়ি আর পরনে বেলদার পাঞ্জাবী। অধিকাংশ মেয়েদের পরনে ঘাঘরা আর ব্লাউজ। মাথায় রয়েছে ওড়না। এখন অনেক আধুনিকতার ছাপও পড়েছে এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে।

অসংখ্য দোকান-পাটে ভরা শহর জয়পুর। জিনিষপত্রের দামের কোন লাগাম নেই এখানে। দোকানদার যার কাছ থেকে যা নিতে পারে, আর সব পর্যটন কেন্দ্রে যেমন হয়। পর্যটক সব সময়েই ঠকে পর্যটনে বেরিয়ে। ভাবে, জিনিষ কিনে লাভ করেছে। আসলে লাভ হয় পরে, স্মৃতি—অর্থে বা জিনিষে নয়।

জমজমাট শহর জয়পুরে সিটিবাস, স্টেশন ওয়াগান, অটোরিক্সা, ট্যাক্সী—অভাব নেই কিছুরই। চাইলেই হাতের কাছে।

ঝকঝকে রাস্তা। এতটুকু গর্ত নেই কোথাও। মসৃণ নিরিবিলি রাস্তা ধরে আমাদের

ট্যাক্সী এগিয়ে চললো অম্বর প্যালেসের দিকে। শহর জয়পুরের উত্তরদিকের পাহাড়ে চলে যাওয়া পথটাই অম্বরের পথ।

চলতে চলতে হঠাৎ ট্যাক্সী থেমে গেল বিশাল একটা প্রাকৃতিক হ্রদের ধারে। এর নাম জলমহল। জয়পুর শহর থেকে এই পর্যন্ত এলাম ৭ কি. মি.। তৎকালীন রাজাদের গ্রীষ্মকালীন আবাস দাঁড়িয়ে আছে হ্রদের মধ্যে। দেখতে হয় দূর থেকে। এটি এখন পরিত্যক্ত। শুধু অতীত স্মৃতির বোঝা-ই বহন করে চলেছে একাকী নিঃসঙ্গ হয়ে। এই আবাসটি নির্মাণ করেন মহারাজা প্রতাপসিং। সুন্দর এই হ্রদটির নাম মানসাগর। গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহ থেকে রক্ষা পেতে জয়পুরের রাজারা গ্রীষ্মকালটা কাটাতেন এখানেই। এই প্রাসাদের স্থাপত্য যেমন বৈচিত্র্যময় তেমনই মনোরম। অম্বরের পথে ডানদিকেই পড়লো জলমহল।

এখানে কাটলো প্রায় মিনিটদশেক। তারপর ট্যাক্সী আবার ছুটলো অম্বর প্যালেস। ফাঁকা মসৃণ রাস্তা ধরে ছুটলো হু-হু করে। দেখতে দেখতে এবার উঠে এলো কালীখো পাহাড়ের উপত্যকায়। আধুনিক শহর জয়পুরের উত্তর-পূর্বে এরই গিরিখাতে রাজস্থানের পুরনো রাজধানী অম্বর। বহু পূর্বে সুরক্ষিত অম্বর পরিচিত ছিল অম্বাবতী নামে।

একদা কালীখো পাহাড়ের গিরিখাতের মধ্যে দিয়ে পায়ে হেঁটে সম্রাট আকবর গেছিলেন খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তির পুণ্যস্থান আজমীরে। দূর থেকে দেখতে পেলাম আমের দুর্গ—অম্বর প্যালেস। স্থানীয় লোকেরা বলেন আমের। পাহাড়ের উপর দুর্ভেদ্য দুর্গ আর প্রাসাদ। সমতল থেকে প্রায় ৪০০ ফুট উপরে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে এই দুর্গ নির্মাণ করেন রাজা প্রথম মানসিং। তবে কিছু কাজ থেকে যায় অসমাপ্ত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তা সম্পূর্ণ করেন সওয়াই জয়সিং। দুর্গের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা আরও দৃঢ় করার জন্য দুর্গকে ঘিরে রয়েছে কয়েক মাইল দীর্ঘ চওড়া পরিখা। এরই কিছুটা দূরে বাঁধানো রাস্তা ধরেই ট্যাক্সী এসে দাঁড়ালো দুর্গের প্রবেশ পথের কাছে। এখানে পরপর খাবারের দোকান রয়েছে বেশ কয়েকটা। সবই পর্যটকদের জন্যে।

অম্বর প্রাসাদে উঠতে হলে হাঁটতে হবে অনেকটাই। বহু হাতি রয়েছে এখানে। পর্যটকদের অনেকেই চলেছেন হাতির পিঠে, কেউ বা হেঁটে। ট্যাক্সী মোটর জীপও যায়। অসংখ্য বিদেশী পর্যটক নারীপুরুষের আগমন ঘটেছে আমেরে। অযোধ্যানাথ রামচন্দ্রের পুত্র ছিলেন কুশ। কথিত আছে, কুশেরই বংশধর ছিলেন রাজা অম্বরীশ। এই নগরের পত্তন তাঁরই হাতে, তাই নাম হয়েছে অম্বর।

রাজস্থানের প্রাচীন রাজধানী অম্বর থেকে মাত্র ১১ কি. মি. দূরেই গড়ে উঠেছে আজকের রাজধানী জয়পুর। সামান্য এই পথটুকু আসতে আমাদের বেশী সময় লাগেনি। টোলট্যাক্স মিটিয়ে ট্যাক্সী সোজা উঠতে লাগলো চড়াই পথ ধরে। সময় লাগলো সামান্যই। মাওয়ুটা হ্রদে ঘেরা পাহাড়ের উপরেই দুর্গ, তার মধ্যেই রাজা মানসিং-এর প্রাসাদ।

রাজা জয়সিং শহর জয়পুরের পত্তন করলেও তার প্রায় ছশো বছর আগের থেকেই রাজস্থানের রাজধানী অম্বর ছিল কাছাওয়া বংশের রাজাদের অধীনে। পরবর্তী-কালে এই পরিবারের মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন মোঘল সম্রাট বাবর। ফলে তাদের সঙ্গে একটা প্রীতির সম্পর্ক আর বন্ধুত্বের বন্ধন হয়েছিল মোঘলদের। বাবর রাজত্ব করেছিলেন মাত্র পাঁচ বছর। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে মারা গেলেন তিনি। কাছাওয়াদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কও গেল নষ্ট হয়ে।

কাছাওয়াদের পরে অম্বর হস্তগত হয়েছিল মীনাজাতিদের। তাদেরই এক রাজা শাসন করতেন ধুন্দর রাজ্য। এই রাজ্য জয় করতে গিয়ে একবার রাজা মানসিং ফিরে এসেছিলেন পরাজিত হয়ে। আকবর তখন দিল্লীর মসনদে। মানসিং তাঁর একান্ত অনুগত সেনাপতি। মানসিং-এর পিসীকে বিয়ে করেছিলেন আকবর। মান-এর পিতামহ বাহারমল। তিনি তাঁর কন্যার বিবাহ দিয়ে মোঘলদের সঙ্গে স্থাপন করেছিলেন এক সুন্দর সম্পর্ক।

যাইহোক, প্রথমবার পরাজিত হলেও সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন মানসিং। খবর পেলেন, দোলযাত্রার দিন মীনারা অস্ত্রধারণ করে না। সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন তিনি। দোলের দিন বিশাল মোঘলবাহিনী নিয়ে চরমভাবে আঘাত হানলেন ধুন্দর রাজ্যে। পরাজিত হলো মীনারা। মানসিং ধুন্দর রাজ্য উপহার দিলেন আকবরকে। এই রাজ্যের গৃহদেবতা অম্বিকেশ্বর মহাদেব। অনেকের ধারণা, তাঁর নাম থেকেই আসছে অম্বর।

মূল দরজা পার হয়ে দুর্গের ভিতরে ট্যাক্সী এসে দাঁড়ালো বিস্তৃত বাঁধানো চত্বরে। একপাশে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে গাড়ী আর একপাশে হাতি। এরই মধ্যে কিছু দোকানী বসে আছে ফুলমালা আর নকুলদানা নিয়ে।

অল্প কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলাম অম্বর প্রাসাদের কালী মন্দিরে। প্রাসাদের মুখ্য প্রবেশদ্বার সিংপলদ্বারের পিছনেই শ্বেতপাথরের মন্দির। রূপোর চাদরে মোড়া বিশাল দরজা। তার দুপাশে সবুজ পাথরের দুটি কলাগাছ খোদিত রয়েছে দেওয়ালে। দেখলেই মনে হয় যেন জীবন্ত। এই গাছদুটির জন্যে পাথর আনা হয়েছিল ইটালী থেকে। এ-দেশে এ-পাথর পাওয়া যায় না কোথাও। মন্দির-মধ্যে অষ্টভুজা কালী মূর্তিটি কষ্টি পাথরের। প্রচলিত মূর্তির মতো নয়। দেবীর জিভ বের করা নয়। পায়ের নীচে শিবও নেই। অসম্ভব আকর্ষণীয় এই মূর্তিটি মাঝারী আকারের। পূজারী আছেন। তাঁর হাত মারফৎ পর্যটকদের পূজা নিবেদিত হচ্ছে মন্দিরে।

সুদর্শন এই কালীমূর্তিটি এখানে আনা হয়েছিল তৎকালীন রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজধানী যশোর থেকে। স্বয়ং মানসিং এনেছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীতে।

এই মূর্তিটি নিয়ে কিছু প্রবাদ প্রচলিত আছে আজও। মথুরায় কংসের কারাগারে দেবকীর সন্তান হলেই আছড়ে মারতেন কংস। মারা হতো একটি বড় কষ্টি পাথর-খণ্ডের উপরে। একদা রাজা প্রতাপাদিত্য গেছিলেন মথুরায়। ওখান থেকেই

পাথরটি এনে শিল্পীকে দিয়ে তৈরী করিয়েছিলেন কালীমূর্তি। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যশোরে। তাই দেবীর নাম দিয়েছিলেন যশোরেশ্বরী। বাংলার যশোরেশ্বরীর নাম হয়েছে অম্বরে শীলাদেবী। মানসিং-এর যশোর থেকে মূর্তি আনার কথা খোদিত আছে মন্দিরের দেয়ালে।

আবার অনেকে বলেন, এটি চাঁদ রায় ও কেদার রায় পূজিত মূর্তি শিলাময়ী। মানসিং সেটিকেই এনেছেন অম্বরে। যশোরেশ্বরী বিগ্রহটি নাকি আজও আছে বাংলাদেশের ঈশ্বরপুরী গ্রামে। এমন আরও অনেক কথাই প্রচলিত আছে এই মূর্তি প্রসঙ্গে।

এই কালী মন্দিরের পাশ থেকেই সিঁড়ি, উঠে এলাম উপরে। এবার দেখা হবে অম্বরের রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদে প্রবেশের প্রধান দ্বারটির নাম গণেশপোল। এটি নির্মাণ করেছিলেন সওয়াই দ্বিতীয় জয়সিং। এর বিশাল দরজাটি দেখে মুগ্ধ হয়ে শিল্পবোদ্ধা সাহেব ফার্গুসন বলেছিলেন, 'এটি বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট প্রবেশদ্বার।' এর উপরদিকে তাকালেই চোখে পড়ে শ্বেতপাথরের একটি অপূর্ব সুন্দর গণেশের মূর্তি। শ্বেতপাথরে খোদাই করা এর মাঝখানে চাকচিক্যময় পিতলের কপাটওয়ালা ছোট একটা দরজা—বড় দরজার সঙ্গে এমনভাবে জোড়া দেয়া রয়েছে, দেখলেই মনে হয় যেন এক ছাঁচে ঢেলে একইসঙ্গে তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু তা নয়। এটাই দরজার অপূর্ব নির্মাণ কৌশল। যারজন্যই তো সাহেব ফার্গুসন ওই মন্তব্য করেছেন দরজা দেখে। এর উপরের কক্ষটির নাম সুহাগ মন্দির।

তাজমহলের পাথরের জালি কাজের সঙ্গে তুলনীয় শ্বেতপাথরের সূক্ষ্ম জালি দ্বারা এটি নির্মিত। রাজবংশীয় নারী এবং রাণীরা এখানে বসে দেখতেন দেওয়ান-ই আমের বিভিন্ন কাজ আর অনুষ্ঠান। তাছাড়া তৎকালীন রাজারা কোথাও যাত্রা করলে এখানেই তাঁদের শুভযাত্রার উদ্দেশ্যে আরতি করতেন রাণীরা।

গণেশপোল দিয়ে ঢুকেই বাঁদিকে এলাম দেওয়ান-ই খাসে। এটি নির্মাণ করেন মির্জা রাজা প্রথম জয়সিং। এটির নাম জয় মন্দির। এর ভিতরে দেয়ালে কাচের উপর রয়েছে সুন্দর কারুকার্য। শীশমহল নামেই এর প্রসিদ্ধি। এটি তৎকালীন বাদশাদের দিল্লীতে নির্মিত দেওয়ান-ই-খাসের এক স্পর্ধিত প্রতিদ্বন্দ্বী যেন।

বিশাল দুটি কামরা আছে দেওয়ান-ই-খাসে। সামনের দিকের কামরার দেয়াল-গুলিতে প্লাস্টারের উপর আকর্ষণীয় নক্সা তৈরী করে বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট কাচ লাগিয়ে এর সৌন্দর্যকে করে তোলা হয়েছে আরও অপরূপ। একটা মোমবাতি জ্বাললে উপরের ছাদ আর দেয়াল যেন ভরে ওঠে অসংখ্য তারার আলোয়। প্রতিটি কাচের উপর দেখা যায় বিচিত্র জ্যোতির ঝলক।

এলডস্ হাক্সলে এই মহলের কাজ দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলেছিলেন, 'ইটালীর সিসিলি দ্বীপে বিশ্ববিখ্যাত কাচের যে ভবনটি আছে, এর তুলনায় সেটি অতি নগন্য। ওই কক্ষটি পুরনো ধরনের এক সাধারণ কর্মকাণ্ড, যার তুলনায় ভারতীয় এই শীশমহলটি শীতলতা, কমনীয়তা এবং সুরুচির এক আশ্চর্যজনক সংমিশ্রণ।'

জয়মন্দির বা দেওয়ান-ই-খাসের ছাদের উপরেই রয়েছে একটি অট্টালিকা। নাম এর যশমন্দির। এটির দেয়ালেও রয়েছে মূল্যবান কাচের আয়না।
মধ্যকালীন শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই অম্বর রাজপ্রাসাদ। রাজা মানসিং এটির নির্মাণ কাজ শুরু করলেও কাজ চলেছিল দ্বিতীয় জয়সিং-এর রাজত্বকালেও। দুধসাদা এই প্রাসাদটি হিন্দু এবং মোঘল এই দুই শিল্পশৈলীতেই নির্মিত। প্রাসাদে ভিতরের অংশের বেশীরভাগই নির্মাণ করেছিলেন মানসিং যা প্রস্তরশিল্প-শৈলীর এক অনবদ্য উদাহরণ। অনেকগুলি ভবনের সম্মিলিত রূপ নিয়েই অপরূপ অম্বরের রাজপ্রাসাদ।
এই প্রাসাদের ভিতরে এবার এলাম দেওয়ান-ই-আমে। ছাই রঙের পাথরে নির্মিত এটির তিনদিকই খোলা। চল্লিশটি স্তম্ভের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে এর ছাদটি। প্রতিটি স্তম্ভের মাথাগুলি দেখতে হাতির মুখের মতো। এর দরবার-হলে মোঘলদের দেওয়ান-ই-আমের মতো কোন দৃষ্টিরোধক স্তম্ভ নেই। এটি গণেশ-পোলের সামনেই।
গণেশপোলের উপরে সোহাগ মন্দিরের জানলাগুলি দিয়ে তৎকালীন রাণীরা দেখতেন দেওয়ান-ই-আমের চত্বরে নানা উৎসব। এটি নির্মাণ করেন প্রথম জয়সিং। এর দেয়ালে আঁকা সুচিত্রিত চিত্রগুলির শিল্পকলা দেখে সম্রাট জাহাঙ্গীর এতখানি ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন যে, তাঁর আদেশে শিল্পকলাগুলি ঢেকে দেয়া হয়েছিল প্লাস্টার দিয়ে। এখান থেকে শহরের আশপাশের দৃশ্যগুলি যেমন সুন্দর তেমনই মুগ্ধকর।
এবার এলাম দেওয়ান-ই-আমের উপরের অংশে মহানিবাসে। এর কোণাগুলি ঝুঁকে আছে বাইরের দিকে। এটির শিল্পকলা নীচের তুলনায় কয়েক গুণ বেশী সুরুচি-পূর্ণ, সুন্দর, আকর্ষণীয়। সম্পূর্ণ শ্বেতপাথরে নির্মিত এই নিবাসটির ছাদ দাঁড়িয়ে আছে গোলাকার গম্বুজের উপর। এর কারুকার্যময় জানলাগুলি দিয়ে দেখা যায় মাওয়াটা হ্রদ, মোহনবাড়ী আর চারদিকের আনন্দদায়ক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় দৃশ্য।
মোহনবাড়ী মোহন উদ্যান নামেও পরিচিত। সিঁড়ির মতো দেখতে এই উদ্যানটি গড়ে তোলা হয়েছে একটি হ্রদের মধ্যে। মাওয়াটা নামটি উদ্ভূত হয় একটি ঝরণা থেকে।
ঘুরতে ঘুরতে এবার এলাম দেওয়ান-ই-খাসের বিপরীতে সুখনিবাস প্রাসাদ বা সুখমন্দিরে। আমাদের সঙ্গে রয়েছে গাইড। গাইড ছাড়া ঐতিহাসিক ক্ষেত্রগুলির কিছু বোঝার উপায় নেই। অম্বরের রাজাদের গ্রীষ্মকালীন উত্তপ্ত দুপুরগুলিতে বিশ্রামের জন্য নির্মিত হয়েছিল এটি। মোঘলদের উদ্যানকলার অনুরূপে তৈরী বাগানের একদিকে অবস্থিত এই সুখনিবাস। রাজাদের আমলে এখানে ছিল শ্বেত-পাথরের নালা আর ফোয়ারার ব্যবস্থা। এখন শীতকালীন ফুলের এক মহাসমারোহ হয়েছে এই সুখমন্দির প্রাঙ্গণে। জালি লাগানো বারান্দার ভিতরে লম্বা একটা কক্ষ

এবং ডান আর বাঁদিকে রয়েছে ছোট ছোট দুটি কক্ষ, যার দরজাগুলি চন্দনকাঠের এবং হাতির দাঁতের কারকার্যখচিত।

সামনেই সাজানো বাগানের পিছনে লাগানো জালি দিয়ে বয়ে আসা চন্দনের গন্ধ মেশানো জল আর ঠাণ্ডা বাতাস—সার্থক, সুন্দর করে রেখেছে সুখনিবাস নামটিকে।

গাইড এবার আমাদের নিয়ে এলো জয়সিং-এর জানানা মহলে। এই প্রাসাদটি অম্বরের সর্বপ্রথম এবং সর্ববৃহৎ। প্রাসাদের কোণাগুলিতে রয়েছে তিনতলা বিশিষ্ট স্তম্ভ আর আছে বাসযোগ্য ঘর। দুর্গপ্রাসাদের সবচেয়ে প্রাচীন অংশ এই জানানা মহল। এটি দুর্গের তৃতীয়ভাগেই অবস্থিত। এর পশ্চিম দিকে রয়েছে রান্না ঘর, ভাড়ার ঘর আর পরিচারিকাদের থাকার ঘর—এই সব নিয়েই এর অংশ। স্তম্ভগুলির নীচে তৈরী কামরাগুলি মীনে করা আর সুন্দর রঙের কাজে সুসজ্জিত। তবে প্রাচীনত্বের ছাপ পড়েছে অম্বরের দেহ ও মনে। তাই প্রাসাদের অন্যান্য অংশের মতোই অনেক মলিন হয়ে গেছে এর সাজসজ্জা। তবুও একটা আলাদা আকর্ষণ আছে এই অম্বরের—যারা আসে ভ্রমণে, জয়পুরে।

অম্বর প্রাসাদের পার্বত্য অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিম তলদেশেই অবস্থিত জগৎ শিরোমণি মন্দির। এই মন্দিরের সুবিস্তৃত ভাস্কর্য আর মার্বেল পাথরে নির্মিত তোরণগুলি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এটি কঙ্কাবতী নির্মাণ করেন তাঁর আপন ভাই মানসিং-এর জ্যেষ্ঠপুত্র জগৎসিং-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে। শ্বেতপাথরের প্রাচীন এই বিশাল বিষ্ণু মন্দিরটি জগৎ শিরোমণি মন্দির নামেই প্রসিদ্ধ। এই মন্দিরের দুদিকেই আছে জালিকাটা জানালা যেখান থেকে মন্দিরের গর্ভগৃহ দেখা যায় বেশ সুন্দর, পরিষ্কারভাবে। মন্দির তোরণের উপরে রয়েছে দুটো পাথরের হাতি। দেখলে মনে হয় যেন পাহারা দিচ্ছে চৌকিদার হিসাবে। এই মন্দির থেকেই যাওয়া যায় পূর্বদিকে অবস্থিত গরুড়দেবের মন্দিরে।

জগৎ শিরোমণি বিষ্ণু মন্দিরের পাশে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে নবসিংজীর ছোট্ট মন্দির। ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত এই মন্দিরটি ঐতিহাসিক দিক থেকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভবত এটাই কাছোয়ার শাসনকর্তাদের প্রথম নির্মিত বাড়ী। কাছোয়ারা অম্বরে প্রবেশ করার আগে এখানে পুজো দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। যারজন্য এখানে স্থাপন করা হয়েছে নরসিংহদেবের মন্দির। এখানেই রয়েছে রাজতিলক চত্বর। জয়পুরের মহারাজাদের রাজতিলক হতো এর উপরেই। তাঁদের প্রথম বিবাহ সংক্রান্ত সমস্ত রীতি ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো এখানে।

জগৎ শিরোমণি মন্দিরের পশ্চিমেই রয়েছে একটি পুরনো জৈনমন্দির। এই মন্দিরটি এতবার সংস্কার হয়েছে যে, এর প্রাচীন শিল্পই ঢাকা পড়ে গেছে। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মির্জা রাজা প্রথম জয়সিং-এর প্রধানমন্ত্রী মোহন দাসই এটি নির্মাণ করান। তৎকালীন এই মন্দিরটি পরিচিত ছিল মোহন দাসের নামেই। এই জৈনমন্দিরে

প্রবেশের জন্যে সুন্দর একটি তোরণ দিয়ে সাজানো আছে প্রবেশদ্বার।
শহর সুরক্ষার জন্য মির্জা রাজা প্রথম জয়সিং এবং সওয়াই দ্বিতীয় জয়সিং নির্মাণ করেন জয়গড় কেল্লা। এখানে অবস্থিত আছে দিবা মীনার নামে একটি পর্যবেক্ষণ স্তম্ভ, যেখান থেকে সমগ্র উপত্যকা আর পাহাড়গুলি দেখা যায় সুন্দরভাবে। হাওয়ার সাহেব এই জয়গড় কেল্লাটি দেখে বলেছিলেন, 'কোন কিছুর সঙ্গেই এর তুলনা হয় না।'
জগৎ শিরোমণি মন্দির থেকে একটু দূরেই অবস্থিত মন্দিরটি অম্বিকেশ্বর মহাদেবের। কথিত আছে, অযোধ্যা শাসনকারী সূর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা ইক্ষ্বাকুর আটাশতম পুরুষ রাজা রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র কুশের বংশধর রাজা অম্বরীশ এটি নির্মাণ করেন।
অম্বরের সবচেয়ে প্রাচীন মন্দিরটি কল্যাণজী মন্দির। অন্যান্য মন্দিরের মতো এখানেও আছে একটি গর্ভগৃহ, আছে পূজাবেদী। এই মন্দিরের গায়ে এবং প্রবেশ পথের ভাস্কর্য এক অনবদ্য সৃষ্টি তৎকালীন ভাস্করদের।
অম্বরপ্রাসাদের পাহাড়ের নীচে রয়েছে একটি বিস্তৃত চক। নাম জলের চক : তৎকালীন আস্তাবল, সেনানিবাস আর সেবকদের আবাস।
মাওয়াটা হ্রদের পাড়েই দিলারামের বাগান। সওয়াই দ্বিতীয় জয়সিং-এর সুদক্ষ ভাস্করের নামেই বাগানটি নামাঙ্কিত। এটি মূলত নির্মিত হয়েছিল অতিথিশালা হিসাবে। এই বাগানটির মধ্যে বর্তমানে রয়েছে ছোট্ট একটি সংগ্রহশালা, যেখানে আজও আছে কিছু প্রাচীন ভাস্কর্যের নিদর্শন।
লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরটিও অম্বরের কম আকর্ষণীয় নয়। অল্প কিছু সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলাম মন্দিরে। উত্তরমুখী মন্দির। এর দুপাশেই রয়েছে সারি সারি দোকান। বর্তমানে মন্দিরটি আছে পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধীনে। তারাই নিত্য ভোগরাগ আর সেবার দায়িত্ব নিয়েছেন পুরোহিতদের হাত থেকে।
অম্বর প্রাসাদ দেখা হলো। আবার ট্যাক্সী চললো বর্তমান রাজধানী জয়পুরের সিটি প্যালেসের উদ্দেশ্যে দিল্লী-জয়পুর রোড ধরে।
অম্বর মসজিদটি রয়েছে শহরের উত্তর-পূর্ব অংশে। মসজিদের মূল স্তম্ভে ফারসী ভাষায় লেখা আছে, এটি নির্মাণ করেন সম্রাট আকবর। তবে ঐতিহাসিকেরা এর গঠনশৈলী দেখে অনুমান করেন ঔরঙ্গজেবের শাসনকালের কিছু পরেই নির্মাণ করা হয়েছে মসজিদটি।
জয়পুরের একটি বিশেষ আকর্ষণ হলো সুন্দরগড় কেল্লা। সুন্দরগড় নাহারগড় নামেই প্রসিদ্ধ। ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সওয়াই জয়সিং মারাঠা আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য এটি নির্মাণ করেন। কেল্লাটি যে পাহাড়ে অবস্থিত সেটি দেখতে অনেকটা বাঘের মতো। অম্বরের জয়গড় কেল্লার সঙ্গে যুক্ত এই সুন্দরগড় কেল্লা। আধুনিক নগর পরিকল্পনার আঙ্গিকেই গড়ে তোলা হয়েছে।
অম্বরপ্রাসাদ থেকে দেখতে দেখতে ট্যাক্সী এসে দাঁড়ালো সিটি প্যালেসের সামনে :

সহযাত্রীসহ নেমে এলাম। এখানে টিকিট কাটতে হয়। প্রবেশ মূল্য দিয়ে প্রবেশ করলাম ভিতরে।

নামেই বোঝা যায় এটা জয়পুরের রাজাদের আবাসস্থল। তবে এখনকার নয়, তৎকালীন রাজাদের। সাতটি প্রবেশদ্বার নিয়ে বিশাল প্রাচীরে ঘেরা প্রাসাদ। এর মধ্যে উদয়পোল দ্বারটিই সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধ। এখানকার প্রাসাদমহলগুলি যদিও দ্বিতীয় জয়সিং নির্মাণ শুরু করেছিলেন তবুও কিছু কিছু মহল বিভিন্ন সময়ে নির্মাণ করেন তাঁর উত্তরাধিকারীরা। জয়পুরের এক সপ্তমাংশ জায়গা জুড়ে এই প্রাসাদ হিন্দুস্থাপত্যের এক অভূতপূর্ব মনোরম নিদর্শন। এই প্রাসাদের দক্ষিণের প্রবেশ পথটি ত্রিপোলিয়াদ্বার নামেই পরিচিত। পূর্বদিকের মূল প্রবেশ পথটির নাম 'শিরে কি দেউড়ী।' এই প্রাসাদ নির্মাণের সূচনা করেন দ্বিতীয় জয়সিং। সম্পূর্ণ করেন পরবর্তী শাসকেরা। এর সুবিশাল প্রাসাদচত্বরে রয়েছে একের পর এক অনেকগুলি প্রাসাদ আর অট্টালিকা।

প্রাসাদের বিখ্যাত মহলগুলিতে প্রবেশ করা যায় ত্রিপোলিয়াদ্বার দিয়ে। ভূতপূর্ব রাজাদের পরিবারের জন্যই ব্যবহৃত হতো এই দ্বারটি। এই দ্বারের ইমারতটির গঠনশৈলী যেমন অপূর্ব তেমনই ঐতিহ্যমণ্ডিত। ত্রিপোলিয়া বাজারের পথে এটি একটি অলংকারবিজড়িত স্থাপত্য। এই দ্বারের নামানুসারেই নাম হয়েছে বাজারের।

গাইড নিয়ে এলাম সিটি প্যালেসের ভিতরে জলের চক। এটি একটি বিশাল হল ঘর। তৎকালীন জয়পুরের রাজারা এখানে বসেই শুনতেন প্রজাদের নানা অভাব অভিযোগের কথা, নিষ্পত্তিও করতেন। এক কথায় জলের চক হলো বিচারালয়। তৎকালীন রাজকীয় শোভাযাত্রা সাজানো হতো এখানে। রাজ্যের বহু হাতি ঘোড়া আর তাদের সওয়ার নিয়ে একসঙ্গে যাত্রা শুরু হতো এখান থেকেই। এর আশপাশেও রয়েছে অনেকগুলি ঘর। এগুলি সংরক্ষিত ছিল রাজপরিবারের ব্যবহারের জন্যে। এখন জলের চক পরিবর্তিত হয়েছে মানসিং টাউন হল নামে।

সিটি প্যালেসে ঢুকলে প্রথমেই যে অট্টালিকাটি চোখে পড়ে সেটির নাম মুবারক মহল। এই মহলেই এসে দাঁড়ালাম সকলে। এটি নির্মাণ করেন দ্বিতীয় মাধোসিং। রাজঅতিথিদের আপ্যায়নের জন্য এটি নির্মিত হয় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। জয়পুরের প্রসিদ্ধ শ্বেতপাথর দিয়ে নির্মাণ করা এই মুবারক মহল স্থাপত্যকলার এক অভূতপূর্ব নিদর্শন। এর বাইরের দিকের দেয়ালে পাথরের উপর যে কারুকার্যখচিত আছে তার তুলনা হয় না। এই প্রাসাদের ঝুলন্ত বারান্দা আর জানলাগুলির যে ভাস্কর্য, তা হিন্দু ভাস্কর্যশিল্পের উৎকর্ষতার দাবিদার। বর্তমানে বস্ত্রসংগ্রহশালায় পরিবর্তিত হয়েছে মুবারক মহল। এখানে সংরক্ষিত আছে তৎকালীন রাজারাণীদের বিচিত্র ধরনের মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদ আর শয্যা দ্রব্য। দ্বিতীয় জয়সিং-এর পুত্র ছিলেন সওয়াই মাধোসিং। উচ্চতায় তিনি ছিলেন সাত ফুট আর চওড়ায় চার ফুট। বিশালদেহী এই রাজপুতের পায়জামা, জামা, বসবার গদি, তাকিয়া, পাশবালিশ, সুন্দর নক্সা করা বিছানার চাদর—সবই সযত্নে রাখা আছে

এখানে। এগুলি সব দুর্লভ ভারতীয় ও রাজস্থানী পোশাকের সংগ্রহ। ঘুরে ঘুরে দেখছি, আর দেখছেন দেশী বিদেশী পর্যটকেরা।

মুবারক মহল থেকে বেরিয়ে এলাম প্রাসাদের অস্ত্রাগারে। নাম এর শিলেখানা। নানা ধরনের দুর্লভ অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে এখানে। ভারতীয় ইতিহাসের কয়েক শতাব্দীর পুরনো এই অস্ত্রগুলি ব্যবহার করতেন তৎকালীন রাজপুত সেনারা। বিভিন্ন আকারের তরবারী, ছোরা, ছুরি, তীর-ধনুক, ঢাল, গোলা, বন্দুক ইত্যাদি সংরক্ষিত আছে এই অস্ত্রাগার, শিলেখানায়।

মুবারক মহলের কাছেই উঁচু চত্বর, তার উপরেই নির্মিত হয়েছে দেওয়ান-ই-খাস। দুটি সারিতে শ্বেতপাথরের স্তম্ভ আছে এখানে। এর কারুকার্য খচিত দুটি পিতলের দরজা যার দুদিকে রয়েছে সুন্দর দুটি শ্বেতপাথরের হাতি। এই ভবনে তৎকালীন রাজারা দেখা সাক্ষাৎ করতেন প্রজাদের সঙ্গে। বিচার এবং রাজ প্রয়োজনে আমন্ত্রিত হতেন মন্ত্রী ও আমলারা। রাজ্যের অভিষেক পর্বের অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হতো এখানে।

দেওয়ান-ই-খাস ছেড়ে এলাম দেওয়ান-ই-আমে। তিনদিক খোলা একটি বিশাল হল ঘর। পূর্বদিকে রয়েছে একটি উঁচু প্ল্যাটফরমের চারদিকেই বারান্দা, যেখানে অর্ধবৃত্তাকারে দোতলা গ্যালারী সামনেই রয়েছে পাথরে কাটা জাল। এর পিছনে বসে রাজপরিবারের মহিলারা দেখতেন বিভিন্ন অনুষ্ঠান। অনবদ্য এই ভবনের সোনার কারুকার্য আর রঙীন চিত্রকলা।

ভারতের বিভিন্ন স্থানের অসংখ্য প্রাসাদের সর্বোৎকৃষ্ট দরজাগুলির মধ্যে রাজস্থানের স্থানীয় শিল্পকলায় পরিপূর্ণ সিটি প্যালেসের 'নক্করখানা দরজা' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। কালের প্রভাবে দরজার উপরের রঙিন চিত্রকলা প্রায় নষ্ট হয়ে গেলেও তার গৌরব হারায়নি এতটুকু। তৎকালীন রাজাদের আমলে নহবত বাজানো হতো এখানে।

দেওয়ান-ই-খাসের উত্তর-পশ্চিমে সাদা অট্টালিকাটির নাম চন্দ্রমহল। কাছাকাছি সমস্ত ভবনগুলি থেকে সবচেয়ে উঁচু এই চন্দ্রমহল। এর সাতটি মহল তৎকালীন রাজারা নির্মাণ করেছিলেন তাঁদের নিজেদের অভিরুচি অনুসারে। আমরা সকলে উঠে এলাম একেবারে উপরে। এখান থেকে দেখা যায় সমগ্র জয়পুর, নাহারগড় আর অম্বর শহরের মনোরম দৃশ্য। বিশাল এই ভবনটির নির্মাণ কৌশল এমনই, বাইরে থেকে এর বিশালতা মোটেই অনুমান করা যায় না। চন্দ্রমহলের দরজা-গুলিতে হাতির দাঁতের কাজ দেখলে একেবারে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। এই ভবনের উদ্যানমধ্যেই স্থাপিত গোবিন্দজী মন্দিরটি চন্দ্রমহল এবং বাদল মহলের মাঝখানে। কথিত আছে, মহলটি নির্মাণের পর সওয়াই জয়সিং প্রথম রাত্রিবাসের সময় দৈবাদেশ পান মহলটিতে বাস না করার, কারণ ওটি দেবস্থান। পরদিনই তিনি ছেড়ে দেন ওই মহলটি। পরবর্তী সময়ে ওখানে স্থাপিত হয় গোবিন্দজীর বিগ্রহ।

মহারাজা দ্বিতীয় রামসিং এই সিটি প্যালেসের মধ্যেই নির্মাণ করেন রামবাগ প্রাসাদ। বিশিষ্ট অতিথিদের আপ্যায়নের জন্যই নির্মিত হয় এটি। তাঁর নামানুসারেই নাম হয়েছে এই প্রাসাদের। পরবর্তী সময়ে এটিকে আরও পরিবর্ধিত এবং আধুনিক সুবিধাযুক্ত করে তোলেন মহারাজা দ্বিতীয় মানসিং। প্রাসাদটি নির্মিত হয়েছিল ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই প্রাসাদ উদ্যানের পূর্বদিকেই রয়েছে একটি চিড়িয়াখানা।

সিটি প্যালেসের মধ্যেই ঘুরে দেখছি একের পর এক তৎকালীন রাজস্থানের নানা শিল্পকলা আর সংস্কৃতির বিকাশ। ঘুরে ঘুরে দেখছেন আমার মতো অসংখ্য ভ্রমণপিয়াসী যারা। বিদেশী পর্যটকও এসেছেন অনেক। তাদের দেখা ও চলাফেরায় কোন বিধি নিষেধ নেই এখানে।

এই প্রাসাদ চত্বরেই রয়েছে খুব সুন্দর সজ্জিত একটি বাগান। তারমধ্যে রয়েছে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর ফোয়ারা। সবকিছুই ঝক্‌ঝক্ করছে। যত্নের যেন আর শেষ নেই। গাছের একটা শুকনো পাতাও পড়ে নেই সারা বাগানের কোথাও।

ত্রিপোলিয়া বাজারের পশ্চিমদিকে অবস্থিত ঈশ্বরলাট। সাততলা এই অট্টালিকাটির মধ্যে রয়েছে গ্যালারী। আকাশচুম্বী ঈশ্বরলাট জয়পুরের একটি বৈচিত্র্যমণ্ডিত অট্টালিকা। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন মহারাজা ঈশ্বরসিং। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে 'সেরফাসুলি' নামেই এর পরিচিতি। এই অট্টালিকাটি এত উঁচু, মনে হয় যেন চিতোরগড়ের বিজয়স্তম্ভ থেকেই এর প্রেরণা নেয়া হয়েছে। এটি জয়পুরেরই একটি বিজয়স্তম্ভ, যা মহারাজা ঈশ্বরসিং তাঁর ভাই দ্বিতীয় মাধোসিংকে পরাজিত করে, সেই জয়কে স্মরণীয় করে তুলতেই নির্মাণ করেছিলেন তিনি।

সিটি প্যালেসের গ্রন্থাগারটিও দেখার মতো। চন্দ্রমহলের পশ্চিমে পুরনো দরবার কক্ষেই গড়ে উঠেছে এটি। অসংখ্য গ্রন্থের সঙ্গেই রয়েছে বহু দুষ্প্রাপ্য চিত্র। বিভিন্ন গ্রন্থের দুর্লভ পাণ্ডুলিপিও আছে এখানে। সেগুলির মধ্যে সযত্নে রাখা আছে আবুল ফজল অনূদিত মহাভারতের ফারসী অনুবাদ, আকবর রাজসভার বিখ্যাত চিত্রকরদের বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় চিত্রকলা। এগুলির মধ্যে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হলো আনুমানিক পাঁচ ফুট লম্বা আর এক ইঞ্চি চওড়া একটি কাগজে মূল সংস্কৃতে লেখা গীতার আঠারোটি অধ্যায়। খালি চোখে লেখা বোঝা যায় না। তাই দর্শকদের সুবিধার জন্যে একটি আতসকাচ রাখা আছে লেখার উপরে। এই গীতাটি লেখা হয়েছিল ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। গাইডের কাছে জিজ্ঞাসা করেও জানা গেল না অতীতের লেখকশিল্পীর নামটা। প্রতিটি পর্যটকের কাছেই জয়পুর দেখা অসমাপ্ত থেকে যাবে এই গ্রন্থাগারটি না দেখলে।

রামনিবাস উদ্যানের দক্ষিণ সীমানার মাঝামাঝি জায়গায় এলাম মিউজিয়ামে। ভারতীয় স্থাপত্যকলায় নির্মিত যত বাড়ী আছে তারমধ্যে জয়পুরের এটি একেবারেই অন্যতম। রাজস্থানের সেরা এই যাদুঘরটি নির্মিত হয়েছে বেলেপাথর আর শ্বেতপাথরের মিলনে। আরও একটা নাম আছে এর—এলবার্ট হল। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এটির শিলান্যাস করেন ওয়েলসের রাজকুমার এলবার্ট নিজেই। সম্পূর্ণ

হয় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর নামেই নাম হয়েছে এই যাদুঘরের। বিদেশী শিল্পকলা ও স্থাপত্যকৌশল প্রয়োগ করা হলেও এর নির্মাণ প্রবৃত্তি মূলত ভারতীয়। এই সংগ্রহশালায় আছে চীন জাপান এবং শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিত্রগুলির প্রতিলিপি, সুন্দর সুচারুরূপে মীন করা ধাতুর বাসন, বিভিন্ন মুদ্রা, ভাস্কর্য, কাঠ এবং হাতির দাঁতের উপর খোদাইয়ের কাজ, চীনামাটি ও পাথরের মূর্তি আর অসংখ্য দুর্লভ বস্তুর এক সুবিশাল সংগ্রহ। অবাক করে দেয়ার মতো একটি পুরনো নকসা করা কার্পেট আছে এখানে যেটির বয়স তিনশো বছর। রাজস্থানের চৌদ্দজন রাজার বিরাট বিরাট তৈলচিত্রের প্রতিকৃতি রয়েছে এই সংগ্রহশালায়। প্রথম চিত্রটি ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দের মহারাজ পৃথ্বীরাজের। সর্বশেষ চিত্রটি দ্বিতীয় মাধোসিং-এর যিনি মারা যান ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে।

আধুনিক জয়পুরের মূল দর্শনীয় স্থানটি সিটি প্যালেসকে বাদ দিয়ে নয়। এর ভিতরে যা যা দেখার ছিল মোটামুটি দেখা হলো সবই। এবার হাঁটতে হাঁটতে এলাম সিটি প্যালেসের পিছনে যন্তর-মন্তর। নামের সঙ্গে ম্যাজিকের কোন সম্পর্ক নেই। আসলে এটি মানমন্দির। সওয়াই জয়সিং যে পাঁচটি মানমন্দির নির্মাণ এবং তত্ত্বাবধান করেছিলেন, যেমন দিল্লী, মথুরা, উজ্জয়িনী, বেনারস এবং জয়পুর—তারমধ্যে জয়পুরের এটি সবচেয়ে বড় এবং পৃথিবী বিখ্যাত মানমন্দির-গুলির মধ্যে অন্যতম একটি। নিষ্প্রাণ ইট পাথরের সমন্বয়ে তৈরী এই মানমন্দিরের মাধ্যমে নিখুঁতভাবে জানা যায় সময়, তিথি, রাশি, নক্ষত্র ইত্যাদি। বিজ্ঞান এবং স্থাপত্যকলার এক অনুপম নিদর্শন এই মানমন্দির। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এটি নির্মিত হয় ত্রিপোলিয়া প্রাঙ্গণে।

এবার ট্যাক্সী চললো জয়পুর শহরের আশপাশের দর্শনীয় যেসব জায়গাগুলি রয়েছে সেগুলি দেখার জন্য।

কলা ও শিল্পের দিক থেকে সারা পৃথিবীতে আলাদা একটা স্থান আছে রাজস্থানের এই জয়পুরের। বিশেষ করে এখানকার স্থানীয় শিল্পীরা বিভিন্ন সামগ্রী এবং সৌন্দর্যপূর্ণ উপযোগী বস্তু দান করেছে ভারত তথা সারা পৃথিবীর মানুষকে। নানা শিল্পদ্রব্যের মধ্যে এমন সজীবতা তাঁরা প্রদান করেছেন, দেখলেই মনে হয় যেন সব জীবন্ত, এরা কথা বলতে চায় পর্যটকদের সঙ্গে। শুধু তাই নয়, রাজপুত জাতিরাই সমগ্র উত্তর ও পশ্চিম ভারতের হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তাছাড়া সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্র ও নৃত্যকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের দিক থেকে রাজস্থানের অবদান অনস্বীকার্য। বিশেষ করে ১৩০০ থেকে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ—এই সময়কালের মধ্যে।

ট্যাক্সী এসে থামলো গৈতর। জয়পুর শহরের উত্তরপূর্বে রয়েছে সুন্দর সাজানো একটি বাগান, পরিবেশও মনোরম। গৈতর সমাধিক্ষেত্র। জয়পুরের প্রাক্তন রাজা মহারাজাদের সমাধি দেয়া হতো এখানে। জায়গাটি নাহারগড় এবং গণেশগড়ের মধ্যে একটি ছায়াঘেরা জায়গা। এখানে নির্মিত সমাধিশৈলীর গড়ন

প্রায় একই ধাঁচের, পাঁচটি চূড়াযুক্ত মন্দিরের মতো। এখানকার মহারাজা দ্বিতীয় সওয়াই জয়সিং-এর সমাধি ক্ষেত্রটি জয়পুরিয়া ভাস্কর্যের একটি নিদর্শন।

এরপর একের পর এক যেসব দর্শনীয় জায়গাগুলি আছে, সেগুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ নাহারগড় কেল্লাটি। এটি অবস্থিত গৈতরের বাঁদিকে। এই কেল্লার আরও একটি নাম সুদর্শন গড়। জয়পুর থেকে এখানে আসতে হয় নাহারগড় রোড ধরেই। কেল্লার প্রবেশপথের পাহাড়টি দেখতে অনেকটা বাঘের মতো। তাই প্রবেশদ্বারের নাম হয়েছে ব্যাঘ্রকেল্লা। আগে এখানকার কোন কিছুই দেখতে দেয়া হতো না। এখন উন্মুক্ত সকলের জন্যেই। কেল্লাটির মধ্যে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণীয় হলো নকল কাচের জানলা আর রঙের বৈচিত্র্য। কেল্লাটি সাতশো ফুট উঁচুতে অবস্থিত। ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এটির নির্মাণ কাজ শুরু করেছিলেন সওয়াই দ্বিতীয় জয়সিং তবে শেষ করতে পারেননি। শেষ করেন দ্বিতীয় সওয়াই রামসিং এবং সওয়াই মাধোসিং।

এই নাহারগড় কেল্লাটির একটি বিশেষত্ব আছে। মাটির উপরে যেমন দুটি তল আছে তেমনই আরও দুটি তল আছে মাটির নীচেও। গরমকালের উত্তপ্ত দুপুরে সময় কাটানো এবং বিভিন্ন মূল্যবান দ্রব্য সুরক্ষিত রাখার জন্যেই ঘরগুলি নির্মাণ করা হয়েছিল মাটির নীচে। ৬ কি. মি. একটি রাস্তার সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে এই কেল্লার সঙ্গে অম্বরের জয়গড় কেল্লার।

শহর জয়পুরের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে রয়েছে আরও অসংখ্য দর্শনীয় স্থান। ট্যাক্সীতে ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকি একের পর এক।

নাহাড়গড়ের সামনের পাহাড়েই গণেশগড়। একটি মন্দির আছে গড়ের মধ্যে। মন্দিরটি গণেশের। সুরক্ষিত কেল্লায় এই গণেশের নামানুসারেই নাম হয়েছে গড়ের। এখানকার আকর্ষণীয় হলো একটি বিশাল জলাধার। একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে যায় বর্ষাকালে। এই গড় থেকে আশপাশের দৃশ্য যেমন নয়নাভিরাম তেমনই দেখা যায় অম্বরের প্রাসাদদুর্গ।

জয়পুর-আগ্রা রোডের পাশেই পুরাণা ঘাট। আসলে এটি গিরিবর্ত। পুরাণা ঘাটের বাঁদিকেই অমরগড় কেল্লা। রামনিবাস উদ্যানের গেট পেরিয়ে সরাসরি আসতে হয় এখানে। এই কেল্লার নীচে যে পাহাড়ী খাদ আছে, সেখানে পাওয়া যায় সুন্দর ও মূল্যবান পাথর। এখান থেকেই পাথর কেটে নিয়ে যাওয়া হয় জয়পুরে বাড়ী নির্মাণের জন্য। জয়পুরের পাথর বিখ্যাত বলতে এখানকার পাথরকেই বুঝায়। এই রাস্তাটির শেষে একটি বাগানের মধ্যে রয়েছে সুন্দর একটি প্রাসাদ। রাস্তার দুপাশে ছায়াবেষ্টিত বাগান আর মন্দির এক অপূর্ব আনন্দের সৃষ্টি করে পর্যটক মনে।

জয়পুর শহরের পূর্বদ্বার সুরজপোল থেকে কিছুটা দূরেই প্রকৃতিপ্রেমিকদের একটি রমণীয় জায়গা পাহাড়ের উপরে অবস্থিত গলতা। এটি হিন্দুদের একটি তীর্থক্ষেত্রও বটে। কথিত আছে, গালব নামে এক ঋষির তপস্যাক্ষেত্র ছিল

এখানে। এখানকার কুণ্ডের জল গঙ্গাজলের মতোই পবিত্র মনে করেন যাত্রীরা। একটি বিরাট সূর্যমন্দিরও আছে এই পাহাড়ের পাদদেশেই। আরও অসংখ্য দেবদেবীর মন্দির রয়েছে পাহাড়ের মাথা থেকে পা পর্যন্ত।

সওয়াই মানসিং-এর তৃতীয় পত্নী ছিলেন গায়ত্রী দেবী। একটি মোতি বা মুক্তোর মহল বানিয়েছিলেন তিনি। যার নামই হয়েছে মোতিডুংরী। গণেশের একটি প্রসিদ্ধ মন্দির আছে এখানে। মোতিডুংরী আর শহর জয়পুরের মাঝামাঝি জায়গায় তৈরী হয়েছে কয়েকটি আধুনিক ভবন। যেমন মহারাজা কলেজ, মেডিকেল কলেজ, রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়, রাজস্থান সরকারের সচিবালয় ইত্যাদি।

জয়পুরের অমানীশাহ নদীর পশ্চিমদিকে সাংগানের। শহর থেকে ১১ কি. মি. দক্ষিণে। কিছু পুরনো মন্দির, মহল আর বাগান নিয়েই প্রাচীন জনপদ এই সাংগানের। এক কথায় এটি পুরনো শহরের ধ্বংসাবশেষ। এর চারদিকেই গভীর বন জঙ্গল। তাই জায়গাটি ভালোভাবে দেখা যায় না দূর থেকে। উঁচু প্রাচীরে ঘেরা পুরনো রাজপুত নগরী। একাদশ শতাব্দীতে মহারাণা সংগার নির্মিত জৈন মন্দিরটি এই প্রাচীন শহরের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। এর স্থাপত্যকলার উৎকর্ষতাও অবর্ণনীয়। মহারাজা পৃথ্বীরাজের তৃতীয়পুত্র সংগার নামানুসারেই নাম হয়েছে এখানকার। এখানেই মোঘল সেনারা পরাজিত করেছিলেন দ্বিতীয় জয়সিং-এর ভাই বিজয়সিংকে।

অনেক কথা পাওয়া যায় মহাভারতে। পাওয়া গেছে মৎস্যদেশেরও কথা। প্রাচীন-কালে জয়পুরের উত্তরাংশটা ছিল মৎস্যদেশের সঙ্গে যুক্ত বিরাট রাজার রাজধানী বিরাট নগর। জয়পুরের কাছে বৈরাটে পাওয়া গেছে সম্রাট অশোকের শিলালিপি। এগুলি ২৭২-৩২ খ্রীষ্টপূর্বের। এর থেকেই জানা গেছে একথা। পুরাকালের মৎস্যদেশ আধুনিক জয়পুর ছিল ১৬টি জনপদের মধ্যে একটি এবং অন্যতম। অজ্ঞাতবাসের সময় পঞ্চপাণ্ডব এসেছিলেন আজকের জয়পুর, প্রাচীন মৎস্যদেশে।

অল্প সময়ের মধ্যে জয়পুরের সবকিছু ঘুরে দেখতে হলে ট্যাক্সীই ভালো। খরচা একটু বেশী পড়বে ঠিকই তবে দেখা হবে প্রায় সবই। নইলে আধা-খ্যাচড়া হয়ে থাকবে। সব দেখে আসা কেউ যখন গল্প করবে তখন নিজেরই আফশোস হবে, 'এই যাহ্, ওখানে তো যাইনি আমরা'।

সব ভাষাভাষীর পর্যটকেরই যেমন আগমন ঘটে এই শহর জয়পুরে তেমনই বিদেশী পর্যটকের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। জয়পুরই হলো রাজস্থানের প্রবেশদ্বার। এই 'পিংক সিটি'-র সঙ্গে রেলের যোগাযোগ রয়েছে ভারতের সমস্ত বড় শহরের। দিল্লী থেকে সকালে একটি ট্রেন ছাড়ে পিংক-সিটি এক্সপ্রেস। এছাড়াও দিল্লী থেকে অসংখ্য বাস কণ্ডাকটের ট্যুরে যায় জয়পুরে।

শহর জয়পুর দেখার জন্যে প্রতিদিন বাস সার্ভিস আছে জয়পুর থেকে। সকালে বাস ছাড়ে স্টেশনের কাছ থেকে। এটি রাজস্থান ট্যুরিজম ডিপার্টমেণ্ট কর্পোরেশনের উদ্যোগে। তিনটি বড় ট্যুরিস্ট অফিস আছে রাজস্থান সরকারের। একটি রেলওয়ে

স্টেশনে, দ্বিতীয়টি সেণ্ট্রাল বাসস্ট্যাণ্ড সিন্ধি ক্যাম্প, আর একটি ১০০ নং জহরলাল নেহের্ মার্গে।

সারা বছরই অসংখ্য পর্যটক আসেন জয়পুর ভ্রমণে। তবে অক্টোবর থেকে মার্চের মধ্যেই এখানে ভ্রমণের উপযোগী সময়। এখন শীতকাল। আমি এসেছি এই শীতেই। কোন অসুবিধে হয় না। দিনের বেলায় বেশ গরম। রাতে পড়ে জব্বর ঠাণ্ডা।

দেখতে দেখতে ট্যাক্সী এসে দাঁড়ালো জয়পুর স্টেশনের কাছে, যেখান থেকে রওনা দিয়েছিলাম সেখানেই। সারাদিন ঘুরে সকলেই ক্লান্ত। খাওয়া দাওয়া সারা হয়েছে পথেই। সন্ধ্যা হতে আর সামান্য বাকি। সংরক্ষিত বগি ছিল ট্যুরিস্ট প্ল্যাটফরমেই। এসে বসলেন আমার সহযাত্রীরা সকলেই।

এখনও অনেক দেরী আছে ট্রেন ছাড়তে। ছাড়বে রাত তিনটেয়। এই বগি এবার লেগে যাবে এক্সপ্রেসে নয়, আগ্রা-আমেদাবাদ প্যাসেঞ্জারে। আগামীকাল সকালে পৌঁছাবো আজমীরে।

## তীর্থগুরু পুষ্কর ও আজমীর

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, কখন যে ট্রেন জয়পুর ছেড়ে চলা শুরু করেছে, কিছুই জানি না। কাকভোরেই ঘুম ভেঙে গেছে আমার সহযাত্রীদের। তাদেরই কণ্ঠস্বরে ঘুম ভেঙে গেল আমারও। শুনছি তাদের কথা। এক বার্থের সধবা বয়স্কা মহিলা যিনি এসেছেন একাই, তার সামনের বার্থের ভদ্রমহিলাকে বলছেন যার স্বামী রয়েছেন নীচের বার্থে শুয়ে,

—জানেন দিদি, আমার বহুদিনের ইচ্ছা ছিল দ্বারকায় যাই। কিছুতেই আর হয়ে ওঠে না। কৃষ্ণের অপার করুণা তাই এবার বেরোতে পেরেছি। তাঁর দয়া ছাড়া কি তীর্থ হয়, বলুন দিদি ?

উত্তর এলো অন্য বার্থ থেকে,

—তাই তো, আমারও অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল, এবার হলো। রাজস্থানটা আমার ইচ্ছা ছিল না। সেটাও হলো, সঙ্গে পুষ্কর, সাবিত্রী, প্রভাস, দ্বারকা, সোমনাথ সবই হবে। ঠাকুরের কত দয়া!

কথাগুলো শুনলাম দেখতে পেলাম না, ভদ্রমহিলা কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন কিনা! 'জানেন দিদি'র বয়েস প্রায় পঞ্চান্ন থেকে আটান্ন হবে। মাথায় কাঁচা আর পাকাচুল ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি। গোলগাল চেহারা। গায়ের রঙ ফরসা। সাজানো দাঁত। মেয়েদের সাধারণ উচ্চতায় যতটুকু—ততটুকু ইনিও। এসব দেখেছি আগেই। ট্রেনে আমার খোপের পাশেই শুয়ে আছেন তিনি। ট্রেন চলছে সমানে। ভগবান দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ ওইটুকুই। এবার 'জানেন দিদি' বললেন,

—আমার ছেলে এখন থাকে আমেরিকাতে। মেয়ে ইংলিশে এম. এ.। বিয়ে দিয়েছি ডাক্তারের সঙ্গে। জামাই-এর সল্টলেকে বিরাট বাড়ী। নিজের গাড়ী। টাকার

বন্যা বয়ে চলেছে উঠোনের উপর দিয়ে। নিজের বলে বলছি না দিদি, আমার মেয়ের যেমন রূপ তেমনই গুণ। ছেলের পক্ষ লুফে নিয়েছে। এতটুকু সমস্যা হয়নি বিয়ে দিতে।…

কৃষ্ণ কথা শেষ। আমি দেখেছি, সংসারেই হোক আর পথেই হোক, ফাঁক ফোকর পেলেই শুরু করেন এইসব 'জানেন দিদি' মার্কা মহিলা বা দাদারা। শুধু বড় বড় কথা। সব বাপ মায়ের মেয়েই সুন্দরী। যদি সঙ্গে না থাকে তাহলে আরও সুন্দরী করে তোলে অন্যের কাছে। মেয়ে তো নয় যেন কর্ণার প্লটের জমি। হাওয়া বাতাস খেলবে চারদিক থেকেই। রাস্তার ধারে লাগোয়া ড্রেন। জলের পাইপ টানতে খরচা কম। বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াবে গাড়ী। সঙ্গীতে প্রভাকর। নাচে মেনকা। রান্নায় অন্নপূর্ণা। মোটের উপর এইসব 'জানেন দিদি'দের ছাঁচে ফেলা রেডিমেড সাপ্লাই। যার যেমনটি দরকার বেছে নাও। বাংলা মা সুন্দরী প্রসব করে বসে আছে ঘরে ঘরে, তবুও বত্রিশে এদের পাত্র জোটে না।

আমি ভাবি, স্বামী সন্তান নিয়ে গর্ব থাকা ভালো। তাই বলে এই হাটে-বাজারে? এদের কারও কোন ছেলে মদ্যপ, লম্পট বা জুয়াড়ী কিংবা কোন মেয়ে যদি বারোয়ারী হয়, এরা কিন্তু তা ভুল করেও অমন গলা বাড়িয়ে বলে না। একথাও জানে, কারও দায় পড়েনি তার খবর নেয়ার, ছেলে আমেরিকাতে আর মেয়ে ইংলিশে এম. এ. কিনা? এইসব বাপ মায়েদের যদি জিজ্ঞাসা করা যায় আপনার যোগ্যতা কি আছে, তাহলে অধিকাংশেরই ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে যাবে মুখখানা।

'জানেন দিদি'র মেয়ের প্রশংসা শুনে এবার উত্তরে শুরু করলেন শুয়ে থাকা প্রায় সমবয়েসি 'শুনছেন দিদি', যার কথার ভাবটা এমন,

—আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে? তোমার মেয়ে ইংলিশে এম. এ-ই হোক আর ছেলে আমেরিকা কিংবা জাহান্নামেই যাক্, আমার কি কমতি হ্যায়? ফ্যামিলির গৌরব দেখা তা হ্যায়? আমার গাড়ী বাড়ী ফোন হ্যায়। হোক না বিকল, তবুও তো ফোন বলে কথা। আমার মেজভাই এখন আমেরিকাতে রুগ্নশিল্প বিষয়ে রিসার্চরত। ছোট ভ্রাতার বিদেশ যাওয়ার ইচ্ছা। বোন একটা ডিমে তিনটে বাচ্চা হওয়ার অধিক ফলন বিষয় নিয়ে থিসিস জমা দেবো দেবো করছে। কাকার ছেলেরা প্রতিষ্ঠিত কনেস্টবল। মাসিমার ছেলে হোমগার্ড। খুড়তুত দাদা উদীয়মান সাহিত্যিক। ঠাকুরদা পূর্ববঙ্গের তৎকালীন জমিদার, অখনে ফুটপাথে। ঠাকুমা কাঁথা সেলাই শিল্পে ডিপ্লোমা…

এ জাতীয় কথা শুনছি শুয়ে শুয়ে, এই সাত সকালে। এখন উভয় পক্ষের ফ্যামিলি নিয়ে চলেছে প্রতিযোগিতা। মনে হয় যেন পাত্র আর পাত্রীপক্ষের মধ্যে কথা হচ্ছে। ভ্রমণপথে দেখেছি, পথে যার সঙ্গে যেখানে আলাপ হয়েছে যেমন, কাশীর পথে বিশ্বনাথ, দ্বারকার পথে কৃষ্ণ, বৃন্দাবনে রাধা, অযোধ্যায় রাম, নেপালের পথে পশুপতিনাথের দয়াতেই আলাপকারীর এই ভ্রমণ হচ্ছে বলে শুরু করে একেবারে সোজা চলে যান বংশের ইতিহাসে। কে কি করেছিলেন, কোন্ কালে কি দিয়ে

ভাত খেয়েছিলেন—এমন হাজার কথা। যাকে উদ্দেশ্য করে বলা তিনিও যে কম যান, তা কিন্তু মোটেই নয়। তার মুখ থেকেও বেরোতে থাকে, আমরা মহাপ্রভুর বংশধর। হুসেন শাহ ৫০০ বিঘে জমি দিয়েছিলেন আমাদের পূর্ব পুরুষদের। কিছুদিন আগেই সেটা সরকার দখল করে নিয়েছে। এককালে হস্তিনাপুরের রাজধানীটা তো আমাদেরই ছিল।…

এমন তরো হাজারো কথা। ভ্রমণে বেরিয়ে কোন কাজ থাকে না তাই চলতে থাকে কার কি আছে, কি ছিল! নিজের কিছু না থাকলে চলে বংশ নিয়ে টানাটানি। আর শেষমেশ তাও যদি না থাকে তবে 'নিজ কলে প্রস্তুত' করে নিয়ে কিছু বলেন। নিজের পরিবারের অথবা বংশের কোন কলঙ্কের ইতিহাস এরা মোটেই বলেন না। আমার তো মনেই হয় না ভারতের এমন কোন পরিবার বা বংশ নেই, যে পরিবার বা বংশ একেবারেই নিষ্কলঙ্ক—ধোয়া তুলসীপাতা। আর ক-জনই বা রাখে তার বংশের খবর! আসলে পাড়ায় এসব কথা চলে না কোন পরিবারের সঙ্গে। সেখানে একে অপরের হাঁড়ির খবর রাখে যে! বাইরেই ভালো—ইমেজ বাড়ে। কেউ তো কারও খবর নিতে যাবে না সুতরাং যে বলে সে খুশীই হয়। যে শোনে সেও শুনে পরে বলে খুশী হয়। অতএব ভ্রমণপথের রস কখনও শুকিয়ে যায় না। অনাবিল আনন্দই থাকে ভ্রমণকারীর বিশেষ করে এই দলবদ্ধ ভ্রমণে।

সকাল ৭/১৫ মিনিট। ট্রেন এসে থামলো আজমীর শরীফ স্টেশনে। যথারীতি কেটে দেয়া হলো আমাদের সংরক্ষিত বগিটাকে। আগ্রা-আমেদাবাদ প্যাসেঞ্জার চললো তার পথ ধরে। আমরা রয়ে গেলাম। জয়পুর থেকে আজমীর এলাম ১৩৮ কি. মি.।

একটু বিশ্রামের পর সহযাত্রী সমেত উঠে পড়লাম বাসে। আগেই ঠিক করা ছিল। ভ্রমণকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গেলে প্রচুর অর্থ যায় তবে উদ্বেগ আর নিজেদের দৌড়-ঝাপ করতে হয় না মোটেই। অর্থের বিনিময়ে মুক্তি পাওয়া যায় এইসব থাকা খাওয়া আর ঘোরাঘুরির ঝামেলা থেকে। সকাল ৯টায় বাস ছাড়লো স্টেশনের কাছ থেকেই।

বাস চললো শহর আজমীরের উপর দিয়ে। মাত্র মিনিট দশেক চলার পরেই শহর ছেড়ে ধরলো শহরতলীর পথ। তারপরেই বাস ক্রমশ উঠতে লাগলো পাহাড়ী পথ ধরে। এখন পাহাড়ে সবুজের নামগন্ধ যেটুকু আছে তা না থাকারই মতো। শীতকাল বলেই হয়তো। বর্ষাকালে পাহাড়ের রূপটাই আলাদা। আরাবল্লী পর্বতমালার অন্তর্গত নাগ পাহাড়ের উপর দিয়েই রাস্তা। এ-পথ চলেছে পুষ্কর তীর্থে। কখনও দুপাশে আবার কখনও একপাশে খাড়া পাহাড়, আর সব পাহাড়ী পথে যেমন বাসপথ হয় তেমনই। পথ খুব চওড়া নয়। বিপরীতমুখী গাড়ী এলে থামে উভয়েই। একে পথ করে দেয় অপরকে। পুষ্করে যাওয়ার এই রাস্তাটি নির্মিত হয় ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে। কিছুক্ষণ চলার পরেই বাস নেমে এলো প্রায় সমতলে। দেখতে দেখতে এসে থামলো পুষ্কর তীর্থের বাসস্ট্যান্ডে। সময়

লাগলো স্টেশন আজমীর থেকে মাত্র ৩০ মিনিট। দূরত্ব সামান্যই—১৩ কি. মি.। সকলেই এসে উঠলাম সিন্ধির ধর্মশালায়। থাকার কোন অসুবিধে নেই এখানে, এই পুষ্করে। রয়েছে অসংখ্য ধর্মশালা, আশ্রম আর বিশ্রামগৃহ।

একটু বিশ্রামের পরেই বেরিয়ে পড়লাম ঘুরতে। বাঁধানো পিচের রাস্তা। প্রথমে চললাম ব্রহ্মার মন্দিরে। পথের দুপাশে সারিসারি দোকান। ফুলের ডালি আর পুজোপোকরণ নিয়ে দোকানী বসে আছে দোকান সাজিয়ে। অযোধ্যার মতো এখানেও মহিলা দোকানী চোখে পড়লো অনেক। হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়ালাম ব্রহ্মার মন্দিরের সামনে। ধর্মশালা থেকে পথ মাত্র মিনিটতিনেকের। বয়স্কদের কাছে মিনিট পাঁচ সাত।

বিরাট তোরণদ্বার। শ্বেতপাথরের বাঁধানো সিঁড়ি। ধীরে ধীরে উঠে এলাম উপরে ব্রহ্মার মন্দিরে। সামনেই ঝুলছে বড় একটা পিতলের ঘণ্টা। বড় তোরণদ্বারটা পেরোতেই বাঁপাশে বিশাল নিমগাছ রয়েছে একটা। এর সামনেই গর্ভগৃহে নেমে এলাম কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙে। শিবলিঙ্গ পাতালেশ্বর মহাদেব প্রতিষ্ঠিত আছে গর্ভমন্দিরে।

এবার এলাম একেবারে পাথর বাঁধানো মন্দিরচত্বরে। তোরণদ্বারের ডানদিকেই কোণে গণেশ মন্দির। তার সামনের মন্দিরটি বেশ ছোট। ভিতরে ধনপতি কুবের বসে আছেন হাতির পিঠে। এঁরই পাশে পশুপতি পঞ্চমুখী মহাদেব। মূর্তিগুলি আকারে ছোট—শ্বেতপাথরের। এই ছোট্ট মন্দিরের মধ্যে আর আছে নারদ, গৌরীশংকর এবং সূর্যদেবের বিগ্রহ। মন্দির চত্বরের মন্দিরগুলি সবই ছোট ছোট। একের পর এক দেখতে থাকি ঘুরে ঘুরে।

পঞ্চমুখী শিবমন্দিরের পাশেই সপ্তঋষির মন্দির। সাতজন ঋষির ছোট ছোট মূর্তি রয়েছে মন্দিরমধ্যে।

মন্দির চত্বরের মাঝখানেই ব্রহ্মার মন্দির। মাঝারী আকারের মন্দিরটি চূড়াশোভিত। কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলাম ছোট্ট নাটমন্দিরে। মূল মন্দিরে রয়েছে রূপোর সিংহাসন। তার উপরেই প্রতিষ্ঠিত চতুরানন ব্রহ্মার মূর্তি। ধবধবে সাদা পাথরের। বাঁপাশেই পত্নী গায়ত্রীদেবী। ব্রহ্মার মাথায় রূপার কারুকার্যখচিত মুকুট।

ব্রহ্মা মন্দিরের ডানপাশে কোণেই রয়েছে একটি বেল আর একটি নিমগাছ। তার পাশেই গর্ভমন্দির। এখানেও স্থাপিত আছে একটি প্রাচীন শিবলিঙ্গ। নেমে দেখে আবার উঠে এলাম উপরে।

ব্রহ্মার মন্দিরকে ঘিরেই এইসব মন্দির। সিংহবাহিনী দেবী অম্বার একটি মন্দির রয়েছে মূল মন্দিরের একেবারে পিছনে। মন্দিরমধ্যে পাথরের দেবী মূর্তির পাশেই স্থাপিত মূর্তি দুটির একটি মহাবীর, অপরটি মহাদেবের। ব্রহ্মা মন্দিরের বাঁপাশেই রয়েছে নিত্য ভোগ রান্নার ঘর।

ব্রহ্মার প্রাচীন মন্দিরের নির্মাণকাল আজও অজ্ঞাত। আনুমানিক ১২৩৮ বছর আগে ভারতের বহু লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার করেন আচার্য শংকর। তিনি এসেছিলেন এই

তীর্থ পুষ্করে। লুপ্তপ্রায় এই তীর্থ ও মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার উদ্ধার করেন তিনিই। আবার তা নষ্টও হয়ে যায় কালের প্রভাব এবং সংস্কারের অভাবে। তবে ব্রহ্মার প্রাচীন মূর্তিটি এখন আর নেই। সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁর রাজত্বকালে (১৬৫৮-১৭০৪) ধ্বংস করে ফেলেন পুষ্করের প্রাচীন মন্দির এবং ব্রহ্মার বিগ্রহ।

পরবর্তীকালে জয়পুরে বাস করতেন এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। নাম গিরিধারী দাস। তাঁর প্রিয় কন্যা ফুনদী বাঈ ব্রহ্মার মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করেন ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে। সংস্কারের অভাবে সেটিও যায় নষ্ট হয়ে। অনেক পরে, ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে আবার নির্মাণ করা হয় এই মন্দিরটি। নির্মাণ করেন তৎকালীন সিন্ধিয়া রাজ্যের রাজা শ্রদ্ধেয় গোকুলচাঁদ পারেখ। আজকের মন্দিরটি তাঁরই অবদান। সেই সময় এই মন্দির নির্মাণের জন্যে ব্যয় হয় প্রায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা।

## পৌরাণিক পুষ্করের উৎপত্তি কথা

ব্রহ্মা মন্দিরের সামনের রাস্তা ধরে সোজা কিছুটা এলেই সিন্ধি ধর্মশালা। এর সামনের রাস্তা ধরে আরও একটু এগোলেই পুষ্কর তীর্থের বড় সরোবর। চারদিক বাঁধানো। বড় বড় ঘাট। পুষ্কর হ্রদের তীরেই ছোট্ট পুষ্কর শহর। এই তীর্থের তিনদিকই পাহাড়ে ঘেরা। সাবিত্রী, গায়ত্রী, পাপমোচনী এবং নাগ পাহাড়বেষ্টিত পাহাড়ী তীর্থ পুষ্কর। কাশীকে বলে তীর্থরাজ। পুষ্কর প্রসিদ্ধ তীর্থগুরু হিসাবে। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ এতই মনোরম, এক অপূর্ব আনন্দের সৃষ্টি করে যাত্রী মনে এখানে এসে পা দিলেই।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে তীর্থ পুষ্করকে। ভাগবত থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত পুরাণেই উল্লেখ আছে, এই তীর্থে স্নান দান শ্রাদ্ধ তর্পণ এবং পারলৌকিক ক্রিয়াদি করলে তার ফল হয় অক্ষয় অনন্ত।

পদ্মপুরাণের কথায় কলির প্রভাবে জগতের মানুষের পাপ বৃদ্ধি হচ্ছে, একদা এ-কথা ব্রহ্মা শুনলেন নারদের মুখে। কথাটা শুনে ব্রহ্মা ভাবলেন, স্বর্গের পবিত্র পুষ্করকে স্থানান্তরিত করবেন মর্ত্যলোকে। উদ্দেশ্য, এই তীর্থে স্নান করলে কলির মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে। কিন্তু এই তীর্থ হতে হবে এমন এক জায়গায় যেখানে কলি অনুপ্রবেশ করেনি।

এই ভাবনায় স্থির হলেন ব্রহ্মা। একটি পদ্মফুল নিজের হাতে নিয়ে বললেন, কলির প্রভাব নেই যেখানে, সেখানেই গিয়ে পড়বে আর পুষ্করকে নিয়ে যাবে সেখানেই। এবার পদ্মটি ফেললেন পৃথিবীর উদ্দেশ্যে। পদ্ম তখন পৃথিবী পরিভ্রমণ করে শেষে স্পর্শ করলো তিনটি জায়গা। একইসঙ্গে সৃষ্টি হলো তিনটি জলপূর্ণ গর্তের। ব্রহ্মা তখন স্বর্গ থেকে আনলেন জ্যেষ্ঠ, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ পুষ্করকে। পদ্ম যেখানে প্রথম পৃথিবী স্পর্শ করে সেটি জ্যেষ্ঠ বা ব্রহ্মপুষ্কর, তারপর মধ্যম বা বিষ্ণুপুষ্কর এবং শেষটি কনিষ্ঠ বা রুদ্রপুষ্কর। এইভাবে সৃষ্টি হলো তীর্থ পুষ্করের। এই তিনটি ক্ষেত্রের কোথাও কোন প্রাণীর মৃত্যু হলে তারা সদ্‌গতি প্রাপ্ত হবে।

এরপর একদা ব্রহ্মার বাসনা হলো যজ্ঞ করবেন পুষ্করে। তোড়জোড় শুরু হলো। যজ্ঞ রক্ষার ভার দিলেন নারায়ণের উপর। অভয় দিলেন নারায়ণ। তারপর ব্রহ্মা নারদকে পাঠালেন যজ্ঞক্ষেত্রে দেব, গন্ধর্ব, বায়ু, সিদ্ধ, বিদ্যাধর প্রভৃতিগণকে আনার জন্যে। সমস্ত দেবতা, তপস্বী এবং যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণও যজ্ঞ স্থলে এলেন ব্রহ্মার অনুরোধে। অত্রি, পুলস্ত্য, মরীচী, ভৃগু, চ্যবণ, মিত্রাবরুণ, গর্গ, গালব প্রমুখ ষোলজন ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করলেন যজ্ঞকর্মে। বিশ্বকর্মা স্থাপন করলেন যজ্ঞমণ্ডপ। তারপর ব্রহ্মার মস্তক মুণ্ডন করলেন দেবশিল্পী নিজে।

শুভলগ্নে ঋত্বিক ব্রাহ্মণেরা শুরু করলেন যজ্ঞকর্ম। ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু, পবন, কুবের এবং সূর্যদেবকে বিভিন্ন কাজের ভার দিয়ে ব্রহ্মা পরিদর্শন করতে লাগলেন নিজে।

সবকিছুই প্রস্তুত অথচ এই যজ্ঞে একমাত্র অনুপস্থিত ব্রহ্মাপত্নী সাবিত্রী। বিবাহিত পুরুষের স্ত্রীবিহীন যজ্ঞ, অসম্পূর্ণ যজ্ঞেরই নির্দেশ করে। তাই চিন্তিত ব্রহ্মা পুত্র নারদকে পাঠালেন পুষ্করযজ্ঞে সাবিত্রীকে আনতে।

পিতার আদেশমাত্রই নারদ গিয়ে সাবিত্রীকে জানালেন মহাযজ্ঞের কথা। যজ্ঞের কাজ শুরু হয়েছে, দেরী না করেই যেন তিনি যান। একইসঙ্গে জানালেন, একা যাওয়াটা শোভন নয়, সঙ্গে অন্যান্য দেবপত্নীদের নিলেই শোভাবর্ধন হবে। রাজী হলেন নারদমাতা। কিন্তু সমস্ত দেবীদের একত্রিত করতে গিয়ে ক্রমশ দেরী হতে লাগলো সাবিত্রীর।

এদিকে ঋত্বিক ব্রাহ্মণেরা দেখলেন শুভলগ্ন পার হতে চলেছে। অস্থির হয়ে ব্রহ্মা পাঠালেন ঋষি পুলস্ত্যকে। সাবিত্রী পুলস্ত্যকে জানালেন, গৌরী ইন্দ্রাণী প্রমুখ দেবপত্নীদের নিয়ে খুব তাড়াতাড়িই যাচ্ছেন যজ্ঞভূমিতে। ঋষি ফিরে এসে সাবিত্রীর কথা জানালেন ব্রহ্মাকে। তবুও দেরী হতে লাগলো। এদিকে যজ্ঞের সময় পার হয়ে যায় দেখে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা আর রাজী হলেন না অপেক্ষা করতে।

ব্রহ্মা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে ইন্দ্রকে বললেন, সাবিত্রী তাঁকে হেয় করার জন্যেই আসতে দেরী করছেন। অতএব এই মুহূর্তে যজ্ঞের কাজ সমাপনের জন্য গ্রহণ করবেন অন্য ভার্য্যা। তাই একটি কুমারী ব্রাহ্মণ কন্যাকে আনতে আদেশ দিলেন তিনি।

অনেক খুঁজেও কোন কুমারী ব্রাহ্মণ কন্যাকে পাওয়া গেল না। ইন্দ্র দেখলেন, পুষ্করের পাশ দিয়েই যাচ্ছে একটি সুন্দরী গোপকন্যা। মাথায় ঘোলের হাড়ি। ইন্দ্র জোর করে তা ফেলে দিয়ে ধরে আনলেন ব্রহ্মার কাছে। সেইসঙ্গে গোপকন্যার দেহ শুদ্ধ ও পবিত্র করার জন্যে একটি গাভীর মুখে প্রবেশ করিয়ে বের করলেন গুহ্যদেশ দিয়ে। তারপর যজ্ঞস্থলে আনলেন ব্রহ্মপুষ্করে স্নান করিয়ে বস্ত্র অলংকারে সাজিয়ে।

যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত দেবতা এবং ঋষিরা সমস্ত কথা শুনলেন ইন্দ্রের মুখে। তারপর সকলে এলেন এই সিদ্ধান্তে, গোপকন্যাকে দেবকার্যের উদ্দেশ্যে গাভীর মাধ্যমে শুদ্ধ ও পবিত্র করা হয়েছে। তাই এই কন্যা মর্ত্যলোকে প্রসিদ্ধিলাভ করবে গায়ত্রী নামে।

উপস্থিত নারায়ণ বললেন, গোজাতি এবং ব্রাহ্মণ—এদের কুল একই। পার্থক্য শুধু আকৃতিতে। গোপকন্যা যেহেতু গাভীর উদর থেকে বেরিয়েছে, সেজন্য এই কন্যা 'দ্বিজন্ম-জাতা'। তাই ব্রহ্মাকে বললেন, গোপকন্যা গায়ত্রীকে গ্রহণ করতে।

নারায়ণের কথায় যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা গোপকন্যাকে গোপজাতিবর্জিতা এবং ব্রাহ্মণী-শ্রেষ্ঠা বলে সম্মান ও সম্ভাষণ করলেন। শাস্ত্র মতে যজ্ঞস্থলে গায়ত্রীর বিবাহ দিলেন ব্রহ্মার সঙ্গে।

সস্ত্রীক হলেন ব্রহ্মা। কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে শুরু হলো যজ্ঞ, চলবে পূর্ণিমা পর্যন্ত।

এদিকে সখী এবং দেবপত্নীসহ সাবিত্রীও উপস্থিত যজ্ঞস্থলে। একেবারে হৈ-হৈ ব্যাপার। আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনার কথা শুনলেন নারদের কাছে। (কথায় আছে, মেয়েরা স্বামীকে যমের হাতে তুলে দিতে রাজী। মরে গেলেও সতীনের সঙ্গে ঘর করতে রাজী নয়।) মর্মাহত এবং ক্রোধে ফেটে পড়লেন সাবিত্রী। একচোটিয়া অভিশাপ দিলেন এই বিবাহে সম্মতি দিয়েছিলেন যাঁরা।

প্রথমেই অভিশাপ দিলেন স্বামী ব্রহ্মাকে, স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও বিনা অনুমতিতে আবার বিয়ে করায় যজ্ঞের উদ্দেশ্য হবে ব্যর্থ। আর একমাত্র পুষ্কর ছাড়া অন্য কোথাও, কারও ঘরে কখনও পুজো হবে না ব্রহ্মার।

বউ থাকা সত্ত্বেও কোন পুরুষ আবার বিযে কিংবা অন্য কোন মেয়েমানুষে আসক্ত হলে মেয়েরা যে কি পরিমাণ ক্ষেপে ওঠে, সাবিত্রীই তার বড় প্রমাণ। এখন হলে হয়তো হাজত বাস করিয়ে ছাড়তেন।

এবার ধরলেন মহাদেবকে। অনাদি অনন্তকাল ধরে ভূতপ্রেতের সঙ্গে থেকে তিনি দিন কাটাবেন গায়ে ভস্ম মেখে। (এই অভিশাপে হয়তো খুশীই হয়েছিলেন মহাদেব। রেশন, বাজার হাট, ডাক্তার বদ্যির পিছনে ছোটা বন্ধ হয়ে গেল চিরতরে।)

দেবী সাবিত্রী এবার পাকড়ালেন ইন্দ্রকে। অভিশাপ দিলেন, দানবদের জন্য সর্বদাই থাকবেন ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে। আর কোন যুদ্ধেই জয়ী হবেন না তিনি।

পবনকে বললেন, সর্বদাই দুর্গন্ধ বয়ে নিয়ে বেড়াবেন। অগ্নিকে বললেন, যা পাবেন, তাই খাবেন। সর্বভুক হয়ে থাকবেন। ক্ষিদে মিটবে না কখনও। এবার সাবিত্রী বাদ দিলেন না যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের। বললেন, বৃথা এবং অকারণ দান গ্রহণই হবে ব্রাহ্মণ জাতির সহজাত প্রবৃত্তি। ক্ষিপ্ত সাবিত্রী অভিশাপ দিলেন লক্ষ্মীকে, সর্বদাই চঞ্চলা হবেন লক্ষ্মী। এক জায়গায় স্থির থাকতে পারবেন না কখনও। প্রধান বসতিই হবে তাঁর অধর্মের ঘরে। নারায়ণও বাদ গেলেন না। তাঁকে অভিশাপ দিলেন, মানুষরূপে জন্মলাভ করবেন। স্ত্রীকে রাবণ নামে এক রাক্ষস নিয়ে যাবে হরণ করে। অমানুষিক কষ্ট পেতে হবে মনস্তাপে।

অভিশাপের বন্যা বইয়ে দিলেন সাবিত্রী। এবার বিনা পয়সায় ভোজ খেতে আসা সব দেবপত্নীদের অভিশাপ দিলেন, স্বর্গের দেবীরা হবে সন্তানহীনা। যাঁদের আছে তাঁদের আর হবে না। যাঁদের নেই, তাঁদের আর হবে না কখনও। (এমন একটা

অভিশাপ বর্তমানে আমাদের দেশেও একান্ত প্রয়োজন ছিল।)

এমন একটা ঘটনায় প্রথম অবস্থায় কিছু বিঘ্নের সৃষ্টি হলো যজ্ঞস্থলে। পরে সে যজ্ঞও সুসম্পন্ন হলো নির্বিঘ্নে।

যজ্ঞস্থলে অপমানিতা সাবিত্রী বললেন, এমন এক জায়গায় তিনি অবস্থান করবেন, যেখানে যজ্ঞ ও হোমের কোন মন্ত্র এবং শব্দই না শোনা যায়। বলেই নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে তপস্যারতা হলেন। সেই পাহাড়টিই আজ সাবিত্রী পাহাড় নামে প্রসিদ্ধ।

সংক্ষেপে এই হলো পুষ্করতীর্থের পৌরাণিক উৎপত্তি কথা। তবে সেই কোন্ অজানা অজ্ঞাতকাল থেকে আজও প্রতিবছর বিশাল মেলা বসে এই পুষ্করে। ব্রহ্মার যজ্ঞের তিথি ধরেই মহাযোগ পড়ে পুষ্কর স্নানের—কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথি থেকে কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ পর্যন্ত। এই সময় লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী এবং পুণ্যার্থীর সমাগম হয় এখানে। তারা আসেন পুণ্যস্নান করতে। দূর-দূরান্তর থেকে আগমন ঘটে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসীদের। আসেন নানা প্রদেশের নানা শ্রেণীর অসংখ্য মানুষ। পুষ্কর মেলার অন্যতম আকর্ষণ উট, গরু আর ঘোড়া খুব সস্তায় বেচাকেনা হয় মেলার মরশুমে।

বর্তমানে তিনটি পুষ্কর দেখা যায় না পুষ্করে। জ্যেষ্ঠ আর কনিষ্ঠ পুষ্করই দেখা যায়। প্রকাণ্ড সরোবরটি বড় পুষ্কর। এরই অন্যদিকে আছে অত্যন্ত ছোট একটি জলাশয়। সেটি ছোট পুষ্কর। এই ছোট পুষ্কর থেকে একটি খালের মতো গিয়ে পড়েছে দক্ষিণদিকের একটি জলাভূমিতে। সেটিই প্রসিদ্ধিলাভ করেছে সরস্বতী নদী নামে।

পৌরাণিক মতে, এই সরস্বতী নদী কুরুক্ষেত্র থেকে অদৃশ্যে এসে পুষ্করে প্রবাহিত হয়েছে পাঁচটি ধারায়, পাঁচটি নদীর নাম নিয়ে। নামগুলিও বড় সুন্দর—সুপ্রভা, কনকা, নন্দা, প্রাচী এবং সুধা। সরস্বতী পঞ্চস্রোতা—পুষ্করের কাছেই প্রতিষ্ঠিত নন্দকেশ্বরে।

পুষ্করের অদূরেই সুপ্রভা, কনকা ও নন্দা—এই তিনটি নদীর সঙ্গমস্থল। প্রতি বছর মকর সংক্রান্তিতে এখানে পুণ্যস্নানের জন্য সমাগম হয় অগণিত মানুষের। কথিত আছে, ওই তিথিতে স্নান করলে প্রয়াগে স্নানের সমান পুণ্য ফল লাভ হয়।

বৃন্দাবন, কাশী আর চিত্রকূটের কামদগিরির মতো এই পুষ্করেও তীর্থযাত্রীদের অনেকেই করে থাকেন পুষ্কর পরিক্রমা। এখানে সাতদিনে পরিক্রমা করতে হয় চব্বিশ ক্রোশ। এই পরিক্রমা করা হয় শ্রাবণ মাসে। পরিক্রমার সময় পথে পড়ে জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ পুষ্কর, গয়াকুণ্ড, কপিল আশ্রম, অগস্ত্য আশ্রম, পঞ্চকুণ্ড, অজগন্ধ মহাদেব এবং প্রাচীন সরস্বতী নদী প্রভৃতি।

পুষ্কর সরোবরের তিনদিকে ঘাট আছে মোট ৫২টি। তার মধ্যে গৌঘাট, বরাহঘাট, রাজঘাট—এই তিনটিই বিশেষভাবে পরিচিত। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় গৌঘাট। এ-ছাড়াও আছে সরস্বতীঘাট, চণ্ডঘাট, যোধপুরঘাট, গোয়ালিয়রঘাট, ইন্দ্রঘাট,

কোটাঘাট, ব্রহ্মাঘাট, যজ্ঞঘাট, সাবিত্রীঘাট, নরসিংহঘাট, গৌরীঘাট, সপ্তর্ষিঘাট, স্বরূপঘাট প্রভৃতি। পুষ্কর সরোবরের চারদিকই পাথর বাঁধানো। মহারাণী অহল্যাবাঈ এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য রাজাদের অনেকেই বাঁধিয়ে দেন এই ঘাটগুলি।

কথিত আছে, ব্রহ্মাঘাটের কাছেই ব্রহ্মা তাঁর যজ্ঞ সম্পন্ন করেন প্রাচীনকালে। আর ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে জয়পুর স্টেট কর্তৃক নির্মিত হয় রাজঘাটটি।

পদ্ম পুরাণে আছে, নাগ পাহাড়ের আরও একটি নাম যজ্ঞ পর্বত। পুষ্করের এই পর্বতেই বামন-অবতারে ত্রিবিক্রম মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন স্বয়ং বিষ্ণু।

প্রবাদ আছে, রাজা পদ্মসেনের সময়ে পুষ্করে আসেন এক হিন্দুযোগী। দীর্ঘ বারো বছর বাস করেন এই তীর্থে। তাঁরই এক শিষ্য প্রতিদিন যেতেন ভিক্ষায়। কিন্তু পুষ্কর শহরটিতে তখন ছিল জৈনদের বাস। তারা ছিল অত্যন্ত হিন্দু বিদ্বেষী। তাই কেউই ভিক্ষা দিত না হিন্দুযোগীর শিষ্যকে। ফলে শিষ্যটি প্রতিদিন কাঠ কেটে তা শহরে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতো দিনের পর দিন। এসব কথা যোগীগুরু কিছুই জানতেন না। একদিন কাঠ কাঠতে গিয়ে আহত হলেন শিষ্য। সমস্ত বিষয় অবগত হলেন যোগী। ক্ষোভে অভিশাপ দিলেন, 'ঝড় জল বন্যায় ধ্বংস হয়ে যাক্ পুষ্কর।' সিদ্ধ হলো সিদ্ধযোগীর কথা। ধীরে ধীরে লুপ্ত হলো হিন্দুতীর্থ পুষ্কর।

নবম শতাব্দীর কথা। তখন মাড়োয়ারের রাজা ছিলেন নরহরি রাও। তিনিই পুনরুদ্ধার করেন পুষ্করের। রাজা নরহরি রাজত্ব করতেন বাংলা থেকে শুরু করে সমগ্র সিন্ধুদেশ পর্যন্ত। একদা মৃগয়ায় বেরিয়ে ছিলেন তিনি। পথশ্রমে শ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত হলেন। ঘুরতে ঘুরতে এলেন লুপ্ত পুষ্করের জঙ্গলে। দেখলেন একটি সরোবর। জলপান করলেন সরোবরের। রাজার হাতে ছিল শ্বেত কুষ্ঠ। সরোবরের জলস্পর্শে মুহূর্তে আরোগ্য হলো ব্যাধি। অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন রাজা। অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন এটি একটি লুপ্ত তীর্থ। পরে তিনি প্রজাদের এনে পরিষ্কার করে বাঁধিয়ে দিলেন সরোবরের চারদিক। যে ঘাটটিতে তিনি জলপান করেছিলেন সেটি আজও আছে। স্বরূপঘাট নামেই এর পরিচিতি। অনেকের মতে, এই ঘটনার সময়কাল নবম শতাব্দীতে নয়—১১৪৪ খ্রীষ্টাব্দে।

একইসঙ্গে রাজা নরহরি করলেন এই তীর্থের বহু প্রাচীন মন্দিরের সংস্কার। নির্মাণ করলেন সরোবরের বহু ঘাট, স্থাপন করলেন বারোটি ধর্মশালা। রাজার স্মৃতি পুষ্কর বুকে ধারণ করে আছে আজও—'পরিহরণ-কি-শালা'। তাঁরই স্মৃতি 'রায় মুকুন্দঘাট'। জৈনদের পর রাজা নরহরির সময় থেকেই এই তীর্থ এলো কায়স্থদের অধীনে।

এর পরের কথা। ১১৫৭ খ্রীষ্টাব্দে দীপাবলীর রাতে একদল সন্ন্যাসী আক্রমণ করলেন কায়স্থদের। ফলে তীর্থপুষ্কর এবার অধীন হলো ব্রাহ্মণদের। সন্ন্যাসীরা পাঁচটি মন্দিরে রেখে গেলেন তাঁদের প্রতিনিধি সন্ন্যাসীদের। এই পাঁচটি মন্দির

হলো—বরাহমন্দির, ব্রহ্মামন্দির, আত্মেশ্বর মহাদেব মন্দির, বদ্রীনাথ এবং সাবিত্রী মন্দির। বর্তমানে এগুলি সন্ন্যাসীদের দ্বারাই পরিচালিত।

পুষ্কর সরোবরের তীরে যোধপুর ঘাটের পিছনেই রয়েছে একটি শ্মশান। হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলি। এর তীরে আজও রয়েছে দুটি লাল পাথরের সুন্দর গৃহ। এ-দুটি সম্রাট জাহাঙ্গীর নির্মাণ করেন ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে। একথা জানা যায় গৃহের দরজার উপরে ফারসি ভাষায় লেখা এক শিলালিপি থেকে।

এবার এগিয়ে যাই রাজঘাটে। পুষ্করের এই ঘাটটি নির্মিত হয় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে। নির্মাণ করেন জয়পুর স্টেট। এই ঘাটের পাশেই আছে মানমন্দির। নির্মাণ করেন জয়পুরের মহারাজা মান সিংহ ( মতান্তরে সওয়াই জয়সিং )। কর্ণেল জেমস্ টডের মতে, সম্রাট আকবরের দরবারের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন মান সিংহ। আকবরের দিগ্বিজয়ের অর্ধেকই ছিল তাঁর অবদান।

রাজঘাট থেকে এলাম পঞ্চবীর ঘাটে। অতীতের এক দুঃখবহ ইতিহাস আছে সুন্দর এই বাঁধানো ঘাটের। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ঔরঙ্গজেব যখন গোঘাটের কাছে অবস্থিত কেশোরায়জীর মন্দির ধ্বংস করে নির্মাণ করলেন একটি মসজিদ, তখন আজমীরের শাসনকর্তা ছিলেন তাইবার খাঁ। সেই সময় খাঁ সাহেব একশো গাভী আনলেন মসজিদে হত্যা করার জন্যে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন পুষ্করের ব্রাহ্মণরা। গোহত্যা নিবারণের জন্যে তারা সাহায্য প্রার্থনা করলেন প্রতিবেশী রাজপুত বীরদের। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন রাজপুতরা। ফলে ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু হলো রাজপুতবীরদের সঙ্গে তাইবার খাঁর সেনাদের—পুষ্কর আর নাগ পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায়। এই যুদ্ধে বহু রাজপুতবীর এবং নিহত হলেন রিয়ানের ঠাকুরসাহেব কেশরী সিং। ঠাকুরসাহেবের মৃত্যু সংবাদ ঠাকুরাণীর কাছে পৌঁছালে তখন তিনি গোহত্যা বন্ধের জন্য তাঁর সদ্য বিবাহিত ষোল বছরের পুত্রকে পাঠালেন যুদ্ধে। এমনই দুর্ভাগ্য, নিহত হলো কেশরী সিং-এর একমাত্র পুত্র। এই পঞ্চবীর ঘাটেই আত্মবলি দিয়েছিলেন পাঁচজন রাজপুতবীর। তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যেই এই ঘাটের নাম হয়েছে পঞ্চবীর ঘাট।

এবার এসে দাঁড়ালাম গোঘাটে। এই ঘাটের একটি অংশের নাম জেনানা ঘাট। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় পুষ্কররাজের আরতি হয় এখানে। এখানকার ঘাটগুলির মধ্যে এটিই প্রাচীনতম। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পুষ্করে আসেন তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের ভূতপূর্ব সম্রাট পঞ্চম জর্জের স্ত্রী রাণী মেরী। স্নান করেন এই ঘাটে। কিছু অর্থও দান করেন। তাঁর দানে আরও সুন্দরভাবে নির্মিত হয় এই গোঘাট। তারপর তাঁর নামেই ঘাটটির আরও একটি নাম রাখা হয় রাণী মেরী জেনানা ঘাট।

১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে পুষ্করে আসেন শিখগুরু গোবিন্দসিং। এই গোঘাটে বসেই তিনি পাঠ করেছিলেন গ্রন্থসাহেব।

কথিত আছে, মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব কোন কারণবশত সসৈন্যে আসেন পুষ্করে।

এখানে বহু হিন্দু দেবদেবীর মন্দির দেখে আদেশ দেন ভেঙে ফেলার। চলতে লাগলো ধ্বংস কার্য। এই সময় সম্রাট দেখলেন, এসব উপেক্ষা করেও অসংখ্য হিন্দু তীর্থযাত্রীরা স্নান এবং পূজাদি করছেন পুষ্কর সরোবরে। এতে কৌতূহলী সম্রাট জিজ্ঞাসা করেন স্থানীয় পাণ্ডাদের, পুষ্করের দেবতার কি ক্ষমতা আছে আর কতটুকুই বা আছে?

সভয়ে উত্তর দেন পাণ্ডারা, এই সরোবরের জল অতলস্পর্শী। এর গভীরতা নির্ণয় করতে আজ পর্যন্ত সক্ষম হয়নি কেউই।

একথা শুনে সম্রাট ঔরঙ্গজেব একটি সোনার ওলন তৈরী করালেন পাঁচ সের ওজনের। তারপর তাঁরই লোক মারফত ওলন জলে ফেলে মাপতে শুরু করলেন সরোবরের গভীরতা। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যর্থ হলো সব চেষ্টা। তল পাওয়া গেল না পুষ্কর সরোবরের। অদ্ভুত ব্যাপার, সোনার ওলন যখন তোলা হলো তখন দেখা গেল সেটি রূপান্তরিত হয়েছে লোহায়। এখানেই শেষ নয়, হঠাৎ সরোবর উগ্রভাব ধারণ করে জলস্ফীতিতে ভাসিয়ে দিল সম্রাটের তাঁবু আর সেনাদের। এই ঘটনায় বিস্মিত ঔরঙ্গজেব ত্রুটি মার্জনা করেন পুষ্করের কাছে। পরে শান্ত হয় সরোবর। পরবর্তীকালে সম্রাট ধ্বংস করা মন্দিরগুলির খেসারৎ বাবদ বহু বিঘা জমি দান করেন দেবোত্তর সম্পত্তি হিসাবে। এসব কথা বলেন স্থানীয় পাণ্ডারা।

একদা উচ্চকোটি সাধক কাশীর সচল বিশ্বনাথ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তৈলঙ্গস্বামীজীর দীক্ষালাভ হয় পরম পবিত্র তীর্থ এই পুষ্করে। ভারতের সাধক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে শংকরনাথ রায় লিখেছেন এইভাবে,

'বৃদ্ধ নরসিংহ রাও-এর জীবনের দ্বারে হঠাৎ একদিন পরলোকের ডাক আসিয়া গেল। শিবরামের বয়স তখন চল্লিশ বৎসরের বেশি নয়। ইহার প্রায় বার বৎসর পরে বিদ্যাবতীও একদিন আত্ম-পরিজনদের মায়া কাটাইয়া প্রস্থান করিলেন সাধনোচিত ধামে। পিতার প্রয়াণে শিবরামের সংসারবন্ধন শিথিল হইয়াছিল, এবার জননীর তিরোধানে সে বন্ধন একেবারে ছিন্ন হইয়া গেল।

গ্রামের শ্মশানের একপ্রান্তে একটি পর্ণকুটির তিনি বাঁধিলেন। নিমগ্ন হইলেন অধ্যাত্ম সাধনায়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীধরের অশ্রুজল, আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের অনুনয়, কোন কিছুই সেদিন তাঁহাকে সংকল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি সব কিছু শ্রীধরকে দান করিয়া সংসারের বন্ধন তিনি ছিন্ন করিলেন।

সাধন কুটিরের একদিকে রহিয়াছে চিতা ভস্মপূর্ণ মহাশ্মশান, আর একদিকে কল্লোলিনী তটিনী। জীবন-মরণের এই পটভূমিকায় বসিয়া দুর্জ্ঞেয় মহাসত্যকে শিবরাম উপলব্ধি করিতে চান। একান্তে, পরম নিষ্ঠায়, তাঁহার সাধনা অগ্রসর হইয়া চলে।

ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কৃচ্ছ্রসাধনের ফল অবশেষে ফলিয়া যায়। কোন এক অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে শ্মশানের ঐ পর্ণকুটিরটিতে সেদিন পদার্পণ করেন স্বামী ভগীরথানন্দ

সরস্বতী। পাঞ্জাবের বাস্তুর গ্রামে ছিল এই শক্তিমান সাধকের পূর্বাশ্রমের গৃহ। ইনিই শিবরামের ঈশ্বর নির্দিষ্ট পথপ্রদর্শক—চিহ্নিত যোগীগুরু।
ভগীরথ স্বামীর ইঙ্গিতে শিবরাম এবার চিরতরে হোলিয়া গ্রাম ত্যাগ করেন। তারপর দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের বহুতর তীর্থ পর্যটনের পর উভয়ে আসিয়া উপস্থিত হন পুষ্করে। এই পবিত্র তীর্থে সাধক শিবরাম স্বামীজীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এ সময়ে তাঁহার বয়স প্রায় আটাত্তর বৎসর। সন্ন্যাস আশ্রমে তাঁহার নূতন নামকরণ হয়—গণপতি সরস্বতী। কিন্তু তেলঙ্গ দেশ হইতে আগত সন্ন্যাসী বলিয়া উত্তরকালে কাশীর জনসাধারণ তাঁকে অভিহিত করিত তৈলঙ্গস্বামী নামে।
দীক্ষা গ্রহণের পর হইতে শিবরাম সাধনার গভীরে নিমজ্জিত হইয়া যান। গুরু ভগীরথ স্বামীর নির্দেশে হঠযোগ ও রাজযোগের দুরূহ সোপানগুলি একে একে তিনি অতিক্রম করেন। দশ বৎসর কঠোর তপশ্চর্যার পর গুরুকৃপায় পরিণত হন যোগসিদ্ধ মহাশক্তিধর মহাপুরুষরূপে। গুরু পুষ্করতীর্থেই নরলীলা সংবরণ করেন। তারপর তৈলঙ্গস্বামীজী ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থসমূহের পরিক্রমায় বহির্গত হন। এ সময়ে তাঁহার বয়স ছিল অষ্টাশি বৎসর। কিন্তু এই বয়েসেও জরাবার্ধক্যমুক্ত এই সিদ্ধযোগীর সুগঠিত দেহ লোকের মনে বিস্ময় জাগাইয়া তুলিত।"
সম্পূর্ণ পুষ্কর ক্ষেত্রটিই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। শহরের মূল পরিবেশ থেকে ১৩ কি.মি. দূরে বলেই এর পরিবেশটা আজও যেমন সুন্দর তেমনই নয়নাভিরাম। পাহাড়ের পাদদেশেই পুষ্কর। এর পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীগুলি আরও সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছে এই তীর্থ পুষ্করের। পথশ্রমের সমস্ত ক্লান্তিই দূর হয়ে যায় তীর্থযাত্রী আর পর্যটকদের—একবার এখানে এসে পৌঁছালে। প্রকৃতি তার সমস্ত রকম প্রাকৃতিক অলংকারের সৌন্দর্যে ভরিয়ে দিয়েছে পুষ্করকে। এখানে পাহাড় আছে—আছে নানা বৃক্ষলতা, হ্রদ, নদী, ঝরণা, মরুভূমি—আছে সমতলও। পুরাণের পুষ্কর, আজকের পুষ্কর হয়ে রয়েছে অসংখ্য প্রাচীন ঋষি, দেবতা আর মহাপুরুষের পাদস্পর্শে পূত পবিত্র।

## সাধুসঙ্গ—কামের ক্রিয়া দেহ মন ও বুদ্ধিতে

পুষ্কর তীর্থের সরোবর। বেশ বড়। বাঁধানো ঘাট। এখন শীতকাল। লোভ মানুষের শীত গ্রীষ্ম বর্ষা, কোন ঋতুরই অপেক্ষা করে না। সময়েরও না। শারীরিক ক্লেশ তো নয়ই। এই কনকনে শীতেও লোভীর সংখ্যা কম নয়। এরা পুণ্যলোভী, তীর্থযাত্রী। স্নান করছেন সরোবরে। কেউ কেউ ডুব দিয়ে উঠছেন, কাঁপছেন ঠক্‌ঠক্‌ করে। ডুব দিয়ে ওঠা মানেই সব পাপ গেল ধুয়ে মুছে। শুরু হয় পুণ্যরূপী ঠক্‌ঠকানি। এই স্নানে স্থানীয় লোকের সংখ্যা কম। চেহারা দেখেই এটা মনে হলো।
তীর্থ পুষ্করের এই ঘাটটি ব্রহ্মাঘাট নামেই প্রসিদ্ধ। জল টলটল করছে। একেবারে কাচের মতো। এই ঘাটেরই একপাশে বসে আছেন এক সাধুবাবা। সিঁড়ির চওড়া

ধাপের উপরে। পাশে রয়েছে কম্বল দিয়ে জড়ানো ছোট্ট একটা বোঁচকা। কমণ্ডলুও আছে একটা। গায়ে জড়ানো রয়েছে ফ্যাকাশে মোটা কম্বল। গলার উপর থেকে মাথা পর্যন্ত বক-সাদা দাড়ি চুল। জড়ানো কম্বলের জন্যে অর্ধেক চুল দাড়ি দেখাই যাচ্ছে না। কানকে বেড় দিয়ে মাথায় ফেটি বাঁধা আছে একটা। তবে পাগড়ি নয়। তাই উপর থেকে দেখা যাচ্ছে চুলগুলো। গেরুয়া বসন যে পরা আছে, তা দেখা যাচ্ছে ফাঁকফোকর থেকে কম্বল ঢাকা দেয়া সত্বেও। কাচাকাচির অভাব আছে বলেই মনে হলো।

এমন অনেক সুন্দরী মেয়ে আছে যাদের চেহারা দেখলে বোঝার উপায় নেই, বারো মাসে তেরো পার্বণ তাদের লেগেই আছে। কিন্তু এই সাধুবাবার চেহারা সুন্দর, শক্ত সমর্থও। দেখলেই বোঝা যায় নিরোগ। তেরো পার্বণের বালাই নেই। ফরসা, সাধুবাবা বেশ ফরসা। চোখদুটো ফালা-ফালা, টানা। তবে জীবনে প্রথম দেখলাম, এই সাধুবাবার চোখের মনিদুটো কালো নয়। একেবারে নীল। ময়ূরের কণ্ঠের মতো নীল। মনে হয় যেন কোন বিদেশিনী নারীর চোখদুটো তুলে এনে বসিয়ে দেয়া হয়েছে এই সাধুবাবার চোখে। মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল। জটা নেই।

সাধুবাবার সামনে জ্বলছে কয়েক টুকরো কাঠ। ধুনী নয়। আগুন তাপছেন। জব্বর ঠাণ্ডা পড়েছে, তাই! আমিও সোজা গিয়ে বসলাম সাধুবাবার সামনে। একেবারে মুখোমুখি হয়ে। ভাবটা এমন করলাম, যেন বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। আগুন তাপতেই বসেছি। হাত তাপতে তাপতেই ঝট্ করে প্রণাম করলাম সাধুবাবাকে। হঠাৎ এমনটা করায় কোন বাধা দেয়া বা কিছু বলার সুযোগই পেলেন না তিনি। হাতদুটো জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে মুখে বললেন,

—রামজী তোকে বৈরাগ্য দিক, আনন্দে রাখুক।

ঠাণ্ডার মধ্যে বিড়িতে টান দিলে আলাদা আমেজ আসে একটা। তাই কোন কিছু জিজ্ঞাসা না করেই বিড়ি বের করলাম পকেট থেকে। এগিয়ে দিলাম সাধুবাবার দিকে। কোন আপত্তি না করেই তিনি নিলেন। সামনে জ্বলতে থাকা আগুনেই ধরালেন। এবার টানতে টানতেই জিজ্ঞাসা করলেন,

—বেটা, কোথায় থাকিস্?

ধোঁয়া লাগছে চোখে। একটু জ্বালা জ্বালাও করছে। চোখের জল মুছতে মুছতেই বললাম,

—থাকি কলকাতায়। এখানে এসেছি বেড়াতে। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে আজ। আপনাকে আগুন তাপতে দেখেই চলে এলাম।

কোন কথার সুযোগ না দিয়েই সাধুবাবা জানতে চাইলেন,

—তোর চুল দাড়ি দেখে মনে হয় তুই ব্রহ্মচারী। তুই কি সংসারে আছিস্ না সংসার ত্যাগ করেছিস্?

হেসে ফেললাম কথাটা শুনে। হাসতে হাসতেই বললাম,

—না বাবা, বিয়ে-থা করিনি এখনও। বয়েসও তো হয়নি বিয়ের। আপনাদের মতো

অল্প বয়েসে বিয়ে হয় না আমাদের। সংসারেই আছি।
কথাটা শুনে মাথাটা দোলাতে লাগলেন। সাধুবাবার চোখেও ধোঁয়া লাগছে। মাঝে মাঝেই চোখ রগড়াচ্ছেন দুহাত দিয়ে। আবার আগুন তাপছেন। এবার সুযোগ পেলাম আমি। জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা, এই তীর্থে আছেন কতদিন?
ধোঁয়া এড়াতে মাথাটা একবার এ-পাশ ও-পাশ করে বললেন,
—এখানে আছি মাসখানেক হলো। আর কয়েকদিন থেকে চলে যাবো বৃন্দাবনে।
জানতে চাইলাম,
—বৃন্দাবনে কি আপনার ডেরা আছে?
ঘাড় নাড়লেন প্রথমে। তারপর মুখে বললেন আকাশ দেখিয়ে,
—না বেটা, আমার কোথাও ডেরা নেই। আকাশের নীচে ভগবানের এত বড় ডেরা থাকতে আর কোথায় ডেরা করবো বলতে পারিস্? বিষয়বুদ্ধির আগমন ঘটলে তবেই সাধুদের ডেরা করার ইচ্ছা জাগে। আমার ওসবের ইচ্ছা কখনও হয়নি—হয়ও না। এই ভালো আছি। খোলা আকাশ, উন্মুক্ত বাতাস—বেটা, এর আনন্দই আলাদা, অসীম। ডেরা করা মানেই বন্ধ হলাম। চার দেয়ালের মায়া কেটে বেরিয়ে আসা মুশকিল।
এবার সংসারীদের উদ্দেশ্য করে সাধুবাবা বললেন,
—মানুষের যখন চারটে দেয়াল হলো তখনই জানবি, সাংসারিক দুঃখভোগের আয়োজনও বেশ ভালোভাবে গুছিয়ে নিয়ে বসলো। পাকাপাকিভাবে। তারপরে যে কি হয়, তা তো তুই ভালোভাবেই দেখতে পাচ্ছিস্। কোন সাধুর ডেরা হলো মানে বিয়ের পর গৃহীদের মতো অশান্তিময় জীবনের শুরু হলো। একটা সাধু একটা ডেরা করলো মানে একগাদা সন্তান প্রসব করলো। এবার রোগ ভোগ শোক দুঃখ বেদনা তো তাকে পীড়িত করবেই। তাই ওসব করায় মন যায়নি আমার।
সাধুবাবার কথায় সুযোগ এসে গেল কথার। বললাম,
—ও-সবে মন যায়নি, ভালো কথা। তবে বাবা, এপথে মনটা এলো কেমন করে, ঘরই বা ছাড়লেন কেন?
সাধুবাবা যে বৈষ্ণব, প্রণাম করার সময় মুখে 'রামজী' উচ্চারণ করায় মনে হয়েছিল। কোন বিরক্তির চিহ্ন নেই মুখখানায়। উত্তর দিলেন সহজ ভাবেই,
—কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বা সাংসারিক কোন কারণে গৃহত্যাগ করিনি আমি। বেটা, মানুষের জন্মের পর থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত—এই সময়কালের মধ্যে প্রতিটি নারী-পুরুষের মনের মধ্যে রামজী কোন না কোন সময় 'কিঞ্চিৎ' বৈরাগ্যের উদয় ঘটান। যেমন, প্রতিটি নারীপুরুষই, সে যত সুখভোগে বা যত দুঃখেই থাকুক না কেন, কোন না কোন সময় ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় বলে, 'দূর, সংসার আর ভাল্ লাগছে না।' এটা প্রতিটি মানুষ বলবেই। আসলে সে বলে না। রামজী মনে ওই 'কিঞ্চিৎ' বৈরাগ্যের সৃষ্টি করে তার অজান্তে, অন্তরে। সে নিজেও বোঝে না, ভাবেও না

একবারও। এবার বেটা, মনে ওই বৈরাগ্যের উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধি তখন নিশ্চয় অনিশ্চয় স্থির করে। বুদ্ধি অনিশ্চয়তায় মানুষকে সংসারী করে। অনিত্য বস্তুজীবনের দিকে টেনে নিয়ে আবদ্ধ করে সংসারে। বুদ্ধি বৈরাগ্যকে নিশ্চয় করলে মানুষ সংসার ছাড়ে, সন্ন্যাসী হয়। নিশ্চয় হচ্ছে পরমপ্রাপ্তির পথ। বেরিয়ে পড়ে তাকে লাভ করার উদ্দেশ্যে। সংসারের কোন বন্ধনই তাকে বাঁধতে পারে না। এগিয়ে চলে নির্লিপ্ত মহাজীবনের পথে। আমার বুদ্ধিকে রামজী নিশ্চয় করেই এনেছেন এ-পথে।

এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন। বার কয়েক ফুকফুক করে টান দিলেন বিড়িতে। তারপর ফেলে দিয়ে আগুনের জ্বলন্ত কাঠটা একবার নাড়িয়ে বললেন,

—তবে বেটা, এখানে কথা আছে একটা। রামজীর কৃপা হলে বুদ্ধি অনিশ্চয় সংসারজীবনেও মানুষের মধ্যে অনুরাগ সৃষ্টি করে। সেই অনুরাগে মানুষ সংসারে থেকেও বৈরাগ্যময় জীবনযাপন করতে পারে।

এখানে বসামাত্রই সাধুবাবা যে এমনভাবে কথা বলবেন, ভাবতেই পারিনি। মনের আনন্দে আবার প্রণাম করলাম সাধুবাবাকে। সাধুবাবাও বেশ খুশী হলেন। মুখ দেখে বুঝলাম, প্রসন্নতায় ভরে উঠেছে মুখখানা। এবার তিনি উদাহরণ দিয়ে বললেন,

—বেটা, জলে উৎপন্ন হয় পদ্ম। ওই একই জলে সৃষ্টি হচ্ছে জোঁক। অথচ দেখ, মানুষের মনে সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটায় পদ্ম। আপন সৌন্দর্যে ভরিয়ে তোলে মানুষের মনকে। সুগন্ধে আকর্ষণ করে ভ্রমর মৌমাছিকে। অথচ ওই একই জলে উৎপন্ন জোঁক রক্ত চুষে খায় মানুষের। বেটা ঠিক সেই রকম, একই বুদ্ধি কারও মনে বৈরাগ্যের সৃষ্টি করে নিয়ে যায় সৃষ্টির রহস্যসন্ধানে—অজানা, অজ্ঞাত জীবনের উদ্দেশ্যে। আবার ওই একই বুদ্ধিতে উৎপন্ন অনিশ্চয় সংসারজীবনে গৃহস্থ উৎপন্ন করে ভোগী গৃহস্থের।

কাঠের আগুন থেকে ধোঁয়া উঠছে। লাগছে সাধুবাবার চোখেও। মাথাটা একবার বাঁপাশে আর একবার ডানপাশে করছেন ধোঁয়া এড়ানোর জন্যে। এবার বাঁহাতটা চোখের উপর ঘষে প্রশ্ন করলেন আমাকে,

—বেটা, সংসারে আছিস, 'লিখাপড়া' তো কিছু করেছিস্ নিশ্চয়ই।

মাথা নাড়ালাম। তবুও মুখে বললাম,

—হ্যাঁ বাবা, সামান্য কিছু করেছি।

একথা শুনে প্রসন্ন মনেই বললেন,

—যে বিদ্যায় সত্যকে জানা যায়, তাকেই প্রকৃত বিদ্যালাভ বলে। যে বিদ্যায় জগতের সত্যকে জানা যায় না, সেটা বিদ্যা নয়। তেমন লেখাপড়া করে কিছু লাভ হয় না পারমার্থিক জীবনে। তবে সংসারজীবনে তো কিছু লাভ হয়ই। এবার বল্ বেটা, লেখাপড়া তো করেছিস্—বিদ্যালাভ হয়েছে ?

একটু অস্বস্তিবোধ করলাম কথাটা শুনে। বললাম,

—না বাবা, সত্যকে জানার মতো বিদ্যালাভ আমার হয়নি। কি করলে, কেমন করে সত্যকে জানা যাবে—দয়া করে বলবেন বাবা ?

আগুনে হাত তাপতে তাপতেই বললেন সাধুবাবা,

—বেটা, সংসার আর সাধুজীবনে—একমাত্র ত্যাগ ছাড়া সত্যকে জানার আর কোন পথ আছে বলে আমার জানা নেই।

সঙ্গে সঙ্গেই জানতে চাইলাম,

—সংসারে থেকে সংসারীদের মানসিক দিক থেকে সব ত্যাগ করা—সে তো সুকঠিন ব্যাপার।

উত্তরে সাধুবাবা বললেন,

—হাঁ বেটা, ঠিকই বলেছিস্। গৃহত্যাগী হয়েও অনেক সাধুরাই তা পারেনি, সংসারীদের পক্ষে এ-তো বড় কঠিন কাজ। যে পারে, সে সত্যকে জানতে পারে। যে পারে না, সে পারে না।

হঠাৎ বলে বসলেন,

—একটু চা খাবি বেটা, বানাবো ? এক ভক্ত একটু দুধ দিয়েছে আমাকে। তুই যদি খাস্ তো বানাই।

সাধুবাবার সঙ্গে আরও মজে, আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা জানার আশায় সম্মতি জানালাম ঘাড় নেড়ে। সাধুবাবার পাশে একটা পাত্রে দুধ ছিল খানিকটা। উঠে পড়লেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিয়ে এলেন একটু চা আর চিনি। কাছেরই একটা দোকান থেকে। দুটো ইট এনে তার উপরে পাত্রটা বসিয়ে কোনরকমে বানিয়ে ফেললেন চা। আমাকে দিলেন সাধুবাবারই একটা ভাঙা এ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে। দুজনেই পান করলাম। কন্‌কনে ঠান্ডায়, এই সকালে বেশ ভালোই লাগলো। এবার জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, সাধু-সন্ন্যাসীরা সংসারের বাইরে হলেও, তাঁদেরও তো একটা কর্তব্য আছে সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করা। আপনি কি মনে করেন সাধুদের কোন কর্তব্যই নেই। ভিক্ষে করে কোনরকমে পেট ভরালেন আর ভগবানকে ডাকলেন, এটাই কি সব বলে আপনি মনে করেন ?

একথা শুনে মুহূর্তমাত্র দেরী করলেন না সাধুবাবা। হাত নাড়িয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে, মুখে বললেন,

—না না বেটা, তা কখনই মনে করি না আমি। নিশ্চয়ই আছে, সাধুদের কর্তব্য আছে বৈ-কি! সেটা কি জানিস্ ? এই জগৎ সংসারে যত সংসারী মানুষ দেখবি, প্রতিটি মানুষই 'ভিতু'-র এক একটা প্রতিমূর্তি। যা কিছু ভয় তা একমাত্র সংসারীদেরই আছে। যেমন ধর্, রোগ শোকের ভয়, সম্মান যশ ধন সম্পত্তি হানি বা নষ্টের ভয় থেকে শুরু করে একেবারে শেষ ভয় মৃত্যু পর্যন্ত। এক কথায় সমস্ত কিছুর ভয়ই আচ্ছন্ন করে রেখেছে সংসারীদের। গৃহীদের মধ্যে ভক্তকে এই ভয় থেকে নির্ভয় করাই হলো প্রতিটি সাধু-সন্ন্যাসীর একমাত্র পরম কর্তব্য।

সঙ্গে সঙ্গেই জানতে চাইলাম,
—এই কর্তব্যটুকু কি সমস্ত সাধু-সন্ন্যাসীরা পালন করে থাকেন ? সকলেই কি এই কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন বলে আপনার মনে হয় ? এ-পথে আপনি তো আছেন বহু বছর ধরে। জীবনে সাধু হয়েও দেখেছেন অসংখ্য সাধু—করেছেন সাধুসঙ্গও।
এবার একটু উদাসীনতার সুর ভেসে উঠলো সাধুবাবার কণ্ঠে,
—সাধুদের কর্তব্য সম্পর্কে সকলেই সচেতন কিংবা জ্ঞাত কিনা তা বলতে পারবো না আমি। এ-পথে যাঁরা আছেন তাদের অন্তত এটা জানা উচিত। না জানলে বলবো, এ-পথে তাঁর উচিত হয়নি আসা। আর এই কর্তব্য সাধুরা পালন করে কি করে না তা বলতে পারবো না আমি।
এবার প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা, বহু সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গেই কথা হয়েছে আমার। যেমন হচ্ছে আপনার সঙ্গে। তাতে দেখেছি, যেটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই ধারণা হয়েছে, সাধু-সন্ন্যাসীদের দেহ এবং মনোগত যেসব ব্যাপার—যেমন কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েই, তেমন কোন পার্থক্যই দেখিনা সাধু-সন্ন্যাসী আর গৃহীদের মধ্যে। একজন শুধু সংসারে আর একজন রয়েছে সংসারের বাইরে। পার্থক্য তো শুধু এই-ই দেখি। ভগবানকে তো ডাকছে দুজনেই। এ-ব্যাপারে আপনার কি মত ?
কথাটা শুনে হেসে ফেললেন সাধুবাবা। কাঠের আগুনে খুব ধোঁয়া উঠছে দেখে কমণ্ডলুতে রাখা জল একটু ছিটিয়ে দিলেন আগুনে। ধোঁয়া কমলো কিছুটা। এবার হাসিমাখা মুখেই বললেন,
—হাঁ বেটা, কথাটা তুই ঠিকই বলেছিস্ তবে এটা অংশতঃ ঠিক। দেহগত ব্যাপার যেটা, যেমন ধর্ কামের কথাই। এ-বিষয়ে সাধু-সন্ন্যাসী আর সংসারীদের মধ্যে পার্থক্য নেই এতটুকুও। কারণ ইন্দ্রিয়ের কাজ ইন্দ্রিয়ই করে। তার প্রভাব নারী-পুরুষ সকলের ক্ষেত্রেই সমান। তবে সাধু-সন্ন্যাসীদের তপস্যা বা সংযমী জীবনের জন্য উগ্রতাটা গৃহীদের মতো নয়। এবার কথা হলো, যার যেমন তপঃ তার সেই অনুসারেই। আর আমি নিজে যেটা বুঝি, গৃহীদের মতো কিছু কিছু চিন্তা-ভাবনা যে সাধুদের মাথায় খেলা করে না, এমন নয়। কখনও কখনও করে বৈ-কি। তবে গৃহীদের মতো অত প্রকট নয়। গড় বিচারে তুই যদি একটা হিসাবে আসিস্ তা হলে দেখতে পাবি, গৃহী আর সাধু-সন্ন্যাসীতে পার্থক্য নেই কিছুই। একজন ঘরের বাইরে, একজন ভিতরে। পার্থক্য শুধু এই—যে বাসনাবিহীন, ইন্দ্রিয় সংযমী, অর্থ আর নারীতে যার আকর্ষণ নেই—সেই-ই সাধু। সে সংসারে থাকুক বা না থাকুক।

এবার সংস্কৃতে একটা শ্লোক আউড়ে হিন্দিতে তার মানে করে সাধুবাবা বললেন,
—বেটা, সুন্দরী স্ত্রী আর রতিশক্তি—একইসঙ্গে এই দুটো যেমন খুব কম পুরুষেরই আছে, তেমনই একেবারে বাসনাবিহীন সাধু-সন্ন্যাসীর সংখ্যা খুব কমই আছে।

বলতে পারিস।
সাধুবাবার অতীত জীবন সম্পর্কে জানার জন্যে জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা, কত বছর বয়েসে আপনি গৃহত্যাগ করেছেন, আর এখন বয়েসই বা কত হলো?
আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে তারপর তাকালেন জ্বলন্ত কাঠের দিকে। এবার বললেন,
—বয়েস যখন আমার বছর সাতেক, তখন আমি ঘর ছেড়েছি। এখন আমার ৮০/৮১ হবে বোধ হয়।
বিস্মিত হয়ে বললাম,
—বলেন কি বাবা! এত অল্প বয়েসে গৃহত্যাগ! কেন করলেন, কিসের তাড়নায়—দয়া করে বলবেন?
ঘাটে একের পর এক তীর্থযাত্রী আসছে স্নান করতে। আবার কেউ কেউ ফিরে যাচ্ছেন স্নান সেরে। আমরা দুজনে এমন একটা জায়গায় বসে আছি, যেখানে সকলেরই চোখ পড়বে একবার। তাই, প্রায় প্রত্যেকটি স্নানযাত্রীই একবার করে দেখতে দেখতে চলে যাচ্ছেন। কথার উত্তর দিলেন সাধুবাবা প্রসন্ন মনেই,
—বেটা, মানুষ কি তার নিজের ইচ্ছায় চলতে পারে—না কিছু করতে পারে কখনও। বিধাতার নিয়মে যা বাঁধা ছিল, তাই-ই হয়েছে। আমার এ-পথে আসার পিছনে রয়েছে এক পূর্বনির্দিষ্ট লিখন। বলি শোন্, তখন আমার জন্মই হয়নি। পরে শুনেছি মা আর গুরুজীর মুখে। আমার মায়ের বিয়ের পর কেটে গেল দশ-দশটা বছর। কোন সন্তানই হলো না। মোটেই শান্তি নেই মায়ের মনে। মেয়েদের বিয়ের পর সন্তান না হলে মনের যে দশা হয়, আমার মায়েরও হলো ওই একই দশা। পাড়া প্রতিবেশী এমনকি বাড়ীর লোকেরা পর্যন্ত মায়ের মুখ দেখতো না সকালে উঠে। যেতে পারতো না কোন উৎসব অনুষ্ঠানে। সকলেই বলতো বন্ধ্যা মেয়ে। মানসিক কষ্টের আর শেষ ছিল না মায়ের। বাবাও চিন্তা করতে লাগলো আবার বিয়ের কথা। তখনকার দিনে দু-পাঁচটা বিয়ে তো কোন ব্যাপারই ছিল না। এখনকার মতো তো আর তখন নয়।
এবার ছোট্ট পাতলা একটা কাঠের টুকরো দিলেন আগুনে। খুব আলতোভাবেই দিলেন, যেন সাজানো আগুন ভেঙে না পড়ে। তাকালেন একবার আমার মুখের দিকে। বললেন,
—মায়ের মনের অবস্থা যখন চূড়ান্ত খারাপ অবস্থায় তখন হঠাৎ একদিন এক 'মহাত্মা' এলেন আমাদের বাড়ীতে। এসেছিলেন ভিক্ষে করতে। মা ঘর থেকে কিছু চাল আর সব্জি নিয়ে এসে দাঁড়ালেন সেই মহাত্মার সামনে। মাকে দেখামাত্রই তিনি বললেন, 'বেটি, তোর মনে বড় দুঃখ—সন্তান হয় না। তাই না?' কথাটা শুনেই মা আমার কান্নায় ভেঙে পড়লেন মহাত্মার পায়ে। তখন মহাত্মা বললেন, 'বেটি, তোকে দুটো সন্তান আমি দিতে পারি একটা শর্তে—যদি কথা দিস্ একটা আমাকে

দান করবি, তবেই দেব।'

কথাটা শুনে মা তো অবাক। সন্তান হবে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে পা-দুটো জড়িয়ে ধরলেন মহাত্মার। কাঁদতে লাগলেন অঝোরে। রাজী হলেন যে কোন শর্তে, সন্তান চাই-ই। মহাত্মা প্রতিজ্ঞা করালেন মাকে, কথার যেন নড়চড় না হয়। এবার ঝোলার থেকে কিছু জরিবুটি বের করে দিলেন মায়ের হাতে। খেতে বললেন নিয়ম করে। তারপর বৃদ্ধ মহাত্মা চলে গেলেন বাড়ী থেকে। যাবার সময় বলে গেলেন যথাসময়ে আসবেন তিনি।

এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন। বিড়ি চাইলেন একটা। কাঠের আগুনে ধরিয়ে দিলাম সাধুবাবার হাতে। টানতে টানতে তিনি বললেন,

—জানিস্ বেটা, অদ্ভুত ব্যাপার। একটা মাসও গেল না। সন্তান এলো মায়ের পেটে বিয়ের দশ বছর পর। আনন্দের বন্যা বয়ে গেল বাড়ীতে। ঠিক ঠিক সময়ে যমজ সন্তান হলো মায়ের। আমি আর দাদা। অল্প কিছু সময়ের ছোট বড়। একই সঙ্গে বেড়ে উঠলাম আমরা দুজনে। বয়েস যখন আমার সাতে এসে দাঁড়ালো, তখন হঠাৎ একদিন বাড়ীর উঠোনে এসে দাঁড়ালেন সেই মহাত্মা। মায়ের চিনতে কোন অসুবিধে হলো না—ভুলতেও পারেননি তাঁর দয়ার কথা। আর প্রতিজ্ঞার কথা তো মায়ের মনেই ছিল। দাদাকে রেখে বাবা আর মা আমাকে স্বেচ্ছায় তুলে দিলেন সেই মহাত্মার হাতে। দাদা হলেন সংসারী আর আমি হলাম সাধু। ভগবানের কি খেলা, তাই না বেটা!

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন বিড়িতে টান দিয়ে,

—এবার সেই মহাত্মা আমাকে একেবারে সোজা নিয়ে গেলেন হরিদ্বারে। পরে আমাকে দীক্ষা দিয়ে তিনিই হলেন ইহকাল পরকালের ত্রাণকর্তা—গুরুজী। এবার বলতো দেখি বেটা, মানুষ কি সত্যিই তার নিজের ইচ্ছামতো জীবনপথে চলতে পারে, না কিছু করতে পারে? আমি কি ভেবেছিলাম—এ-পথে আসবো?

এবার জানতে চাইলাম,

—যখন মহাত্মা আপনাকে নিয়ে যায় মায়ের কাছ থেকে—যাবার মুহূর্তে তো মা কেঁদেছিলেন নিশ্চয়ই—এ-বলার অপেক্ষা রাখে না। সে-কথা জানতে চাইছি না আমি। জানতে চাই, মায়ের স্নেহ ভালোবাসা ছেড়ে, খেলার সাথী দাদা, বাবাকে ছেড়ে যাওয়ার ওই সময় আপনার মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল—তা কি এখনও স্মরণে আছে আপনার?

এ-প্রশ্নে সাধুবাবা ভুরু কুঁচকে একটু ভাবলেন। ফিরে গেলেন অনেক অ-নে-ক অতীতে। কিছুক্ষণ। তারপর আবার ফিরে এলেন। বললেন,

—বেটা, তখন আমি কিছুই বুঝি না। মনের অবস্থা আমার কি হয়েছিল, তাও আমি বলতে পারবো না এখন। তখন তো আমি একেবারেই ছেলেমানুষ। এ-টুকু আমার মনে আছে, খুব কেঁদেছিলাম। মনটাও গেছিলো খুব খারাপ হয়ে। কিন্তু কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, কিভাবে চলবে, কি হবে আমার, আর কখনও বাড়ীর

মুখ দেখতে পাবো না, মায়ের কাছে আর ফিরবো না—এসব কোন চিন্তাভাবনাই মনে আসেনি তখন, এখনও বেশ মনে আছে আমার। আর এটা বেশ খেয়াল আছে, বিবশভাবেই বেরিয়ে পড়েছিলাম সেই মহাত্মা, গুরুজীর সঙ্গে।

আবার জানতে চাইলাম,

—ঘর ছেড়ে বেরোনোর পর মায়ের জন্য মন খারাপ হতো না? আর কখনও বাড়ীতে গেছিলেন? বাড়ী কোথায় ছিল আপনার?

উত্তরে সাধুবাবা নির্বিকারভাবে বললেন,

—প্রথম প্রথম মায়ের জন্য মনটায় খুব কষ্ট হতো। লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতাম। গুরুজী শান্তনা দিতেন আমাকে। নানা কথায় ঘুরিয়ে দিতেন মনটাকে, একই সঙ্গে দিতেন মায়ের স্নেহ আদর আর ভালোবাসা। আর সঙ্গে নিয়ে বেড়াতেন এ-তীর্থ আর সে তীর্থে। ধীরে ধীরে মনটা আমার বসে গেল। ভুলে গেলাম সকলের কথা। বাড়ীর সমস্ত স্মৃতিই আমার লোপ পেয়ে গেল অদ্ভুতভাবে, বছর খানেকের মধ্যে। উত্তরপ্রদেশের কোন এক গ্রামে আমার জন্ম। কোথায়, কোন গ্রামে কিছুই চিনতে পারবো না—বলতেও পারবো না। ঘর ছাড়ার পর ঘরও আমাকে ছেড়ে গেছে, তাই আর ঘরে যাইনি কখনও।

এই পর্যন্ত বলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন সাধুবাবা। জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, বছরখানেকের মধ্যেই মা বাবা দাদা আর বাড়ীর সকলের কথা আপনার স্মৃতি থেকে লোপ পেয়ে গেল—এটা কি করে সম্ভব হলো?

একটু উদাসীনতার সুরেই বললেন,

—বেটা, তখন তো আমি কিছুই বুঝিনি, ভাবিনিও কিছু। এখন বুঝি, তখন গুরুজী আমাকে 'হজম' করে নিয়েছিলেন বলেই সম্ভব হয়েছিল। বেটা, শিষ্যকে যদি গুরু আত্মসাৎ করে না নেন, তাহলে শিষ্যের কল্যাণ তো কিছু হয়ই না, মুক্ত হয় না মন—মুক্তিও নয়।

'গুরুজীর' কথা বলায় জানতে চাইলাম,

—বাবা, সংসারজীবনে গৃহীদের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য কেমন গুরু করা উচিত বলে মনে করেন আপনি?

মুখের ভাবটা দেখে মনে হলো খুব খুশী হলেন এ-প্রশ্নে। আন্তরিকতার সুরেই সাধুবাবা বললেন,

—বেটা, সাধুই বল্ আর সংসারীদেরই বল্—তাঁদের গুরু এমন হওয়া দরকার, যিনি শিষ্যের কোন কিছুই গ্রহণ করেন না কখনও। আবার শিষ্যও এমন হওয়া চাই, যে সব কিছুই সমর্পণ করবে তার গুরুর কাছে নির্বিকার চিত্তে।

এবার হিন্দিতে একটা শ্লোক বলে তার মানে করে বললেন,

—বেটা, গৃহী শিষ্যের সংসারীগুরু হলে শিষ্যের কোন উপকারেই আসে না। যেমন কাদা দিয়ে কাদার দাগ তোলা যায় না। গুরুও অন্ধ, শিষ্যও অন্ধ। হাত ধরাধরি করে একে অপরকে টেনে নিয়ে চলে। তারপর দুজনেই একসঙ্গে মরে

গর্তে পড়ে।
এ-কথায় কেমন যেন খটকা লাগলো মনে। জিজ্ঞাসা করলাম,
—সংসারীগুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নিলে শিষ্যের কোন কল্যাণ বা উপকার হয় না কেন? গৃহী গুরুর অপরাধটা কোথায়?
আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না। উঠে দাঁড়ালেন। ইসারায় কয়েকটা সিঁড়ি দেখালেন। আমিও উঠলাম। ইসারায় দেখানো সিঁড়ির কাছে গিয়ে নিজে বসলেন, আমাকেও বললেন বসতে। বসলাম। এবার বললেন,
—বেশ রোদ্দুর আছে এখানে। ওখানে ধোঁয়ায় চোখ জ্বলছিল। তাই এখানে এলাম। আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, তাই না?
সম্মতি জানালাম ঘাড় নেড়ে। এবার সাধুবাবা বললেন,
—গৃহীগুরুর কোন অপরাধের কথা বলছি না আমি। শুধু এইটুকুই বলছি, কামুক পুরুষ যেমন নারী ভালোবাসে, ধন ও অর্থ ভালোবাসে যেমন লোভী, ভক্ত যেমন ভালোবাসে ভগবানকে, তেমনই গৃহীগুরু ভালোবাসে তার নিজের স্ত্রী সন্তানকে। এরা নিজের স্ত্রী সন্তানের মঙ্গল কামনা করবে, না শিষ্যের বোঝা কাঁধে নিয়ে তার কল্যাণ কামনা করবে? ওই জন্যেই তো বললাম, কাদা দিয়ে কাদার দাগ তুলতে গেলে যে অবস্থা দাঁড়ায়, গৃহীগুরুর অবস্থাও তেমন।
একটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম—বাধা দিয়ে বললেন,
—বেটা, জটিয়াবাবার মতো, স্বামী সন্তদাসের মতো ক-টা সাধুকে খুঁজে পাবি যে, বিয়ের পরও সাধনার উচ্চস্তরে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমন সাধুমহাত্মার কাছ থেকে দীক্ষা তো দূরের কথা, এঁদের একটা 'লাথ্' খেলেও ইহকাল পরকাল ধন্য, সার্থক হয়ে যায়। এঁদের মতো সাধু লাখে একটা পাবি কিনা সন্দেহ।
সাধুবাবা এবার একটু হাসলেন। পুষ্কর সরোবরের জলের দিকে তাকিয়ে বললেন আবেগভরা কণ্ঠে,
—বেটা, এই সংসারে শিষ্যই হলো প্রথম দাতা, যে গুরুতে অর্পণ করে নিজের দেহ মন আত্মাকে। একইসঙ্গে একমাত্র গুরুই হলেন প্রথম দাতা, যিনি শিষ্যের পার্থিব বন্ধন মুক্তির জন্যে দান করেন নামরূপ পরমধন, যার কোন বিনিময় মূল্য হয় না। তবে বেটা, গুরু সকলকেই চান নিজের করে নিতে কিন্তু গুরুকে কেউ চায় না। কেন জানিস্? যতদিন শিষ্যের আশা আছে, ততদিন গুরুকে সর্বস্ব অর্পণ করে নিঃস্ব হয়ে পারে না গুরুর সর্বস্ব গ্রহণ করতে।
বসেছিলাম পাশাপাশি। কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছে, তাই এক ধাপ নীচে বসে সোজাসুজি তাকালাম সাধুবাবার মুখের দিকে। বললাম,
—গুরুর সর্বস্ব বলতে কি বাবা আপনি গুরুশক্তির কথা বলতে চাইছেন?
কথাটা শেষ হতে না হতেই আনন্দে একেবারে ডগমগ হয়ে বললেন,
—হাঁ হাঁ বেটা, আমি তাই-ই বলতে চাইছি। গুরুর শক্তি ছাড়া গুরুর আছেটা কি? ও শক্তিই তো কাটাবে সংসার মায়া আর জীবনের বন্ধন। যখনই শিষ্য তার

সমস্ত কিছু অর্পণ করলো—ব্যস, একেবারে নিশ্চিত জানবি, শিষ্য নিঃস্ব হলো না, শূন্যও হলো না, একেবারে পরিপূর্ণ হলো গুরুশক্তিতে। কিন্তু এমন শিষ্য কোথায়, কটা পাবি এই সংসারে ?

এমন আন্তরিকভাবে কথা বলছেন দেখে আমি আবেগের বশেই বলে ফেললাম,

—বাবা, সাধুরা সাধারণত কথাই বলতে চান না। এড়িয়ে যান। এ আমি দেখেছি বহুবার, বহুক্ষেত্রে। এমন প্রসন্নভাবে কথা বলবেন আপনি, ভাবতেই পারিনি। মনে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে আমার।

হাসিতে ভরে উঠলো সাধুবাবার মুখখানা। নিঃশব্দ হাসি। বললেন,

—বেটা, সাধারণ মানুষের মধ্যে সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে কেউ আসে ভাব নিয়ে, কেউ আসে অভাব নিয়ে। আমার মনে হয়, মানুষের ভাব অভাবের বিচার না করে, যারা আসে তাদের সকলের সঙ্গেই কথা বলা উচিত।

এবার প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞাসা করলাম,

—সেই সাত বছর বয়েসে গৃহত্যাগ করেছেন আপনি। তাতে তো বুঝতেই পারছি ইস্কুলের মুখ দেখেননি কখনও। গুরুজীর কাছে থেকে কি কিছু পড়াশুনা করেছেন ?

এবার হাসিতে একেবারে ফেটে পড়লেন সাধুবাবা। হাসির আওয়াজ শুনে ঘাটে স্নানরত কিছু তীর্থযাত্রী একবার তাকালেন আমাদের দিকে। আমি দেখলাম। ভ্রূক্ষেপ করলেন না সাধুবাবা। হাসতে হাসতেই বললেন,

—না না বেটা, পড়াশুনা তো দূরের কথা, একটা অক্ষরও চিনি না আমি।

সঙ্গে সঙ্গেই বললাম,

—তাহলে এমন সুন্দর সুন্দর শ্লোক আর জ্ঞানগর্ভ কথা বলছেন কি করে ?

এতটুকু দেরী না করেই বললেন,

—বেটা, রেডিওতে তোরা যেমন গান শুনে শুনেই শিখে ফেলিস্—শিখে ফেলিস্ তার কথা, সুর—তেমনই গুরুজীর মুখ থেকে এ-সব কথা আমি শুনে শুনেই শিখে ফেলেছি। এতক্ষণ তোকে যেসব কথা বললাম—জানবি, আমার গুরুজীর কথাই তোকে বললাম। আমার দয়াল গুরু কখনও শাস্ত্রের কথা ভিন্ন অন্য কোন কথা বলতেন না।

এই কথাটুকু বলার পর কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন সাধুবাবা। কোন কথা বলে আর বিরক্ত করলাম না। মিনিট পাঁচেক কাটলো এইভাবে। ভাবের ব্যাঘাত ঘটালাম না। কি ভাবছিলেন তা তিনিই জানেন। এবার তাকালেন আমার দিকে। আমি উন্মুখ হয়েই ছিলাম। তাকানো মাত্রই জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, তীর্থে তীর্থে বেড়ান। চলার পথে সুন্দরী নারীর দর্শনও পান অসংখ্য। তাদের দেখে মনে কখনও কোন প্রতিক্রিয়া হয় না আপনার ? নারীভোগ তো করেননি, ভোগের কোন ইচ্ছা জাগেনি কখনও ? বয়েসে কামেন্দ্রিয় শিথিল হয়ে যায়, তাই এখনকার কথা বলছি না আমি। বলছি, যখন আপনার যৌবন ছিল,

যখন সব মানুষের মনের একটা সম্ভোগ চাহিদা থাকে, তখনকার কথা।
হঠাৎ এমন একটা প্রশ্ন করায় সাধুবাবা কেমন যেন একটু হতভম্ব হয়ে গেলেন। মুখের ভাব দেখে মনে হলো, চট্ করে কি উত্তর দেবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। আমি মুহূর্ত দেরী না করেই হাতজোড় করে সাধুবাবাকে বললাম,
—বাবা, আমার এ প্রশ্ন যদি আপনাকে কোনভাবে বিচলিত করে থাকে, মনে যদি বিন্দুমাত্র অস্বস্তির সৃষ্টি করে থাকে, তাহলে নিজগুণে ক্ষমা করে দেবেন আমাকে।
ক্ষমা প্রার্থনা করায় সাধুবাবা অভয় দিলেন হাতের ইসারায়। চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ, রইলাম আমিও। এমনভাবে কাটলো মিনিট দশেক। বসে রইলাম উত্তরের আশায়। এবার শুরু করলেন সাধুবাবা,
—বেটা, এই বিশ্বসংসারে সেই পুরুষ একেবারেই দুর্লভ, বিরল—যে কখনও নারীর রূপ যৌবন, স্তনযুগল আর অর্থে প্রলুব্ধ হয় না। সুতরাং সাধুরা যখন পুরুষ তখন তাঁরাও পারে না এর বাইরে যেতে। তবে বেটা, সংসারীদের সঙ্গে সাধুদের প্রলুব্ধ হওয়ার মধ্যে কমবেশী মাত্রাভেদ আছে। এই ভেদটুকু সংযম আর সাধু-সন্ন্যাসীদের ব্যক্তিগত তপস্যার উপরেই নির্ভর করছে। কারও কম, কারও বেশী, তবে থাকবেই। যৌবনে এসবকে উপেক্ষা করা, মনের দিক থেকে সাধনজীবনে প্রথম অবস্থায় বেশ কঠিন বলে মনে হয়েছে। পরে দেখেছি, কেমন করে যেন সব উতরেও গেছি গুরুকৃপায়।
সাধুবাবার কথাগুলো শুনছি মন দিয়ে। অন্য কোন দিকেই মন নেই আমার। মন নেই সাধুবাবারও অন্য দিকে। একটু থেমে আবার বললেন,
—বেটা, তুই জোয়ান বয়েসের কথা জানতে চাইছিস্, তুই আমার এই আশি বছরের বুড়োর কথা শোন্। তীর্থে তীর্থে ঘুরি। কখনও একা বসে থাকি পথের ধারে। অজস্র নারীর মুখ দেখি আমি। আমার পাশ দিয়ে যায় অনেকেই। প্রণামও করে কেউ কেউ এসে। কথাও বলে দু-চারটে। অনেকেই জানায় তাদের দুঃখের কথা। এইভাবেই কেটে গেল দীর্ঘজীবনের এতগুলো বছর। তুই শুনলে অবাক হবি, এখনও পর্যন্ত, এই বয়েসেও কোন রমণীকে দেখলে মনে এক অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করি। ভীষণ ভালো লাগে। আনন্দের বন্যা বয়ে যায় দেহ মন ও প্রাণে।
এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন এক দৃষ্টিতে। ভাবছেন হয়তো আমি কি ভাবছি। আর কথাটা শুনে আমি ভাবছি, বলেন কি সাধুবাবা! এই বয়েসে কাম-ইন্দ্রিয় হয়তো শিথিল হয়ে গেছে অথচ মানসিক দিক থেকে নারীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব? আবার সাধন ভজন জীবনটাও তো সাধুবাবার কম হলো না। তাহলে ব্যাপারটা কি হলো? এই মুহূর্তে মাথায় আমার কিছুই ঢুকলো না। শুধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম মুখের দিকে। সাধুবাবা বোধহয় বুঝে ফেলেছেন আমার মনের কথা। মুচকি হেসে বললেন,

—হ্যাঁরে বেটা, সত্যি কথাই বলেছি আমি। এখনও মনে দারুণ আকর্ষণ অনুভব করি নারীর রূপ যৌবন দেখে। আনন্দ হয়, তবে বেটা কামের কোন প্রতিক্রিয়া হয় না মনে।

এ-কথায় এতটুকু দেরী না করেই বললাম,

—বাবা, কথাটা যেন ঠিক হলো না। পৃথিবীতে জড় অজড় সমস্ত বস্তুরই একটা কমবেশী আকর্ষণ আছে। দেখলে কেউ কম, কেউ একটু বেশী আকর্ষণ অনুভব করে। সেখানে সুন্দর অসুন্দরের বালাই নেই। বিষয় বা বস্তুর স্বকীয় গুণেই সেই আকর্ষণ। সবক্ষেত্রেই কামের ( Sex ) দ্বারা আকর্ষণ অনুভূত হয় না, এটা আমার ধারণা। কিন্তু নারী বিষয়ক যা কিছু চিন্তাভাবনা, আকর্ষণ এবং ভোগ, তা তো মূলত কাম থেকেই সৃষ্টি। এটাই সত্য। তাহলে কামই যখন এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়া করে মনের উপর তখন কামের প্রতিক্রিয়া কেন হয় না মনের উপর ? এটা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা ?

কথাটা শুনে হেসে ফেললেন সাধুবাবা। বললেন হাসিমুখেই,

—বেটা, সংযম থাকলে তুই আমার কথাটা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে পারতিস্। অসংযমী জীবন যাদের, তারা এ-কথার গুরুত্ব বুঝবে না, পারবে না উপলব্ধিও করতে। তুই ঠিকই বলেছিস্, কাম থেকেই তো রমণীর প্রতি আকর্ষণ, তাছাড়া আর কি থেকে হবে ? এ আকর্ষণ পুরুষের দেড়শো বছর বয়েসেও হতে পারে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তবে বেটা এখানে একটা কথা আছে। এ আকর্ষণ গৃহীদের দেহমনোগত, সংযমী সাধুদের ধর্মমনোগত। পার্থক্য এখানেই।

একটু থামলেন সাধুবাবা। চারদিকে একবার বুলিয়ে নিলেন চোখ দুটোকে। তারপর আমার চোখের উপর চোখ রেখে বললেন,

—বেটা, অসংযমী গৃহীদের কোন নারীকে দেখামাত্রই মনে যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, তা মন থেকে কাম-ইন্দ্রিয় ছড়িয়ে দেয় সারা দেহে। বাহ্যত প্রকাশ না পেলেও পরোক্ষে প্রতিক্রিয়া হয় দেহমনে, কম বা বেশী। এটা হয় কামভোগের বাসনা থেকে। এর নিবৃত্তি হয় কারও অসংযমে শুক্রক্ষয়ে, কারও নারীসঙ্গলাভের মাধ্যমে। তৎক্ষণাৎ হয়, এমন নয়। কখনও না কখনও, কোন না কোন সময়ে। এই আকর্ষণ, এইভাবে নিবৃত্তি—এটাই চলতে থাকে গৃহীজীবনে, নারীপুরুষের। এই নিবৃত্তি তাৎক্ষণিকভাবে দেহমনে এক অদ্ভুত আনন্দের সৃষ্টি করে, যেটা কামধর্ম এবং সম্পূর্ণ দেহগত, কারণ গৃহীদের মন থাকে ইন্দ্রিয়ের বশে।

সংযমী সাধুদের তা হয় না। দীর্ঘদিনের জপতপের ফলে মন সরে আসে ভোগ-বাসনা থেকে। তবে পার্থিব জীবনে নারীদর্শন ও ভাবনাজনিত সমস্ত ক্রিয়াই চলে মনের উপর। প্রতিটি মানুষের মনই থাকে ইন্দ্রিয়ের বশে। সেই বশীভূত মনের বশে রয়েছে বুদ্ধি। সংযমী সাধুদের সাধনবলে মন ইন্দ্রিয় থেকে—বুদ্ধি মন থেকে মুক্ত হয়। ফলে নারীদর্শনজনিত ক্রিয়ারূপ আকর্ষণ মনে অনুভূত হলেও ইন্দ্রিয় সেটা মুক্ত মন ও বুদ্ধির উপর কোন ক্রিয়া করতে পারে না। ফলে কোন প্রতিক্রিয়াই

হয় না দেহের উপর। তবে নারীর রূপ যৌবন দর্শনের ফলে একটা কার্য তো হবেই নইলে প্রকৃতির নিয়মই যে মিথ্যে হয়ে যায়। কাম-ইন্দ্রিয় মনের উপর কোন-ভাবেই কাজ করে না বলেই মনে দর্শনে আকর্ষণজনিত একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় মাত্র—যা রূপ নেয় এক অপার্থিব আনন্দের—যা বয়ে যায় প্রাণে, মনে। সেইজন্যেই তো বিশ্ববিধাতার সৃষ্টি অজস্র নারীর রূপ যৌবন দেখতে ভালো লাগে। মন ভরে যায় আনন্দে। এখানে সংযমী সাধুদের মুক্ত মনে কাম-ইন্দ্রিয় রূপ নেয় এক অপার্থিব আনন্দের। অসংযমী গৃহীদেরও নেয়—ভোগ-আনন্দের। তাই সংযমী সাধু-সন্ন্যাসীদের নারী দর্শনের ফলে যে আকর্ষণ ও আনন্দ তা ধর্মমনোগত।

রোদের তাপ একটু বেড়েছে। তাই ঠাণ্ডাও একটু কম লাগছে। কনকনে ভাবটা এখন আর নেই। তীর্থযাত্রীদের আনাগোনাও বেড়েছে অনেক, স্নানার্থীদেরও। সাধুবাবার ঝোলা-কম্বল রয়েছে ঘাটেরই একপাশে। সাধুবাবা জানেন ওটা কেউ নেবে না। আর তো কিছু নেই—তাই! এবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,

—এখানে আছিস্ ক-দিন ?

বললাম,

—আজ ভোরে এসেছি, চলে যাবো আজই। আগেও এসেছি পুষ্করে।

কোন বাধাধরা প্রশ্ন নিয়ে সাধুদের কাছে বসিনা কখনও। যখন যে প্রশ্ন মনে আসে তখন সেটাই করি। আর প্রশ্ন করি প্রসঙ্গক্রমে। জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, সংসারজীবনে থেকে কমবেশী ঈশ্বরকে ডাকছে প্রায় সকলেই। দীক্ষিত বা অদীক্ষিত সকলের কথাই বলছি। আমার প্রশ্ন, সংসারীদের মধ্যে এমন কোন শ্রেণী কি আছে, যাদের কখনও ঈশ্বরদর্শন বলে যদি কিছু থাকে, তা তাদের হবে না বা মুক্তিলাভ করতে পারবে না ?

প্রশ্ন শোনামাত্রই সাধুবাবা তাকালেন আমার মুখের দিকে। এবার তাকানোর মধ্যে রয়েছে বেশ একটা গভীরতা। হয়তো ভাবলেন কিছু। বিরক্ত হলেন না। ধীরে ধীরে একটা হালকা হাসির রেখা ফুটে উঠলো চোখমুখে। বললেন সহজভাবে, স্বাভাবিক সুরেই,

—গৃহীদের মধ্যে অদীক্ষিত যারা—তারা যতই ভগবানকে ডাকুক, মাথা খুঁটে মরে গেলেও তাঁর স্বরূপ দর্শন তো হবেই না, মুক্তিলাভও হবে না। সংসারে এরা এসেছে নরক ঘাটতে, বিষয় বাড়াতে আর কাম-ইন্দ্রিয়ের সুখভোগ করতে। ঈশ্বরের নামগানে তাদের সাংসারিক কল্যাণ তো কিছু হবেই কারণ তিনি যে সকলকে করুণা করার জন্যেই বসে আছেন। তবে তাঁর রাজত্বে পৌঁছানোর দরজা বন্ধই থাকে। এ-কথা বেটা নারীদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে সত্য। অদীক্ষিত গৃহীরা তাঁর নামগান করলো মানে মনের জমি চাষ করলো। গুরুর দেয়া বীজ না পড়লে ফসল হবে কি করে ? আবার গুরু বীজ দিলেই যে ফসল হবে, এমন ভাবাটাও ঠিক ভাবা নয়। শিষ্যের যত্ন, পালন আর জল সিঞ্চনের অর্থাৎ ভক্তি বিশ্বাস আর শরণাগতির উপর

ফসল বা তাঁর দর্শন নির্ভর করবে, সাধনা চাই।
এই পর্যন্ত বলে খুব হাসতে লাগলেন সাধুবাবা। অবাক হয়ে গেলাম হাসি দেখে। হাসির কোন কারণ খুঁজে পেলাম না বলেই কারণ জানতে চাইলাম। সাধুবাবা বললেন,
—বেটা, হাসছি কেন জানিস্? গুরুকরণটা একশ্রেণীর গৃহীদের কাছে বর্তমানে একটা আভিজাত্য প্রকাশের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেমন জানিস্, যেমন নিজে ব্যাভিচারে লিপ্ত কিংবা যোগ্যতার লেশটুকুও নেই অথচ বংশে কোন গৌরব থাকলে তার নাম ভাঙিয়ে নিজে গৌরববোধ করে। ঠিক সেই রকম, নাম করা গুরুবংশে বা নামী গুরুর কাছে দীক্ষা নেয়। কোন রকমে নিয়মরক্ষা করে একটু জপ করে, না করলে নয় বলে। অনেকে তো করেই না অথচ কথা প্রসঙ্গে বলে, আমি ওমুক গুরুর শিষ্য বা শিষ্যা। ওমুক জায়গা থেকে দীক্ষিত। ভাবটা এমন, বিরাট কিছু করে ফেলেছি। এই জাতীয় গৃহীদের দীক্ষা হলেও তাদের দর্শনলাভ হয় না। আর মনের শান্তি, যা দীক্ষায় হয়—তা তো হয়ই না। এদের দশা অদীক্ষিত গৃহীদের থেকে কম নয়, দীক্ষা নিয়েও। তবে ভগবানের রাজত্বে ঢোকার অনুমতি পায় কিন্তু ঢোকার ইচ্ছা হয় না—ঢোকেও না। পাসপোর্ট হলো তবে সাংসারিক ভোগবাসনা আর সাধন বিমুখতায় এরা ভিসা পায় না। ঘুরে ঘুরে আসতে হয় নরক ঘাটতে। এদেরও মুক্তি হয়, এক জন্মে নয়।
সাধুবাবা মিনিটখানেক চুপ করে থেকে আবার বলতে শুরু করলেন,
—সংসারী নারীপুরুষের মধ্যে যারা কামাতুর, বিষয়ী, লোভী আর ক্রোধী—তারা দীক্ষিত হলেও তাদের কখনও ঈশ্বরের দর্শনলাভ তো হবেই না, বিন্দুমাত্র ভক্তিলাভও হয় না। বিষয়ী এবং লোভীর ভগবানকে ডাকা—ধনবৃদ্ধি এবং তা রক্ষার্থে, ঝামেলামুক্ত হতে। এছাড়া সংসারীদের সকলেরই ঈশ্বরের দর্শন ও মুক্তিলাভ হতে পারে, তা নির্ভর করবে ব্যক্তিগত সাধনা আর গুরুকৃপার উপরে। বেটা, সাধনা করলেই তাঁর কৃপা লাভ হবে। ওটা লাভ করলেই সব লাভ হয়। ফাঁকি মেরে কৃপা, দর্শন, মুক্তি—এর কোনটাই লাভ করা যায় না অধ্যাত্মজীবনে। আর মোক্ষ—সংসারীদের কয়েক কোটিতে একটা হলেও হতে পারে—সরাসরি। না হওয়ার সম্ভাবনাই পূর্ণমাত্রায়। তবে মুক্তি অজস্র সংসারীদের হয়—হচ্ছে—হবেও, যাঁরা তাঁকে ধরে আছে নিষ্ঠার সঙ্গে। এমন সংসারীদের সংখ্যা মোটেই বিরল নয়।
কোন কথা বললাম না। এক মনেই বলে চললেন সাধুবাবা,
—বেটা, মোক্ষ আর মুক্তির তফাৎ কিছু বুঝিস্?
হ্যাঁ বা না, কিছুই বললাম না। সাধুবাবাই বললেন,
—বলি শোন, জীবের আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার লীন হয়ে যাওয়ার নামই মোক্ষ। মুক্তি হলো সাধনবলে মুক্ত আত্মা সংসারবন্ধন ছিন্ন করে গেল পরলোকে। সেখানেও চলতে লাগলো তার সাধনভজন। আর জন্ম হলো না। সাধনবলে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে একদা আত্মা লীন হয় পরমাত্মার সঙ্গে। সেটা কার কত কালে হবে তা বলার

সাধ্য নেই কারও। সংক্ষেপে এ-টুকুই জেনে রাখ্।
এবার আমার চোখ থেকে সরালেন চোখদুটোকে। রাখলেন পুষ্করের জলে। উদাসীন কণ্ঠে সুর করে বললেন,

নিত নহনেসে হরি মিলেতে তো জলজন্তু হোই।
ফল মূল খাকে হরি মিলেতে তো বাদুড় বাঁদরাই॥
তিরণ ভখনকে হরি মিলেতে তো বহুত মৃগ অজা।
স্ত্রী ছোড়কে হরি মিলেতে তো বহুত রহে খোজা॥
দুধ পিকে হরি মিলেতে তো বহুত রহে বৎস বালা।
মীরা কহে, বিনা প্রেম সে না মিলে নন্দলালা॥

মীরার দোঁহা বলে সাধুবাবা আবেগভরা কণ্ঠে বললেন,
—বেটা, মীরার এ-কথা যে কত সত্য, তা এই জীবনে না এলে আমি কিছুতেই বুঝতে পারতাম না।
একটু থামলেন। জিজ্ঞাসা করলাম,
—সাধুজীবনে আসার পর কেটে গেল প্রায় সত্তরটা বছর। এত বছরের এই জীবনে আপনার অন্তরে কোন ক্ষোভ দুঃখ বা বেদনা কি কিছু আছে—যা মাঝেমধ্যেই কষ্ট দেয় মনটাকে?
এক মুহূর্ত দেরী না করেই বললেন,
—এ-জীবনেও যদি গৃহীদের মতো ক্ষোভ দুঃখ বেদনা পীড়িত করে তাহলে আর সাধুজীবনের মূল্য কি রইলো, সাধু রইলাম কোথায়! ওসব কিছু হয়নি—হয়ও না কখনও। বেটা, অত্যন্ত সুন্দরী, রূপসী রমণীও যেমন অতি বড় কুৎসিত, যদি সে ঈশ্বরে মনোনিবেশ না করে, তেমনই কুৎসিত অধম সেই সাধু, যার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ দুঃখ বা বেদনা আছে এই সাধুজীবনে।
আরও অনেক অ-নে-ক কথা হলো সাধুবাবার সঙ্গে। অনেক কথা শুনে, অনেক কথার শেষে জিজ্ঞাসা করলাম শেষ কথা,
—আচ্ছা বাবা, সত্যিই কি তাঁর দর্শন পাওয়া যায়?
কথাটা শেষ হতে না হতেই টেবিল চাপড়ে কথা বলার মতো বাঁ-হাতের তালুতে ডানহাতের একটা চাপড় মেরে বললেন উদ্দীপ্ত কণ্ঠে, দৃঢ়তার সঙ্গে,
—আলবৎ পাওয়া যায়। কেমন করে পাওয়া যায় জানিস্—দেহটাকে প্রদীপ, জীবনটাকে সলতে আর দেহের এই প্রতিটা রক্তবিন্দুকে তেল করে জ্বালালে, তবেই।
সঙ্গে সঙ্গেই পুষ্করতীর্থের রামগতপ্রাণ অতিবৃদ্ধ নির্বিকার নির্লিপ্ত এই সাধুবাবাকে বললাম,
—বাবা, আপনি কি তাঁর দর্শন পেয়েছেন?
সাধুবাবাও মুহূর্তমাত্র দেরী না করেই উদাত্ত কণ্ঠে বললেন,
—বেটা, রামজীর সমান রামজী শুধু নিজেই। তাঁকে ডাকলে সব—সবকিছুই পাওয়া যায় অনায়াসে—'দর্শন ভি'।

ভারতের সমস্ত তীর্থই তীর্থ হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে কোন না কোন কারণে। কোথাও কোন মহাত্মার অবস্থানের জন্যে, কোথাও অবতারের জন্ম ইত্যাদি নানা কারণে। তবে তীর্থপুষ্করের প্রসিদ্ধি বেদমাতা গায়ত্রীর জন্ম, ব্রহ্মার যজ্ঞ এবং প্রাচীন মুনি ঋষিদের তপোভূমির জন্যে।

পর্বতের মধ্যে মেরু, পাখীর মধ্যে যেমন গরুড় তেমনই সমস্ত তীর্থের মধ্যে পুষ্কর অনাদিকাল থেকেই শ্রেষ্ঠ। ত্রেতাযুগের প্রধান তীর্থই ছিল পুষ্কর। বেদ, পুরাণ, রামায়ণ থেকে শুরু করে মহাভারতে আছে তীর্থপুষ্করের কথা।

বাল্মীকি রামায়ণের বালকাণ্ডে উল্লেখ আছে, একদা পুষ্কর তীর্থে তপস্যা করেছিলেন মহর্ষি বিশ্বামিত্র। স্বর্গের অপ্সরা মেনকা স্নান করেন পুষ্করের পবিত্র জলে। শুধু তাই নয়, বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করায় দশ বৎসর মেনকার সঙ্গে বিশ্বামিত্রের পুষ্করে থাকার কথাও বর্ণিত আছে রামায়ণে।

অযোধ্যাকুলনিধি রামচন্দ্র বনবাসকালে সীতাকে নিয়ে আসেন পুষ্করে। পিণ্ডদান করেন রাজা দশরথের। সশরীরে এসে সেই পিণ্ডগ্রহণ করেন রাজা।

পদ্মপুরাণের মতে, গঙ্গাকে মা আর সমস্ত তীর্থের গুরু বলা হয়েছে পুষ্কর এবং প্রযাগকে। একইসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে, বিশ্বসৃষ্টির আরম্ভ হয় এই তীর্থেই। সৃষ্টির মানসে এই তীর্থে যজ্ঞ করেন ব্রহ্মা। পৃথিবীতে ব্রহ্মার মন্দির ছিল মোট ১০৮টি। সবই লুপ্ত হয়ে যায় কালের নিয়মে। বর্তমানে ভারতে ব্রহ্মার মন্দির আছে একটি—এই পুষ্করে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের ১৪শ অধ্যায়ের ২৭ থেকে ৩১ শ্লোকে বলা হয়েছে, "যেখানে গঙ্গা প্রভৃতি পুরাণ বিখ্যাত নদী, পুষ্করাদি সরোবর ও সাধুসেবিত পবিত্র কুরুক্ষেত্র, গয়া, প্রয়াগ, পুলহমুনির আশ্রম, নৈমিষারণ্য, ফল্গু নদী, সেতুবন্ধ, প্রভাসতীর্থ, কুশস্থলী, দ্বারকা, কাশী, মথুরা, পম্পা ও বিন্দু সরোবর বিদ্যমান সেই দেশই পুণ্যতম দেশ বলে জানবে।"

পুষ্করকে ব্রহ্মার নিবাসস্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে মহাভারতে বনপর্বে। রাজা যুধিষ্ঠিরের তীর্থভ্রমণ প্রসঙ্গে পাণ্ডবগণের পুরোহিত ধৌম্যমুনি উপদেশ দেন, "সিন্ধুদেশ দর্শনের পর যেন পুষ্করতীর্থে যান।"

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে, মহর্ষি ব্যাসদেব পুষ্করতীর্থে তপস্যা করেন এবং সিদ্ধিলাভ করে হন কবিশ্বর। পরে বেদবিভাগ এবং রচনা করেন অষ্টাদশ পুরাণ। দেবগুরু বৃহস্পতি এই তীর্থে তপস্যা করে হন দেবগুরু। দেবর্ষি নারদও এসেছিলেন এই পুষ্কর তীর্থে।

মধ্যদেশের রাজা এই তীর্থে তপস্যা করে লাভ করেছিলেন সাবিত্রী ও সত্যবানকে। ধ্রুবপুত্র উৎকলও রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করেন পুষ্করে। একদা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও এসেছিলেন এই পবিত্র তীর্থে।

একদা অর্জুনও বাস করেছিলেন এই পুষ্করে। মহাভারতে সুভদ্রাহরণ পর্বাধ্যায়, আদিপর্বে আছে, "যাদবগণ কৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে অর্জুনকে ফিরিয়ে আনলেন, তিনি সুভদ্রাকে বিবাহ করে এক বৎসর দ্বারকায় রইলেন, তারপর বনবাসের অবশিষ্ট কাল পুষ্কর তীর্থে যাপন করলেন। বার বৎসর পূর্ণ হলে অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে গেলেন।" প্রবাদ আছে, বদরীনারায়ণ, রামেশ্বর, পুরীতে জগন্নাথ, দ্বারকাদর্শন এবং পুষ্করে স্নান করলে মানুষের মুক্তিলাভ হয়।

দেবী ভাগবতের মতে, দেবী পুরুহোতা পুষ্কর তীর্থে বিরাজমানা। পীঠস্থানের শাস্ত্রীয় নাম—দেবী গায়ত্রী এবং ভৈরব সর্বানন্দ। সপ্তম স্কন্ধের ত্রিংশ অধ্যায়ে পুষ্কর হ্রদের দক্ষিণকূলে গায়ত্রী পাহাড়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা, "গায়ত্র্যাশ্চ পরং স্থানং শ্রীমৎ পুষ্করিণীতীরম্।' ওই পাহাড়ে দেবীর একটি পীঠস্থান আছে। কথিত আছে, বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত হয়ে দেবীর মনিবন্ধ বা করগ্রন্থি পড়েছিল পুষ্কর ক্ষেত্রের গায়ত্রী পাহাড়ে।

পুষ্কর তীর্থের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে রাজা যুধিষ্ঠিরকে মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ বলেছিলেন, "রাজা! মনোযোগী হইয়া শ্রবণ করুন—যেমন বুদ্ধিমান্ ভীষ্ম পুলস্ত্যের নিকট এই সকল শ্রবণ করিয়াছিলেন" ॥

"মহারাজ। পূর্বে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ও মহাবীর ভীষ্ম গঙ্গাতীরে দেব, দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণসেবিত পবিত্র এবং উৎপাতশূন্য গঙ্গাদ্বারে পিতৃলোকের সেবায় ব্যাপৃত হইয়া মুনিগণের সহিত বাস করিয়াছিলেন" ॥

ভীষ্ম বলিলেন, "ভগবন্! তীর্থধর্ম্মবিষয়ে আমার কোন কোন সন্দেহ আছে, আপনি তাহার পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে সমাধান করুন, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি ॥

দেবতুল্য তপোধন! যে লোক তীর্থসেবার উদ্দেশ্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, তাহার কি ফল হয়, তাহা আপনি আমার নিকট বলুন" ॥

পুলস্ত্য বলিলেন, "ভাল, ঋষিদিগেরও যাহা পরম আদরণীয়, তাহা আমি তোমার নিকট বলিব। বৎস! তীর্থকার্যে যে ফল হয়, তাহা তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর ॥

যাহার হস্তযুগল চরণযুগল,ও মন অত্যন্ত সংযত থাকে এবং বিদ্যা, তপস্যা ও কীর্ত্তি থাকে, সেই লোকই তীর্থের ফল লাভ করে ॥

যে লোক কোন প্রকার প্রতিগ্রহ করে না, যে কোন বস্তু দ্বারা সন্তুষ্ট হয় এবং অহংকারশূন্য থাকে, সেই লোকই তীর্থের ফল লাভ করে ॥

যে লোকের কপটতা বা অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা থাকে না, লঘু আহার করে, জিতেন্দ্রিয় হয় এবং সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত থাকে, সেই লোকই তীর্থের ফল লাভ করে ॥

এবং রাজশ্রেষ্ঠ! যে লোক ক্রোধশূন্য, সত্যপরায়ণ, দৃঢ়ভাবে ব্রতনিষ্ঠ এবং সকল প্রাণীর প্রতিই নিজের মত ব্যবহার করে, সেই লোকই তীর্থের ফল লাভ করে ॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই পুণ্যজনক তীর্থপর্যটন যজ্ঞ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট এবং ঋষিদের নিকটও পরম আদরণীয় ॥

আবার তীর্থগমনে যে ফল পাওয়া যায়, প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত অগ্নিষ্টোমপ্রভৃতি যজ্ঞ করিয়াও সে ফল পাওয়া যায় না ॥

মনুষ্যলোকে মহাদেবের তীর্থ ত্রিভুবনবিখ্যাত পুষ্করতীর্থে যাইয়া মানুষ মহাদেবের তুল্য হয় ॥

কারণ, মহামতি কুরুনন্দন! পুষ্করতীর্থে তিন বেলায়ই শাস্ত্রোক্ত দশসহস্রকোটি তীর্থ সন্নিহিত থাকে ॥

এবং আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, অন্যান্য দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরাগণ সর্ব্বদাই পুষ্করতীর্থে সন্নিহিত থাকেন ॥

মহারাজ! দেবগণ, দৈত্যগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ যে পুষ্করতীর্থে তপস্যা করিয়া অলৌকিক শক্তিশালী ও মহাপুণ্যশালী হইয়াছেন ॥

যে মনস্বী মনে মনেও পুষ্করতীর্থে যাইতে ইচ্ছা করে, তাহারও সকল পাপ নষ্ট হয় এবং সে স্বর্গে পূজিত হয় ॥

মহাত্মন্! ভগবান্ পদ্মাসন ব্রহ্মা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সর্বদাই এই পুষ্করতীর্থে বাস করিতেন ॥

এবং পূর্ব্বকালে ঋষিগণের সহিত দেবগণ এই পুষ্করতীর্থেই মহাপুণ্যশালী হইয়া পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ॥

অতএব যে লোক পিতৃগণ ও দেবগণের পূজায় ব্যাপৃত থাকিয়া সেই পুষ্করতীর্থে স্নান করে, সে—অশ্বমেধযজ্ঞের ফল পায় এবং ব্রহ্মলোকে পূজিত হয় ॥

ভীষ্ম! যে লোক পুষ্করবনে থাকিয়া একটিমাত্র ব্রাহ্মণকেও ভোজন করায়, সে লোক সেই কার্য্যদ্বারাই ইহলোক ও পরলোকে আনন্দ লাভ করে ॥

ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কিংবা অন্য যে কোন জাতি শিবের তীর্থ পুষ্করে স্নান করিয়া আর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে না ॥

বিশেষতঃ, যে লোক কার্ত্তিকমাসের পূর্ণিমাতে পুষ্করতীর্থে গমন করে, সে লোক ব্রহ্মলোকে অক্ষয় বন্ধুজন লাভ করে ॥

ভরতনন্দন! যে লোক প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে কৃতাঞ্জলি হইয়া পুষ্করতীর্থ স্মরণ করে, তাহার সমস্ত তীর্থেই স্নান করার ফল হয় ॥

স্ত্রীলোকের বা পুরুষের জন্ম হইতে যে পাপ সঞ্চিত হয়, পুষ্করে স্নান করিবামাত্র তাহাদের সে সমস্ত পাপই নষ্ট হয় ॥

ভীষ্ম! নারায়ণ যেমন সমস্ত দেবতার আদি, পুষ্করও তেমনই সমস্ত তীর্থের আদি, ইহা মুনিরা বলিয়া থাকেন ॥

মানুষ—পবিত্র ও একাহারাদি নিয়মযুক্ত হইয়া বার বৎসর পুষ্করতীর্থে বাস করিয়া সমস্ত যজ্ঞের ফল লাভ করে এবং ব্রহ্মলোকে গমন করে ॥

যে লোক পূর্ণ একশত বৎসর পর্যন্ত অগ্নিহোত্রযাগ করে কিংবা একমাত্র কার্ত্তিকমাসের

পূর্ণিমাতে পুষ্করতীর্থে বাস করে, সেই উভয় কার্য্যেরই সমান ফল হয় ॥

পুষ্করে গমন করা দুষ্কর, পুষ্করে তপস্যা করা দুষ্কর, পুষ্করে দান করা দুষ্কর, আর পুষ্করে বাস করা অতিদুষ্কর ॥

সত্যযুগে সকল তীর্থই পুণ্যজনক, ত্রেতাযুগে পুষ্করতীর্থ পুণ্যজনক, দ্বাপরে কুরুক্ষেত্রতীর্থ পুণ্যজনক, আর কলিযুগে গঙ্গা পুণ্যজনক ॥

পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, গঙ্গা এবং প্রয়াগাদি মধ্যবর্তী তীর্থে স্নান করিয়া মানুষ ঊর্ধ্বে সাতপুরুষ এবং নিম্নে সাতপুরুষ উদ্ধার করে ॥ ( মহাভারত, বনপর্ব, সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ, পৃষ্ঠা-৬৮৯—৭০০ )

'পুষ্কর' নামে ব্রহ্মার একটি পবিত্র সরোবর আছে ; তাহার তীরে বনবাসী সিদ্ধ ঋষিগণের প্রিয় আশ্রম রহিয়াছে ॥

যে মনস্বী মনে মনে পুষ্করতীর্থ কামনাও করে, তাহার সমস্ত পাপ নষ্ট হয় এবং সে —স্বর্গলোকে আমোদ করে ॥ ( মহাভারত, বনপর্ব, চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ, পৃষ্ঠা-৮২৭ )

এ-ছাড়াও বেদ, বায়ুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, বামন ও ভবিষ্যপুরাণ, নৃসিংহপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি পুরাণাদিতেও আছে পুষ্করতীর্থের মাহাত্ম্যকথা।

## অতীত পুষ্কর ও ঐতিহাসিক মতামত

তীর্থ পুষ্কর কত কালের প্রাচীন তার সঠিক কোন নির্দেশ পাওয়া যায়নি আজও। তবে এই তীর্থ যে মহাভারতীয় যুগে ছিল, তার উল্লেখ আছে মহাভারতেই। সেই হিসাবে ধরলে পুষ্করের আনুমানিক বয়েস প্রায় ৪৪৩৮ বছরেরও বেশী।

কালের নিয়মে পুষ্কর বিস্মৃত হয়েছে বহুবার আবার সংস্কারও হয়েছে ওই একই নিয়মে—বহুবার। তবে এই তীর্থটি যে ভারতের অন্যান্য তীর্থের মধ্যে অন্যতম প্রাচীন তীর্থ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পুষ্করে পাওয়া গেছে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের কার্যাপন মুদ্রা ( Punch marked coin )। এটি ভারতের প্রাচীনতম মুদ্রা বলে জানা যায়। তাছাড়াও এখানে পাওয়া গেছে ব্যাকট্রিয়ান ( Bactrian ) গ্রীক ও গুপ্ত রৌপ্যমুদ্রা। এতে প্রমাণিত হয় খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতেও ছিল পুষ্করের পরিচিতি। এছাড়াও পাওয়া গেছে পৃথ্বীরাজের তাম্রমুদ্রা এবং মোঘল পাঠান রাজ্যের মুদ্রা।

ভারতের বিভিন্ন স্থানের শিলালিপি থেকে ঐতিহাসিকেরা জানতে পেরেছেন, বৌদ্ধদের একটি প্রধান তীর্থ ছিল এই পুষ্কর। মধ্যভারতের ভূপালের অন্তর্গত সাঁচিতে অবস্থিত বৌদ্ধস্তূপে পাওয়া চারটি শিলালিপিতে উল্লিখিত হয়েছে—ভিক্ষু অইদিন নাগররক্ষিত, আর্য্য বুদ্ধরক্ষিত, হিমগিরি, পোষাক এবং ভিক্ষুণী ইসিদাতা অনেক দান করেছেন পুষ্করবাসীদের। এই শিলালিপিগুলি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর। এর থেকে আর জানা গেছে, পুষ্কর খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতেও ছিল একটি জনবহুল এবং প্রসিদ্ধ তীর্থশহর।

একদা এই পুষ্কর ছিল জৈনদেরও প্রধান তীর্থ। জৈনরা এই তীর্থকে বলতো কোকন তীর্থ। বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের সঙ্গে পুষ্করও এক সময় পরিণত হয় ধর্ম-সংস্কারের কেন্দ্ররূপে। পরে বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তির সঙ্গে পুষ্করেরও প্রসিদ্ধি লুপ্ত হয়, বিস্মৃতও হয়।

পরবর্তীকালে এই তীর্থের সংস্কার করেন জৈন রাজা পদ্মসেন। পুষ্করে শহর এবং গৃহনির্মাণও করেন এক লক্ষ। পদ্মসেন কর্তৃক পুষ্করে পত্তন করা শহরটি ছিল খুবই সমৃদ্ধিশালী। তখন এই শহরের পাশ দিয়েই প্রবাহিত ছিল তিনটি নদী—নন্দা, সরস্বতী এবং প্রাচী।

পুষ্করে অবস্থিত খুট-মন্দিরের কাছে পাওয়া সংস্কৃত ভাষায় লেখা একটি শিলালিপি থেকে জানা গেছে একটি মর্মান্তিক কাহিনীর কথা। প্রথম শতাব্দীতে ব্যাস বিক্রমের কন্যা এবং তাঁর স্বামী গোবিন্দ ব্রাহ্মণ একইসঙ্গে প্রাণত্যাগ করেন জ্বলন্ত চিতায়। বর্তমানে মূল্যবান সেই শিলালিপিটি গেছে লুপ্ত হয়ে।

পুষ্করে পাওয়া যায় আরও একটি শিলালিপি—৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের। তখন রাজা দুর্গারাজের সময়কাল। প্রায় ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের আজমীরের চৌহান রাজা বাক্‌পতি রায়ের সময়ের একটি শিলালিপিও পাওয়া গেছে পুষ্করে। এই দুটি শিলালিপিই যত্নের সঙ্গে সংরক্ষিত আছে আজমীর রাজপুতানা মিউজিয়ামে। পুষ্করে রাজা বাক্‌পতির একটি শিবমন্দির নির্মাণের কথাও জানা যায় এই শিলালিপি থেকে।

জয়পুরের শেখাবতীতে আছে হর্ষনাথ মন্দির। সেখানে পাওয়া গেছে ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে লেখা একটি শিলালিপি। তাতে উল্লিখিত হয়েছে, চৌহান রাজা সিংহরাজ একদা পুষ্করে স্নান সেরে পরে হর্ষনাথ মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য চারটি গ্রামের রাজস্ব দান করেন।

দ্বাদশ শতাব্দীতে লেখা 'পৃথ্বীরাজ বিজয়' নামক গ্রন্থে আছে পুষ্কর তীর্থের মাহাত্ম্য এবং বর্তমানে লুপ্ত প্রাচীন অজগন্ধা মহাদেব মন্দিরের মনোজ্ঞ বর্ণনা।

পুষ্করে অষ্টোত্তর শতলিঙ্গ মহাদেব মন্দিরে সতীস্তম্ভে লেখা একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। সেটি ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দের।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির নাসিক শহরের কাছেই রয়েছে ত্রিরশ্মি পাহাড়। এই পাহাড়ের পাণ্ডুলেনা গুহাতে ১২৫ খ্রীষ্টাব্দে লেখা একটি শিলালিপিতে আছে, শক-বংশের দিনিকের পুত্র এবং ক্ষত্রপ বংশের রাজা নহপানের জামাতা উশবদত্ত একদা আসেন রাজস্থানে। একটি ঘাট নির্মাণ করেন বানা নদীর তীরে। পরে তিন হাজার গাভী এবং একটি গ্রাম দান করেন পুষ্করতীর্থে। এ-থেকেও বোঝা যায় তীর্থ হিসেবে পুষ্করের প্রসিদ্ধি ছিল দ্বিতীয় শতাব্দীতেও।

দশম শতাব্দীতে রুদ্রাদিত্য নামে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ একটি বিষ্ণু মন্দির নির্মাণ করেছিলেন এই পুষ্করে। তখন চৌহান বংশের রাজা ছিলেন বাক্‌পতি রায়।

১১০৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্ভার বংশের প্রথম রাজা পৃথ্বীরাজ কিছু চালুক্যদের হত্যা করেন, যারা এসেছিলেন পুষ্করে বসবাসকারী ব্রাহ্মণদের গৃহে লুণ্ঠনের জন্যে।

'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, জাহাঙ্গীর আজমীরে থাকাকালীন পুষ্কর হ্রদের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে পুষ্করে এসেছিলেন পনেরো বার।

১৪২৮ খ্রীষ্টাব্দে চিতোরের রাজা পরাজিত করেন মোকালা নাগুরের নবাবকে। এরপর পুষ্কর এবং তার পারিপার্শ্বিক অঞ্চল হয়েছিল তাঁর রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত। সুপ্রাচীন হিন্দুতীর্থ এই পুষ্করের পূর্বদিকে সারি সারি পর্বতমালা, পশ্চিমে সাবিত্রী পাহাড়, উত্তরে পাপমোচন আর দক্ষিণে রয়েছে নাগপাহাড়। এদের কোলেই হাজার হাজার বছর ধরে পরম নিশ্চিন্তে বসে আছে পুষ্কর—তার কাছে আসা অসংখ্য দেবতা, ঋষি এবং মানুষের আনাগোনার সাক্ষী হয়ে। তীর্থ পুষ্করকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক, পর্যটক এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ মনীষীরা দেখেছেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। যেমন,

ডাঃ আর. এইচ. আর্ভিন সাহেব বলেন, 'শহর পুষ্কর চিত্রের মতোই মনোহর। হ্রদটি জল পায় নাগপাহাড় থেকে। এই হ্রদটিই পুষ্কর তীর্থ।' ( General and Medical Topography of Ajmer by Dr. R. H. Irvine )

পুষ্কর সরোবর দেখে মুগ্ধ কর্ণেল জেমস্ টড্ সাহেব বলেছিলেন, 'ভারতের পবিত্রতম সরোবর পুষ্কর। একমাত্র মানস সরোবর-এর সমতুল্য।' ( Tod's Rajasthan, Personal Narrative. )

সি. সি. ওয়াট্সন বলেন, 'এত পবিত্র তীর্থ এই পুষ্কর যে, প্রাচীন নিয়মানুসারে এই তীর্থের সীমানার মধ্যে জীব হত্যা করাই নিষেধ।' ( C. C. Watsons Gazetteer of Rajputna Vol. II. )

পুষ্কর তীর্থ দর্শন করেন বিশপ হিবার—১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে। তখন পুষ্কর ছিল আঙুরের জন্য বিখ্যাত। তিনি বলেন, 'পুষ্কর ফল এবং ফুলের বাগানে পূর্ণ। এখানকার আঙুর ভারতের শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম এবং পারস্যের শিরাজের আঙুরের মতো উত্তম ও সুস্বাদু।' ( Bishop Hebers' Narrative. Vol. I p. 5. )

কর্ণেল টড্ সাহেবের মতে, 'পুষ্করের পূর্বদিকে নাগ পাহাড়। এই পাহাড় আরাবল্লীর অংশবিশেষ। অসংখ্য ঝরণা ও বহু রমণীয় স্থান আছে নাগ পাহাড়ে। এই পাহাড়ে অনেক আশ্রম এবং গুহা দেখা যায়। প্রাচীনকাল থেকে হিন্দুযোগীরা বাস করতেন এখানে এবং এখনও থাকেন অনেক সাধু। নাগ পাহাড়ের পশ্চিম পাশেও আছে অনেক সুন্দর মনোরম স্থান। বনরাজিশোভিত অগস্ত্যমুনির আশ্রম আছে এখানে। স্থানটি জনশূন্য।' ( Annals and Antiquities of Rajasthan by Col. Tod. Vol. I. p. 776. )

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী পুষ্কর তীর্থ দর্শনকালে কর্ণেল ব্রাফটন্ সাহেব অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন পাণ্ডাদের ব্যবহারে। তাই তিনি লিখেছেন, 'পুষ্করে হিন্দু পাণ্ডাদের সৌজন্য ও ভদ্রতা হৃদয়স্পর্শী। কিন্তু আজমীরের দর্গা দেখার সময় মুসলমান পুরোহিতের অভদ্রতা, চিৎকার ও অহংকারে ক্ষুব্ধ হয়েছি।' ( Letters from a Mahratta Camp by Col. Broughton. p. 259 )

মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী' গ্রন্থে লিখেছেন, তিনি পুষ্কর হ্রদটির পরিধি মেপে দেখেছিলেন যে, এর পরিধি প্রায় তিন মাইল। হ্রদটি গভীর এবং তাতে কুমীর আছে অসংখ্য। স্নানার্থীযাত্রীরা কখনও কখনও কুমীর কর্তৃক আক্রান্ত হন। ( **Tuzaki Jahangir By Rogers, Vol. I. p. 255** )
তৎকালীন দেওয়ান বাহাদুর হরবিলাস সর্দা বলেন, 'কালীদাস বর্ণিত কন্বমুনির আশ্রম ( যেখানে শকুন্তলা জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রতিপালিত হন ) অবস্থিত ছিল এই নাগ পাহাড়ে। কালীদাসের বর্ণনার সঙ্গে এই স্থানের সঙ্গে একেবারে হুবহু মিল আছে।' ( **Ajmer Historical and Descriptive. p. 414, By Diwan Bahadur Harbilas Sarda.** )

ছোট্ট পাহাড়ী শহর এই পুষ্কর। এর সরোবরের তীর আর আশপাশে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য মন্দির। শোনা যায়, প্রায় চারশো মন্দির আছে এখানে। তার মধ্যে কিছু মন্দির আছে বেশ প্রাচীন। সংস্কারও হয়েছে বহুবার। আর কিছু আছে নতুন মন্দির। বিভিন্ন রাজার রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছে এগুলি আবার সংস্কারও করেছেন অনেকে। এইসব মন্দির আর তীর্থদর্শনে প্রতিদিন আসেন অসংখ্য তীর্থযাত্রী। দর্শন করেন তীর্থদেবতাকে, হারিয়ে যান প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্তরালে। পুষ্করে ব্রহ্মার মন্দিরই প্রথম—সেইজন্যেই বিখ্যাত। তাই ব্রহ্মপুষ্কর নামেও এর প্রসিদ্ধি।
সিন্ধির ধর্মশালার পাশ দিয়েই চলে গেছে বাঁধানো পীচের রাস্তা। ডানদিকে ব্রহ্মার মন্দির। বাঁ-পাশে ধর্মশালাকে রেখে এগিয়ে চললাম। দুপাশেই সারি সারি অসংখ্য দোকান। চলেছে অগণিত তীর্থযাত্রী, ভ্রমণকারী। তাদের মতোই চলেছি আমিও। আমার সঙ্গীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে কে কোথায়—জানি না। বহু বিদেশী পর্যটকও এসেছেন এখানে। তাঁরা কোন মন্দিরে প্রবেশ করেন না—করছেনও না। হিন্দুমন্দিরে তাঁদের প্রবেশ নিষেধ যে। ইতস্তত ঘোরাঘুরি আর পুষ্কর সরোবর দেখেই ফিরে যাচ্ছেন তাঁরা।
প্রায় মিনিট দশেক হাঁটার পর এলাম ব্রহ্মা ঘাটে। এখানে বসেছে ছোট্ট একটা সব্জীর বাজার। সারা পুষ্করে কোথাও মাছ মাংস আর ডিম বিক্রি হয় না। এই ঘাটের বিপরীত দিকেই চলে গেছে একটা রাস্তা। কিছুটা এগোতেই এলো রঙ্গনাথ মন্দির। মন্দিরটি শহর পুষ্করের মাঝখানেই। বড় তোরণদ্বার পেরোতেই পড়লো পাথরে বাঁধানো বিশাল চত্বর। সামনেই দারুণ সুন্দর মন্দির। বেশ কয়েকটি চূড়াশোভিত মন্দিরে রয়েছে শিল্পের ছোঁয়া। মন্দিরমধ্যে রঙ্গনাথজী—শ্রীকৃষ্ণ। কুচকুচে কালো পাথরের। দাঁড়ানো মূর্তি। পাশেই বলরাম, মহালক্ষ্মী আর ছোট ছোট অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি। ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে রয়েছেন রামানুজাচার্য।
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এই মন্দিরটির পরিচালক দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণগণ। বিশাল এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শেঠ পুরাণমল। তিনি এটি নির্মাণ করেন ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। হায়দ্রাবাদের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী পুরাণমল আরও দুটি মন্দির নির্মাণ করেন

এই তীর্থ পুষ্করে।

রঙ্গনাথ মন্দিরের চূড়াগুলি উত্তরভারতের মন্দিরের মতো আর দাক্ষিণাত্যের মতো গোপুরম। মন্দিরের সামনেই রয়েছে বৃন্দাবনের শেঠের মন্দিরের মতো সোনার তালগাছ।

রঙ্গনাথ মন্দির থেকে বেরিয়ে সোজা এলাম ব্রহ্মাঘাটে। এর বিপরীত দিকে চলে গেছে আরও একটি রাস্তা। গলির মতো তবে চওড়া। কিছুটা এগোতেই পেলাম 'শ্রী বরাহ ভগবান কা প্রাচীন মন্দির'। মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বারেই লেখা আছে এ-কথা। প্রায় দেড় ফুট উচ্চতায় এই মন্দিরটি অবস্থিত। কিছু সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলাম মন্দিরে। বড় একটা তোরণদ্বার পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই শ্বেত পাথরে বাঁধানো চত্বরে দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট একটা মন্দির। ভিতরে সাদা পাথরের বিষ্ণুর বরাহ অবতার মূর্তির সঙ্গে রয়েছে গরুড়দেব। মুখখানা বরাহের। দেহটা মানুষের। চারটি হাতে রয়েছে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম।

পুষ্করে বরাহ ভগবানের এই মন্দিরটিও খুব প্রাচীন। এটি নির্মাণ করেন অর্ণরাজ। নির্মাণকাল ১১২৩—১১৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী' গ্রন্থে লিখেছেন, চিতোরের রাণা প্রতাপের ভ্রাতা সাগর এই মন্দিরটি সংস্কার ও মেরামত করেন সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে। রাজা হাম্বির আবু থেকে আজমীর হয়ে পুষ্করে এসে বরাহ ভগবানের পুজো দিয়েছিলেন এই মন্দিরে। বুঁদির রাজা ছত্রপাল একটি বর্শা রেখে যান এখানে—যা আজও রক্ষিত আছে সযত্নে।

১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরও এসেছিলেন এই হিন্দুতীর্থ পুষ্করে। অন্য ধর্মের প্রতি বিরূপ ছিলেন বলে তিনি আদেশ দেন মন্দির থেকে বরাহমূর্তি ভেঙে ফেলার। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বলাভের অষ্টম বর্ষেই তিনি এসেছিলেন পুষ্করে। তাঁর আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী'তে ( অনুবাদ সুধা বসু ) এক জায়গায় তিনি লিখেছেন,

'৭ই আজর আমি পুষ্কর সরোবর দেখতে ও তার আশে-পাশে শিকার করতে গিয়েছিলাম। এই জায়গাটি হিন্দুদের পূজা ও প্রার্থনার একটি সুপ্রতিষ্ঠিত স্থান। সেই পূজা-অর্চনার নিখুঁত রূপ সম্বন্ধে তাঁরা এমন বর্ণনা দান করেন যা বোধগম্য ও বিশ্বাসযোগ্য নয় একেবারেই। ধর্মস্থানটি আজমীর শহর থেকে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত। সরোবর তীরে আমি দু-তিনদিন জলকুক্কুট শিকার করে ফিরে আসি। তড়াগটির চারদিকে অনেক নতুন ও পুরাতন মন্দির আছে। নাস্তিক ও অবিশ্বাসীদের ভাষায় এগুলিকে বলা হয় দেওহর। সেই মন্দিরশ্রেণীর মধ্যে রাণা শঙ্কর খুব জাঁকালো রূপের একটি দেওহর নির্মাণ করিয়েছিলেন। ইনি ছিলেন বিদ্রোহী রাণা অমর সিংহের খুল্লতাত এবং আমার সাম্রাজ্যের উচ্চপর্যায়ের সম্ভ্রান্ত আমিরদের একজন। মন্দিরটির জন্য ব্যয় হয়েছিল এক লক্ষ টাকা। আমি সেটি দেখতে গিয়েছিলাম। ওখানে কালো পাথরের একখানি মূর্তি আছে। তার

মাথাটি শূকরের মতো, আর দেহের বাকী অংশ মনুষ্যাকৃতি। হিন্দুদের এই অর্থহীন ধর্মের একটি বিশিষ্টতা হচ্ছে এই যে কোন সময় বিশ্বনিয়ন্তা যেন বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে এই রকম অদ্ভুত রূপাকৃতি ধারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কাজেই হিন্দুরা এই জাতীয় মূর্তিকে খুব প্রিয় মনে করেন এবং পূজা ও অর্ঘ্য দান করে তৃপ্তি লাভ করেন। আমি কিন্তু হুকুম দিলাম যে সেই বীভৎস মূর্তিটিকে ভেঙে পুকুরের জলে নিক্ষেপ করা হোক্।

মন্দিরটি দেখলাম। তারপরে পাহাড়ের চূড়ায় নজরে পড়লো একটি শ্বেত গম্বুজ। চারদিক থেকে ওখানে খুব লোক আসছিল। আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম যে সেখানে জনৈক যোগী পুরুষ বাস করেন। সাধারণ সরল প্রকৃতির লোকেরা তাঁর কাছে গেলে তিনি সকলকে এক মুঠো করে আটা বা ময়দা দিয়ে থাকেন। আর তাদের তা মুখে পুরে দিয়ে একটি জন্তুর ডাক অনুকরণ করে চিৎকার করতে হয়। অনেক সময় সেই নির্বোধ লোকগুলি নিজেদের মধ্যে মারামারিও করে। আর তা চলে পাশবিক ধরণে। ওদের ধারণা তাতে সব পাপ-তাপ দূর হয়ে যায়। আমার হুকুমে স্থানটি ভেঙেচুরে যোগীকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো। মন্দিরের মধ্যে যে মূর্তি ছিল তাও ধ্বংস করা হয়েছিল। এদের আর একটা ধারণা যে পুষ্করিণীটি অতল। অনুসন্ধান করে জানা গেল যে কোথাও তা চব্বিশ হাতের বেশী গভীর নয়। আমি ওটির আয়তনও পরিমাপ করিয়েছিলাম। তা দেড় ক্রোশ মতো।"

অলবেরুণী ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই তেরো বছর কাটিয়েছিলেন ভারতে। হিন্দু জীবনের ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-আচরণ আর বিধি-বিধানের অধিকাংশ তথ্যই তিনি নিয়েছেন শাস্ত্রীয় পুঁথিপুরাণ থেকে। পুষ্কর ভ্রমণ তাঁর অভিজ্ঞতার অংশবিশেষ। 'অলবেরুণীর দেখা ভারত' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন,

"অনুরূপ আর একটি স্থান হচ্ছে পুকর (পুষ্কর)। এটি সম্বন্ধে এরকম কাহিনী প্রচলিত আছে, ব্রহ্মা একদিন সেখানে যজ্ঞ করছিলেন। সে সময়ে ঐ যজ্ঞাগ্নি থেকে এক শূকর আবির্ভূত হলো। সুতরাং তারা সেখানে তার মূর্তিকে শূকরের রূপ দিয়েছে। এখানে, শহরের বাইরে তিনটি স্নানের ঘাট নির্মাণ করেছে তারা। এই স্থানকে বিশেষ পুণ্যস্থলীরূপে মনে করা হয় ও এখানে পূজো-অর্চনা করা হয়।"

পরে অবশ্য মন্দিরটি ভেঙে দিয়েছিলেন সম্রাট ঔরঙ্গজেব। আবার এটি পুনর্নির্মাণ করেন জয়পুরের মহারাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। একইসঙ্গে স্থাপন করেন বিষ্ণুর বরাহ অবতার বিগ্রহটি। ১৫০ ফুট উঁচু ছিল মন্দিরটি—ছিল অপূর্ব সুন্দর কারুকার্যখচিত। ঔরঙ্গজেব ধ্বংস করার পর অবশিষ্ট ছিল মাত্র কুড়ি ফুট। পরবর্তীকালে তার উপর থেকেই নির্মিত হয় নতুন করে। বরাহ মন্দিরের শিলালিপি থেকে জানা গেছে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মূর্তিটি স্থাপিত হয় ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে।

পুষ্কর সরোবরের গোঘাটের কাছে কেশোরায়ের প্রাচীন মন্দিরটিও রক্ষা পায়নি ঔরঙ্গজেবের হাত থেকে। মন্দিরটি ধ্বংস করে সেখানে নির্মাণ করেন মসজিদ।

এই মন্দিরগুলি ছাড়াও পুষ্কর সরোবরকে কেন্দ্র করে আরও বেশ কয়েকটি প্রসিদ্ধ মন্দির আছে এখানে। মন্দিরগুলি একটি থেকে অপরটির দূরত্ব সামান্যই। যেমন, আত্মেশ্বর মহাদেবের মন্দিরটি পুষ্করের অন্যান্য মন্দিরগুলির মধ্যে বেশী প্রাচীন। মন্দিরটি অটোমটেশ্বর মন্দির নামেও প্রসিদ্ধ। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরের জীর্ণ উদ্ধার করেন মারাঠা শাসক ওমানজীরাও। তখন তিনি ছিলেন আজমীরের সুবেদার। জানা যায়, জীর্ণ মন্দির সংস্কারের পূর্বে মন্দিরের নীচের যে অংশটি পাওয়া গেছে সেটি চৌহান রাজাদের আমলের। কথিত আছে, প্রাচীনকালে এখানে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন ব্রহ্মা নিজে। বর্তমানে শংকর ভগবান প্রতিষ্ঠিত আছেন গর্ভমন্দিরে।

পুষ্করের পূর্বদিকে অবস্থিত রামবৈকুণ্ঠ মন্দিরটি শুধু প্রাচীন নয়, প্রসিদ্ধও বটে। এটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত শ্রী সম্প্রদায়ের মন্দির। একাদশ শতাব্দীতে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন আচার্য রামানুজ। পরবর্তীকালে ভিউয়ানী নিবাসী শেঠ বাঙ্গর প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা খরচ করে মন্দিরটি আরও আকর্ষণীয়, আরও সুন্দর করে সাজিয়ে তোলেন। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ বৈকুণ্ঠনাথের সঙ্গে আছেন লক্ষ্মীদেবী। প্রতিবছর শ্রাবণ মাসে ঝুলন উৎসব পালিত হয় মহাসমারোহে। চৈত্র মাসে বৈকুণ্ঠনাথের ঝাঁকিদর্শন এবং অন্যান্য লীলা প্রদর্শনী হয় এই মন্দিরে। একটি সুউচ্চ গোপুরম আর বহুকালের প্রাচীন একটি গরুড় ধ্বজা আছে এখানে। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে লেখা ভিলশা (Bhilsa) শিলালিপি থেকে জানা গেছে, হেলিওডরাস (Heliodoros) নামে এক গ্রীক গ্রহণ করেছিলেন বৈষ্ণবধর্ম। তিনিই নির্মাণ করান এই গরুড় ধ্বজাটি।

সাবিত্রী পাহাড়ের উত্তরেই আছে পাপমোচিনী পাহাড়। এই পাহাড়ে রয়েছে পাপমোচিনী দেবীর মন্দির। এখানে প্রতিবছর বিশাল মেলা বসে ভাদ্র মাসে। প্রবাদ আছে, ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকেও মুক্ত হওয়া যায় এই দেবীর দর্শন করলে।

পুষ্কর সরোবরের পূর্বদিকেই আরাবল্লী পর্বতশ্রেণীর একটি অংশ নাগ পাহাড়। এই পাহাড়ের ঝরণা আর বর্ষার জলই এসে পড়ে পুষ্কর সরোবরে। জল নিকাশের কোন ব্যবস্থাই নেই এই সরোবরের, অথচ কি সুন্দর নির্মল জল।

এই নাগ পাহাড়ের পশ্চিম পাশেই রয়েছে অগস্ত্যমুনির আশ্রম। পুষ্কর থেকে দূরত্ব ২.কি. মি.। এখানে পাথরের উপর দুটি পায়ের ছাপ রয়েছে অগস্ত্যের। কথিত আছে, একদা এই পাহাড়ে বসে তপস্যা করেছিলেন অগস্ত্যমুনি। এই আশ্রমের কাছেই রয়েছে ভর্তৃহরি গুহা। তার পাশের গুহাটি বামদেবজীর। আরও একটু এগোলেই জমদগ্নি কুণ্ড। প্রতিবছর কার্তিক মাসে মেলা বসে এখানে।

জমদগ্নি কুণ্ডের একটু দূরেই বাগকুণ্ড সূর্যকুণ্ড গঙ্গাকুণ্ড গণেশকুণ্ড আর ব্রহ্মকুণ্ড —মোট কুণ্ড রয়েছে পাঁচটি। পঞ্চকুণ্ড নামেই এর প্রসিদ্ধি। পুণ্যার্থীরা স্নান

করেন এখানে। সিদ্ধগণেশের মন্দিরও আছে একটি। প্রবাদ আছে, অজ্ঞাতবাসকালে পঞ্চপান্ডবেরা এসেছিলেন পুষ্করের এই ক্ষেত্রটিতে।

পঞ্চকুন্ডের উত্তরে পাহাড়ের পাদদেশেই আছে গোমুখতীর্থ। এই কুন্ড থেকে সর্বদাই ঝরছে সাদা দুধের মতো জলধারা। এখানেও রয়েছে দুটি মন্দির। একটি দেবী অন্নপূর্ণা আর একটি ভীমাদেবীর মন্দির।

এগুলি ছাড়াও তীর্থ পুষ্করকে কেন্দ্র করে সুন্দর পাহাড়ী মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে আছে অজয় গন্ধেশ্বর মহাদেব মন্দির, বৈজনাথ, নন্দা প্রাচী আর সরস্বতী সঙ্গম, কালী মন্দির, গয়াকুন্ড, মার্কেন্ডেয় ঋষির আশ্রম, কপিল কূপ, সুপ্রদা কূপ, রূপতীর্থ, রুদ্রকুন্ড, চক্রতীর্থ, নাগকুন্ড এবং ঋষি পুলস্ত্যের আশ্রম।

যে কোন প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রে মূল মন্দিরকে কেন্দ্র করে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেমন অসংখ্য দর্শনীয় স্থান আর ছোট বড় মন্দির গড়ে ওঠে, তেমনভাবে এই পুষ্করও বাদ যায়নি সাধারণ নিয়ম থেকে। তবে এমন অনেক ভোজনকারী আছে, খেতে বসে মুখে যে তরকারী ভালো লাগে সেটা দিয়েই সব ভাত খেয়ে ওঠে। পাশে হাজার ব্যঞ্জন থাকলেও আমল দেয় না তাতে। অনেক সময় ছোঁয়ও না। আবার এমন অনেক ভোজনরসিকও আছে, কোনটাই বাদ দেয় না। সবই খায় তারিয়ে তারিয়ে। এমন ভোজনরসিকের মতো রয়েছে অসংখ্য পর্যটক, ভ্রমণপিয়াসীও।

## সাধুসঙ্গ—ঘৃণা আর দুঃখই যে সাধুর পাথেয়

বেশ কিছুটা পথ চলতে হয় বালির উপর দিয়ে, সাবিত্রী পাহাড়ে যেতে। এখনও বেলা তেমন বাড়েনি। বাড়লে বালিও গরম হয়, পথ চলতেও বেশ কষ্ট হয়। তাই ধর্মশালা থেকে বেরিয়েছি সকাল সকাল। পথ চলছি একাই। আমার মতো পথ চলছে আরও অনেক, যে যার ভাবে। আছে সব বয়েসের। তবে বেশী বয়সের যারা, তাদের অনেকেই চলেছেন ডান্ডিতে। বলা যায় কাঁধে চড়ে। উপায় কি! সারাজীবন সংসারের ঘানি ঠেলা এরা। সময় পায়নি। তাই শেষ বয়েসে কাঁধে চড়ে তীর্থ করা। চেহারা দেখে মনে হয়, এদের পয়সা আছে—বয়েস নেই।

ঘাটে যাওয়ার আগে ঘাটের পাথেয় সংগ্রহ করতে যারা আসেন, তাদের অনেকের সঙ্গেই কথা বলেছি বহু তীর্থে, যখন যেখানে সুযোগ হয়েছে। কর্ম ও সংসার জীবনে অবসরপ্রাপ্ত বিপত্নীক আর বৃদ্ধ 'ব্যাচেলার'—তাদের অনেকেই আসেন তীর্থ ভ্রমণে। 'একা একা আর ভাল লাগে না। নাতি নাতনি কিংবা ভাইপো ভাইঝিদের স্কুলে নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসার ডিউটিতে ধরেছে অরুচি। প্রায়ই ছেলে বউ নিয়ে, ভাই তার বউকে নিয়ে যাচ্ছে বেড়াতে। বাচ্চা সামলাতে হচ্ছে বুড়োকে। ওরা ফুর্তি করবে, আমি ঘরে বসে থাকবো পাহারাদার হয়ে, তার চেয়ে বরং বেরিয়ে পড়ি। পরপারের কাজ তো কিছু হবে। এদের ভ্রমণে সঙ্গী বউ নয়, সঙ্গী থাকে হার্ট, প্রেসার আর ডায়াবেটিসের প্যাকেট।

এদের মধ্যে আবার এমন কিছু আছে, সারাজীবন খেটেখুটে ছেলেদের দাঁড় করিয়ে

দিয়েছেন। মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন ভালো ঘরে। অভাব নেই। সারাজীবন সময়ও পাননি। অফিস, বউ, ছেলেমেয়েদের পিছনেই গেছে যৌবনটা। এখন অবসর জীবন। পাড়ার বুড়োদের সঙ্গে পাঁচ বাড়ীর পাঁচালীও আর ভালো লাগে না। তাই দিন কয়েকের জন্য রুচি পাল্টাতে বেরিয়ে পড়া। এখন এদেরও হয়তো কেউ চলেছেন এই সাবিত্রী-তীর্থ পথে।

অনেক বিধবা বুড়িও চলেছেন এ-পথে—চলেছেন এখন এমন অনেক সারা ভারতের—বিভিন্ন তীর্থপথে। এ্দের অনেককেই আফশোস করে বলতে শুনেছি, বাবা, শাস্তরের কথাই ঠিক। এত বছর ধরে সংসার করলাম। দেখলাম, কেউ কারও নয়। এসেছি একা, যেতেও হবে একা। আমি মনে মনে বলি, কথাটা ঠিক নয় ঠাকুমা। একা এসেছেন ঠিকই। কেউ কারও নয়—বেঠিক কথা। একাও যেতে হবে না। স্বামী নেই বলে দুঃখের কিছু নেই। পরপারে যাওয়ার সময় সঙ্গে যাবে আপনার বাত, হাঁটু আর কোমর ব্যথা। মনের ব্যথার চেয়েও এ-ব্যথা বড় বেশী ব্যথা। এ-ব্যথা নেই, এমন কোন বৃদ্ধা সধবা, বিধবা আমার অন্তত দেখা নেই। এই সঙ্গীকে নিয়েই এ-পথে চলেছেন অনেক বৃদ্ধা বিধবা।

অনেক জ্বালায় এদের অনেকের তীর্থে আসা। শেষ বয়েসে ভাবনা আসে পরপারের। হিন্দুর সমস্ত সম্প্রদায়ের নারীপুরুষ নির্বিশেষে। বিধবাদের অনেকে আসে—ভাবে, তীর্থ করলেই ঝুলি ভরে যাবে। তাই বেরিয়ে পড়া। এ-ভাবনা আসে পরোক্ষে। প্রত্যক্ষে সংসার আর বিষয় ভাবনা এদের পিছু ছাড়ে না অধিকাংশেরই। ছেলের বউ-এর সঙ্গে মন মতের মিল নেই। কেউ দেখতে পারে না কাউকে। তাই দুদিনের জন্য বেরিয়ে পড়া। দুটো দিনই শান্তি। ছেলেমেয়েরা সবাই দাঁড়িয়ে গেলেও একটা পারেনি। তার চিন্তা নিয়েই পথে বেরোনো। দ্বারকাধীশ যদি একটা গতি করে দেয়। কারও চিন্তা চলে মেয়েটা পার হয়নি। ঠাকুর, মেয়েটার একটা গতি করে দিও। এমন হাজার হাজার ভাবনা। ভ্রমণে পা চলে, মন আর সংসার চলে পিছে পিছে। এদিকে ঘরে বউমা ভাবে, বাঁচলাম বাবা, যে কদিন বাইরে থাকে বুড়ি, সে কদিনই শান্তি। বাড়ীতে এলে তো টিকতে দেবে না। এমনটাই দেখেছি অধিকাংশ বিধবা বুড়িদের কথায়, হাবভাবে। এদের অধিকাংশেরই ঈশ্বর চিন্তায় নয়, সাংসারিক তাড়নায় বেরিয়ে পড়া।

এবার বলি এদের পথে বেরানোর আগের কথা। পাড়া, বেপাড়া আর আত্মীয়-পরিজনদের কারও জানতে বাকি থাকে না, 'অ-দিদি, এবার দ্বারকায় চললুম। অনেক দিনের ইচ্ছা, কৃষ্ণকে দর্শন করি। আর কটা দিনই বা আছি। অনেক কালই তো সংসার করলুম। তাঁর কৃপাতেই দর্শন হবে এবার।' যে বউমার সঙ্গে মনের মিল নেই, তাকে উদ্দেশ্য করে, 'বউমাই আমার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে।' বউমাও ভাবে, 'হাড়ে বাতাস লাগবে কটা দিন।' এইসব সধবা বা বিধবা বুড়িদের অনেকেই তার যাওয়ার ব্যাপারে একই কথা বলতে থাকে, পরিচিত যাকে দেখে তাকে।

আর্থিক অসুবিধে যাদের আছে তাদেরও অনেকেই সাবিত্রী তীর্থে চলেছেন বাস্রির

উপর দিয়ে, পায়ে হেঁটে। দেহের কষ্ট হচ্ছে অথচ যেতেও হবে। আর আর্থিক সামর্থ্য যাদের আছে, চলার শক্তি কম অথচ উঠতে হবে পাহাড়ে, তাদের অনেকেই চলেছেন ডাণ্ডিতে। আবার অনেকের ভাবনা এমন—তীর্থ করতে বেরিয়েছি তো লোকের ঘাড়ে চড়বো কেন ?

এদের সকলকেই—কাউকে ডায়ে, কাউকে বাঁয়ে রেখে এগিয়ে চলেছি সাবিত্রী পাহাড়ের দিকে। এ-পথের যাত্রী অনেক। আমি চলেছি আমার মতো। কোমর ব্যথা আর ছেলেপুলে, কোনটাই আমার নেই। তাই ওদের চাইতে গতি আমার এখন অনেক বেশী। গতি বাড়িয়ে দিয়েছি আরও—দূর থেকে গেরুয়া বসন পরা এক সাধুবাবার পিছনটা দেখে। তিনিও চলেছেন সাবিত্রী তীর্থে। সাধু বলে মনে হয়েছে বসনের জন্যে। নইলে তীর্থযাত্রী বা ভ্রমণকারী বলেই মনে হতো। দূরত্ব অনেকটা। বালির উপর দিয়ে তত বেশী জোরেও চলা যাচ্ছে না। হাঁপিয়ে উঠছি। তবুও যতটা পারলাম—চালালাম। এগোলাম আনন্দেই, সাধুসঙ্গ হবে।

এক সময় এসেই গেলাম। একেবারে সাধুবাবার পিছনে। কোনদিকেই তাঁর দৃষ্টি নেই—সামনে। এতক্ষণ দৃষ্টি ছিল আমার সাধুবাবার পিছনে। এবার এসে গেলাম পাশাপাশি। পিছন থেকে ডাকলে অনেকেই অসন্তুষ্ট হয়, তাই ডাকি না কাউকে। সাধুবাবাকেও ডাকলাম না।

এবার সামনে এসে তাকালাম আড়চোখে। সাধুবাবার মুখের দিকে। তাকানো-মাত্রই মনটা আমার খারাপ হয়ে গেল। হতাশ হয়ে গেলাম। হতাশ হলাম দেখে। ট্যারা। ভাঙা গাল। রঙ একেবারেই ময়লা। বেশ কালো। মুখখানায় এতটুকুও আকর্ষণ নেই কোথাও। কুৎসিত দেখতে। দেহে সৌন্দর্যের কোন চিহ্নই নেই। এমন রূপ—যার সঙ্গে কোন কিছু দিয়েই তুলনা করা চলে না। সাধুদের সাধারণ সৌন্দর্য যেটুকু থাকে, তার বিন্দুমাত্রও নেই। যেমন অনেক মেয়ের দেহের গঠন আর পোশাকে পিছনটা এমন সুন্দর, দারুণভাবে আকর্ষণ করে পুরুষদের। তারপর অনেকক্ষেত্রেই হতাশ হয় আমার মতো, যারা 'ওভারটেক' করে সামনে এসে দেখে। প্রথম দর্শনে আমি কিছুই পেলাম না সাধুবাবার কাছ থেকে—না তাঁর রূপ, না সুন্দর দেহ। মানুষকে প্রথম দর্শন ব্যাপারটা যে মনের উপর কতটা ক্রিয়া করে, তা প্রত্যক্ষভাবে গভীর উপলব্ধি হলো এই প্রথম। সেইজন্যেই হয়তো রুক্ষমেজাজের দোকানদারের কণ্ঠেও মধু ঝরে পড়ে সুন্দরী ক্রেতা দেখলে। মানুষের জন্য মানুষ—স্বার্থসিদ্ধির সময়টুকু ছাড়া আর কোথাও মনে হয় না কখনও।

সাধুবাবার চেহারাটা এবার একটু খোলাখুলিই বলি। ট্যারা, একেবারে মোক্ষম ট্যারা। আমার দিকে তাকালেন, না পাহাড়ের দিকে—কিছুই বোঝা গেল না। হাতুড়ি মারা গাল, থ্যাবড়ানো। চওড়া অথচ চ্যাপ্টা কপাল। সারা গালে নয়, থুতনিতে একগুচ্ছ দাড়ি। মাথায় সামান্য চুলে ছোট ছোট কয়েকটা জটা। ঝুলে আছে কাঁধের নীচ পর্যন্ত। আধুনিকাদের চুলে ছাঁট দেয়ার পর মাপ যতটুকু দাঁড়ায়—ততটাই। বিবর্ণ, ফ্যাকাসে গেরুয়া বসন। কনুইয়ের হাড় বেরোনো। মাংসের

বড় অভাব। এমন অভাব সারা দেহে। কাঁধে ছোট্ট একটা ঝোলা। হাতে লম্বা লাঠি রয়েছে একটা। বেশ বয়েস হয়েছে। আন্দাজ ৭০/৭৫-এর কাছাকাছি। এমনটা দেখার পর একটা কথা বলতেও প্রবৃত্তি হলো না আমার। যেমন প্রবৃত্তি হয় না সুন্দরীদের—রূপ নেই, এমনদের সঙ্গে কথা বলতে। তার উপরে যদি দারিদ্র্যের ছাপ থাকে তো কথাই নেই।

সাধুবাবাকে দেখলাম। এবার এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টায় কয়েক পা বাড়াতেই সাধুবাবা বললেন,

—কিরে বেটা, আমাকে পছন্দ হলো না বুঝি?

এইভাবে জীবনে কখনও অপমানিত হয়নি আমি। এর চেয়ে সরাসরি যদি জুতো মারতো তাহলে বোধ হয় মনে লাগতো কম, অপমানিতও হতাম না। দাঁড়িয়ে গেলাম। এক পা-ও আর এগোলো না। মাথা তুলে দাঁড়ানোর ক্ষমতাও রইলো না লজ্জায়। দাঁড়ালেন সাধুবাবাও। অভ্যাসবশতই প্রণাম করলাম। মাথায় হাত দিলেন সাধুবাবা। মুখ থেকে কোন কথা সরলো না। সাধুবাবাই বললেন,

—বেটা, মানুষের মনের ছবি তোলা যায় না। তা যদি যেতো, তাহলে কেউ কাউকে কোনদিনই মুখ দেখাতে পারতো না এই সংসারে। আমার রূপ নেই, তাই তোর প্রণামে কোন আন্তরিকতাও নেই। বুঝলাম, প্রণাম করলি নিয়ম রক্ষার্থে। একমাত্র আশীর্বাদই হলো প্রণামের বিনিময়। তাই-ই তোকে করি, বেটা, তুই পরমানন্দেই থাক্।

জীবনে সাধুসঙ্গের সময় অনেক সাধুর গালাগাল খেয়েছি—অনেক। মুখে আনা যায় না এমন গালিও দিয়েছে অনেকে। তবে কারও কাছে কথায় এমনভাবে অপমানিত হইনি কখনও। কি বলবো, কিছু বুঝেই উঠতে পারলাম না। লজ্জায় মাথাটা আমার আরও নত হয়ে এলো। মাথা তুলে দাঁড়ানোর শক্তিও যেন হারিয়ে গেল। সাধুবাবা বললেন,

—তোর কোন দোষ নেই বেটা। আমার রূপ নেই বলে সংসারই যখন আমাকে গ্রহণ করেনি, তখন তুই-ই বা করবি কেমন করে! তুই আমাকে দেখে এড়িয়ে যেতে চাইছিলি, এতে বিন্দুমাত্র অবাক হইনি আমি, দুঃখিতও নই।

এ-কথায় মানসিক অপরাধবোধ জেগে উঠলো আমার। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে সাধু-বাবার পা-দুটো ধরে বললাম,

—আমার নীচ মনের এই অপরাধের জন্যে ক্ষমা করে দিন আমাকে। আশীর্বাদ করুন, কারও রূপ গুণ কিছু না থাকলেও তাকে অবজ্ঞা করার মনটা যেন আমার কখনও না হয়।

সাধুবাবা আমার দু-বাহু ধরে টেনে তুলতে তুলতে বললেন,

—ওঠ্ ওঠ্ বেটা, লোকে দেখলে অন্য কিছু ভাববে। কিছু মনে করিনি আমি। ওঠ্ ওঠ্।

উঠে দাঁড়ালাম। এবার একটু স্বস্তি এলো মনে। এতক্ষণ পর তাকালাম সাধাবাবার

মুখের দিকে। দেখলাম, হাসিতে ভরা মুখখানা। এবার কুৎসিত রূপ আর চোখে পড়ছে না। মুহূর্তে কোথায় যেন সব মিলিয়ে গেছে। উজ্জ্বল প্রসন্ন হাসি। আনন্দময় হাসি। এ হাসি বোধ হয় সাধুরাই হাসতে পারে। এখন আর রূপ কাজ করছে না আমার মনে। হাসির ছটায় চোখ মুখ ভেসে যাচ্ছে সৌন্দর্যে। কোন শিশুর মুখ কিংবা ফুলের সঙ্গে এখনও সাধুবাবার মুখের তুলনা করা যায় না। অভাবের সংসারে পিতৃহীন অভুক্ত শিশুর মা খাবার জোগাড় করেছেন অতিকষ্টে। নিজে না খেয়ে শিশুকে খাওয়ানোর পর যে তৃপ্তিতে আনন্দময় এক রূপ ফুটে ওঠে মায়ের মুখে, তেমনই এখন সেই রূপ-সৌন্দর্যে ভরে উঠেছে সাধুবাবার মুখখানা। একেবারে মোহিত হয়ে গেলাম। কয়েক মিনিটের জন্যে চিন্তাশূন্য হয়ে গেল আমার মনটা। সাধুবাবার কথায় মনটা আবার ফিরে এলো মনে। বললেন,

—বেটা, সাবিত্রী মায়ের দর্শনে যাবি, এখানে বোকার মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে? চল্ চল্, এখন পথ হাঁটতে হবে অনেকটা। জীবনের পথও অনেক লম্বা। দাঁড়িয়ে থাকলে লক্ষ্যে পোঁছাবি কেমন করে? যে দাঁড়িয়ে থাকে, সে দাঁড়িয়েই থাকে। তোকে আমাকে, সকলকেই এগোতে হবে। দেরী করলে চলবে কেন?

সাধুবাবা আর আমি, এগিয়ে চলি দুজনেই। মুখ থেকে এখনও আমার কোন কথা সরছে না। পথ চলছি নিঃশব্দেই। বালির উপর দিয়ে তাড়াতাড়ি চলা যায় না। তাই চলছি ধীরে ধীরে। কোন কথা বলছি না দেখে সাধুবাবাই বললেন,

—তোকে অপমান বা আঘাত করবো বলে কথাটা বলিনি। তোর মনের কথা আমার মনে হয়েছে বলেই বলেছি। এতে তোর মনে কষ্ট দিয়ে থাকলে মাপ করে দিস্ আমাকে।

এ-কথার উত্তরেও কোন কথা বললাম না আমি। সাধুবাবা বললেন,

—কোথায় থাকিস্? এখানে কি বেড়াতে এসেছিস্?

আমার আসার কারণ আর উদ্দেশ্যের কথা জানালাম সাধুবাবাকে। আমরা এসেও গেলাম সাবিত্রী পাহাড়ের পাদদেশে। হাওয়া বইছে হু-হু করে। বেশ শীত শীতও করছে। চলার সময় বেশ গরম লাগছিল। এবার দুজনেই উঠতে লাগলাম পাহাড়ী পথ ধরে। উঠছে আমাদের মতো আরও অনেক তীর্থযাত্রী, দর্শনার্থীরা। এতক্ষণ পর এই প্রথম জিজ্ঞাসা করলাম সাধুবাবাকে,

—বাবা, আপনার বাড়ী কোথায় ছিল, বর্তমানে ডেরাই বা কোথায়?

মানসিক প্রসন্নতার সুর ফুটে উঠলো সাধুবাবার কণ্ঠে। বললেন,

—বিহারের এক অজ-গাঁয়ে। নাম বললে তুই চিনতে পারবি না। ও-নাম তুই শুনিস্নিও কখনও। আর আমার ডেরাও নেই কোথাও। একমাত্র পথই আমার পরম আশ্রয়।

পাহাড়ী পথের কখনও দুপাশে, কখনও বা একপাশে ছোটবড় নানা ধরনের গাছ। পাহাড় কেটে তৈরী সিঁড়ি মতো রাস্তা। ধীরে ধীরে উঠছি দুজনে। মাঝে মাঝেই চোখ পড়ছে, বিশ্রাম নিচ্ছেন বয়স্ক যারা। বসে আছেন পাথরের চাঁই-এ, পথের

খারে। জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা, ঘর ছেড়েছেন কত বছর ?
এতটুকু না ভেবেই বললেন,
—তখন আমার বয়েস বছর ত্রিশ-বত্রিশেক হবে।
—এখন বয়েস কত ?
এবার উত্তর দিলেন একটু ভেবে,
—সত্তরের উপর হবে, তার কম নয়।
এবার আর দ্বিধা না করেই বললাম,
—ঘর ছাড়লেন কেন ?
ইসারায় একটা পাথর দেখালেন সাধুবাবা। বসতে বললেন। বসলাম দুজনেই। এতক্ষণ চলার মধ্যে বিশ্রাম করিনি এতটুকুও। তাই বিশ্রাম নিতেই বসলাম। সাধুবাবা বললেন,
—বেটা, সংসারে কিছু পুরুষ আছে যারা রোগগ্রস্থ। এরা স্ত্রীকে ভোগ করতে পারে না, ত্যাগ করতেও পারে না। আমি রোগগ্রস্থ নই তবে রুগীর মানসিকতারও নই। ভোগই যখন করতে পারবো না তখন ভোগের আশায় সংসারে পড়ে থেকে লাভ কি ? তাই সব ছেড়ে, মা-বাবা ভাই-বোন আত্মীয়-বান্ধব সবাইকে ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম পথে। এমনিতেই সংসারে থাকার সময় মৃত্যু হয়েছে সংসারের। বেঁচে ছিল মনটা। থাকলে মনটারও মৃত্যু হতো। বেটা, একেবারে অকালেই মৃত্যু হতো।
কথার সুরেই পেলাম সাধুবাবার ব্যথিত জীবনের ইঙ্গিত। জানতে চাইলাম,
—আপনার কথাটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। একটু খোলাখুলি বলবেন বাবা।
মলিনতার ছাপ ফুটে উঠলো সারা মুখখানায়। বললেন,
—ও-সব কথায় কাজ নেই। চল্ বেটা, এগোই।
কথাটা বলেই উঠতে যাচ্ছিলেন। সাধুবাবার বাঁপাশেই বসে ছিলাম আমি। আমার ডানহাত দিয়ে সাধুবাবার বাঁহাতটা টেনে ধরে বসিয়ে বললাম,
—যেতে তো হবেই। একটু বসুন না, বলুন না বাবা কেন ঘর ছাড়লেন আপনি ?
সাধুবাবা বসলেন। চুপ করেই বসে রইলেন প্রায় মিনিট পাঁচেক। লক্ষ্য করলাম, ধীরে ধীরে সাধুবাবা যত অতীতে চলে যাচ্ছেন মনে মনে, ততই বেড়ে যাচ্ছে মুখের মলিনতা। এইভাবে কাটলো আরও কিছুক্ষণ। তারপর বললেন,
—বেটা, জীবনের প্রথম ৩০/৩২টা বছর সংসারে কেটেছে আমার অকর্মণ্য, অপদার্থতার অবস্থায়। এর একমাত্র কারণ আমার রূপ নেই—নেই দেহে বিন্দুমাত্র সৌন্দর্য। ছোটবেলায় পড়াশুনা করিনি কিছু। তখন কোন ইস্কুলই ছিল না আমাদের গাঁয়ে। পড়াশুনার পাটও ছিল না ঘরে ঘরে। আমার কোন বন্ধু নেই ছোটবেলা থেকে, আজও। কারও সঙ্গে কথা বলতে গেলে, এড়িয়ে চলতো। প্রথম প্রথম, যখন বয়েস কম ছিল তখন বুঝতাম না। যখন জ্ঞান হলো তখন বুঝলাম, আমার একমাত্র অপরাধ আমি কুৎসিত দেখতে। কষ্ট হতো মনে। ছোটবেলায় মাকে এসে বলতাম

'মা, সবাই খেলা করে, আমাকে কেউ খেলায় নেয় না। তাড়িয়ে দেয়। আমি কি কোন অপরাধ করেছি?' মা আমার কথার কোন উত্তর দিতেন না। চুপ করেই রইতেন। তবে দেখতাম, মায়ের মুখখানা অন্ধকার হয়ে যেতো। একমাত্র মা ছাড়া সংসারে আমার বাবা ভাই বোন প্রতিবেশী—কেউই আমাকে ভালোবাসেনি, আদর করে ডাকেনি। আন্তরিকতা তো দূরে থাক্‌, ভালোভাবে কেউ কথাটা পর্যন্ত বলেনি কখনও। এমন মনোকষ্ট নিয়েই বড় হতে লাগলাম। জমিতে জনমজুরের কাজ করবো, তাও আমার মেলেনি। একদিন কিছু সব্‌জি নিয়ে বসেছিলাম আমাদের গাঁয়ের হাটে। দুপুর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বসেই রইলাম। দু-পয়সার খদ্দের জুটলো মাত্র একটা। আমাকে দেখে কিন্তু কেনে না কিছুই। অথচ একই জিনিষ অন্যে নিয়ে বসেছে। তার কাছ থেকে কিনছে সবাই। আমি শুধু বসে বসেই দেখলাম। সন্ধ্যের সময়, যেমন নিয়ে গেছিলাম তেমনই সব নিয়ে ফিরে এলাম ঘরে। তারপর আর কখনও হাটে যাইনি। পাঁচজনের হাঁড়িতে একজনের দু-মুঠো যেমন জোটে তেমন জুটতো আমারও। ঠিক এইভাবে, একই নিয়মে অসহ্য মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে কাটলো আমার জীবনের ওই প্রথম ৩০/৩২টা বছর।

একটানা এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা থামলেন। অসহ্য বেদনা আর বাল্য-ব্যথার ছাপ ফুটে উঠলো সারা মুখখানায়। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন। চুপ করে রইলেন মিনিটখানেক। লক্ষ্য করতে লাগলেন যাত্রীদের যাওয়া-আসা। একটা কথাও বললাম না আমি। সাধুবাবার কথা শোনার অপেক্ষায় রইলাম। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,

—বেটা, আমার জীবনে তুই-ই একমাত্র প্রথম ব্যক্তি, যার সঙ্গে এই প্রথম কথা হলো এতক্ষণ, যে ধৈর্য ধরে শুনছে আমার কথা। আজ তোকে পেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে মনে। জয় হোক্‌ তোর, সারাজীবন তোর জয়জয়কার হোক্‌।

বলে হাতদুটো আমার মাথায় বুলিয়ে দিলেন স্নেহভরে। কোন কথা বেরোলো না মুখ থেকে। একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লাম আমি। এবার সাধুবাবা বললেন হতাশার সুরে,

—বেটা, সংসারে থেকেও আমার কাছে মরে গেল সংসারটা। হতভাগ্য বোধ হয় একেই বলে, তাই না বেটা? জীবনে কোন অপরাধ করিনি আমি। অথচ এমন চরম দণ্ড দিলেন ভগবান, এ-কোন পাপে বলতে পারিস্‌?

চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলাম। মাথাটা নিচু করে মনে মনেই বললাম, বাবা, এর উত্তর আমার জানা নেই। ভাবলাম, সংসারে তো কত কুৎসিত রূপের নারীপুরুষ দেখা যায়, তাদের জীবনে কি কখনও এমন হয়েছে? সাধুবাবারই বা এমন হবে কেন? চিন্তাগুলো আমার মাথায় কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। কিছুই আর ভাবতে পারছি না। সাধুবাবা বললেন,

—এমন এক যন্ত্রণাময় জীবনযাপন করতে করতে একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে গেলাম আমি। একদিন না পেরে মাকে বললাম আমার মনের কথা। আমি বুঝতাম, মা

বুঝতেন আমার অন্তরের দুঃখের কথা। কি-ই বা করার ছিল মায়ের! বেটা, এমন কোন বাক্যেরও সৃষ্টি করেননি বিধাতা, যে বাক্যে আমার এই পরিস্থিতিতে সান্ত্বনা দেবেন তিনি। অথচ দেখ, সংসারে সব যন্ত্রণা উপশমের জন্যে বিধাতা সব ধরনের বাক্য সৃষ্টি করেছেন, যে বাক্যে রোগে শোকে দারিদ্র্যে ব্যথা বেদনায় সান্ত্বনা পেতে পারে মানুষ।

এই পর্যন্ত বলে চুপ করে রইলেন সাধুবাবা। ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরতে লাগলো চোখ থেকে। কি বলবো আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম মুখের দিকে। খানিক পরে ভাবটা একটু সম্বরণ হতেই বললেন,

—বেটা, একদিন গোপনে মাকে বললাম, 'মা যে সংসারে ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত কেউই গ্রহণ করলো না আমাকে, সে সংসারে থেকে লাভ কি?' কথাটা শুনে মা আমার অঝোরে কাঁদলেন। একদিন সকলের অলক্ষ্যে উঠলাম ভোর রাতে। ডেকে তুললাম মাকে। প্রণাম করলাম। অনুমতি দিলেন না, তবে বাধাও নয়। বেরিয়ে পড়লাম মানুষের রূপ নয়, ঈশ্বরের স্বরূপ জানতে, যিনি আমার এমন রূপস্রষ্টা, যার জন্যে সংসারে পেলাম না কিছুই।

এই পর্যন্ত বলে উঠে দাঁড়ালেন সাধুবাবা। উঠে দাঁড়ালাম আমিও। চলতে শুরু করলাম পাশাপশি। লাঠি ভর দিয়ে চলতে চলতেই বললেন,

—বেটা, বড় দেরী হয়ে গেছে। আরও অনেক আগেই বেরিয়ে পড়া উচিত ছিল আমার। কোন অপরাধ তো করিনি আমি, তাই আশা আর অপেক্ষা করেছিলাম কিন্তু হলো না।

এবার খপ্ করে সাধুবাবা বাঁহাত দিয়ে আমার ডানহাতটা ধরে দাঁড়ালেন। বললেন আবেগের সুরে,

—বেটা, এই সংসারে যা কিছু দুঃখ, যা কিছু মানসিক কষ্ট, তার মূলেই হলো একমাত্র আশা। মানুষের দুঃখ শোক আর মানসিক কষ্ট উৎপন্ন করে আশাই। এটা ত্যাগ করতে না পারলে পৃথিবীর কোন মানুষ, কোনদিনই মুক্ত হতে পারবে না মানসিক কষ্ট থেকে। বেটা, আশা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে—মানসিক কষ্ট আর জাগতিক দুঃখের মধ্যে দিয়েই বাঁচিয়ে রাখে। আশা ছাড়াও মানুষ বাঁচতে পারে, সে বাঁচায় আছে এক অদ্ভুত আনন্দ, পরমানন্দ। তবে আশামুক্ত জীবনটাই একটা আলাদা জীবন। সেখানে প্রবেশ করা বড় কঠিন। সে পথও সাধনার পথ। বেটা, যতদিন বেঁচে থাকবি সংসারে, আশা ছাড়াই চলতে চেষ্টা করবি। দেখবি, এক সময় মনটা তৈরী হয়ে গেছে। চাওয়া পাওয়ার বাসনা থেকে একেবারেই মুক্ত হয়েছে মন। পরে দেখতে পাবি, আশা করে মানসিক কষ্টের মধ্যে থেকে যা পেতিস্, তার থেকে অনেক অ-নে-ক বেশী পেয়েছিস আশা না করেই।

হাতটা ছেড়ে দিলেন। নিঃশব্দে চলতে শুরু করলাম দুজনে। প্রায় মিনিট দশেক পথ চললাম কোন কথা না বলেই। ভাবতে লাগলাম সাধুবাবার কথা। প্রথমে সাধুবাবাকে অন্তর থেকে গ্রহণ করিনি আমি। তিনিই আমাকে আপন করে নিয়ে

এমন আন্তরিকভাবে কথা বলছেন দেখে অন্তরে আমার এক অদ্ভুত আনন্দের সঞ্চার হলো। ভেসে গেল মনটা। দেখছি, সাবিত্রী মন্দির দর্শন করে ফিরছেন অনেক তীর্থযাত্রী। আবার আমাদের পাশ কাটিয়েও এগিয়ে চলেছেন অনেকেই। পাশে, নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, বেশ অনেকটাই উঠেছি উপরে। সাধুবাবাকে বললাম,

—বাবা, সারা ভারতের সমস্ত তীর্থদর্শন করেছেন নিশ্চয় ?

ঘাড় নাড়লেন। পরে মুখেও বললেন,

—হাঁ বেটা, গুরুকৃপায় সমস্ত তীর্থদর্শনই হয়েছে আমার। তবে মানস সরোবর আর কৈলাসে আমি যাইনি কখনও। শুনেছি ও-পথ বড় দুর্গম। আমার শরীরও ও-পথের উপযুক্ত নয়। তাই চেষ্টাও করিনি।

একটা প্রশ্ন এসে গেল মাথায়। করেই বসলাম,

—বাবা, সংসারের কেউই গ্রহণ করলো না আপনাকে, আপনার দেহসৌন্দর্য নেই বলে। যাঁর কাছে দীক্ষা হয়েছে আপনার, তিনি আপনাকে দেখামাত্রই নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করেছেন ?

আনন্দবিগলিত কণ্ঠে লাঠিসমতে হাতদুটো উপরে তুলে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বললেন,

—জয় গুরুমহারাজ কি জয়—জয় গুরুমহারাজ কি জয়—জয় গুরুমহারাজ কি জয়। বেটা, ঘর ছেড়ে তো বেরোলাম। তারপর এখানে সেখানে—এ-তীর্থ সে-তীর্থ করেই কাটতে লাগলো দিনগুলো। ভগবানকে ডাকি মনে মনে। দুঃখের কথা জানাই। শান্তি পাই না। তবে বাড়ীর কথা, কারও কথা আমার মনে পড়তো না কখনও, একমাত্র মাকে ছাড়া। আর মনে পড়ার মতো মনে কোন ছাপ তো কেউ রাখেনি, তাই মনে পড়তো না। ছন্নছাড়াভাবে ঘুরতে ঘুরতে চলে গেলাম বেনারসে বাবা বিশ্বনাথের দরবারে। একদিন সকালে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করে সবে উঠেছি, যাবো বিশ্বনাথ মন্দিরে। কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে ওঠার পর চোখ পড়লো, দেখলাম এক বৃদ্ধ সাধুবাবাকে। বসে আছেন ঘাটের সিঁড়িরই একপাশে। আর মন্দিরে গেলাম না আমি। সোজা গিয়ে প্রণাম করে জানালাম আমার জীবন-মনের কথা। সমস্ত কথা শুনে সাধুবাবা বললেন, 'ভয় কি বেটা, আমি তো আছি। তোর সমস্ত ভার, তোর সারাজীবনের দুঃখের বোঝা আমিই বইবো। তুলে দে আমার কাঁধে।' বলে মাথায় হাত দিয়ে বৃদ্ধ সাধুবাবা আশীর্বাদ করলেন আমাকে। এমন কথা শুনে আনন্দে কেঁদে ফেললাম আমি। তারপর একদিন দীক্ষা হলো আমার, ওই সাধুবাবারই কাছ থেকে। তিনিই হলেন আমার গুরুজী মহারাজ।

এবার আবেগে কাঁদতে কাঁদতে সাধুবাবা বললেন,

—বেটা, তুই বিশ্বাস কর্, গুরু মানুষের ধনসম্পদ যশ প্রতিপত্তি কিছুই দেখেন না, ভুল করেও দেখেন না রূপ-যৌবন। দেখেন শুধু শরণাগতের নিঃস্ব মনটা।

একটু দাঁড়িয়ে মুছে নিলেন চোখদুটো। তারপর আবার শুরু হলো চলা। মনে

প্রশ্ন এলো। বললাম,
—বাবা, কি করে চলে আপনার, আহার সংগ্রহ করেন কোথা থেকে ? আমার মনে হয়, আপনার নিজের রূপচিন্তায় মন তো কারও কাছে নিয়ে যায় না হাত পাততে।
সঙ্গে সঙ্গেই সাধুবাবা বললেন,
—হাঁ বেটা, তুই ঠিকই বলেছিস্। কারও কাছে আমি হাত পাতি না। আমি জানি, কারও কাছে ভিক্ষা চাইতে গেলে সে আমায় ভিক্ষা দেবে না। তাই যাই না কারও কাছে। তবুও আমার প্রতিদিন কিছু না কিছু জুটে যায়। কেন জোটে জানিস্ ? সকাল থেকে রাত পর্যন্ত—এই সময়ের মধ্যে আমার আহার অন্ন জুটবে, এমন আশা আমি ভুল করেও করিনা বলেই আমার কিছু জুটে যায়।
মনে মনে বললাম, ধন্য সাধুবাবা—ধন্য তোমার মন। সাধুবাবার সম্পর্কে এই মুহূর্তে আর কিছু ভাবলাম না। সময় নষ্ট হয়ে যাবে। পরে ভাববার সময় পাবো অনেক। তাই এবার বললাম,
—বাবা, সংসারে এলেন অথচ সংসার হলো না আপনার। মানুষ দেখলেন অনেক অথচ কোন মানুষের সঙ্গেই প্রীতির সম্পর্ক, প্রেমেরও কোন বন্ধন হলো না আপনার। এ-এক অদ্ভুত জীবন কাটালেন আপনি। তাই না, বলুন ?
এ-কথা শুনে দাঁড়িয়ে গেলেন সাধুবাবা। একটু বিস্ময়ের সুরেই বললেন,
—কি বললি বেটা, প্রেম !
ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' বললাম। সাধুবাবা বললেন,
—বড় শক্ত কথা বলে ফেললি বেটা, বড় শক্ত কথা বলে ফেললি। প্রেম কি জানিস্ ? যা চোখে দেখা যায় না, মুখে বলা যায় না, কোন বাহ্যকর্মের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না, যার প্রকাশে কোন ভাষা বা অভিব্যক্তির সৃষ্টি হয়নি আজও, অথচ অন্তরে সর্বদাই অনুভব করা যায়, তার নামই প্রেম—তাকেই বলে প্রেম। বুঝলি বেটা ? তবে বেটা, এই প্রেম কথাটা হামেশাই শোনা যায়, কিন্তু প্রেমের সঙ্গে পরিচয় ঘটে ক-জনার ? মানুষের জীবনে প্রেম এমনই এক বস্তু, যা আসলে সহসা চলে যায় না। চলে গেলে তা সহজে ফিরে আসেনা। সংসারে প্রেমের স্বরূপ বেটা দেখেছে ক-জনা ?
এই পর্যন্ত বলে আবার চলতে শুরু করলেন সাধুবাবা, আমিও। চলছি অতি ধীরে ধীরে। আমাদের পিছনের লোক চলে যাচ্ছে আমাদের পিছনে ফেলে। আমরা চলছি আমাদের মতো। প্রশ্ন করলাম,
—বাবা, কি পরিস্থিতিতে, কখন মানুষ অনুভব করতে পারবে, প্রেমের উদয় হয়েছে তার মনে ? যে বস্তু দেখা যায় না, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, সে বস্তু বোঝার উপায় কি ?
প্রশ্নটা শুনে আবার দাঁড়িয়ে গেলেন সাধুবাবা। একটু সরে এসে, একেবারে আমার মুখোমুখি হয়ে বললেন,
—বেটা, মন যখন কামগন্ধলেশ হয়, তখনই বুঝতে পারবি প্রেমের উদয় হয়েছে

মনে। তখন এমন এক ভাবের সৃষ্টি হয়, যে ভাব অন্যে সংক্রামিত হলে সে-ও আনন্দময় ভাব অনুভব করে, যাতে অলক্ষ্যে সৃষ্টি হয় এক সূক্ষ্ম বন্ধনসূত্র, যে সূত্রে বাঁধা যায় মানুষ, এমনকি ভগবানকেও। বেটা, বিরহ ছাড়া যেমন বৈরাগ্য আসেনা, তেমনই প্রেম না আসলে ধৈর্য'ও আসেনা। যার জাগতিক সমস্ত ব্যাপারে, বিষয়ে ধৈর্য এসেছে—একেবারে নিশ্চিত জানবি, তার ভিতরে প্রেম এসেছে। যার ধৈর্য নেই, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রেমও নেই। সে না পারবে মানুষকে, না পারবে ভগবানকে বাঁধতে। সুতরাং বুঝতেই পারছিস্, প্রেম—কথাটা সংসারে শোনা যায় তবে তার সঙ্গে সংসারে পরিচয় ঘটে খুব কম মানুষেই।

একটু থেমে আবার বললেন,

—বেটা, সাধু আর গৃহী—এদের মধ্যে কারও মনে প্রেমের উদয় হলে সে আখের গাছ হয়ে যায়। নিংড়ালে মধুর রস ছাড়া আর কিছুই বেরোবে না।

সাবিত্রী পাহাড়ের অনেকটা উপরেই উঠে এসেছি আমরা। শারীরিক কষ্ট তেমন কিছু হচ্ছে না। কারণ ধীরে ধীরে উঠছি বলে। আর অল্প কিছুক্ষণ পরেই পেঁছে যাবো মন্দিরে। সাধুবাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, এ-জন্মে তো আপনার কোন ভোগই হলো না। না দুটো ভালো খাওয়া, না পরা, অন্য কিছু—কোন ভোগই নয়। এর জন্যে মনে কখনও কোন ক্ষোভ বা দুঃখ হয় না?

এতটুকু দেরী না করেই বললেন,

—না বেটা, এখন কোন ক্ষোভ দুঃখ জ্বালা ব্যথা বেদনা, কোন কিছুই আমার মনকে আর পীড়িত করতে পারে না। কারণ কোন আশা নিয়ে তো বেঁচে নেই আমি। বেটা, ময়লা যেমন দেহকে, তেমনই আশা কলুষিত করে মানুষের মনকে। যেদিন ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি, সেদিন সব ছেড়ে বেরিয়েছি। তাই আমার মনে আর ও-সব কিছুই হয় না।

এবার বললাম,

—বাবা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

মুখের দিকে তাকালেন। মুখে কিছু বললেন না। ভাবটা এমন, যা খুশী জিজ্ঞাসা করতে পারিস্, আপত্তি নেই। বললাম,

—বাবা, হিন্দুধর্মশাস্ত্রের যেসব কথা শুনি—যেটুকু পড়ি, তাতে অনেক সময় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় মনে। কখনও কখনও একটা কথার সঙ্গে আর একটা কথার যোগসূত্র বা মিল খুঁজে পাই না। গোলমাল হয়ে যায় সব। অনেক উদাহরণই আমি দিতে পারি। যেমন ধরুন, মূল মহাভারতের কথা। সেখানে ব্যাসদেব এক জায়গায় বলেছেন, পুরুষের একমাত্র শত্রু তার স্ত্রী। আবার অনেক পরে এক জায়গায় তিনিই বলেছেন, পুরুষের একমাত্র পরম বন্ধু হতে পারে তার স্ত্রী। এবার বলুন, কথাটার মধ্যে কতটা ফারাক। এমন অসংখ্য কথা আছে, যা প্রায়ই যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয় না। আবার অনেক কথায় বিপরীত প্রশ্ন আসে মনে। উত্তরও তার খুঁজে

পাওয়া যায় না। ঋষিরা ভুল কিছু বলেছেন, এমন কথা বলার মতো স্পর্ধা আমারা নেই। দয়া করে যদি বিষয়টা একটু বুঝিয়ে দেন, তাহলে ঋষিবাক্যে বিশ্বাসটা আরও দৃঢ় ও গভীর হয়।

কথাটা বললাম চলতে চলতেই। সাধুবাবা একটা পাথরের চাঁই দেখিয়ে বললেন,

—চল্, ওখানে একটু বসি। এ-কথার উত্তর দিতে হলে একটু বসেই দিতে হবে।

একটু এগিয়ে গিয়ে বসলাম মাঝারী আকারের একটা পাথরের চাঁই-এ। এবার সাধুবাবার কণ্ঠে ফুটে উঠলো বেশ দৃঢ়তার সুর। বললেন,

—নানা বেটা, প্রাচীন ভারতের ঋষিরা একটা কথাও বেঠিক বলেননি। একটা কথার সঙ্গে অপরটার যোগসূত্র কোথাও ছিন্ন নয়। শাস্ত্রীয় কথায় কোথাও মনে বিপরীত কোন প্রশ্নের উদয় হলে, তৎক্ষণাৎ সেখানে মনে উদিত সেই প্রশ্নের উত্তর না পেলেও জানবি, তার উত্তর দিয়েছেন ঋষিরা অন্য কোথাও। সেখানেও কোন ভুল নেই। তবে ঋষিদের কথার মানে বুঝতে গেলে ঋষিদের কৃপা লাভ করতে হবে। নইলে সব কথার অর্থ উদ্ধার করতে পারবি না। সাধারণ জ্ঞান যেটুকু ধরবে, সেটুকুই বুঝবি, তার এক চুলও বেশী নয়। হিন্দু ঋষিদের বলা প্রতিটি বর্ণ সত্য জানবি। শুধু সত্য বললে, মিথ্যা বলা হয়। তাদের কথা চিরন্তন-শাশ্বত-সনাতন সত্য। ঋষিদের জ্ঞান এক অখণ্ড জ্ঞানভাণ্ডার যে।

জীবনে বই-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংস্পর্শহীন এক সাধুবাবা—যার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম বসে। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন,

—বেটা, বহু দৃষ্টান্ত দেখে একটা সিদ্ধান্তে পেঁছানোই আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি। তাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি এরই উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই আজকের বিজ্ঞান যত উন্নতই হোক না কেন, এর কোন কাজ ও কথা—কোনটাই পরিণত ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। এই বিজ্ঞান আর বিজ্ঞান বিষয়ক কথা সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল বলেই বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলির পরিবর্তন হচ্ছে সর্বদাই—হবেও। এক কথায় বলতে পারিস্, আধুনিক বিজ্ঞান মানেই অস্থির সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান। যদিও এটা বিশেষ জ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা থামলেন। এদিক ওদিক একবার চোখদুটো ঘুরিয়ে নিলেন। তারপর আবার মুখের দিকে তাকালেন। জিজ্ঞাসা করলেন,

—তুই কি আমার কথা কিছু বুঝতে পারছিস্?

মুখে কিছু বললাম না। ঘাড় নেড়েই জানালাম—হ্যাঁ। আবার শুরু করলেন সাধুবাবা,

—বেটা, শাস্ত্রে যেসব কথা লেখা আছে, সেই ঋষিবাক্যও বিশেষ জ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। তবে 'আধুনিক বিজ্ঞান' শব্দে মানুষ যে অর্থ বোঝে, ঋষিবাক্য বা শাস্ত্র সে অর্থে বিজ্ঞান নয় কিন্তু বিজ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কেমন করে জানিস্? প্রাচীন ঋষিদের সমাধিকালীন মহাশূন্যে প্রতিভাত বিশেষ জ্ঞানের কথা—যা শাস্ত্রে লেখা হয়েছে। এই জ্ঞানের কথা সত্য। আর তা পর্যবেক্ষণের

উপর নির্ভরশীল নয় বলেই এই জ্ঞানলব্ধ বাক্যের কোন ভ্রান্তি নেই। একটা পরীক্ষা-নলে কোন রাসায়নিক দ্রব্য বা গ্যাস ভরে নির্দিষ্ট মাত্রায় উত্তাপ দিয়ে ঋষিবাক্যের সত্যতা প্রমাণ করা যাবে না। চির-সত্য এই জ্ঞানবাক্যের কখনও কোন পরিবর্তন ঘটে না—পরিবেশের, স্থানের পরিবর্তনেও। এই জ্ঞানের কথাই বিভিন্ন শাস্ত্রকথা—মানুষের আত্মিক, মানসিক এবং সার্বিক কল্যাণের জন্যে। এখন ঋষি-বাক্যের প্রয়োগকর্তা বা ব্যাখ্যাকার যদি প্রয়োগ বা ব্যাখ্যায় ভুল করে, তাহলে ঋষিরা কি করবেন? বেটা, ঋষিদের অখণ্ড জ্ঞানভাণ্ডারের জ্ঞান-কথার অন্তর্নিহিত সত্যকে বুঝতে হলে নিজেকেও প্রবেশ করতে হবে আধ্যাত্মিক তপোবনে। ওটাই ওই জ্ঞান লাভের আখড়া।

এবার কিছুক্ষণ চুপ করে বসে কিছু একটা ভাবলেন মনে হলো। কোন কথা বলে চিন্তায় ছেদ টানলাম না। তিনিই বললেন,

—তুই একটু আগে বললি, ব্যাসদেব এক জায়গায় বলেছেন, পুরুষের একমাত্র শত্রু তার স্ত্রী। আবার তিনিই বলেছেন, পুরুষের স্ত্রীই পরম বন্ধু হতে পারে। এ-কথায় মনে তোর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে, তাই না? তুই কি মনে করিস্, ব্যাসদেব পাগল?

আমি হেসে ফেললাম। হাসলেন সাধুবাবাও। হাসতে হাসতেই বললেন,

—বেটা, ব্যাসদেব তো ঠিকই বলেছেন। পুরুষের একমাত্র শত্রু তার স্ত্রীই। কেমন করে জানিস্? পুরুষের দেহরাজ শুক্র। স্ত্রীসঙ্গে এই শুক্রক্ষয়ে পুরুষ ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে ইহলোক আর পরলোক, সব পথের দ্বারই রুদ্ধ করে ফেলে। অথচ দেখ্, এই সংযমের মাধ্যমেই পুরুষ জাগতিক যা কিছু—পারমার্থিক পরম ব্রহ্মপদ পর্যন্ত লাভ করতে পারে। কিন্তু সংসারে থেকে কোনভাবেই, প্রায় কোন পুরুষের পক্ষেই তা সম্ভব হচ্ছে না। যাদের হচ্ছে, তারা ভাগ্যবান। তবে এমন ভাগ্যবানের সংখ্যা একরকম বিরলই বলতে পারিস্।

এই পর্যন্ত বলে একটু হাসলেন সাধুবাবা। হাল্‌কা হাসি—প্রসন্ন হাসি। তারপর আবার শুরু করলেন,

—বেটা, সংসারে পুরুষের একমাত্র পরমবন্ধু হতে পারে তার স্ত্রীই। চরম শোক দুঃখে, সাংসারিক পরম সুখে একমাত্র স্ত্রী ছাড়া কেউই সহায় সঙ্গী হতে পারে না। পিতা মাতা সন্তানও ত্যাগ করতে পারে কিন্তু প্রকৃত স্ত্রী তার স্বামীকে কখনও ত্যাগ করে যায় না প্রতিকূল পরিস্থিতিতে। সন্তান বা পিতৃ-মাতৃ বিরহে যতবেশী কাতর হয় পুরুষ, তার চেয়ে অনেক বেশী কাতর হয় তার প্রকৃত স্ত্রী বিরহে। পুরুষের জীবনে একটা সময়ের পর থেকে সারাজীবনব্যাপী তার স্ত্রীর ভূমিকাই বেশী, সেখানে বাবা মা ভাই বোন সন্তান আত্মীয় পরিজনের ভূমিকা শূন্য। সেইজন্যেই তো ব্যাসদেব বলেছেন, পুরুষের পরমবন্ধু একমাত্র তার স্ত্রীই হতে পারে। তবে হবেই, এমন কথা বলেননি।

এখানেই একটা প্রশ্ন আর খট্‌কা এসে গেল। বললাম,

—ব্যাসদেব 'হতে পারে' বলেছেন, 'হবেই' বলেননি কেন ?
সঙ্গে সঙ্গেই সাধুবাবা বললেন,
—বেটা, নারী চরিত্রে কিছু বৈশিষ্ট্য এবং বিশিষ্ট কিছু গুণের সমন্বয় এমনভাবে ভগবান করে দিয়েছেন, যেখানে স্ত্রীর ভূমিকায় নারীরপক্ষে যেটা করা সবক্ষেত্রে সহজ সম্ভব, সেটা অন্য কোন পুরুষ বা নারীরক্ষেত্রে অন্য কোন কিছুর ভূমিকায় বা বিনিময়ে তা কিছুতেই, কখনই করা সম্ভব নয়। অন্যের মাধ্যমে আংশিক পূরণ হতে পারে, স্ত্রীর মাধ্যমে পূর্ণরূপে তা সম্ভব বলেই ঋষি প্রাধান্য দিয়েছেন স্ত্রীকে। মা এবং স্ত্রী—একই মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীতে সৃষ্ট। মায়ের দ্বারাও পুরুষের পূর্ণতা সম্ভব হতে পারে কিন্তু জাগতিক কারণেই তা সম্ভব হচ্ছে না। তাই স্ত্রীর ক্ষেত্রে হতে পারে বলেছেন। মায়ের মধ্যে একটু সম্ভাবনা রয়েছে বলেই এখানে ঋষি একটু ছাড় দিয়ে কথা বলেছেন।
এতক্ষণ বসে বসেই কথা হলো। আবার উঠে এগোতে লাগলাম। এবার সাধুবাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা, পুষ্কর-সাবিত্রী দর্শনের পর কোথায় যাবেন ?
সাধুবাবা হাসিমুখেই বললেন,
—অনেকদিন হলো হরিদ্বারে যাইনি। ভাবছি একটু হরিদ্বারেই যাবো।
জানতে চাইলাম,
—বাবা, পথ তো চলছেন, কখনও কোনভাবে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। দেহ যখন, তখন কোন বড় রোগ-ভোগ তো হতেই পারে। যদি তেমন কিছু হয় কখনও, তখন সেবা করার মতো কাউকে পাবেন বলে তো মনে হয় না। এ-কথা বলছি আপনার চেহারার কথা ভেবে, যা আপনাকে সংসার ছাড়তে বাধ্য করেছে। এটা আপনি নিজের মুখেই বলেছেন। এমন যদি হয় কখনও, সেই পরিস্থিতিতে কি করবেন আপনি ?
আমরা দুজনে প্রায় সাবিত্রী মন্দিরের একেবারে কাছাকাছিই এসে গেছি। সাধুবাবা কিছু না বলেই আবার বসে পড়লেন একটা বড় পাথরের চাঁই-এর উপর। আমাকেও বসতে হলো। এবার হাতের লাঠিটা পাথরে ঠুক্‌ঠুক্‌ করে ঠুকতে লাগলেন। তাকালেন আমার মুখের দিকে। প্রসন্ন হাসিতে ভরে উঠলো সাধুবাবার মুখখানা। বললেন,
—বেটা, সংসারে যাদের দেখার মানুষ আছে, তাদের রোগ ভোগ দুঃখ বেদনাও আছে। আবার দেখার মানুষ থাকলেও তো অনেক সময় দেখে না কেউই। সাধুদের দেখার মতো কেউ নেই, তাই রোগ ভোগও তেমন কিছু নেই, যাতে সাধু পড়ে থাকে। সাধু পড়ে থাকলে তো দেখতে হবে ভগবানকেই, তাতে তাঁরও তো কষ্ট। কারণ সাধুরা তো তাঁর উপরেই সব ছেড়ে দিয়ে পড়ে আছে। সেইজন্যেই তো বেটা, ভগবান তাঁর ভক্তকে, সাধুকে, শরণাগতকে ঝামেলায় ফেলে, দেহকষ্ট দিয়ে নিজে ঝামেলায় পড়তে চায় না কখনও। এই দেখ্‌ না বেটা, এতগুলো বছর তো কেটে

গেল পথে পথে, আজ পর্যন্ত শারীরিক কোন কষ্টই পাইনি, রোগ ভোগও হয়নি এতটুকুও। একটু সর্দিজ্বরও নয়। আমি মনে করি, ভগবান আমাকে রোগে ফেলে নিজে ঝামেলায় পড়তে রাজী নয়।

এই কথাগুলো বলে সাধুবাবা এক অদ্ভুত আনন্দে হাসতে হাসতে একটু নুয়ে পড়লেন। কথাটা একটু রসিকতার সুরেই বললেন সাধুবাবা। অথচ কথার মধ্যেই পরিষ্কার ফুটে উঠলো ঈশ্বরে একান্ত বিশ্বাস আর শরণাগতের গভীর অনুরাগের কথা।

আবার দুজনেই উঠে হাঁটতে শুরু করলাম। সামান্য পথ চলার পরেই কানে এলো সাবিত্রী মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি। নজরে এলো দেবীমন্দির। দেখছি, অসংখ্য তীর্থযাত্রী নেমে আসছেন সাবিত্রীদর্শন করে। উঠছেন আমাদের সঙ্গে অনেক দর্শনার্থী। উঠে এলাম মন্দির চত্বরে। সাধুবাবা আর আমি। এবার ছেড়ে যেতে হবে সাধুবাবাকে। সংসারের কেউই যখন ধরে রাখতে পারেনি যেখানে, সেখানে পথ চলায় আমাকে তো ছাড়তেই হবে। সাধুবাবা আর আমি, দাঁড়িয়ে আছি মুখোমুখি হয়ে। বললেন,

—বেটা, আজ বড় আনন্দের দিন আমার। জীবনে এই প্রথম গুরুজীকে ছাড়া তোর কাছে বলতে পারলাম আমার মনের কথা। জয় হোক তোর—জয় হোক।

দেখলাম, চোখদুটো ছলছল করে উঠলো সাধুবাবার। তাকাতে পারলাম না চোখের দিকে। এমন 'সুন্দরী' মন সাধুবাবার, কুৎসিত রূপ আর চোখে পড়ে না। দারিদ্র্যে মানুষের যেমন সমস্ত গুণ নষ্ট হয়, এখানে সাধুবাবার কুৎসিত রূপ নষ্ট হয়েছে শরতের শিউলীর মতো সুন্দর মনের জন্যে। এবার শেষ প্রশ্ন করলাম সাধুবাবাকে,

—বাবা, যে রূপস্রষ্টা আপনার এই রূপ সৃষ্টি করে সংসার, ভোগহীন এই জীবনে এনেছেন—সেই রূপস্রষ্টার স্বরূপ দর্শন কি আপনার হয়েছে?

সাবিত্রী মন্দির চত্বর এখন গমগম করছে লোকে, সাধুবাবার চোখদুটো ছলছল করছে জলে। চোখে জল, অমানবিক মুখখানা। বললেন,

—বেটা, আমার ভিতরে আর কোন যন্ত্রণা নেই।

সাধুবাবাকে প্রণাম করবো বলে একটু ঝুঁকতেই, একটু পিছনে সরে—সরিয়ে নিলেন পা-দুটো। বাঁহাতে লাঠিটা ধরে ডান হাতটা মাথায় বুলিয়ে দিতে দিতেই বললেন,

—বেটা, ভগবানের স্থাপিত মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে কাউকে প্রণাম করতে নেই, নিতেও নেই।

সাবিত্রী পাহাড়ের চূড়ায় এলাম মন্দির প্রাঙ্গণে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে ফুরফুর করে। এবার একা বসে একটু বিশ্রাম নিলাম। সিঁড়ি ভাঙার ক্লান্তি দূর হলো। পাহাড়ের গায়ে চারদিকেই রয়েছে অসংখ্য নানা ধরনের গাছ-গাছালি। পরিবেশও বড় মনোরম। এখানে দাঁড়িয়েই দেখা যায় পুষ্কর সরোবর, আরও বহু দূরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। আবার পুষ্কর সরোবরের কাছে দাঁড়িয়ে সাবিত্রী মন্দিরকে

দেখলেই মনে হয়, পাহাড়ের মাথায় যেন পরানো হয়েছে একটা সাদা টোপর।
পুষ্কর সরোবর থেকে সাবিত্রী পাহাড় দেখলে মনে হয় যেন খুব বেশী দূরে নয়। কিন্তু বেশ কিছুটা দূরে—৬ কি. মি.। অনেকটাই আসতে হয়েছে বালির উপর দিয়ে। মন্দিরে আসার পথে ধাপ বা সিঁড়ি পেরিয়ে এসেছি মোট ৩৬০টা। তীর্থ-যাত্রীদের বেশ কষ্ট হয় পাহাড়ে উঠতে। তাই যাত্রীদের পথকষ্ট নিবারণের জন্যে এই সিঁড়ির মতো ধাপগুলি নির্মাণ করে দেন তৎকালীন যোধপুরের রাজার এক দেওয়ান। তাও এখন থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে। সমতল থেকে পাহাড়ের উচ্চতা প্রায় দেড় হাজার ফুট। উঠতে সময় লাগলো প্রায় এক ঘণ্টা।
পুষ্করে ব্রহ্মার যজ্ঞে অপমানিতা স্ত্রী সাবিত্রী প্রতিষ্ঠিতা হন এই পাহাড়েরই চূড়াতে। তাই নাম হয়েছে তাঁরই নামে—সাবিত্রীতীর্থ।
সাবিত্রী মন্দিরটি নির্মাণ করেন মাড়োয়ারের মহারাজা অজিত সিং-এর (১৬৮৭—১৭২৪ খ্রীঃ) পুরোহিত। একেবারেই সাদামাটা মন্দির। শিল্পের এবং শিল্পীর কোন ছোঁয়া নেই পাথরে নির্মিত এই ছোট্ট মন্দিরে। বাইরের দেয়ালের রঙ সাদা। মন্দিরমধ্যে প্রতিষ্ঠিতা দেবী সাবিত্রী। সাদা ধবধবে পাথরের সুন্দর মূর্তি। টানা টানা চোখ। তারই পাশে রয়েছে আরও একটি মূর্তি—দেবী সরস্বতী। তবে পদ্মে বসা নয়, দাঁড়ানো। বীণা নেই হাতে।
মন্দির প্রাঙ্গণেই রয়েছে একটি বিশাল গাছ। এরই নীচে রয়েছে একটি বহুকালের শিবলিঙ্গ। একটি ছোট্ট জলের কুণ্ডও আছে মন্দির প্রাঙ্গণের বাইরে। অসংখ্য যাত্রী সমাগম হয়েছে এই মন্দিরে। তাঁরা পুজো দিচ্ছে শুকনো নারকোল, নকুলদানা আর মিছরী। সবই শুকনো ভোগ। বাড়ীতে প্রসাদ হিসেবে নিয়ে যেতে অনেক সুবিধে। নষ্ট হওয়ার ভয় নেই। সাবিত্রী মন্দির প্রাঙ্গণে আর তেমন লক্ষণীয় কিছু চোখে পড়লো না। ঘণ্টা খানেক কেটে গেল এখানে। তারপর সাধুবাবার কথা ভাবতে ভাবতে ফিরে এলাম পুষ্করে।
একটু বিশ্রামের পর আবার শুরু হলো চলা। পুষ্কর থেকে বাস ছাড়লো সঙ্গীদের নিয়ে। চললো আবার সেই পাহাড়ী পথ ধরে এঁকেবেঁকে। একই পথে এলো একেবারে আজমীর স্টেশনের কাছে। আসতে সময় লাগলো মাত্র ২৫ মিঃ। স্টেশন থেকে এবার অটোতে করে এলাম আজমীরের দরগা খাজা সাহেব। পাঁচ মিনিটেই এলাম ২ কি. মি.। টাঙ্গাও রয়েছে অসংখ্য, তারাও যায়। এসে দাঁড়ালাম মূল প্রবেশদ্বারের সামনে।
ছোট্ট সাজানো শহর আজমীর। শহরটি মাদার-পর্বত আর তারাগড় পাহাড়ের মধ্যেই অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা প্রায় দেড় হাজার ফুট। সুন্দর ও উপভোগ্য রাজস্থান হিন্দুপ্রধান হলেও আজমীর শহর মুসলমান প্রধান অঞ্চল।
মোঘল আমলে সম্রাট আকবর বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন রাজপুতদের সঙ্গে। তবে রাজস্থানকে নিজের এক্তিয়ারে রাখতেও কার্পণ্য করেননি তিনি। তাই ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে আজমীরে তৈরী করেন মোঘল সেনাদের জন্যে একটি শক্তঘাটি। আকবর

বহুবারই এসেছেন এই ছোট্ট শহর আজমীরে। সম্রাট শাহজাহানও একদা এখানে এসে আত্মগোপন করেছিলেন পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তাঁর চারটি ছেলের মধ্যে দারা ও সুজার জন্ম হয় এই আজমীর শহরে।
আজমীরে অনেক কীর্তি আছে সম্রাট জাহাঙ্গীরের। সম্রাট তাঁর নিজের জীবন-চরিতে লিখেছেন, ভারতে গোলাপের আতর সর্বপ্রথম প্রস্তুত হয় আজমীরে তাঁর রাজত্ব-কালে। তাঁরই শাশুড়ী সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের মাতা সর্বপ্রথম আতর তৈরী করেন এখানে।
আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতী। একসময় আজমীর ছিল আর্যসমাজের বড় একটি কেন্দ্র। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর দয়ানন্দ দেহত্যাগ করেন এই আজমীরেই।
স্বামী বিবেকানন্দও এই আজমীরে দুবার এসেছিলেন তৎকালীন দেওয়ান বাহাদুর হরবিলাস সর্দার অতিথি হয়ে। ( **Ajmer : Historical and Descriptive by Diwan Bahadur Harbilas Sarda.** )
দরগার বিশাল প্রবেশদ্বার দিয়ে এগিয়ে চলি ভিতরে। এই দ্বারটি নির্মাণ করেন হায়দ্রাবাদের নিজাম ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে। এটির উচ্চতা ৭৫ ফুট।
কিছুটা এগোতেই দুপাশে পড়লো দুটি বিশাল লোহার কড়াই। বাঁ-পাশেরটা একটু ছোট। ডান পাশেরটা বড়। ছোট কড়াইতে দরগায় কোন উৎসব অনুষ্ঠান হলে রান্না হয় একসঙ্গে ৬০ মণ আর ৯০ মণ খিচুড়ী হয় বড়টিতে। এত বড় কড়াই আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই, দেখিনিও কখনও।
আজমীরে থাকাকালীন সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে এই বিশাল কড়াই প্রসঙ্গে লিখেছেন,
"খাজা সাহেবের দরগার জন্য আমি আগ্রাতে একটি বিশাল কড়াই তৈরী করাবার হুকুম পাঠিয়েছিলাম। ঐদিন সেই কড়াইটিকে আমার কাছে নিয়ে আসা হলো। তখন আবার আমি হুকুম দিলাম যে কড়াইটিতে করে দরিদ্রদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করা হোক। আর আজমীরের সমস্ত গরীব-দুঃখীদের একত্রিত করে আমার উপস্থিতিতেই তাদের খাদ্য বিতরণ করা হবে। ভোজনপর্ব শেষ হলে আমি নিজহাতে সকল দরবেশকে টাকাকড়ি দান করেছিলাম।"
আরও একটু এগোতেই বাঁ-পাশে পর পর কয়েকটি দোকান। থরে থরে সাজানো রয়েছে গোলাপের ডালি। এখান থেকেই ফুলের ডালি নিয়ে যাত্রীরা দরগার সমাধিতে দেয় শ্রদ্ধা জানাতে।
আরও কয়েক পা এগোতেই দেখলাম, সামনে বিশাল বাঁধানো চত্বরে টাঙানো রয়েছে বড় একটা চাঁদোয়া। তারই নীচে বসে আছেন অসংখ্য মুসলমান ভক্তরা। ডানদিকেই দরগা সাহেব। ভিতরে প্রবেশ করতে হয় মাথায় একটা রুমাল বেঁধে। মাথায় রুমাল বেঁধে আমরা সকলেই ঢুকলাম ভিতরে। আতর, ফুল আর ধূপের গন্ধে দরগা সাহেব ভরপুর। শ্বেতপাথরে নির্মিত অপূর্ব সুন্দর স্থাপত্য এই সমাধি।

এখানেই চিরশায়িত রয়েছে খাজা বাবার পবিত্রদেহ।

সম্রাট জাহাঙ্গীর আজমীর যাত্রা প্রসঙ্গে তাঁর আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী'তে লিখেছেন,

"জ্যোতির্বিদরা ঐ রাত্রিতেই একটি সুসময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন আজমীর যাত্রার জন্য।

সুতরাং সোমবার ২রা শ্রাবণ অর্থাৎ ২৪শে শাহরিয়র রাত্রিতে সাতটায় সুখ-সৌভাগ্যের মধ্যে আজমীর যাত্রার মনস্থ করি। এই যাত্রার পেছনে আমার দুটি উদ্দেশ্য ছিল। একটি হলো, খাজা মুইনুদ্দিন চিশ্তির অপূর্ব স্মৃতিসৌধ দর্শনের তীর্থযাত্রা। সেই মহান পূত আত্মার আশীর্বাদেই এই গৌরবান্বিত পরিবারের অনেক সুখ-সৌভাগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি সম্রাট হয়ে তাঁর পরম পূত পীঠস্থানে তীর্থযাত্রার অবকাশ পাইনি। দ্বিতীয় কারণ—বিদ্রোহী অমর সিংহকে পরাস্ত করা। ...এখন চলছে আমার রাজত্বের অষ্টম বর্ষ।

...রবিবার রাত্রিতে পড়েছিল মহানপুরুষ খাজা মুইনুদ্দিনের বাৎসরিক স্মৃতিদিবস। আমি তাঁর পবিত্র দরগায় গিয়ে সেদিন মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সেখানে কাটিয়ে এসেছি। দরগার সুফীরা ও অপরাপর শিষ্য-ভক্তরা সকলেই সমাধিস্থভাবে আবিষ্ট হলেন। আমি নিজহাতে ফকির সম্প্রদায়কে ও দরগার সেবকদের দান করলাম সবসুদ্ধ ছয় হাজার টাকা। আরও দিয়েছিলাম এক শতটি 'শউর-কুর্তা' (পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলের আলখাল্লা) ও সাত শত মুক্তার মালা, প্রবাল, স্ফটিক ইত্যাদি।"...

খাজা মৈনুদ্দিন চিশ্তি ছিলেন আকবরের ধর্মগুরু। ১১৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন আফগানিস্থানে। পরে সুলতান সাহাবুদ্দিন ঘোরীর সৈন্যদের সঙ্গে তিনি ভারতে আসেন। স্থায়ীভাবে বসবাস করেন আজমীরে। বিবাহ করেছিলেন চিশ্তি। সন্তানাদিও ছিল তাঁর। মৈনুদ্দিন ছিলেন উন্নত সাধক। ১২৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে চিশ্তি সাহেবের মূল কবরের উপর বিরাট দরগা নির্মাণ করেন তাঁরই পুত্র সুলতান মহম্মদ খিলজী। এই দরগায় একটি বিশাল মসজিদ নির্মাণ করে দেন সম্রাট আকবর ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রায়ই তিনি আসতেন এই দরগা দর্শনে। এখানকার সমাধিকে কেন্দ্র করে একটি সম্মেলন কক্ষ এবং একটি বুলন্দ দরওয়াজা নামে গড়ে তোলা হয়েছে দুটি মসজিদ। এই মসজিদে আকবরের মতো অবদান আছে সম্রাট জাহাঙ্গীরেরও। সম্রাট শাহাজানের অবদানও কম নয়। দরগার মধ্যে শ্বেতপাথরের জুম্মা মসজিদটি তাঁরই কীর্তি।

দেওয়ান বাহাদুর হরবিলাস সর্দা আজমীরের দরগা খাজা সাহেব সম্পর্কে বলেন, 'দরগাস্থিত গৃহগুলি হিন্দু ও জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দ্বারা নির্মিত। এই দরগাস্থ সমাধির নীচে একটি শিবমন্দির আছে। দরগা থেকে জায়গীরপ্রাপ্ত এক ব্রাহ্মণ পরিবার পুরুষানুক্রমে এই মন্দিরে সকলের অজ্ঞাতসারে গোপনে শিবের পূজা দিয়ে আসেন।' ( Ajmer : Historical and Descriptive, P. 88-90. )

আজমীরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা অজয়পাল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে অজয়পাল এই শহর স্থাপন করে নিজ নামানুসারেই শহরের নাম রাখেন অজয়মেরু দুর্গ, তার থেকেই এসেছে আজমীর শব্দ। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এখানে রাজত্ব করেন চৌহান রাজারা। আজমীরের প্রথম রাজা অজয়পাল সন্ন্যাস গ্রহণ করেন বৃদ্ধ বয়েসে। পরে আজমীরের নিভৃত এই স্থানটিতে বসে সাধনা ও সিদ্ধিলাভ করেন। প্রবাদ আছে, পুষ্করের চার সীমানায় চারটি শিবমন্দির স্থাপন করেন ব্রহ্মা। অজয়গন্ধেশ্বর, বৈজনাথ, অর্ধচন্দ্রেশ্বর আর নন্দকেশ্বর। আজমীরে অর্ধচন্দ্রেশ্বর মন্দিরের উপরেই অবস্থিত খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তির দরগা। সমাধির নীচে ভূগর্ভে মন্দির প্রকোষ্ঠে রয়েছে অর্ধচন্দ্রেশ্বর মহাদেব। এই মহাদেবের দর্শন করতে পারে না হিন্দুরা। জনশ্রুতি আছে, চিস্তি সাহেব এই মহাদেবের বরেই নাকি সিদ্ধিলাভ করেন।

বিখ্যাত ফরাসী পর্যটক Victor Jacquemont আজমীরে এসেছিলেন ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে। এখানকার প্রাকৃতিক শোভা এতই মনোরম যে, তিনি আজমীর পরিদর্শন করে মুগ্ধ হয়ে তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, 'শহর আজমীরের শোভা শতগুণ বেড়ে যায় বর্ষাকালে। তখন চারপাশের পর্বতগুলি সবুজ রঙে রাঙায়িত হয়ে এক অপূর্ব রূপ ধারণ করে। পাহাড়ের পিছনে অসীম নীলাকাশ, তার পাদদেশে আনা সাগর, বিশালা হ্রদ, ফয় সাগরের উচ্ছ্বলিত জলরাশি আর অদূরেই ক্যাজমা, আস্তেথ এবং বৈজনাথ—এই তিনটি জলপ্রপাতের মৃদুমন্দ গর্জন এবং পার্বত্য নদীগুলির নিম্নমুখী প্রবাহ—চোখ কানের এক অপূর্ব মোহ সৃষ্টি করে। বর্ষার সময় যখন বনে জঙ্গলে উদ্যানে শত শত গোলাপ আর সহস্র সহস্র চামেলী ফুল ফোটে—তখন তার সুগন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে আজমীরের আবহাওয়া।' ( **Letters from India by Victor Jacquemont.** )

এখানকার জলবায়ু সম্পর্কে ডাঃ আর. এইচ. আর্ভিন সাহেব লিখেছেন, 'ছবির মতো সুন্দর শহর আজমীর। গরমকালে এখানে গরম কয়েকদিনের বেশী স্থায়ী হয় না। ৯০ ডিগ্রী উত্তাপ উঠলেই বর্ষা নামে।' ( **Medical Topography of Ajmer by Dr. R. H. Irvine, P. 66.** )

আজমীর পরিভ্রমণ করে অভিভূত সাহেব কেইন লিখেছেন, 'প্রাচীন শহর এই আজমীর ঐতিহাসিক এবং শিল্পসম্পদে পূর্ণ। ভারতের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ইমারত অবস্থিত আজমীরেই। শহরটির চারদিকই পাথরের প্রাচীরে ঘেরা।' ( **Picturesque India by Caine, P. 77.** )

আজমীর শহরের নয়া বাজারেই খাজা দরগা সাহেব। এর পিছনেই তারাগড় পাহাড়। এই জায়গাটির নাম ইন্দ্রকোট। পাহাড়ের উপরেই রয়েছে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ।

বিশপ আর. হিবার তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, 'তারাগড় একটি অসাধারণ দুর্গ। দুর্গটি একপ্রকার দুর্ভেদ্য এবং দুর্গম বললেই চলে। এতে প্রায় বারো-শ লোক বাস করতে

পারে। জলের অভাব নেই এখানে। এতে যদি ইউরোপীয় শিল্পনৈপুণ্য লাগানো হতো, তাহলে এটা দ্বিতীয় জিব্রাল্টারে পরিণত হতো।' ( **Hiber's Journal, Vol. II. P. 48.** )

কর্নেল টড্ বলেছেন, 'তারাগড় দুর্গ আশি একর জমি বিস্তৃত, সমতল ভূমি থেকে ১৩০০ ফুট এবং আজমীর শহর থেকে প্রায় হাজার ফুট উপরে এই দুর্গ নির্মাণ করেন রাজা অজয় পাল। আজমীরের এক পাশে সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তারাগড়।' ( **Tod's Rajasthan, Vol. I. P. 783.** )

এই দুর্গ পরিদর্শন করে কেইন সাহেব লিখেছেন, 'এই দুর্গের দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। বিশেষ করে ভোরবেলায়।' ( **Caine's picturesque India, P. 81.** )

ডাঃ আর্ভিন লিখেছেন, অজয় পাল নির্মিত এই দুর্গের প্রাকারটি কুড়ি ফুট চওড়া, কুড়ি ফুট উঁচু এবং প্রায় দু-মাইল লম্বা ছিল। বর্তমানে এই প্রাকারটি বিলুপ্ত বললে অত্যুক্তি হয় না। দ্বাদশ শতাব্দী যাবৎ এই দুর্গের উপর কত যে যুদ্ধ হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।' ( **Dr. R. H. Irvine's Medical Topography of Ajmer.**)

'আকবর-উল-আখিয়ার' নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে, 'তারাগড় ভারতের সর্বপ্রথম দুর্গ। সোমনাথ এবং থানেশ্বর বিখ্যাত মন্দির দুটির ধ্বংসকারী গজনীর সুলতান মামুদ ১০২৪ খ্রীষ্টাব্দে আক্রমণ করেন তারাগড়। যুদ্ধে আহত এবং অকৃতকার্য হয়ে পালিয়ে যান। এটাই তারাগড়ের উপর প্রথম আক্রমণ।'

খাজা বাবার দরগা থেকে এই তারাগড়ের পাদদেশে এসেছি অটোতে। সামান্য পথ। সময়ও লেগেছে সামান্যই। অটো থেকে নেমে ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলাম 'আড়াই দিন কা ঝোপড়া'তে।

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কথা। তখন চৌহান রাজা ছিলেন চতুর্থ বিগ্রহরাজ। তিনি আজমীরের এই তারাগড়ে নির্মাণ করেছিলেন একটি সংস্কৃত কলেজ এবং সরস্বতী মন্দির। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদঘোরী তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পরাজিত করেন পৃথ্বীরাজ চৌহানকে। জয় করেন আজমীর। আদেশ দেন, মন্দির এবং কলেজ ভেঙে আড়াই দিনের মধ্যে বানিয়ে দিতে হবে মসজিদ। সঙ্গে সঙ্গেই ঘোরীর আদেশে আড়াই দিনের মধ্যেই মন্দির রূপান্তরিত হলো মসজিদে। নাম হলো 'আড়াই দিন কা ঝোপড়া'। হিন্দুর বহু দেবদেবীর মূর্তি আজও আছে নামে ঝোপড়া এই প্রাসাদের দেয়ালে। এটি হিন্দুস্থাপত্যের এক শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন বললে বেশী বলা হবে না।

এরপর ক্ষমতায় এলেন ইলতুৎমিস্। এই ঝোপড়ার সংস্কার করলেন তিনি। সেটা ১২১১ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর ১২১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশদ্বারের চারদিকে তিনি খোদাই করে দেন বড় বড় আরবী অক্ষর।

আড়াই দিন কা ঝোপড়ার ঐতিহাসিক গুরুত্ব যেমন আছে, তেমনই দেখার মতো এর শিল্পকলা সম্ভার। জেনারেল ক্যানিংহাম সাহেবের ( ভারতের ডিরেক্টর জেনারেল

অব আর্কিওলজি ) মতে, 'প্রত্নতত্ত্ব বা ইতিহাসের দিক থেকে আজমীরে অবস্থিত আড়াই দিন কা ঝোপড়ার মূল্য অনেক। যে সূক্ষ্ম শিল্প, অপূর্ব সুন্দর কারুকার্য এবং শ্রমসাধ্য বৈচিত্র্য হিন্দুশিল্পীরা দেখিয়েছেন এই প্রাসাদের দেয়ালে, জগতে তা অতুলনীয়। এই ভাঙা প্রাসাদটি পৃথিবীর মহত্তম প্রাসাদেরই সমকক্ষ।' (Archeological Survey of India, Vol. II. P. 2.)

কর্ণেল টড্ এই প্রাসাদের শিল্পকলার কাজে মুগ্ধ হয়ে বলেছেন, 'এই গৃহটি হিন্দুশিল্পের উৎকর্ষের এক অপূর্ব নিদর্শন।' ( Annals and Antiquities of Rajasthan. Vol. I. P. 778.)

শিল্পবোদ্ধা সাহেব ফার্গুসনের মতে, 'সূক্ষ্ম কারুকার্য হিসাবে এই ঝোপড়া বোধ হয় পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। এর সূক্ষ্মতম সৌন্দর্যের কাছে কাইরো বা পারস্যের কিছুই দাঁড়াতে পারে না। এর সঙ্গে স্পেন বা সিরিয়ার কোন কারুকার্যের উপমা চলে না। ( History of Indian and Eastern Architecture by Fergusson, P. 513. )

'আড়াই দিন কা ঝোপড়ার সমগ্র দেয়ালের বাইরের সূক্ষ্ম কারুকার্যের যে রমণীয় বৈচিত্র্য লেসের (Lace) সঙ্গেই তার তুলনা চলতে পারে।' এ-কথা বলেছেন ডাঃ ফিউরার। (Archeological Survey Report ( N.W.R. ) by Dr. Fuhrer. for 1893.)

মিঃ এ. এল. পি. টুকার (Tucker) বলেন, '১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে একটি শ্বেতপাথরের শিবলিঙ্গ পাওয়া গেছে ঝোপড়ার উঠোন খনন করে। সুতরাং এই ঝোপড়া নির্মাণের শিল্পী হিন্দু, জৈন নয়।' (Archeological Survery Report, for 1902-3, P. 81.)

কাউজেনস্ (Cousens) সাহেবের মতে, 'ঝোপড়ার শিল্প নিঃসন্দেহে হিন্দু, জৈন নয়। দেয়ালের গায়ে মহাকালী, শিবপার্বতী এবং কুবের প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর ভাঙা মূর্তি দেখা যায় এখনও।' (Archeological Survey Report, Western India, for 1900.)

ডাঃ কীলহর্ণ (Dr. Keilhorn) ঝোপড়ার দেয়ালে প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা 'ললিত বিগ্রহরাজ নাটক'এর শিলালিপির কিছু অংশ বিশ্লেষণ করে লিখেছেন, 'এই সব শিলালিপিতে ললিত বিগ্রহরাজ নাটকের কিছু অংশ লেখা আছে। মহাকবি সোমদেব এই নাটকটি রচনা করেছিলেন আজমীরের মহারাজা বিগ্রহ রাজদেবের সম্মানার্থে।' (Indian Antiquary, Vol. XX. P. 201.)

৫ই মে ১৯৯২, আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত জয়পুর থেকে পি. টি. আই. প্রেরিত সংবাদে বলা হয়েছে, 'আজমীর মসজিদ সরস্বতী মন্দির ছিল বলে দাবি।'

"আজমীরের বিখ্যাত মসজিদ 'আড়াই দিন কা ঝোপড়া' আসলে ছিল সরস্বতী মন্দির। এই মন্তব্য করেছেন রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ঐতিহাসিক ডঃ আর. নাথ। এই মসজিদটির ভিতরে ভাস্কর্যই এর প্রমাণ দিচ্ছে বলে তিনি

দাবি করেছেন।

মুঘল কলা বিশেষজ্ঞ ঐ ইতিহাসবিদ বলেছেন, ১১৫৩—৬৪ খ্রীষ্টাব্দের চৌহান রাজা চতুর্থ বিগ্রহরাজ-এর আমলে ওই মন্দিরটি তৈরী হয়। দ্বাদশ শতকের শেষ দিকে কুতুবুদ্দিন আইবক এটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। ১২১১—৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সম্রাট ইলতুৎমিস্ মসজিদের সামনের একটি মস্ত প্রবেশপথ তৈরী করান।

মসজিদের উঠোন থেকে পাওয়া দুটি কালো পাথরে নাকি বিগ্রহরাজের লেখা একটি সংস্কৃত নাটকের খানিকটা উৎকীর্ণ আছে বলে দাবি করেছেন ওই ঐতিহাসিক। আর একটি পাথরে নানা দেবদেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। ডঃ নাথ বলেছেন, মসজিদটি যে মন্দির ছিল এটাই তার প্রমাণ।"

তারাগড় পাহাড়ের নীচেই তারাগড় দুর্গ। অনেকের মতে, ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন রাজা অজয়পাল। আবার অনেকে এ-মতও পোষণ করেন, এই দুর্গটি নির্মাণ করেন সম্রাট আকবর ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে।

'তাবাকটি আকবরী' গ্রন্থে বলা হয়েছে, সম্রাট আকবর আগ্রা থেকে ফতেপুর সিক্রি হয়ে আসেন আজমীরে। এখানে এসে তিনি শহরের চারদিকে পাথরের দৃঢ় প্রাচীর এবং শহরের মাঝে প্রাসাদ নির্মাণের আদেশ দেন। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে নিজে বাস করার জন্যে বাদশা এই মোঘলদুর্গ এবং প্রাসাদ নির্মাণ করান। চারকোণা এই দুর্গটি আয়তনে যেমন বিশাল, তেমনই এর প্রতিটি কোণে রয়েছে আটকোণা বড় বড় গম্বুজ।

মোঘলদুর্গ এবং আকবরের এই প্রাসাদেই রয়েছে রাজপুতানা মিউজিয়াম। আজমীরের এই মিউজিয়ামটিও দেখার মতো। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জন আসেন আজমীরে। তিনি আদেশ দেন মিউজিয়াম স্থাপনের। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে 'প্ল্যান' করেন ভারতের ডিরেক্টার জেনারেল অব আর্কিওলজি। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় মিউজিয়াম।

একদা এই দুর্গের প্রাসাদে প্রতিদিন সকালে বসতেন জাহাঙ্গীর। শুনতেন প্রজাদের সুখ-দুঃখের কথা। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই জানুয়ারী সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রথম দেখা এবং সাক্ষাৎ করেন তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের রাজা জেমস্ (প্রথম)-এর ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত টমাস্‌রো-এর সঙ্গে। রাজকীয় সম্মানে অভ্যর্থনা করেন সম্রাট তাঁর এই প্রাসাদে। তাই এই প্রাসাদটি যতদিন থাকবে ততদিন জাহাঙ্গীর আর টমাস্‌রো-এর স্মৃতি বুকে নিয়েই দাঁড়িয়ে থাকবে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে।

আজমীরের এই মিউজিয়াম ঘুরে দেখতে দেখতে চোখে পড়লো, পদ্মের উপরে শোয়া শিবের উপর দাঁড়ানো কালীমূর্তি, যার ৫৪টি হাত এবং মাথা ১০টি। এর মধ্যে একটি মাথা মানুষের—বাদ বাকি ৯টি মাথা কুকুর, শিয়াল, হাতি, শুকর, বানর, ঘোড়া, সিংহ প্রভৃতির। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর পঞ্চাশটি কার্ষাপন (Punch-Marked) মুদ্রা, মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া প্রাচীন মুদ্রা, তীর্থঙ্কর গোমুখ

যক্ষ এবং সরস্বতী প্রভৃতির নানা জৈন দেবদেবীর মূর্তি, আজমীর থেকে ৩৬ মাইল দূরে ভিলোত মাতার মন্দিরে পাওয়া খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর (প্রাকঅশোক-যুগের) ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা শিলালিপি। এ-ছাড়াও নানা দর্শনীয় দ্রব্যের মধ্যে আছে রাজপুতানার প্রসিদ্ধ রাজা, সম্রাট আকবর, বীরবল এবং অন্যান্য অনেক মোঘল সম্রাটের সুন্দর সুন্দর তৈলচিত্র। এর মধ্যে নূরজাহানের প্রাচীন ছবিও আছে একটি।

আড়াই দিন কা ঝোপড়া আর মিউজিয়াম দেখতে দেখতে বিকেল হয়ে গেল। অটোতেও চলে এলাম আজমীরের আনা-সাগরের ধারে। আসতে সময় বেশী লাগলো না, সামান্য পথ।

আনা-সাগর—নামেই সাগর। আসলে এটি একটি বিশাল কৃত্রিম হ্রদ। বড় বড় ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে পাড়ে। হাওয়া বইছে হু-হু করে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরে আছে আনা-সাগর। ওপারেই নাগ পাহাড়। এপারে শ্বেত পাথরে বাঁধানো লম্বা সুন্দর চত্বর। এরই মাঝে মাঝে রয়েছে শ্বেতপাথরের ছত্রি। এই ছত্রির নীচ দিয়ে বাঁধানো সিঁড়ি নেমে গেছে হ্রদের জলে।

রাজা পৃথ্বীরাজের পিতামহ ছিলেন রাজা আনাজী বা অর্ণরাজ। ১১৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এই হ্রদ নির্মাণের কাজ শুরু করেন তিনি। সম্পূর্ণ হয় ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে। এই হ্রদের পরিধি প্রায় ৮ মাইল। গভীরতায় প্রায় ১৫/২০ ফুট।

আজমীরে বসবাসকালীন একদা এই আনা-সাগর দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। হ্রদের পাশেই গড়ে তুললেন সুন্দর একটি প্রমোদকানন। নাম দিলেন দৌলতাবাগ। একইসঙ্গে নির্মাণ করলেন মনোরম মার্বেল পাথরের একটি বিশ্রাম ভবন। এই হ্রদের তীরে রয়েছে সুন্দর একটি মন্দির। মহাবীরের মূর্তি স্থাপিত আছে মন্দিরে।

সম্রাট জাহাঙ্গীরও তাঁর 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী' আত্মজীবনীতে লিখেছেন,

"আজমীরের কাছে ভারি সুন্দর গভীর একটি গিরিসংকট আছে। তার শেষ প্রান্তে একটি ঝর্ণাধারা এসে লম্বা চওড়া এক সরোবর রচনা করেছে। এর জল আজমীরের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। গোটা উপত্যকা ও প্রস্রবণটি 'হাফিজ জমাল' নামে সুবিদিত। আমি ঐ স্থানটি অতিক্রমকালে হুকুম দিলাম যে ওখানে বিশেষ উপযুক্ত ধরনের একটি বাড়ী তৈরী করতে হবে। কারণ জায়গাটি অতি উত্তম ও মনোরম। তাছাড়া উন্নতিলাভের যোগ্য। এক বছরের মধ্যেই ওখানে একটি বাড়ী, উদ্যান ও অঙ্গন তৈরী হয়েছিল। যাঁরা সারা বিশ্ব ঘুরে বেড়ান তাঁরাও ওই রকম সুন্দর আর একটি জায়গার কথা উল্লেখ করতে পারবেন না। চল্লিশ গজ মাপের চৌকো একটি জলাধার নির্মিত হয়েছিল। একটি ফোয়ারার মাধ্যমে তার জল উপরে উঠতে থাকে। ঝর্ণার ধারা দশ-বারো ফুট উঁচু হয়ে ওঠে। বাড়ীটি নির্মিত হয়েছিল জলাশয়ের কিনারায়। যেখানে বৃহৎ সরোবর ও প্রস্রবণ রয়েছে। তার উপরিভাগে চমৎকার রমণীয় একটি স্থান রচনা করে সুন্দর কক্ষসারি ও বিশ্রামাগার তৈরী হয়েছে অতি

উপভোগ্য রকমে। বাড়ী-ঘরগুলি তৈরী হয়েছিল খুব সুনিপুণ রীতিতে। আর তা সুদক্ষ চিত্রকার ও শিল্পীদের দ্বারা অলঙ্কৃত করাও হয়েছিল। আমার আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল যে এই রমণীয় স্থান ও আবাসের একটি যোগ্য মহিমামণ্ডিত নাম রাখা হোক। তাই নাম দেওয়া হলো 'চস্মান্ই-নূর' অর্থাৎ 'আলোর ঝর্ণা'। এই কাজের মূল পরিকল্পনায় আমাদের কিছু ত্রুটি হয়েছিল। এটি তৈরী করা উচিত ছিল এমন একটি স্থানে বা বড় শহরে যেখানে মানুষ হামেশা যাতায়াত করে অথবা অনবরত লোক সমাগম হয়। এখানকার সৌধ ও আবাস তৈরীর কাজ শেষ হতে আমি প্রায় প্রতি বৃহস্পতি ও শুক্রবার সেখানেই কাটিয়েছি। আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম যে গৃহটির নির্মাণকার্য শেষ হলে উপযুক্ত একটি পরিচয়লিপি ও সন তারিখ যেন উৎকীর্ণ করা হয় ওটির মুখপাতে। সৈদা জিলানি হলেন স্বর্ণকারদের মধ্যে মুখ্য ব্যক্তি। তিনি এই পংক্তিটি রচনা করে দিয়েছিলেন এই উদ্দেশ্যে।
'শাহ নূর উদ্দিন জাহাঙ্গীরের প্রাসাদ (১০২৪)'।"

১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে স্যার টমাস্রো যখন আজমীরে এসেছিলেন তখন তিনিও মুগ্ধ হয়ে যান এই আনা-সাগর দেখে। পরে মনোরম বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে।

জাহাঙ্গীরের পর এলো শাজাহানের রাজত্বকাল। শাজাহানও আকর্ষিত ও মুগ্ধ হলেন আনা-সাগরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে। তিনিই বাগিচার মধ্যে হ্রদের পাড়ে নির্মাণ করে দিলেন শ্বেতপাথরের চত্বর। লম্বায় ১২৪০ ফুট। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে আনা-সাগর সংস্কার করেন ভারত সরকার। একইসঙ্গে জাহাঙ্গীরের প্রমোদ কানন দৌলতাবাগও।

প্রায় দেড় হাজার বছরের প্রাচীন আজমীর শহরের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখা হলো একেবারে ঝড়ের বেগে। কারণ বাঁধা সময়ের ভ্রমণসূচী। তাই দেখে নিতে হয়, ঘুরে বেড়াতে হয় একটু দ্রুততার সঙ্গে। আমরা আবার সদলবলে ফিরে এলাম আজমীর স্টেশনে, যেখানে প্রথম ট্রেন চলে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট।

## জহরব্রতের চিতোরগড

ভ্রমণপথে ট্রেনে এসে বসলেই শুরু হয়ে যায় সহযাত্রীদের সংসারের পাঁচালী। কথায় কথায় শুরু হয় নানা কথা। দেখে আসা স্থানের কথা হয় না অধিকাংশক্ষেত্রেই। কোমর ব্যথা, পায়ের ব্যথা থেকে শুরু হয়ে যায় সংসারে কার কি মনের ব্যথা—শুধু সেই কথা। সহযাত্রীদের সেই সংঘবন্ধ ভ্রমণে কথা হয় অনেক তবে কৃষ্ণকথা নয়।

এখনও অনেক দেরী আছে আমাদের ট্রেন ছাড়তে। সামান্য বিশ্রামের পর আমার সামনে উপরের বার্থের এক সহযাত্রী নীচের বার্থে বসা দাদাকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন,

—এখন আপনি কিসে আছেন? স্বাধীন পেশায় আমি ডাক্তার।

উত্তরে সহজ সরল কণ্ঠে নীচের সহযাত্রী দাদাকে বললেন,

—এখন আমি গভমেণ্ট অফিসে আছি।

শুরু হলো তাঁদের কথোপকথন। শুনলাম ছোট্ট একটা কথা—আমি ডাক্তার। আমি দেখেছি ভ্রমণপথে, কোন উৎসব অনুষ্ঠানে, প্রথম আলাপ পরিচয়ে—ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পুলিশ এবং ব্যাঙ্কে কর্মরত যারা, তাদের বেশীরভাগই 'আমি ডক্টর', 'আমি ইঞ্জিনিয়ার,' 'আমি পুলিশে আছি' বলে আগ বাড়িয়ে নিজের কর্মের কথা বলেন। কেউ জানতে চাইলে তো বলেনই, না চাইলেও 'আমি' দাদাদের যেকোন ভাবে নিজের ওই কর্মের কথা না বলা পর্যন্ত যেন শান্তি নেই। এ আমার বহু অভিজ্ঞতায় দেখা।

আর দেখেছি, যারা সরকারী অফিসে বেয়ারা বা কেরাণীপদে আছেন, তাদের সঙ্গে পরিচয় হলে কখনই তারা পদের কথা বলেন না। তাদের সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'এখন আমি গভমেণ্ট অফিসে আছি।' কিন্তু কখনই তাদের পদের কথা বলতে শুনিনি আগ বাড়িয়ে, যারা আছেন অনেক অ-নে-ক বেশী যোগ্যতা নিয়ে উচ্চপদে, কোন বিশেষ কর্মে।

ইতিমধ্যেই আমাদের বগি লেগে গেছে আমেদাবাদগামী ট্রেনে। আজমীর শরীফ থেকে ট্রেন ছাড়লো রাত ৮/১০ মিঃ।

আমার যেমন কোন কাজ নেই—কাজ নেই আর সব সহযাত্রীদেরও। যে যার জায়গায় বসে কথা বলছেন তার সামনে বসা সহযাত্রীদের সঙ্গে। 'আমি ডাক্তার' দাদাকে ছেড়ে উঠে এসে বসলাম এক অল্প বয়স্কা ভদ্রমহিলার পাশে। এই ভদ্রমহিলার স্বামী গিয়ে বসেছেন আর এক সহযাত্রীর পাশে। একঘেয়েমী কাটানোর জন্যে সকলেই যায় সকলের কাছে। এই ভদ্রমহিলা কথা বলছিলেন তার সামনে বসা এক বয়স্কা ভদ্রমহিলার সঙ্গে। বয়েস পঞ্চাশের উপরেই হবে। বিবাহিতা। চওড়া পেড়ে শাড়ি পরা। আমি এসে বসলাম তাদের কথার মাঝে। কথায় ছেদ পড়বে ভেবে কোন কথা বললাম না। পূর্বে কোন কথার সূত্র ধরেই অম্লানমুখে বললেন অল্প বয়স্কা দিদি,

—আমার শ্বশুরটা খুব ভালো মানুষ। কারও কোন সাথেপাছে নেই। শাশুড়ীটাই পাজী। বিয়ের পর থেকে একটা দিনের জন্যে শান্তি পেলাম না। সব সময় পিছনে লেগেই আছে। স্বামী ডিউটি থেকে এলে আমার নামে যা তা লাগায়। কানভাঙানী দেয়। তাই শুনে স্বামীও বড্ড অশান্তি করে। আমার বাচ্চাটাকে এতটুকু দেখে না, ধরেও না পর্যন্ত। দেওরের ছেলেটাকে স্নান করানো, খাওয়ানো থেকে শুরু করে সবকিছুই করবে আমার শাশুড়ী। আমার বাচ্চাটার দিকে একবার ফিরেও তাকায় না। অথচ আমার স্বামীই সংসারে খরচা করে বেশী। বিশ্বাস করুন দিদি, সংসারে সবার জন্যে এ্যাতো করি তবুও কারও মন পাই না। ননদটা তো পিছনে সব সময় লেগেই আছে। বসে বসে ঠ্যাং নাচিয়ে খাবে আর আমি সারাটা দিন খেটে খেটে মরি। একটা কুটো গাছও নাড়ে না। আমার স্বামীও অসম্ভব রাগী, বদমেজাজী। আমার কোন কথাই শুনতে চায় না। মাঝে মাঝে মনে হয় বিষ খেয়ে মরি। শুধু বাচ্চাটার মুখ চেয়ে পারি না।

কথাটা শেষ হতে না হতেই আর এক বয়স্কা বিধবা এসে বসলেন আমার পাশে। 'আমি সকলের জন্যে করলাম কেউ আমাকে দেখলো না'—এমন কথা শুনিনি, এমন নারীপুরুষের সঙ্গলাভ আমার জীবনে খুব কমই ঘটেছে। এবার 'শান্তি পেলাম না দিদি'র কথা শুনে সামনের বয়স্কা ভদ্রমহিলা বললেন,

—দিদি, আপনার যেমন দুঃখ আছে, দুঃখ আমারও আছে। আমার ছেলে একটা হীরের টুকরো। মা ছাড়া ও কিছুই জানতো না। কিন্তু দিদি, বিয়ের পর থেকেই কেমন যেন হয়ে গেল। বউই এখন সব। মাসের মধ্যে অর্ধেক দিনই তো বাপের বাড়ী পড়ে থাকে ছেলেকে নিয়ে। যে কদিন বাড়ীতে থাকে, সন্ধ্যেটা পর্যন্ত দেয় না। বেড়াতে দাও, খুব খুশী। কাজের কোন কথা বললেই মুখ ব্যাজার। বাপের বাড়ীতে নিয়ে ছেলেকে যে কি ফুসমন্তর দেয়—কে জানে! ওখান থেকে বাড়ীতে এলেই শুরু করবে অশান্তি। বেশ বুঝতে পারি, বউমার বাপের বাড়ীর লোকেরা আমার সংসার ভাঙার চেণ্টা করছে।

আমার পাশে বসা বিধবা মাসী কথাগুলো শুনলেন। কোন কথা বললেন না। 'শান্তি পেলাম না দিদি' উত্তরে হীরের মাকে বললেন,

—এ্যাতো অত্যাচার করেও আমার শাশুড়ী শান্তি পেল না। কি আর বলবো দিদি, আমার শাশুড়ী প্রত্যেক শনি মঙ্গলবার যায় এক তান্ত্রিকের কাছে। আমার ক্ষতি করার জন্যে। তুকতাক্ কি সব করে, যার জন্যেই তো আমার বাচ্চাটার শরীর কিছুতেই ভালো হচ্ছে না। স্বামীর মনটাও কেমন যেন আমার উপর বিষিয়ে যাচ্ছে। বিয়ের পর বছরখানেক ও মোটেই এমন ছিল না।

হঠাৎ পাশের খোপ থেকে এক সহযাত্রীর কথা কানে আসায় সকলেই চুপ করে গেলেন। বন্ধ হয়ে গেল এখানকার আলোচনা। দেখতে পাচ্ছি না কাউকে। কথা শুনছি এই রকম, সহযাত্রী বলছেন এক সহযাত্রিনীকে উদ্দেশ্য করে,

—জাতবাবুর মুখে শুনলাম দিদি, আপনি নাকি চাক্রী করেন?

মুখের কোন আওয়াজ বা কথা হলো না। বুঝলাম, ঘাড় নাড়িয়েই হয়তো সম্মতি জানালেন সহযাত্রিনী। এবার সহযাত্রীর কথা শুনলাম,

—কিছু মনে করবেন না দিদি, আমার দশা আপনার স্বামীরই মতো।

কথাটা শুনেই সহযাত্রিনী বিস্মিত কণ্ঠে বললেন,

—মানে!

সহযাত্রী গলাটা একটু খেকার দিয়ে বললেন,

—দেখুন, ব্যাপারটা আপনি গায়ে মেখে নেবেন না। বউ চাকরীজীবী হলে দুটো পয়সা হয় বটে, তবে দুটো ভালো খাওয়া জোটে না কপালে। আমি ছোটখাটো একটা ব্যবসা করি। তাতে যা আয় হয়, সেই আয়ে আমার ভালোভাবে তো চলে যায়ই, উপরন্তু কিছু সঞ্চয়ও হয়। বছরে ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৩০/৪০টা দিন একটু ভালো খেতে পাই শুধু ওই রবিবারে। চাক্রীয়ালা বউ ঘরে থাকলে তার স্বামীর কপালে দুটো ভালো খাবার জোটে বলে তো আমার মনেই হয় না, অন্তত আমার

কপালে যে জোটে না—এ কথাই আপনাকে বলা। সকালে ঘুম থেকে উঠেই শুরু করে তাড়াহুড়ো। একমাত্র ধান্দা থাকে কতক্ষণে অফিসে যাবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ গোপালের মা, না কি একটা ঝি-এর উদাহরণ দিতেন। বলতেন, ঝি বাবুর বাড়ীতে কাজ করে। বাবুর ছেলেকে আদর করে লোকদেখানো। মনটা বাড়ীতে পড়ে থাকে ছেলের জন্যে। ভগবানকে পেতে হলে সংসারে কাজ করতে হবে, মনটাকে রাখতে হবে তাঁর জন্যে। চাকরীজীবী মেয়েই বলুন আর আমার বউই বলুন, দেহটা থাকে বাড়ীতে, মনটা পড়ে থাকে অফিসে। শাশুড়ী থাকলে তো আর কথাই নেই। সংসারের বন্দুক তার ঘাড়েই চাপিয়ে দিয়ে হাওয়া হয়ে যায়।

একটু থামলেন। কোন উত্তর দিলেন না সহযাত্রিনী। সহযাত্রী বললেন,

—কি করে জানেন আমার স্ত্রী? অফিসে যাওয়ার সময় কড়াইতে কোনদিন ডাল, কোনদিন আলুসিদ্ধ চাপিয়ে বলে যায়, তুমি একটু নুন-লঙ্কা দিয়ে মেখে নিও। আর সন্ধ্যের সময় অফিস থেকে ফিরে এসে এলিয়ে পড়বে। ভাবটা এমন, লঙ্কা জয় করে এলুম। তার পরের রান্না শুকনো রুটি, আলুর তরকারী নইলে ভাত—সঙ্গে আর কিছু। এখন ফ্রিজ হয়েছে। সাতদিনের বাসী খাবার একটু গরম করে পাতে দেবে। রবিবারে একবেলা যা একটু ভালো খাই। ভালো মানে ওই একঘেয়ে রান্না। ওর শরীর খারাপ থাকলে তো আর কথাই নেই। এই হলো আমার নিত্য-দিনের খাওয়া। বাচ্চাটার একটু যত্ন হয় না। অযত্নেই বেড়ে উঠছে। বহুবার বলেছি চাকরী ছাড়তে, কিছুতেই রাজী নয়। যার প্রয়োজন আছে—সে করুক। আমার প্রয়োজন নেই। কিছু মনে করবেন না দিদি, আমি দেখেছি, একবার কোন মেয়ে কিংবা ঘরের বউ চাকরী পেলে সে যত কম মাইনেরই হোক, কিছুতেই ছাড়তে চায় না। শুধু ভাবি, চাকরী আর অফিসে যে কি মধু আছে তা উনিই জানেন!

বিধবা মাসী এবার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। বলা হলো না। রাতের খাবার এলো বলে। সকলেই গিয়ে বসলাম যে যার জায়গায়। খাওয়ার পাট চুকলো। ট্রেন চলছে হু-হু করে। মাঝে মাঝেই ট্রেন থামছে স্টেশন এলে। জানলার কাছে মুখ নিয়ে দেখছি যাত্রীদের ওঠা-নামা। অনেক রাত হলো। শুয়ে পড়লেন সকলেই—আমিও। ট্রেন চিতোরগড় পৌঁছাবে রাত ১/৫ মিঃ।

সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখলাম শুধু আমাদের বগিটা দাঁড়িয়ে আছে ট্যুরিস্ট প্ল্যাট-ফরমে। আজমীর থেকে চিতোর এলাম ১৮২ কি. মি.। জয়পুর থেকে এর দূরত্ব ৩২০ কি. মি.।

আজমীর-খাণ্ডোয়া মিটার গেজ লাইনের একটি জংশন স্টেশন হলো চিতোরগড়। উদয়পুর, যোধপুর, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের সঙ্গেও সরাসরিভাবে যুক্ত চিতোরগড়। দিল্লী থেকে দূরত্ব এর ৬৩০ কি. মি.।

সকাল ৯টা। আমাদের অস্থায়ী সংসারের বত্রিশজনকে অটো নিয়ে চললো চিতোর-

দুর্গের দিকে। চললো শহর ছেড়ে শহরতলীতে।

রাজস্থানের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় কর্ণেল জেমস টডের কথা। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে টডের জন্ম ইংল্যাণ্ডে। ১৭ বছর বয়েসে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে তিনি ভারতে আসেন। প্রায় বাইশটা বছর কাটালেন ভারতে। তারপর আবার ফিরে গেলেন তাঁর নিজের দেশে। মৃত্যু হয় ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। ভারতে থাকাকালীন রাজস্থানের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করে তিনি **Annuls and Antiquities of Rajasthan'** নামে একটি বই লিখলেন দুটি খণ্ডে। প্রকাশিত হলো যথাক্রমে ১৮২৯ এবং ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে। কর্ণেল টড-ই প্রথম প্রামাণিক ইতিহাস রচনা করেন রাজস্থানের উপর।

তিনি তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, **"There is not a petty State in Rajasthan that has not had Thermoplyae and Scarcely a City that has not Produced its Leonidas."** ('রাজস্থানের মধ্যে এমন ক্ষুদ্র রাজ্য বা অংশ নেই যেখানে বীরত্বের উত্তাপ নেই এবং এমন কোন শহর নেই যেখানে সিংহ-বিক্রম মানুষের জন্ম হয়নি।')

চিতোরগড় রাজস্থানের এমনই এক বীরভূমি, যা সৃষ্টি করেছিল শৌর্যবীর্য পৌরুষ আর দেশভক্তির উদাহরণ। চিতোরগড়—যার হৃদয়ে আজও লেখা রয়েছে বীর-বীরাঙ্গনাদের আত্মবলিদানের স্মৃতি। চিতোরগড়—এ সেই পবিত্রভূমি, যেখানে গেলেই শোনা যায় মহারাণা প্রতাপের মতো বীর, ভামাশাহের মতো দানবীর দেশভক্ত, মীরার মতো কৃষ্ণপ্রেমিকা, কর্ণাবতীর কথা। চিতোরগড়—এ সেই বীরভূমি, যেখানে রূপসী রাণী পদ্মিনী সম্মান ও সতীত্ব রক্ষার্থে হাসিমুখে আলিঙ্গন করেছিলেন জহর অগ্নিকুণ্ড। চিতোরগড়—যেখানে রাণা সংগার পরাক্রম, গোরা-বাদলের আত্মবলিদান, রাণাকুম্ভের সঙ্গীত সাহিত্য আর কলাসাধনার স্মৃতি বুকে ধরে আছে আজও। চিতোরগড়—যেখানে পান্নাবাঈ মেবারের রাজবংশ রক্ষার্থে নিজের পুত্রকে নিজের চোখের সামনেই দেখেছিলেন হত্যা হতে।

ভারত-ইতিহাসে এঁদের কথা কখনই বিস্মৃতির নয়। বহু শতাব্দী ধরে এঁদের কথাই প্রেরণার স্রোত হয়ে বয়ে চলবে ভারতের বুকে। এঁদের স্মৃতি বুকে নিয়েই চিতোরদুর্গ স্মারক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখনও। একইসঙ্গে হাতছানি দিয়ে ডাকছে দেশবিদেশের অসংখ্য পর্যটকদের। মূক হয়েও চিতোর শোনাচ্ছে নিজের অতীত গৌরবগাঁথা ইতিহাসের কথা।

ছোট্ট সাজানো শহর চিতোর। শহরতলী ছেড়ে অটো এবার ধীরে ধীরে উঠতে লাগলো পাহাড়ী পথ ধরে। সমুদ্রতল থেকে এর উচ্চতা ১৩২৩ ফুট। রাজস্থানের আরাবল্লী পর্বতমালার দক্ষিণ-পূর্ব দিকেই অবস্থিত পাহাড়ী দুর্গ চিতোরগড়।

পারমার রাজবংশের মৌর্য রাজকুমার ছিলেন চিত্রং মোরি। একদা একটি নগর গড়ে তোলেন বর্তমান চিতোরগড়ে। নাম দেন চিত্রকূট। অনেকের ধারণা, চিত্রকূট নাম থেকেই এসেছে চিতোর। কিছু ঐতিহাসিকের মত, চিতোরের কেল্লা সম্ভবঃ

শতাব্দীতে স্থাপন করেছিলেন রাজা চন্দ্রগুপ্ত মতান্তরে চিত্রগুপ্ত। নিজের নাম থেকেই স্থানের নাম রাখেন চিত্রকূট। পরে তা পরিণত হয় চিতোরে। তবে মেবারে পাওয়া ৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রাচীন মুদ্রাতে চিত্রকূট কথাটির উল্লেখ আছে বলে জানা যায়।
মৌর্য রাজকুমারের রাজত্বকালের পর আর কোন্ কোন্ রাজা চিতোরে রাজত্ব করেছিলেন তার কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায়নি। তবে কর্ণেল টডের গবেষণায় ৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজপুতানার মানসরোবরে পাওয়া একটি শিলালিপি থেকে জানা গেছে, রাজা চিত্রং-এর পর রাজা মহেশ্বর, পরে ভীম, ভীমের পুত্র ভোজ এবং তাঁর পুত্র রাজা মোনমৌর্য রাজত্ব করেন চিতোরে।
যাইহোক, গোহিলোট বংশের শিলাদিত্যের পুত্র ছিলেন বাপ্পা রাওয়াল। তিনি নিয়মিত সেবা করতেন হারিত নামে এক ঋষির এবং পুজা করতেন একলিঙ্গ মহাদেবের। সেবাপুজায় তুষ্ট ঋষি বাপ্পাকে বর দেন রাজা হওয়ার। পরে তিনি ৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মোনমৌর্যের কাছ থেকে অধিকার করেন চিতোরদুর্গ তারপর মেবারের রাজধানী চিতোরগড়। ৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে চিতোর আক্রমণ করেন আরব নিবাসী মহম্মদ বিন কাশিম। তবে বীর যোদ্ধাদের সহায়তায় বাপ্পা চিতোরকে নিজের করায়ত্ত রাখলেন আক্রমণ প্রতিহত করে।
গোহিলোট রাজবংশের প্রতিষ্ঠার পর থেকে চিতোর হয়তো একটা দিনও শান্তিতে কাটাতে পারেনি। বহুবার যুদ্ধ, অনেকবার চিতোর আক্রান্ত হয়েছে কখনও দিল্লীর, কখনও গুজরাটের দিক থেকে।
প্রামাণিক তথ্য না থাকলেও ঐতিহাসিকদের ধারণা, বাপ্পা রাওয়ালের পর থেকে কর্ণসিংহের রাজত্বকালের মধ্যে চিতোরে রাজত্ব করেন ২৪ জন রাজা। ১১৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সোলংকি জয়রাজ যশোবর্মণ, ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটের চালুক্য রাজা কুমার পালের আধিপত্যে ছিল চিতোর। ১১১৫ খ্রীষ্টাব্দে চৌহান রাজা চতুর্থবিগ্রহরাজ শাসন চালিয়েছিলেন এখানে। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আবার প্রভাব স্থাপিত হয় চালুক্য ও গোহিলোট বংশের। ১২১৩ থেকে ১২৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নাগদার পতনের পর চিতোরকে রাজধানী করে শাসন চালান ক্ষেত্রসিং। পরাক্রমী এই রাজা পরাজিত করেছিলেন দিল্লীর বাদশা গিয়াসুদ্দিনকেও।
বড় বিচিত্র ইতিহাস এই চিতোরের। বাপ্পা রাওয়াল থেকে শুরু করে রাণা প্রতাপ পর্যন্ত চলেছে একের পর এক যুদ্ধ। তবে চিতোর মূলত মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয় তিনবার।
১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খিলজীর সঙ্গে যুদ্ধ হলো রাওয়াল রতনসিং-এর। এটাই চিতোরের প্রথম লুণ্ঠন নামে পরিচিত। জয়লাভ করলেন আলাউদ্দিন। পুত্র খিজির খাঁকে দিলেন মেবারের শাসনভার। ওই সময় চিতোরে নাম দেয়া হয়েছিল খিজিরাবাদ।
এবার খিজির খাঁ চিতোরের রাজকার্যের ভার দিলেন কান্তাদেবের ভাই মালাদেবের হাতে। ভাগ্য প্রসন্ন হলো গোহিলোট বংশের। বাপ্পা রাওয়ালের বংশধর দূরদর্শী

ও প্রবল পরাক্রমী হাম্বির এদের হাত থেকে উদ্ধার করলেন চিতোরকে। যোগ্যতার সঙ্গে রাজকার্য চালালেন পঞ্চাশ বছর ধরে।

হাম্বিরের পর ১৩৬৫—১৩৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাণা ক্ষেত্রসিং এবং ১৩৭৩—১৩৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চিতোর শাসন করলেন রাণা লাখা বা লক্ষ্মণ সিং।

এরপর ১৩৯৮ থেকে ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোকল-এর রাজত্বকাল। ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মেবারের শাসনভার এলো ইতিহাস প্রসিদ্ধ মোকলের পুত্র মহারাণা কুম্ভের হাতে। রাণা কুম্ভ ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মহম্মদ খিলজীকে পরাজিত করে চিতোর পুনরুদ্ধার করেন। মহারাণা কুম্ভের রাজত্বকালকে বলা হয়ে থাকে মেবারের স্বর্ণযুগ। এই সময় কুম্ভ বড় বড় প্রাসাদ, অজেয় দুর্গ বা কেল্লা তৈরী করেছিলেন অনেকগুলি। কুম্ভের পর চিতোর আরও গৌরবময় হয়ে উঠেছিল রাণা কুম্ভের নাতি রাণা সংগার ( সংগ্রাম সিংহ ) শাসকাল ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে।

১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আবার কালো মেঘে ভরে উঠলো মেবারের আকাশ। দ্বিতীয়বার আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হলো চিতোর। আক্রমণ করলেন গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ। এই সময় মেবারের ইতিহাসে ঘটে গেল এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। ঘটনাটি এই রকম,

মহারাণা সংগ্রাম সিংহের স্ত্রী ছিলেন রাণী কর্ণবতী—উদয় সিংহের মা। ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বাহাদুর শাহ যখন চিতোর আক্রমণ করলেন তখন উদয় সিংহ ছিলেন একেবারেই শিশু। রাজপুত বীরদের সঙ্গে নিয়ে রাণী কর্ণবতী প্রবলভাবে বাধা দিলেন সুলতান বাহাদুর শাহকে। কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। এ-সময় অনন্যোপায় হয়ে রাজপুতদের প্রথানুসার রাণী কর্ণবতী একটি রাখী পাঠালেন দিল্লীর বাদশা হুমায়ুনের কাছে সাহায্য চেয়ে।

এই রাখী পাঠানোর প্রথায় একটি মধুর ধর্মীয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যিনি পাঠান এবং যার কাছে পাঠান তার সঙ্গে। সম্পর্ক হয় ভাই-বোনের। এই প্রথানুসারে একে অপরকে যেকোন বিপদে সাহায্য করবে, এটাই ছিল প্রচলিত নিয়ম। সেই সময় রাখী পাওয়াটাও ছিল একটা বিশেষ সামাজিক সম্মানের ব্যাপার।

হুমায়ুন রাখী পেলেন এমন সময়, যখন তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন বাংলার এক বিদ্রোহদমনে। তবুও তিনি দ্রুততার সঙ্গে যাত্রা করলেন চিতোর অভিমুখে। দূরত্ব বড় নয়। সুতরাং আসতে দেরী হলো পথে। যখন হুমায়ুন চিতোরে এসে পৌঁছালেন তখন সব শেষ হয়ে গেছে। শত শত রাজপুত বীর তখন রণক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করেছেন। আর নিশ্চিত পরাজয়ের গ্লানি থেকে চিরতরে মুক্তি পেতে রাজপুত রমণীদের সঙ্গে নিয়ে রাণী কর্ণবতী প্রাণ দিয়েছেন জহরব্রতে।

হুমায়ুন কিন্তু ছেড়ে দিলেন না। যুদ্ধের শুরুতেই পরাজয় নিশ্চিত হবে জেনে গুজরাট সুলতান বাহাদুর শাহ চিতোর ছেড়ে পালিয়ে গেলেন গুজরাটে। অবশ্য দিন পনেরো বাহাদুর শাহের দখলে ছিল চিতোরকেল্লা। এই যুদ্ধে সুলতানকে সাহায্য করেছিলেন মালবের রাজা। তাকেও হুমায়ুন করলেন রাজ্যচ্যুত। তারপর

দিল্লী ফিরে যাওয়ার আগে মালবরাজের ছেলে বিক্রমজিৎকে বসালেন তাঁরই সিংহাসনে।
এরপর উদয় সিংহের কথা। উদয় সিংহের বয়েস যখন বছর পনেরো, তখন মহারাণা সংগ্রাম সিংহের ভাই পৃথ্বীরাজের দাসীপুত্র বনবীর এলেন চিতোরে। আশ্রয়প্রার্থী হলেন মহারাণা বিক্রমাদিত্যের। মঞ্জুর হলো প্রার্থনা। বনবীর দেখলেন, এখন বয়েস কম হলেও পরবর্তী মেবারের রাণা হবে উদয় সিংহ। রাজ্য অধিকারের লোভে বনবীর হত্যা করলেন প্রথমে বিক্রমাদিত্যকে। অধিকার করলেন মেবারের সিংহাসন।
এবার ষড়যন্ত্র করলেন উদয় সিংহকে হত্যা করে পথ পরিষ্কার করবেন। এই ষড়-যন্ত্রের গোপন খবর আর হত্যার দিনটি জানতে পারলেন উদয় সিংহের ধাইমা পান্না। তখন পান্না রাণার বংশকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে একেবারে সাধারণ পোশাক পরিয়ে এক বিশ্বস্ত পরিচারিকার সঙ্গে উদয়কে পাঠিয়ে দিলেন বহুদূরে কমল-মীরের দুর্গে। সেখানে উদয় বড় হতে লাগলেন আশা শাহের ভাইপো হয়ে।
এ-দিকে নির্দিষ্ট দিনে পান্না নিজপুত্রকে রাজপোশাক পরিয়ে শুইয়ে রাখলেন উদয়ের বিছানায়। পান্না-পুত্র আর উদয় ছিল সমবয়সী। রাতের অন্ধকারে রাজ্যলোভী বনবীর পান্নার সামনেই চোখের পলকে দু-টুকরো করে ফেললেন পান্নারই পুত্রকে। ইতিহাসের কোন একটি পাতায় লেখা চিতোরের পান্নার কথা, সে পাতা কখনও খোয়া গেলেও ভারতবাসী ভুলবেনা তাঁর ত্যাগের কথা।
এবার ধীরে ধীরে রাণা হওয়ার বয়েস হলো উদয়ের। মেবারের সিংহাসনে উদয়কে অভিষেক করলেন রাজপুত সর্দাররা। অনন্যোপায় বনবীর প্রাণ বাঁচাতে পালালেন দাক্ষিণাত্যে। কেল্লার অধিকার ফিরে পেলেন মহারাণা উদয় সিংহ।
এই সময় সারাভারতে মুঘলদের প্রবল আধিপত্য। সম্রাট আকবর প্রায় সব রাজপুত শাসকদের নিজের অধীন করে নিয়েছিলেন—পারেননি উদয় সিংহকে।
১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর। আবার পতন হলো চিতোরের। এবার আক্রমণ করলেন সম্রাট আকবর। মহারাণা উদয় সিংহ মেবারের শক্তি সংগঠিত করতে চিতোরকেল্লার ভার সাইদাস ( সলুম্বর ), শিশোদিয়া পত্ত ( কেলবা ) এবং রাঠোর জয়মলের ( বদনীর ) উপর সঁপে দিয়ে চলে গেলেন। পরে মেবারের নতুন রাজধানী করলেন উদয়পুরে।
একে একে বহু রাজপুত বীর প্রাণ দিলেন এই যুদ্ধে। সাইদাস, পত্ত ও জয়মল প্রমুখ বীরেরা সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশ নিলেও চিতোর কেল্লা চলে গেল সম্রাট আকবরের অধিকারে।
এলো ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দ। মেবারের সিংহাসনে বসলেন রাণা প্রতাপ সিংহ। সেই সময় চিতোরসহ অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল আকবরের অধিকারে। চিতোর উদ্ধারের জন্যে মহারাণা প্রতাপ মোঘলদের সঙ্গে অনেকবারই লিপ্ত হয়েছিলেন যুদ্ধে। নিজ মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও ধর্মরক্ষার্থে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে অত্যন্ত দুঃখময় জীবন-

যাপন করেছিলেন পাহাড়ে জঙ্গলে। তবুও আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেননি তিনি। প্রতাপের সঙ্গে আকবরের যুদ্ধের মধ্যে হলদিঘাটের যুদ্ধই প্রসিদ্ধ। চিতোরগড়ের উপর নিজের অধিকার না পাওয়ার দুঃখ প্রতাপ সবসময়েই করতেন। প্রতাপের দেহাবসান হয় ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী। জনশ্রুতি আছে, প্রতাপের মৃত্যু সংবাদ শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান দিল্লীর বাদশা আকবর, পারেননি তিনি চোখের জল সম্বরণ করতে।

কর্ণেল জেমস্ টড্ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, "আকবরের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নিপুণতা আর অসাধ্যসাধনের ক্ষমতা কিন্তু দৃঢ়চেতা মহারাণা প্রতাপের অদম্য বীরত্ব, উজ্জ্বল কীর্তি রাখার অসীম সাহস এবং নিষ্কপট অধ্যবসায় দমন করতে অসমর্থ হয়েছিল। আল্পস্ পর্বতের মতো আরাবল্লীর এমন কোন ঘাটি ছিল না—যেখানে প্রতাপের কোন না কোন বীরত্বে, উজ্জ্বল বিজয়ে বা পরাজয়ে পবিত্র হয়নি।"

চিতোরগড় স্টেশনের কাছেই বনস্ নদী। স্টেশন থেকেই পাকা রাস্তা একেবারে দুর্গ পর্যন্ত। টাঙ্গা অটো মোটর সবেতেই আসা যায় এই দুর্গে। স্টেশন থেকে আসার পথে পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বাঁদিকে জনতা আবাস। জৈন ধর্মশালা প্রতাপ উদ্যানও পড়েছে বাঁদিকে, যেখানে রয়েছে ঘোড়ার উপরে বসা রাণা প্রতাপের বিশাল মূর্তি।

স্টেশন থেকে দুর্গ—এ-পথেই চৌরাস্তার পাশে রয়েছে আধুনিক ঢঙে নির্মিত ভোপাল ভবন। এটি নির্মাণ করেছিলেন উদয়পুরের মহারাণা ভোপাল সিংহ। বর্তমানে এটি হয়েছে সার্কিট হাউস এবং ডাকবাংলো, পর্যটক আর সরকারী কর্মীদের থাকার সুবিধার জন্যে। বাংলোর সামনেই নেহেরু বাল উদ্যান। এই রাস্তাতেই রয়েছে মীরা পার্ক।

এখান থেকেই রাস্তা দু-ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একটা চলে গেছে উত্তরদিকে ভীলওয়াড়া। পূর্বের পথটা গেছে শহর বা দুর্গের দিকে। এই রাস্তাটি গান্ধীমার্গ নামেই পরিচিত। এ-পথেই আমাদের অটো পার হয়ে এসেছে গম্ভিরী নদীর উপর গম্ভিরী পুল। লম্বায় ৫৬৬ ফুট। এটি নির্মাণ করেছিলেন আলাউদ্দিনের পুত্র খিজির খাঁ। মুসলীমশৈলীতেই নির্মিত হয়েছে পুলটি, যার পাশেই রাজস্থান পরিবহনের বাসস্ট্যান্ড। এর কাছেই শ্বেত পাথরে নির্মিত কাজী চল্পীর শা-এর দরগা।

এসব পেরিয়ে এলাম চিতোরদুর্গে। সুরক্ষিত এই দুর্গ বড় বড় পাথরের প্রাচীরে ঘেরা। প্রায় ৭০০ একর এলাকা নিয়েই গড়ে তোলা হয়েছে এই দুর্গ। লম্বায় ৫·৬ কি. মি.। চওড়ায় কোথাও কোথাও ½ মাইল। রেলস্টেশন থেকে দূরত্ব প্রায় ৩·২ কি. মি.।

এই দুর্গের প্রবেশদ্বার মোট সাতাশটি। এর মধ্যে দুর্গের প্রথম প্রবেশদ্বারটির নাম পাডনপোল। এই পোলে প্রবেশ করার একটু আগেই রয়েছে মহারাণা মোকল-এর

প্রোপৌত্র রাওত বাঘ সিংহের একটি স্মারক। ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান বাহাদুর শাহের দ্বারা চিতোর আক্রান্ত হওয়ার সময় মহারাণা বিক্রমাদিত্যের প্রতিনিধিত্ব করে যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুবরণ করেন বাঘ সিংহ। তাঁরই স্মৃতিতে নির্মিত হয়েছে এই স্মারক।

পাডনপোলের পরেই দ্বিতীয় প্রবেশদ্বার ভৈরোঁপোল। এখানে বাহাদুর শাহের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলেন সোলাঙ্কি ভৈরোঁদাস। তাঁরই স্মৃতিতে নাম রাখা হয়েছে এই দ্বারের। মূল এবং প্রাচীন প্রবেশদ্বারটি ভেঙে যায়। পরে এই দ্বারটি পুনঃনির্মাণ করেন উদয়পুরের মহারাণা ফতেসিং।

চিতোরদুর্গের দ্বিতীয় প্রবেশদ্বার পার হওয়ার পরেই ডানদিকে পড়লো 'জয়মল-কল্লা কি-ছতরিয়া'। চারটি ছোট স্তম্ভবিশিষ্ট স্মারকটি রাঠোর সেনাপতি বীর জয়মলের বড় শ্যালকের। তার পাশে ছয়টি বড় স্তম্ভ দিয়ে তৈরী স্মারকটি জয়মলের। এ-গুলির পরেই পার হয়ে এলাম তৃতীয় প্রবেশদ্বার হনুমান পোল। ছোট্ট একটি মহাবীরের মন্দির আছে এখানে।

এরপর রাস্তা বাঁক নিতেই পড়লো গণেশ পোল। কেল্লার চতুর্থ প্রবেশদ্বার। এখানেও একটি মন্দির রয়েছে—গণেশজীর।

এই দুর্গের পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রবেশদ্বার জোড়লা পোল আর লক্ষ্মণ পোল। লক্ষ্মণের একটি ছোট্ট মন্দির রয়েছে লক্ষ্মণ পোলের কাছে। আঁকাবাঁকা পথে পর পর ছয়টি প্রবেশদ্বার পেরিয়ে অটো এসে দাঁড়ালো এবার দুর্গের ভিতরে। এখান থেকে একটা রাস্তা চলে গেছে সোজা উত্তরদিকে। রাস্তাটি দুর্গের সপ্তম বা প্রধান প্রবেশদ্বার রাম পোল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দ্বারটির গঠনশৈলী ভারতীয় স্থাপত্যকলা ও হিন্দু সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল প্রতীক। একাদিক্রমে এই সাতটি প্রবেশদ্বারের নির্মাণ মহারাণা কুম্ভের শাসনকালেই হয়েছে বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা।

রাম পোল অতিক্রম করলো আমাদের অটো। ডানদিকে পড়লো রামচন্দ্রের সুন্দর ছোট্ট একটি মন্দির। রামপোলের পরেই দু-ভাগে ভাগ হয়ে গেছে রাস্তা। একটি গেছে উত্তরে আর একটি দক্ষিণে। চিতোরদুর্গের মুখ্য দর্শনীয় স্থানগুলি সব দক্ষিণে। অটো চললো এবার দক্ষিণেরই পথ ধরে।

রাম পোলের সামনে দক্ষিণে যাওয়ার রাস্তার উপরে মোড় ঘুরতেই পড়লো 'শিশোদিয়া পত্ত স্মারক'। ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা। আকবরের মোঘলবাহিনীর বিরুদ্ধে আমরণ লড়াই করেছিলেন ষোল বছরের বীরসেনা পত্ত। সঙ্গে যোদ্ধৃবেশে ছিলেন তাঁর সদ্য পরিণীতা স্ত্রী। কিশোর পত্তের বীরত্ব দেখে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হয়ে গেছিলেন সেদিন দিল্লীর সম্রাট আকবর। শিশুকালেই পিতৃহারা পত্তের এমনই দুর্ভাগ্য, হঠাৎ রণাঙ্গনে একটি হাতি ছুটে এলো পত্তের কাছে। শুঁড়ে তুলে আছাড় মারলো মাটিতে। শেষ হয়ে গেল চিতোরের উজ্জ্বল আশা। রাম পোলের কাছে যেখানে মৃত্যু হয়েছিল, সেখানেই সুন্দর একটি স্মারক রয়েছে পত্তের।

পত্তের সমাধিস্থল থেকে একটি রাস্তা চলে গেছে ডানদিকে। এর ডানপাশেই রয়েছে

একটি ধ্বংসাবশেষ। 'পুরোহিতজী কি হাবেলী' নামেই এর পরিচিতি। এই রাস্তার উপরের মন্দিরটি 'তুলজা ভবানী মন্দির'। পৃথ্বীরাজের দাসীপুত্র বনবীর ছিলেন দেবী ভবানীর উপাসক। ১৫৩৬-১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন তিনি। কথিত আছে, নিজের দেহের ওজনের সমপরিমাণ সোনা দিয়েই নির্মিত হয়েছে এই মন্দির।

আমাদের অটো ভবানী মন্দিরের পরেই এসে পৌঁছালো দুর্গের মধ্যে প্রায়-সমতল একটি জায়গায়। পর্যটকদের বিশ্রামের জন্য বসার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। এখান থেকে দুর্গের নীচে চিতোর শহরের দৃশ্য যেমন অপূর্ব, নয়নাভিরামও।

এবার অটো এলো একটি ভাঙা এবং অসম্পূর্ণ প্রাচীরের সামনে। দাসীপুত্র বনবীর ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণা বিক্রমাদিত্যকে হত্যা করে বসেছিলেন সিংহাসনে। তারপর নিজেকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন দুর্গকে দু-ভাগে ভাগ করার জন্যে। কিন্তু শেষ করতে পারেননি। সিংহাসনচ্যুত করলেন উদয় সিংহ। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, বনবীর এই প্রাচীরটির নির্মাণ শুরু করেছিলেন দুর্গের অন্য অংশের ভেঙে পড়া ভবনের পাথর দিয়ে। চিতোরদুর্গের এই প্রাচীরটি 'বনবীর প্রাচীর' নামেই প্রসিদ্ধ।

এই প্রাচীরের পশ্চিম মাথায় অর্ধবৃত্তাকারে কামরা রয়েছে একটি। বনবীরের নয় লক্ষ টাকার ধন সম্পদ থাকতো এখানে। তাই এটি 'ন-লাক্ষা ভাণ্ডার' নামেই পরিচিত। কিন্তু এর গঠনশৈলী দেখে মনে হয়, বনবীর নিজ সুরক্ষার কারণে অস্ত্র-শস্ত্র আর গোলা বারুদ রাখার জন্যেই নির্মাণ করেছিলেন এটি। তবে উদ্দেশ্য যাই থাকুক, কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হয়নি বনবীরের।

দর্শনীয় এই স্থানগুলি সবই রয়েছে পাশাপাশি। হেঁটে হেঁটে ঘুরে ফিরেই দেখছি এ-গুলি। তবে চিতোরদুর্গ দেখতে হলে গাইড একটা নিতেই হবে, নিয়েছি আমরাও। আমি যা লিখছি তা বলছেন গাইডই। নইলে চোখের দেখা হবে, বোঝা যাবে না কিছুই। কারণ এখন এখানে সবই ধ্বংসাবশেষ, পোড়োবাড়ীর মতো। গাইড খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখায়, বুঝিয়ে দেয়। সদলবলে ঘুরছি আমরা গাইডের সঙ্গে।

এবার এলাম বনবীর প্রাচীরের মাঝামাঝি জায়গায় রাজপুত ও জৈন স্থাপত্যকলার সমন্বয়ে নির্মিত 'শৃঙ্গার চৌড়িতে'। এর মাঝখানে ছোট্ট একটা বেদীর উপর চারটি স্তম্ভ দিয়ে নির্মিত হয়েছে একটি ছত্রী। কথিত আছে, মহারাণা কুম্ভের কন্যা রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ সংস্কার সম্পন্ন হয়েছিল এখানে। কিন্তু এখানে পাওয়া একটি শিলালিপি থেকে ঐতিহাসিকেরা জানতে পেরেছেন এটি ছিল একটি জৈন মন্দির। নির্মাণ করেছিলেন রাণা কুম্ভের কোষাধ্যক্ষ বেলকা। পঁচিশ ফুট উঁচু এই প্রাসাদভবনের প্রবেশপথ আছে উত্তর ও পশ্চিমদিকে। উপরে রয়েছে পার্শ্বনাথের মূর্তি। এই ভবনের দক্ষিণ-পূর্বদিকে রয়েছে সুন্দর একটি গবাক্ষ। এর বাইরের দিকে খোদাই করা আছে নানা দেবদেবী আর নৃত্যরত সুদর্শন কিছু মূর্তি।

বনবীর প্রাচীরের সামনের দিকে এলাম তোপখানায়। এরই কাছে পুরাতত্ত্ব কার্যালয় ও সংগ্রহশালা। চিতোরদুর্গ থেকে পাওয়া বহু মূর্তি, প্রাচীন দ্রব্যাদি আর যুদ্ধে ব্যবহৃত বেশ কয়েকটি ছোট বড় কামান রাখা আছে এই সংগ্রহশালায়। ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং পর্যটকদের কাছে এর আকর্ষণ কিন্তু কম নয়।

পুরাতত্ত্ব কার্যালয়ের কাছে একেবারে উত্তর মাথায় ধ্বংসাবশেষটি 'ভামাশাহ হাবেলী'। এটি পর্যটক মনে সর্বদাই স্মরণ করিয়ে দেয় দানবীর ভামাশাহের কথা, যিনি মাতৃভূমি রক্ষার্থে সারাজীবনের অর্জিত সমস্ত সম্পদ দান করেছিলেন মহারাণা প্রতাপকে।

এখান থেকে আরও একটু এগোতেই পড়লো পাতালেশ্বর মহাদেবের মন্দির। প্রাচীন এই মন্দিরের ভাস্কর্যগুলি যেমন মনোরম, মূর্তিগুলিও অপূর্ব। এটি নির্মিত হয়েছে ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে।

বনবীর প্রাচীরের দক্ষিণে রয়েছে আরও একটি প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। এটির গঠনশৈলী রাজপুতানার এবং ভরা রয়েছে ভারতীয় স্থাপত্যকলায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত এই প্রাসাদের সংস্কার করেছিলেন মহারাণা কুম্ভ। একইসঙ্গে নির্মাণ করেছিলেন আরও কয়েকটি মহল। তাই প্রাসাদটি মহারাণা কুম্ভের মহল নামেই প্রসিদ্ধ। এই প্রাসাদ-চৌহদ্দিতে আরও কয়েকটি মহলের মধ্যে আছে দেওয়ান-ই-আম, সুরজ গোখড়া, জানানা মহল, কঁওরপদাকে মহল এবং শিবমন্দির প্রভৃতি।

পুরাতত্ত্ব বিভাগ খননকার্য চালানোর সময় দেখেছেন, এই মহলগুলির নীচেই রয়েছে একটি সুড়ঙ্গ পথ। চলে গেছে কাছেরই গোমুখ কুণ্ড পর্যন্ত। ঐতিহাসিকদের ধারণা, চিতোরে প্রথম লুণ্ঠনের সময় মহারাণী পদ্মিনী তাঁর সখীদের সঙ্গে নিয়ে এই কুণ্ডে স্নান করে পরে মহলের মধ্যে পালন করেন জহরব্রত।

কুম্ভমহলের একটি অংশে 'কঁওরপদাকে মহল'-এর ভগ্নাবশেষ। মহারাণা উদয় সিং-এর জন্ম, পান্নার মাধ্যমে উদয় সিং-এর প্রাণ রক্ষার্থে নিজপুত্রের বলিদান, মীরার কৃষ্ণ উপাসনা এবং মহারাণা বিক্রমাদিত্যের পাঠানো বিষ অমৃত মনে করে পান—এ-সবই এই মহল এলাকায় সংঘটিত হয়েছিল বলে অনুমান করেন ঐতিহাসিকেরা। এই কুম্ভপ্রাসাদের প্রধান প্রবেশদ্বারটির নাম 'বড়ী পোল'।

এই বড়ী পোল থেকে বেরোলে সামনেই নয়নাভিরাম দোতলা মহলটি 'ফতেহ প্রকাশ মহল'। এটি নির্মাণ করেন উদয়পুরের মহারাণা ফতেহ সিং। সুদর্শন গণেশের একটি মূর্তি রয়েছে এর ভিতরে। এ-ছাড়াও আছে সুন্দর ঝরণা আর বহু ভাস্কর্য। বর্তমানে মহলটি রাজ্য সরকারের সংগ্রহশালা। এই দুর্গে পাওয়া বহু প্রাচীন দ্রব্যসামগ্রী, অস্ত্র-শস্ত্র, মূর্তিকলার নমুনা, প্রাচীন চিত্র, বিভিন্ন ঐতিহাসিক এবং লোকশিল্পের সামগ্রী প্রদর্শিত হয় এখানে।

এই মহলের পশ্চিমে যাওয়ার রাস্তার উপরেই রয়েছে কিছু পুরনো দোকানের ধ্বংসাবশেষ। এক সময় এটি মতিবাজার নামেই প্রসিদ্ধ ছিল।

ফতেহ প্রকাশ মহলের দক্ষিণ-পশ্চিমে রাস্তা পেরিয়ে এলাম একটি সুন্দর জৈন মন্দিরে। এখানে মূর্তি আছে মোট সাতাশটি। তাই নাম হয়েছে এর 'সাতবিশ দেউড়ি'। মন্দিরমধ্যে গম্বুজের মতো স্তম্ভ আর ছাদের নীচে খোদাই করা সূক্ষ্ম কাজগুলি পর্যটক মনকে মুগ্ধ করে দেয়ার মতো। বর্তমানে জৈনসাধু আর পর্যটকদের থাকার সুন্দর ব্যবস্থাও আছে এখানে।

ছোট্ট একটা পিচের রাস্তা চলে গেছে এই দেউড়ির কাছ থেকে। অটো সেই পথ ধরেই এলো কুম্ভ শ্যাম মন্দির। ১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সুন্দর এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন মহারাণা কুম্ভ। মন্দিরের বিশাল কারুকার্যময় মণ্ডপটি স্থাপত্যকলার এক অপূর্ব নিদর্শন। একটি গরুড় মূর্তি আছে উঁচু স্তম্ভের উপরে। মন্দিরে হাতে আঁকা সুন্দর ছবিটি বরাহ অবতারের। আরও দুটি আঁকা ছবি ত্রিবিক্রম এবং শিব-পার্বতীর। মন্দিরের ছাদ, গর্ভগৃহের দ্বার ছাড়াও মন্দিরের স্তম্ভে অসংখ্য সুদর্শন মূর্তি এবং শুভ প্রতীক আজও পরিচয় বহন করছে তৎকালীন শিল্প এবং সুন্দর শিল্পী মনের। বাইরে, মন্দিরের গায়ে বিষ্ণুর বিভিন্ন রূপকে সুন্দর মূর্তির মাধ্যমে যেভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে তাতে এগুলি নিঃসন্দেহে রাজস্থানী কলা সমৃদ্ধির পরিচায়ক।

এছাড়াও শ্যাম কুম্ভ মন্দিরের এই বিগ্রহগুলি থেকে ফুটে উঠেছে পঞ্চদশ শতাব্দীর আরও একটি রূপ, যে রূপটি তৎকালীন মেবারের জনজীবনের। সেই সময়কার বেশভূষা, অলংকার, কেশ প্রসাধনী, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি বিষয়গুলি পর্যাপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে এই মূর্তিগুলির মধ্যে দিয়ে।

এই মন্দিরের বাঁপাশে একই চত্বরে রয়েছে মীরামন্দির। আকারে একটু ছোট। কয়েকধাপ সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয় মন্দিরে। এরই সামনে মীরার গুরু রুইদাসের একটি স্মারক আছে স্মৃতি হিসাবে। একদা এই মন্দিরে ভজন ও উপাসনা করতেন স্বয়ং মীরা—যাঁর স্পর্শ আজও অনুভব করা যায় এখানে এলে। মীরামন্দিরটিও মহারাণা কুম্ভের কীর্তি বলে মনে করেন অনেক ঐতিহাসিক।

রাও জোধাজীর বংশধর রাও দুদাজীর দ্বিতীয় পুত্র রতন সিংহ (প্রথম)-এর কন্যা মীরা। মীরার জন্ম হয় ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে মেড়তার কুড়কি গ্রামে। মাত্র দশ বছর বয়েসেই মাতৃহীনা হন মীরা। তাঁর বিবাহ হলো মেবারের রাণা সাঙ্গার পুত্র ভোজরাজের সঙ্গে। ছোটবেলা থেকেই কৃষ্ণপ্রেমিকা মীরার ধর্মোন্মাদনা আরও বেড়ে গেল বিবাহের পর। সাধুসঙ্গ আর ভজন কীর্তন করতে লাগলেন সমানে। একেবারে মন নেই সংসারে। ফলে মীরার উপর ক্রোধ সৃষ্টি হলো মেবারের মহারাণা আর রাজপরিবারের। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে মীরা হারালেন পিতা, শ্বশুর আর স্বামীকে। মহারাণা সাঙ্গার মৃত্যুর পর প্রথমে রতন সিং (দ্বিতীয়) এবং পরে চিতোরের সিংহাসনে বসেন বিক্রমাদিত্য।

কথিত আছে, দেবর বিক্রমাদিত্য অসহ্য কষ্ট দিয়েছিলেন মীরাকে। এমনকি এই চিতোরদুর্গেই বিষপান করিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কোন ক্ষতিই হয়নি কৃষ্ণপ্রেমে

মাতোয়ারা মীরার। শেষ পর্যন্ত মীরা আর থাকতে পারলেন না চিতোরে। নিজের কাকা রাও বিরমদেও-এর ডাকে তিনি চলে গেলেন মেড়তা। তারপর সেখান থেকেই শুরু হলো একে একে ভারতের বিভিন্ন তীর্থপরিক্রমা। অবশেষে মথুরা বৃন্দাবন হয়ে দ্বারকায় এসে বসেন সাধন-আসন বিছিয়ে। তারপর রহস্যময় দেহরক্ষা হয় দ্বারকায় কৃষ্ণের কোলে মাথা রেখে ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে।

এবার শ্যাম কুম্ভ মন্দির ছেড়ে বিজয়স্তম্ভ যাওয়ার পথ ধরলো আমাদের অটো। যাওয়ার পথে ডানদিকে রাস্তা থেকে একটু দূরেই পড়লো জটাশংকর মন্দির। নেমে এলাম মন্দিরে। শিবমন্দিরের দেয়ালে খোদিত সুন্দর মূর্তিগুলি আজও অক্ষত অটুট আছে সেই মহারাণাদের আমল থেকে।

অটো এসে দাঁড়ালো বিজয়স্তম্ভের কাছে। এখানে দাঁড়িয়ে আছে আরও কিছু অটো মোটর আর টাঙ্গা। এই বিজয়স্তম্ভের বাঁদিকে দেখছি কিছু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, ডানদিকে বড় বড় কয়েকটি গাছ। তার পাশেই চওড়া পিচের রাস্তা চলে গেছে দুর্গের আরও ভিতরে।

নয় তলা এই বিজয়স্তম্ভের উচ্চতা ১২২ ফুট। ৪৭ ফুট বর্গাকার এবং ১০ ফুট উঁচু জায়গার উপরে নির্মিত স্মারক স্তম্ভটি ভারতীয় স্থাপত্যকলার এক অনবদ্য কারিগরীর প্রতীক। স্তম্ভের ভিতরে ১৫৭টি সিঁড়ি ঘুরে ঘুরে উঠেছে একেবারে উপরে। এই স্মারক স্তম্ভটির ভিতরে ও বাইরে খোদিত রয়েছে পুরাণের নানা দেবদেবী, অর্ধনারীশ্বর, লক্ষ্মী নারায়ণ, ব্রহ্মা, সাবিত্রী, বিষ্ণু প্রভৃতির বিভিন্ন রূপ এবং রামায়ণ মহাভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অসংখ্য মূর্তি। প্রতিটি মূর্তিই যেমন সুন্দর তেমনই নিখুঁত, জীবন্ত যেন। একইসঙ্গে মূর্তিগুলির মধ্যে কারিগরী দক্ষতায় ফুটে উঠেছে তৎকালীন রাজপুত জনজীবনের এক অপূর্ব বিচিত্র মনোমুগ্ধকর রূপ।

এই স্তম্ভটির নির্মাণ কার্য ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়ে শেষ হয় ১৪৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। মহারাণা কুম্ভ এটি নির্মাণ করেছিলেন বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। জনশ্রুতি আছে, মানডু-র (মালওয়া) সুলতান মহম্মদ খিলজী এবং গুজরাটের সুলতান কুতবুদ্দিনের সংযুক্ত সেনাদের সঙ্গে লড়াই-এর পর কুম্ভের বিজয়ের স্মৃতি বলেই মনে করা হয় বিজয়স্তম্ভটিকে।

তবে এই যুক্তিকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন না ঐতিহাসিকেরা। এই বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন তাঁরা। যাইহোক, স্তম্ভের উপরের কিছু অংশ একবার নষ্ট হয়ে যায় বাজ পড়ে। পরে এর সংস্কার করেছেন উদয়পুরের মহারাণা স্বরূপ সিং।

বিজয়স্তম্ভের কাছেই রয়েছে সমিধেশ্বর মহাদেবের একটি প্রাচীন মন্দির। সহযাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে গাইড এলো মন্দিরপ্রাঙ্গণে। মূল মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের পিছনে দেয়ালে রয়েছে তিনটি মুখবিশিষ্ট শিবমূর্তি। দুর্গস্থিত এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন মালওয়ার রাজা ভোজ। ১৪২৭ খ্রীষ্টাব্দে এটি সংস্কার করান চিতোরের

মহারাণা মোকল। এই মন্দিরটিকে মোকলজীর মন্দিরও বলা হয়।
সমিধেশ্বর মহাদেব মন্দিরে পাওয়া গেছে দুটি প্রাচীন শিলালিপি। একটি ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দের। এটি থেকে ঐতিহাসিকেরা জেনেছেন, গুজরাটের সোলাঙ্কি কুমার পাল চিতোরে প্রবেশ করেছিলেন আজমীরের চৌহান রাজা আনাজীকে পরাস্ত করে। অপর শিলালিপিটি ১৪২ ' খ্রীষ্টাব্দের। এটিতে আছে মহারাণা মোকলের কথা।
বিজয়স্তম্ভ আর সমিধেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের মাঝে খোলা আকাশের নীচে সমতল জায়গাটুকু মহারাণা এবং রাজপরিবারের শ্মশান। অনেক ক্ষত্রিয় রমণী তাঁর স্বামীর সঙ্গে একই চিতায় আত্মাহুতি দিয়েছেন এখানে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালানোর সময় সমিধেশ্বর মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম দরজার পাশে পাওয়া গেছে বহু কাপড়ের ভস্মাবশেষ। রাণী কর্ণবতী তেরো হাজার বীরাঙ্গনার সঙ্গে এখানেই জহরব্রত করেছিলেন বলে স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাস।
এখান থেকে একটু এগোতেই পড়লো গোমুখ কুণ্ড। এই কুণ্ডের জল উপর থেকে নীচে পড়ছে একটি শিবলিঙ্গের উপরে। এর উত্তর পাশে স্থাপিত ছোট্ট মন্দিরটি পার্শ্বনাথের। মহারাণা জয়মলের আমলেই নির্মিত হয়েছে এটি। পার্শ্বনাথের মূর্তিটি আনা হয়েছিল দাক্ষিণাত্য থেকে। কন্নড় ভাষায় '১৪৬৮ খ্রীষ্টাব্দ' কথাটি খোদিত আছে মূর্তির গায়ে। এই মন্দির থেকে একটি সুড়ঙ্গ পথ চলে গেছে কুম্ভ মহল পর্যন্ত।
গোমুখ কুণ্ডের ডানদিকের চত্বরে রয়েছে রাঠোর জয়মল এবং পত্তর মহলগুলির ভগ্নাবশেষ। চিতোরের শেষ পতনে আকবরের সেনাদের সঙ্গে এঁরা লড়াই করতে করতে দিয়েছিলেন প্রাণ বিসর্জন। জলমল-পত্তর মহলগুলির সামনের দিকে রয়েছে একটি জলাশয়। জলমল-পত্তর পুকুর নামেই এর পরিচিতি।
এখান থেকে অটো এবার চললো আরও কিছুটা ভিতরে। চারদিক এমনিতে ফাঁকা হলেও নজরে পড়ে শুধু প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। দেখতে দেখতে এসে দাঁড়ালো চিতোরেশ্বরী মন্দিরের সামনে। বেশ কিছু সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলাম উপরে। মন্দিরমধ্যে মাঝারী আকারের কালো পাথরের দেবীমূর্তিটি কালী। এই মন্দিরটি অষ্টম কিংবা নবম শতাব্দীতে নির্মিত হয় বলে ঐতিহাসিকদের অনেকের অনুমান। তবে এটি নির্মাণ করেন মেবারের গুহিল বংশের রাজারা। এই মন্দিরের দরজায়, গর্ভগৃহের বাইরে অন্যান্য অনেক জায়গায় খোদিত আছে সূর্যমূর্তি। এ-থেকে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন প্রথমে এটি ছিল একটি সূর্য মন্দির। মোঘল আমলে ভেঙে দেয়া হয় মন্দিরের সূর্যমূর্তি। পরবর্তীকালে মন্দিরে স্থাপন করা হয়েছে কালীমূর্তি। মন্দিরটি সংস্কার করেন সজ্জন সিং।
চিতোরেশ্বরী মন্দির থেকে সামান্য একটু এগিয়ে এলাম নওগজা পীরের কবর। নয় গজ লম্বা পাথরে নির্মিত হয়েছে এটি। কথিত আছে, একদা নয় গজ লম্বা একজন মুসলমান আসেন চিতোরে। তৎকালীন ওই রকমই লম্বা চিতোরের এক রাজকুমারীকে তিনি বিবাহ করতে চান। কিন্তু তার সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি আর

মৃত্যুও হয় তার এই কেল্লাতেই। এ-কবর তাঁরই।
চিতোরেশ্বরী মন্দির ছেড়ে একটু এগোলেই সূর্যকুণ্ড। এই কুণ্ডের দক্ষিণদিকে এলাম একটি পুকুরের ধারে রাওয়াল রতন সিং-এর রাণী পদ্মিনী মহল।
তখন চিতোরের সিংহাসনে বসেছিলেন রাওয়াল রতন সিং। ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী আক্রমণ করলেন চিতোর। যুদ্ধ চললো বেশ কিছুদিন ধরে। সুলতান দেখলেন, জয়ের কোন সম্ভবনা নেই। চালাকি করে প্রস্তাব দিলেন, পদ্মিনীকে যদি এক ঝলক দেখিয়ে দেন তাহলে তিনি ফিরে যাবেন দিল্লীতে। কারণ সুলতান পদ্মিনীর অসাধারণ রূপের কথা শুনেছিলেন আগেই। মেবারের প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন, তাই রতন সিং আলোচনা করলেন সভাসদ আর জ্ঞানীদের সঙ্গে। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবে রাজী হলেন রাণা। তবে সামনা-সামনি নয়, আয়নায় পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব দেখবেন আলাউদ্দিন খিলজী। এ-কথায় রাজী হলেন দিল্লীর সুলতানও।
ছোট্ট একটি জলাশয়ের মধ্যে তৈরী একটি মহলের সিঁড়িতে দাঁড়ালেন রাণী পদ্মিনী। জলাশয়ের পাশেই নির্মিত আর একটি মহলের ভিতরে লাগানো বড় আয়নায় সুলতান দেখলেন সুন্দরী পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব। এমনভাবে মহলটি নির্মিত এবং এমন একটি জায়গায় আয়না লাগানো রয়েছে, হঠাৎ যদি ঘুরেও দেখার চেষ্টা করেন, তাহলেও দেখা যাবে না রাণীকে।
অনেকের ধারণা, বর্তমানে পদ্মিনী মহলটি ছিল রাণী পদ্মিনীর গ্রীষ্মকালীন আবাস। মুখ্যত তিনি থাকতেন কুম্ভ মহল নামে পরিচিত রাজপ্রাসাদেই।
আজকের এই মহলগুলি দেখলে মনে হয় না এগুলি সেই প্রাচীন মহল। কারণ পরবর্তী সময়ে চিতোরদুর্গে প্রবেশ করে আলাউদ্দিন খিলজী এগুলি সব নষ্ট করে দিয়েছিলেন। পরে ওই একই জায়গায় ঘটনাগুলির স্মৃতিতে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের সংস্কার করে নির্মাণ করা হয়েছে নতুন মহল। মহারাণা সজ্জন সিং ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এই মহলগুলিতে প্লাস্টার এবং নতুন নির্মাণ কার্যও করেছিলেন।
অটো আর টাঙ্গা আসে এই পদ্মিনী মহল পর্যন্ত। তাই এই পর্যন্ত দেখেই ফিরে যেতে হয় পর্যটকদের। এছাড়া খুব আকর্ষণীয় না হলেও এই দুর্গের মধ্যে রয়েছে মহারাণা ক্ষেত্র সিং-এর পাটরাণীর খাতন রাণীর মহল, মালওয়ার সুলতান মহম্মদ-শা-কে মহারাণা কুম্ভ যেখানে পাঁচ মাস কয়েদ করে রেখেছিলেন—ভাক্সী, চিত্রাঙ্গদ মৌর্যের শাসনকালে খনন করা জলাশয় চতরং তালাও, সুলতান বাহাদুর শা-র চিতোর আক্রমণের সময় ফিরিঙ্গিরা যে সুড়ঙ্গে বারুদ ভরে দুর্গের পঁয়তাল্লিশ হাত লম্বা প্রাচীর উড়িয়ে দিয়েছিল—বীকাখোহ, রাজপুত শাসকদের যেখানে রাজ্যাভিষেক হতো—রাজটিলা, মৃগবন, পদ্মিনীর কাকা গোরা—যিনি আলাউদ্দিনের তরবারীর কোপ থেকে রাওয়াল রতন সিংকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন এবং চিতোরের প্রথম পতনের লড়াইতে পদ্মিনীর খুড়তুত ভাই বারো বছরের বাদল যুদ্ধরত অবস্থায় মারা যায়, তাঁদেরই বাড়ী গোরা-বাদলকে মকানোকে গম্বুজ, ১৪৮৩

খ্রীষ্টাব্দে মহারাণা রায়মলের শাসনকালে নির্মিত জীর্ণ প্রাচীন শিবমন্দির—অম্বুদজী কা মন্দির, দুর্গের প্রধান প্রবেশদ্বার সুরজপোল, দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত জৈনকীর্তি মন্দির, বাপ্পা রাওয়াল নির্মিত বানমাতার মন্দির, চতুর্দশ শতাব্দীতে মহারাণা হাম্বির নির্মিত অন্নপূর্ণা মন্দির, রাণা লাখার পুত্র যাঁকে ভুল করে হত্যা করা হয়েছিল, সেই রাঘবদেবের ছত্রি। চিতোরদুর্গের ঐতিহাসিক এই স্থানগুলি প্রাচীন চিতোরেরই স্মৃতি বহন করে চলেছে শত শত বছর ধরে।

চিতোরগড়ের দর্শনীয় যা—তা দেখা হলো প্রায় সবই। এবার ফেরার পালা, ঘরে নয়—স্টেশনে। একে একে সহযাত্রীরা সকলেই উঠে বসলেন অটোতে। এবার কিছু বলার আছে। আগেই বলেছি, এ-যাত্রায় পরপারের নোটিশ পাওয়া যাত্রীর-সংখ্যাই বেশী। একটা বিষয় লক্ষ্য করছি প্রথম থেকেই, লক্ষ্য করেছি শুধু এই ভ্রমণেই নয়, অন্য কোথাও যখন ভ্রমণ করেছি তখনও—সেটা হলো, বয়স্ক বুড়ো যারা এবং মাঝবয়সী বা তার থেকে একটু কম বয়েসের যারা—তারা ভ্রমণপথে কেউই বউকে ছেড়ে থাকছে না, থাকেও না। মেয়েরা সবাই একসঙ্গে আর পুরুষেরা সব একসঙ্গে আলাদা মোটরে, অটোতে বা টাঙ্গায় যেতে কেউই রাজী নয়। অটোতে উঠছে—বসছে পাশাপাশি। হাঁটছে যখন—পাশাপাশি। খেতে বসছে—পাশাপাশি। ট্রেনে চড়লে—পাশাপাশি। শোয়ার কথা তো বাদই দিলাম। এদের মতো যারা, তাদের দেখে মনে হয় লোকজন না থাকলে হয়তো বাথরুমটাও সারতো একইসঙ্গে। বাঙালী ঘরানায় একেই হয়তো বলে মাঝ-বয়সী বা বুড়ো বয়েসের প্রেম।

অটো দেখতে দেখতে চলে এলো চিতোরদুর্গ ছেড়ে চিতোরগড় স্টেশনে। বেরিয়েছিলাম সেই সকাল ৯টায়। ফিরে এলাম বেলা প্রায় ২টোয়। ট্রেন ছাড়বে বিকেল ৩/১৫ মি.। এখান থেকে এবার যাবো আমরা উদয়পুরে।

**'উদয়পুর হলো সুন্দরের মধ্যে সুন্দরতম।'**
**—লর্ড কার্জন**

কয়লার ইঞ্জিন। চললো ঝিকির ঝিকির করে একের পর এক স্টেশন পার হয়ে। ট্রেন চলা মানেই সকলের সমবেত হওয়া, যেটা চলার পথে অন্য কোন সময় হয় না। দর্শনীয় জায়গাগুলি ঘোরার সময় দলবদ্ধভাবে থাকলেও সকলে থাকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তাই মনের কথা বলতে পারে না কেউ কাউকে। ট্রেন চললেই তখন সবাই এক সংসারে কারণ হাঁড়িটা যে এক।

জয়পুর থেকে অনেকেই কিনেছেন অনেক কিছুই। এ-পর্যন্ত কেউই ফুরসৎ পায়নি দেখানোর। এবার শুরু হলো প্যাকেট খোলা, দেখাদেখি। সকলেই যে যার জিনিষ নিয়ে ফেরিওয়ালাদের মতো যাচ্ছেন একে অপরের কাছে। কেউ বললেন, শাড়ি কিনলুম দিদি। মালা নিলুম ক-খানা। সকলকে দেবো একটা করে। বাইরে এসেছি, খালি হাতে ফিরবো!' কেউ চটি, কেউ বিছানার চাদর থেকে শুরু করে পিতলের ছোট ঢাল তলোয়ার পর্যন্ত। বাড়ীতে ফিরলে তো আবার সংগ্রাম শুরু হবে।

এক বয়স্কা বেতো মহিলা বললেন আর এক মহিলাকে,

—এই জামাটা কিনলাম আমার নাতির জন্যে। এই শাড়িটা বউমার। এটা মেয়ের জন্যে। আমার নাতিকে কি সুন্দর দেখতে। কি মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে দিদি। না শুনলে আপনার বিশ্বাসই হবে না। তিন বছরের ছেলের মুখে যেন খই ফুটছে। মামার বাড়ীর রূপ পেলে আর দেখতে হতো না। এগুলো খুব সস্তায় কিনেছি। কলকাতায় যা দাম—বাব্‌বা।

জিনিষের দাম এবং কথাগুলো বলতে বলতে বেতো মাসিমা একের পর এক দেখালেন জামা কাপড়গুলো। এবার উত্তরে শ্রোতা মাসিমা বললেন,

—তাহলে বোধ হয় আমি একটু ঠকেই গেছি দিদি। আমার কাপড়টার দাম একটু বেশীই নিয়েছে কেনার পর মনে হয়েছে। অথচ দিদি আপনার মতো তো একই জিনিষ কিনেছি আমিও।

বলেই তাড়াহুড়ো করে বাক্স খুলে কাপড়টা মেলে ধরলেন সকলের সামনে। একে একে সকলেই কে কি কিনেছেন, কোনটা সুন্দর, কোনটার দাম কত, কে ঠকলো, কার লাভ হলো কত—এই নিয়েই শুরু হলো হিসাব নিকাশ। শেষ হিসাবে দেখা গেল, ট্রেনের এ-সব ক্রেতারা সবাই ঠকিয়ে এসেছেন গোটা জয়পুর রাজস্থানের দোকানদারদের। কি দুর্ভাগ্য তাদের, ভাবতেই খারাপ লাগছে।

এসব দেখলেও ভাবছি অন্য কথা। বেতো মাসিমার নাতির কথা। প্রায় সব ঠাকুমা ঠাকুরদা, দাদু দিদিমার নাতিনাতনীই খুব সুন্দর দেখতে। এমন সুন্দর, ভগবান যেন একটাই টুকরো পাঠিয়েছেন এই ধরাতলে। সব সময়েই পাকাপাকা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে। শুনলে মনে হবে বড় কেউ যেন শিখিয়ে দিয়েছে। কি বুদ্ধি! কি নাক—কি চোখ! গায়ের রঙ যেন ঠিক্‌রে পড়ছে! বিশ্বের বিস্ময় যেন! নাতি বা নাতনীর মুখখানা চাঁদপানা নয়, এমন কথা বলতে শুনিনি কখনও কোনও ঠাকুমা দিদিমাকে। এমন আদিখ্যেতা দেখা যায় অধিকাংশ পরিবারে বাবা মায়েদের মধ্যে, যদি একটা ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার কপাল গুণে হয়ে যায় পরিবারে। পরিচয়পর্বে জানতে কারও আর বাকি থাকে না, 'আমার ছেলে ডাক্তার'—'আমার ছেলে ইঞ্জিনিয়ার'।

ট্রেন চলছে হু-হু করে। কেনাকাটা আর দেখাশুনোর পাট চুকলো। আসরও বেশ জমে উঠেছে। লম্বা কামরা এ-মাথা থেকে সে-মাথা। পায়রার খোপ। মাপা জায়গা। আধুনিক ফ্ল্যাট। এবার বেতো মাসিমা বললেন,

—জানেন দিদি, আজ একটা জিনিষ দেখে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেছে আমার। বাথরুমের কাছে যে বুড়িদিদির সিট্ পড়েছে তার কথাই বলছি গো আপনাকে। আজ দেখলাম এ্যাতো ভাত খাচ্ছেন। থালায় যেন হিমালয়ের চুড়ো। এ্যাতো খায় কি করে, রাখে কোথায়? আমি তো দিদি খেতেই পারি না। দুপুরে দুমুঠো ভাত, রাতে এক থেকে দেড়খানা রুটি—ব্যস, তাতেই আমার হয়ে যায়।

এখন শুরু হলো কে কি খান, কতটা খাচ্ছেন, কার পেটটা কত বড়। শুধু খাওয়ার

কথা। খাওয়ার ব্যাপারে বক্তা যিনি একমাত্র তিনিই স্বল্পাহারী। আর সকলের খাওয়াই রাক্ষসের মতো। এ-যাত্রায় এরাই সঙ্গী আমার। চলেছেন দ্বারকায় দ্বারকাধীশের দর্শনে। বহুদিনের ইচ্ছা এদের পূরণ হতে চলেছে। অবাক হইনা, খুশীই হই এদের উপর দ্বারকাধীশের কৃপা দেখে।

রাত ৭/৪৫ মিঃ এলাম উদয়পুর সিটি স্টেশনে। টিকটিকির ল্যাজ খসে যাওয়ার মতো রয়ে গেল আমাদের সংরক্ষিত কামরাটা। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। তবুও কয়েকজন স্টেশনে একটা চক্কর মেরেই ফিরে এলেন কামরায়। আমি আর বেরোলাম না। আসরের কথা হারাতে হবে বলে।

জয়পুর থেকে ভ্রমণপর্ব শুরু করলে আমরা রেলপথে এই পর্যন্ত এলাম ৪০৬ কি.মি.। চিতোরগড় থেকে ১১৩ কি. মি.। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উদয়পুরের উচ্চতা ১৮৯৩ ফুট। ট্রেনটা স্টেশনে এসে দাঁড়াতেই আলোচনাটা বন্ধ হয়ে গেছিল প্রায় মিনিট কুড়ি। তারপর আবার শুরু হলো। মাসে হাজার টাকার ওষুধ খাওয়া সদাশিবের স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বেতো মাসিমা বললেন তার সামনে বসা সহযাত্রিনীকে,

—পঞ্চাশের উপর বয়েস হতে চললো এখনও উনি নিজেকে যুবতী ভাবেন। কচি খুকি! দেখছেন না, কুচি দিয়ে কাপড় পরছেন ঠোঁটে লিপস্টিক দিচ্ছেন। ছিঃ, আমার নিজেরই লজ্জা করে। আমার জোয়ান বয়েসেও ওই সব রঙ-চং মুখে মাখিনি, চুল কেটে ভুরুও তুলিনি কখনও।

এবার সকলেই যোগ দিলেন এই আলোচনায়। কে কি পরছে, কে কেমন সাজছে. এই ভ্রমণে কে কটা শাড়ি ব্লাউজ এনেছেন—এই সব কথা। এবার শ্রোতা মাসিমা এক ভদ্রমহিলাকে উদ্দেশ্য করে বললেন যিনি বসে আছেন অন্য জায়গায়, যার বয়েস প্রায় বছর ৪০/৪২ হবে। বেশ মোটা, বিয়ে হয়নি।

—ওনাকে দেখছেন না, একটা শালোয়ার কামিজ পরেই ঘুরঘুর করছেন কয়েকদিন ধরে। কাচাকাচির নাম নেই। এ-বেলারটা ও-বেলায় পরতেই গা ঘিনঘিন করে। কি করে যে পরছেন ওটা, রামো!

এখন অনেক বাঙালী মেয়েই শালোয়ার কামিজ পরে। এতে চলাফেরায় সুবিধা হয় অনেক। প্রবাসী বাঙালীদের কথা বলছি না। এ-ব্যাপারে তারা অনেকেই অভ্যস্ত বহুকাল থেকে। তবে এমন অনেক অল্পবয়সী বিবাহিতা, অবিবাহিতা, আধাবয়সী এবং বয়স্কা বিবাহিতা আছেন, যারা পাড়ায় বা বাড়ীতে শালোয়ার কামিজ পরেন না কখনও। হয়তো শ্বশুর শাশুড়ী বা বয়েসের কথা ভেবে কিংবা পাড়ায় একটা লজ্জা লজ্জা ভাব। এরা একটু গোপনে একসেট মাত্র শালোয়ার কামিজ তৈরী করেন। তুলে রাখেন বাক্সে। কোথাও বেড়াতে গেলে নিয়ে যান সঙ্গে করে। ওটাই পরতে থাকেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। ভ্রমণপথে এদের অনভ্যস্ত চালচলন দেখলেই বোঝা যায় এরা আর কেউ নয়—বাংলার বাঙালীদিদি।

সকাল হতেই গুছিয়ে নিলাম সকলে। বেলা সাড়ে আটটায় অটো চললো শহরের

রাস্তা ধরে। সুন্দর সাজানো শহর—অপূর্ব। পরিকল্পিত শহর বলেই হয়তো এতো সুন্দর। ঝকঝকে রাস্তা। কোথাও এতটুকু খানাখন্দ নেই। আর একটা জিনিষ সবচেয়ে ভালো লাগলো, জয়পুরের সমস্ত বাড়ীর রঙ যেমন গোলাপী—এখানে সবই সাদা। 'হোয়াইট সিটি'ও বলা চলে উদয়পুরকে। অতীতে এক সময় উদয়পুর ছিল মেবারের রাজধানী।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন এসেছিলেন এই শহর উদয়পুরে। এই শহরের সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে তিনি বলেছিলেন, 'উদয়পুর হলো সুন্দরের মধ্যে সুন্দরতম। রাজপুতানার সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণের মধ্যে অন্যতম। এটা আজই দেখি বা কালই দেখি, এর স্মৃতি কখনই মুছে যায় না মন থেকে।'

১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণা উদয়সিং অত্যন্ত সুন্দর এই শহরের পত্তন করলেন আরাবল্লীর ঢালে। নাম দিলেন নিজের নামানুসারে উদয়পুর।

চিতোর যখন বারংবার আক্রান্ত হচ্ছিল মোঘলদের দ্বারা তখন মহারাণা উদয়সিং নিরাপত্তার কারণেই ত্যাগ করলেন চিতোর। আলোচনা করলেন সেনাপতি আর সব পারিষদের সঙ্গে। পাহাড়ে ঘেরা আহার নামক স্থানটি দেখলেন চিতোরের চেয়ে অনেক বেশী নিরাপদ। স্থাপন করলেন প্রাসাদ, গড়ে তুললেন শহর। সেই সৃষ্টির পর থেকে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন মহারাণাদের শাসনকালে আরও অনেক প্রাসাদ আর দ্রষ্টব্য স্থান গড়ে উঠেছে একের পর এক সুন্দর নগরী এই উদয়পুরে।

আরাবল্লী পর্বতমালা দিয়ে ঘেরা এই শহরের প্রধান প্রবেশদ্বার পূর্বদিকে সুরজপোল। শহর জুড়ে পোল বা প্রবেশদ্বার রয়েছে মোট এগারোটি। এর মধ্যে প্রধান চারটি—পশ্চিমে ব্রহ্মা, উত্তরে হাতি, দক্ষিণে কৃষ্ণ এবং পূর্বে সুরজপোল। মোটর টাঙ্গা অটো এমনকি পায়ে হেঁটেও ঘোরা যায় এই মনোরম শহর উদয়পুর। এখানে ভ্রমণের সবচেয়ে ভালো সময় হলো অক্টোবর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত।

একদা এই শহরে এসেছিলেন ব্রিটেনের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ, ইরানের শাহ, বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার আর্নল্ড টয়েনবি (Sir Arnold Toyanbee)। এসেছেন আরও অসংখ্য পর্যটক। বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়েছেন এই শহরের সৌন্দর্য দেখে। একজন বিখ্যাত পর্যটকের বিমুগ্ধ চিত্তের উক্তি, 'ভেনিস দেখো এবং মারা যাও, কিন্তু উদয়পুর দেখো এবং বেঁচে থাকো বার বার দেখার জন্য।'

আগেও এসেছি উদয়পুরে, আবারও এলাম। যতবার দেখা যায় ততবারই আরও—আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে উদয়পুর। মনে হয় যেন সব নতুন করে গড়ে উঠেছে, রাঙায়িত হয়েছে নতুন রঙে। পাহাড়ে ঘেরা উদয়পুরে রয়েছে দুটি বড় হ্রদ—পিছোলা আর ফতেসাগর। এদুটো বাদ দিলে বাদবাকিটা সম্পূর্ণই শহর।

আমাদের যাত্রী বোঝাই অটো এসে থামলো সিটি প্যালেসে। পিছোলা হ্রদের বুকেই গড়ে তোলা হয়েছে এই রাজপ্রাসাদ। এটিই মহারাণার রাজবাড়ী। মূল প্রাসাদটি নিজেই নির্মাণ করেছিলেন উদয়সিং। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে এসেছেন বিভিন্ন রাণা। তাদের চেষ্টায় গড়ে উঠেছে একের পর এক মহল।

প্রাসাদটি যেন একটা যাদুঘর। প্রত্যেকটি মহল দেখতে থাকি ঘুরে ঘুরে। সঙ্গে রয়েছে গাইড। বিভিন্ন রাণাদের আমলে এই মহলগুলি তৈরী হলেও এর গঠন-শৈলীতে একের সঙ্গে অপর মহলগুলির বজায় রয়েছে এক অপূর্ব সাদৃশ্য। এ-কথা গাইড না বলে দিলে বোঝার উপায় নেই। মনে হবে একজন মহারাণাই নির্মাণ করেছেন প্রতিটি মহল।

সমগ্র রাজস্থানের মধ্যে বৃহত্তম এই রাজপ্রাসাদটি লম্বায় ১৫০০ ফুট, চওড়ায় প্রায় ৮০০ ফুট। ঐতিহাসিকদের অনেকেই এটির সঙ্গে তুলনা করেন লণ্ডনের উইণ্ডসর কাস্‌লের সঙ্গে। এই প্রাসাদের অলিন্দ থেকে পিছোলা হ্রদ আর উদয়পুরের বিস্তীর্ণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এতই মনোরম দেখায়, যা দেখে একদা ভ্রমণে এসে মোহিত হয়ে পঞ্চম জর্জ বলেছিলেন, 'সমগ্র হিন্দুস্থানের মধ্যে উদয়পুরের মতো এ-রকম ছবির শহর আর কোথাও নেই যা উদয়সিং স্থাপন করেছিলেন পাহাড়ের মধ্যে।'

গাইড এবার নিয়ে এলেন প্রাসাদের মতিমহলে। রঙিন কাচের টুকরো দিয়ে তৈরী নয়নাভিরাম যে কারুকার্য আছে এই মহলে তা চোখে না দেখলে কারও বিশ্বাসই হবে না। শিল্প কর্মের নিপুণতা দেখে পর্যটকমাত্রই অভিভূত হতে বাধ্য।

প্রাসাদমধ্যে রয়েছে 'ছোটি চিত্রশালি'—অপূর্ব। এই মহলে রয়েছে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর তৈলচিত্র। হলদিঘাটে আকবর-সেনাদের সঙ্গে রাণা প্রতাপের যুদ্ধ, প্রতাপের প্রতিজ্ঞা—চিতোর উদ্ধার করতে না পারা পর্যন্ত পাতায় আহার ও তৃণশয্যায় শয়ন, পর্বত ও জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ, এমন আরও কিছু তৈলচিত্র আছে এই 'ছোটি চিত্রশালি'তে। মুহূর্তে অতীত ইতিহাস ভেসে ওঠে ভ্রমণ পিয়াসী মনে এই মহলে এসে দাঁড়ালে। চমৎকার এটি—দেখার মতো।

ঘুরতে ঘুরতে এবার এলাম 'বড়ি মহল' বা 'মোরচক'। প্রাসাদমধ্যে এই মহলটিতে রয়েছে পাঁচটি ময়ূর। এগুলি সব রঙীন এবং মোজায়েক করা। এর শৈল্পিক উৎকর্ষ বর্ণনায় আনা যায় না। সার্থক হয়ে যায় চোখদুটো। জনৈক ফরাসী সাংবাদিক সেইজন্যেই হয়তো বলেছিলেন, 'এই শহরে প্রকৃতি এবং জীবনের সৌন্দর্য মিশে আছে একসঙ্গে। আমি উদয়পুরে পৌঁছে খুশী এবং উৎসাহিত হয়েছিলাম যখন দেখেছিলাম এর আশ্চর্য প্রাসাদগুলি, পান্নার মতো হ্রদের জল, রূপকথার গল্পের মতো রঙীন পোশাকে সজ্জিতা মহিলা, এর আকাশ—যার তুলনা কেবলমাত্র স্বর্গের সঙ্গেই চলে। যখন ছেড়ে যাচ্ছি তখন মন বিষাদগ্রস্ত হচ্ছে।'

এই প্রাসাদের একটার পর একটা দরজা পেরিয়ে দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি—এগিয়ে চলেন দলবদ্ধভাবে আমার সহযাত্রীরা, সঙ্গে চলেন গাইড। এই প্রাসাদ মিউজিয়ামের দক্ষিণদিকেই এলাম জানানা মহলে। স্তম্ভাকৃতি এই প্রাসাদটি নির্মিত হয় ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে। পরে এটি দুর্গের রূপ পায়। অলিন্দবিহীন এই প্রাসাদটির প্রকৃত নাম রাওয়ালা। পরে নাম হয় এর জানানা মহল।

এই মহলের মধ্যে আর একটি অংশের নাম রঙ ভবন। রাজ্যের সম্পদ সোনা রূপা এবং অন্যান্য রত্নাদি জমা থাকতো এখানে। এই মহলেরই দ্বিতীয় দরজাটি লক্ষ্মী-

চকের প্রবেশদ্বার। রাণীদের এই মহলগুলি সাজানো হয়েছে নানা রঙের বিভিন্ন চিত্র আর রঙীন কাচের টুকরো দিয়ে কারুকার্য করে। এই চিত্রগুলির মধ্যে রয়েছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার জীবনকথা এবং রাজস্থানী সংস্কৃতির বিভিন্ন কাহিনীর চিত্ররূপ।

এখানকার প্রাসাদ মিউজিয়ামে দেখলাম মেবারের বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন, তৎকালীন মুদ্রা, বংশ পরম্পরায় মেবারের শাসনকর্তাদের ছবি, তাদের ব্যবহৃত পোশাক, একইসঙ্গে নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র। এই প্রাসাদেই রয়েছে মীরাবাঈ প্রতিদিন যে গিরিধারী গোবিন্দজীর মূর্তিটি পূজা করতেন—সেটি। কষ্টি পাথরের এই মূর্তিটি ভ্রমণকারীদের দেখায় কোন বাধা নেই। এগুলি ছাড়াও প্রাসাদমধ্যে কারুকার্যখচিত শিশমহল, কৃষ্ণভিলা, মানক মহল, ভীমভিলা প্রভৃতি মহলগুলি অভিভূত করে দেয় পর্যটক মনকে।

উদয়সিং-এর রাজপ্রাসাদ ছেড়ে এবার অটোতে করে এলাম পিছোলা হ্রদে। চারপাশ এর পাহাড়ে ঘেরা। হ্রদের মধ্যে রয়েছে দ্বীপ—যেখানে গড়ে তোলা হয়েছে সুন্দর প্রাসাদ, মন্দির। তিন মাইল লম্বা আর দেড় মাইল চওড়া এই কৃত্রিম হ্রদটি পিছলি গ্রামের কাছে, তাই নাম হয়েছে এর পিছোলা। এই হ্রদটি তৈরী হয় চতুর্দশ শতকের শেষভাগে। অনিন্দ্যসুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা পিছোলা আর শহর উদয়পুরের রূপে মোহিত হয়েই হয়তো ফরাসী পর্যটক পিয়ার লোটি বলেছিলেন, "যতই এগিয়ে যাই ততই সাদা রঙের প্রাসাদ ও মন্দিরের সমারোহ দেখা যায় দূর থেকে, যেগুলি চারদিক থেকে সুউচ্চ শিখরমণ্ডিত পাহাড় দিয়ে ঘেরা, যে পাহাড়গুলি জঙ্গলাবৃত। এই অভূতপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে এই শহরটি বিরাজ করছে রহস্য এবং শান্তির বাসা হয়ে।"

এই পিছোলা হ্রদের বুকে রয়েছে এক নর্তকীর পাথরের সুন্দর একটি স্মৃতিস্তম্ভ। একটি দুঃখময় কাহিনী জড়িয়ে আছে এই স্মৃতিস্তম্ভের পিছনে। মহারাণার সঙ্গে একবার এক নর্তকীর কথা হয়, দড়ির উপর দিয়ে নাচতে নাচতে পার হয়ে যাবে হ্রদ। বিনিময়ে তাকে দিতে হবে অর্ধেক রাজ্য। রাজী হলেন মহারাণা। নর্তকী এপার থেকে শুরু করলেন নাচ, পৌঁছে যাচ্ছেন ওপারে। মন্ত্রী দেখলেন এ-কাজে সফল হবে নর্তকী, দিতে হবে তাকে অর্ধেক রাজ্য। কেটে দিলেন দড়ি। হ্রদের জলে পড়ে সারাজীবনের জন্যে নৃত্যের পরিসমাপ্তি ঘটলো নর্তকীর। তাঁরই স্মৃতিতে এই স্মৃতিস্তম্ভ।

পিছোলা হ্রদের তীর থেকে ৮০০ ফুট দূরেই চারদিকে জলবেষ্টিত হয়ে যে প্রাসাদটি দাঁড়িয়ে আছে, সেটি জগনিবাস প্রাসাদ বা লেক প্যালেস। চার একর জায়গা জুড়ে এই ভাসমান প্রাসাদটি ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করেন জগৎ সিং। তারপর এটি আরও উন্নত ও সংযোজিত হয়েছে বিভিন্ন রাণাদের আমলে। এই প্রাসাদের একটি অংশে এখন লেক প্যালেস হোটেল। এই হোটেলে নজর কাড়ার মতো রয়েছে বিভিন্ন চিত্রকলা, সুন্দর ঝরণা, স্নানাগার এবং নানা ধরনের মূল্যবান আসবাব পত্র।

একবার জয়পুরে এসেছিলেন তৎকালীন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জন. এফ. কেনেডি। ভ্রমণকালে এই হোটেলেই তিনি বিশ্রাম এবং অবস্থান করেন। নৌকা ভাড়া করতে হয় এই হোটেলে যেতে। চোখের দেখা দেখতে সামান্য এই খরচটুকুতে কেউই কার্পণ্য করেন না, আমরাও করিনি।

পিছোলা হ্রদের বুকে দাঁড়িয়ে মনে পড়ে যায় প্রিনস্ অব ওয়েলস্-এর কথা, "মাদ্রাজ এবং উত্তরাপথের উদয়পুরের মধ্যে আর কিছু দর্শনীয় নেই—যদি কেউ ওখানে প্রথম যায়, তাহলে এই ব্যাপারটা সেইরকম দাঁড়ায় যে, তার ভোজসভা মহাআড়ম্বরে করেছে এবং অন্যান্য খাবার দিলে তার বিতৃষ্ণা জাগছে।"

আরও একটি জলবেষ্টিত প্রাসাদ জগমন্দির। পিছোলা হ্রদের দক্ষিণ প্রান্তেই নির্মিত হয়েছে এটি। সুদৃশ্য এই প্রাসাদের মূল বাড়ীটি একটি তিনতলা গোলাকৃতি স্তম্ভ। হলুদরঙের বেলে পাথরে নির্মিত এই প্রাসাদের নির্মাণ কাজ শুরু করেছিলেন মহারাণা অমর সিং ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে। করণ সিং শেষ করেন ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে। তবুও কিছু কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সেটির পরিসমাপ্তি করেন মহারাণা জগৎ সিং। তাঁর নামানুসারেই প্রাসাদের নাম জগমন্দির।

এর মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো বারোটি বিশালাকৃতি মার্বেল পাথর দিয়ে নির্মিত একটি প্রাসাদ। আর আছে পাথর দিয়ে তৈরী কারুকার্যখচিত সুন্দর সর্পাকৃতি একটি সিংহাসন, বেলজিয়াম কাচের আসবাবপত্র। এ-ছাড়া খাসমহল, গুলাব বাগ বা সজ্জন মহল, দিলারাম, চিড়িয়াখানা এবং মিউজিয়ামও অতুলনীয় করে তুলেছে এই প্রাসাদকে।

শাজাহান তখনও সম্রাট হননি, নাম ছিল খুরম। পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন তিনি। ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণা করণ সিং-এর শরণাপন্ন হয়ে শাজাহান আশ্রয় নিয়েছিলেন এই জগমন্দির প্রাসাদে।

এবার এলাম জগদীশ মন্দিরে। ৮০ ফুট উঁচু এই আকর্ষণীয় মন্দিরটি ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করেন মহারাণা জগৎ সিং। ৩২ ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলাম মন্দির চত্বরে—যার চার কোণে রয়েছে শিব, শক্তি, সূর্যদেব আর গণেশের মন্দির। মূল মন্দিরটি তিনতলা। ভগবান বিষ্ণুর সুদর্শন পাথরের বিগ্রহ স্থাপিত আছে মূল মন্দিরে।

অটো ভাড়া করা হয়েছে উদয়পুর স্টেশনের কাছ থেকে। শহরের মধ্যে দর্শনীয় স্থানগুলি দেখাতে দেখাতে নিয়ে চলেছে অটোড্রাইভার। তাকে আমাদের জিজ্ঞাসা করতে হয় না কোন পথে যাবো—কি কি দেখবো। আর আমরা যখন দর্শনীয় জায়গাগুলি দেখতে যাই তখন অপেক্ষা করে তারা।

পিছোলা হ্রদের পাড় ধরে অটো এলো উত্তরে ফতেহ সাগর। কৃত্রিম এই হ্রদটি তৈরী করেন জয় সিং ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। একবার বন্যায় বেশ বড় রকমের ক্ষতি হয় হ্রদের। পরে পুনর্নির্মাণ করেন মহারাণা ফতেহ সিং। তাঁর নামানুসারেই নাম হয়েছে ফতেহ সাগর। লম্বায় এই হ্রদটি ২·৪ কিমি এবং চওড়ায় ১·৬ কি.মি.।

গভীরতায় এটি ২৫ ফুট।
শান্ত সুন্দর এই হ্রদটির মধ্যেই রয়েছে নেহেরু দ্বীপ উদ্যান। প্রায় সাড়ে চার একর এলাকা জুড়ে বাগানটির মধ্যে রয়েছে অনেকগুলি ফোয়ারা। এই হ্রদের মধ্যে একটি ছোট্ট দ্বীপে আছে জেট ফোয়ারা। এটি বসানো হয়েছে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে। ফোয়ারা থেকে জল উপরে উঠছে ১৫০ ফুট।
এছাড়া ফতেহ সাগর হ্রদের সর্পিল বাঁকে অবস্থিত গুরুগোবিন্দ সিং পাহাড় উদ্যান। আনন্দ ভবন হোটেলের কাছে সুন্দর ছোট্ট বাগান আরাবল্লী বাটিকাটিও আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে উদয়পুরের।
ফতেহ সাগর হ্রদের বিপরীতেই মাঝারী উচ্চতার পাহাড়টি মোতিমগরী। অটো দেখতে দেখতে উঠে এলো উপরে। বিস্তৃত মোতিমগরীর চত্বরে আছে সাজানো ফুলের বাগান আর রাণাপ্রতাপের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রতাপ পার্ক। ফোয়ারায় ঘেরা উঁচু মঞ্চে রয়েছে ঘোড়ার উপরে বসা প্রতাপের ব্রোঞ্জের বিশাল প্রতিকৃতি। মঞ্চের গায়ে একদিকে হলদিঘাটের যুদ্ধের চিত্র আর একদিকে লেখা মহারাণা প্রতাপের জন্ম ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মে, মৃত্যু ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী। এই পাহাড় থেকে চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য এতই মনোরম, যা দেখেই হয়তো জনৈক বিশ্বপর্যটক বলেছেন, "উদয়পুরের মতো স্বপ্নালু জায়গা ভারতে কয়েকটিই আছে। এই আশ্চর্যনগরী ছুটি কাটানোর পক্ষে আদর্শ—যার নরম আকাশ, শান্তিপূর্ণ বাতাস আর নীরব সঙ্গীত উপলব্ধি করা যায়।"
অটো এবার হ্রদের পাশ ধরে পাহাড়ী পথের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে এলো সমতলে। দাঁড়ালো প্রাচীরে ঘেরা একটি বাগান বাড়ীর সামনে—সহেলিওঁ কি বাড়ী। অসংখ্য ফোয়ারায় ভরা এই সুন্দর বাড়ীটি ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করেছিলেন দ্বিতীয় সংগ্রাম সিং। ফতেহ সাগর বাঁধের নীচুতেই এই বাগানটি। একবার বাঁধ ভেঙে বাগানটি নষ্ট হয়ে যায়। পরে এটি আবার সুন্দরভাবে তৈরী করেন ফতেহ সিং।
বাগানের মধ্যে ঢুকে কিছুটা এগোতেই সামনে পড়লো সুন্দর একটি সাদা পাথরের ছোট্ট প্রাসাদ। এরই সামনে বাঁধানো পুকুরের চারপাশে অসংখ্য ফোয়ারা, যাতে কৃত্রিম বর্ষার সৃষ্টি করা যায়। এই বাগান বাড়ীর পাঁচটি মুখ্য ফোয়ারার নাম—স্বাগত ফোয়ারা, বিন বাদল বরসাত, শাওন ভাদো, কমল তলাই আর রাসলীলা ফোয়ারা। এই ফোয়ারাগুলি সব বিচিত্র ধরনের। কোথাও গম্বুজের কার্নিশ বেয়ে আবার কোথাও অবিরত জল ঝরছে হাতির শুঁড়ের ভিতর দিয়ে। যেমন সুন্দর তেমনই আকর্ষণীয়। এই ছোট্ট প্রাসাদকে ঘিরে চারদিকেই রয়েছে অসংখ্য রকমারী ফুল আর বাহারী গাছের বাগান।
মহারাণা ফতেহ সিং-এর মহারাণী গ্রীষ্মকালে অবসর বিনোদন করতেন এখানে তাঁর অসংখ্য সখীদের সঙ্গে। তাই এই বাগিচার নাম হয়েছে সহেলিওঁ কি বাড়ী।
মনোরম এই বাগানটি দেখলে মনে পড়ে যায় পৃথিবী বিখ্যাত ঐতিহাসিক Sir

Arnold Toyanbee-এর কথা, যিনি উদয়পুর ভ্রমণের পর বলেছিলেন, "আমি সব সময় জানতাম উদয়পুর হলো পৃথিবীর সুন্দর জায়গাগুলির একটি কিন্তু উদয়পুরের ছবিগুলি দেখলে এর সম্বন্ধে সব জানা যায় না। তাই উদয়পুর দেখতে গেলে নিজের চোখেই দেখতে হবে।"

এ-ছাড়াও উদয়পুরের দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে রয়েছে কাঠের পুতুল নাচের জন্যে প্রসিদ্ধ ভারতীয় লোক-কলা মণ্ডল, নেহেরু শিশু উদ্যান, মহারাণা ফতেহ সিং নির্মিত প্রাচীরে ঘেরা পশুদের প্রমোদ উদ্যান হরিদাসজী কি নগরী, উদয়পুর থেকে ৩ কি. মি. দূরে মন্দির মিউজিয়াম এবং মহারাণাদের সমাধিক্ষেত্র আহার, মহারাণা জয় সিং তাঁর রাণীর জন্যে করেছিলেন সুন্দর জয়সমন্দ বা ধেবর লেক, শহর উদয়পুর থেকে ১৩ কি.মি. দূরে ১৫৫৯-১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মহারাণা উদয় সিং নির্মিত উদয়সাগর, মানিক্যলাল উদ্যান, মহারাণা রাজ সিং-এর মা জনদেবী নির্মিত পাহাড়বেষ্টিত হ্রদ জনসাগর বা বাড়ী কি তালাও, শ্বেতাম্বর জৈনদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ঋষভদেবজীর মন্দির, মহারাণা রাজ সিং নির্মিত রাজসাগর হ্রদ, শহর থেকে ৬৪ কি. মি. দূরে ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণা কুম্ভ নির্মিত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩৫৬৮ ফুট উঁচুতে কুম্ভলগড়ে তাঁর নিজের সমাধিক্ষেত্র, উদয়পুর থেকে ১৬ কি. মি. দূরে গোগুন্ডা—যেখানে দেহত্যাগ করেছিলেন উদয়পুর স্রষ্টা স্বয়ং উদয়সিং। এইসব দর্শনীয় স্থানগুলি আজও আকর্ষণ বৃদ্ধি করে চলেছে ভ্রমণ পিয়াসীদের।

আজ উদয়পুরে দ্বিতীয় দিন। এখন শীতকাল। সকাল সাতটার আগে আলোর মুখই দেখা যায় না এখানে। ভোর রাতে চারটের সময় সকলেই তৈরী হয়ে নিয়েছি। বাস আগেই এসে হাজির। বলা ছিল তাই। সহযাত্রীরা সকলেই এসে বসলেন বাসে। কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যেই বাস ছাড়লো ভোর পাঁচটায়।

উদয়পুর শহর ছেড়ে বাস চললো পাহাড়ী পথ ধরে। অন্ধকারে কালো কালো পাহাড় আর বাসের হেডলাইটের আলোয় আঁকাবাঁকা পথ ছাড়া আর দেখা যায় না কিছুই। একটানা চললো চল্লিশ মিনিট। আবছা অন্ধকারের মধ্যেই এসে দাঁড়ালো একলিঙ্গজী মন্দিরের সামনে। স্টেশন উদয়পুর থেকে এলাম ২৫ কি. মি.। একলিঙ্গজী মন্দিরটি দিল্লী-উদয়পুর-বোম্বাই সড়কে কৈলাসপুরী গ্রামে।

বাস থেকে নেমে এগিয়ে চললাম সকলেই। বিশাল কারুকার্যখচিত তোরণদ্বারের দুপাশে রয়েছে গম্বুজ। প্রবেশপথের পাশের দেয়ালে মন্দির প্রতিষ্ঠাকাল লেখা দেখলাম 734 A.D.। দুটি পাহাড়ের মাঝের খাদেই স্থাপিত হয়েছে মন্দিরটি। চারদিকেই উঁচু পাথরের প্রাচীরে ঘেরা মন্দির। দূর থেকে দেখলেই মনে হয় যেন একটি সুরক্ষিত দুর্গ। আসলে তৎকালীন কিছু মোঘল সম্রাটদের হিন্দু মন্দির আক্রমণের একটা রেওয়াজ ছিল। তাঁদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যেই নির্জন পাহাড়ের আড়ালে এমনভাবেই করা হয়েছে মন্দির। সমগ্র রাজস্থানে এই একটিই

মন্দির যেখানে মোঘল বাদশাহের হাতের স্পর্শ পড়েনি।

তোরণদ্বার পেরিয়ে এলাম বাঁধানো লম্বা চত্বরে। ডানদিকে পড়লো কারুকার্যখচিত তিনটি স্তম্ভ। এ-গুলিতে খোদিত আছে নারায়ণের অপূর্ব মূর্তি। চত্বর পেরোতেই মাঝারী চওড়া—লম্বা একটি পথ। এখানে রয়েছে পুরীর মন্দিরের ধাঁচে তৈরী একটি পাথরের মন্দির। বিভিন্ন দেবদেবীর ছোট ছোট মূর্তি খোদাই করা আছে মন্দিরের দেয়ালে। প্রাচীনত্বের ছাপও চোখে পড়ে মন্দিরের চেহারায়। কিছু মূর্তি ভেঙে গেছে, যেমন ভেঙেছে কোণারক ভুবনেশ্বর এবং ভারতের অনেক প্রাচীন মন্দিরে। এটা কিন্তু একলিঙ্গজী মন্দির নয়। একে ডানপাশে রেখে লম্বা রাস্তা ধরে আরও কিছুটা এগিয়ে এসে দাঁড়ালাম একেবারে মূল মন্দিরের সামনে।

একলিঙ্গজী মন্দিরের নাটমন্দিরে উঠতে প্রথমে পড়লো কুচকুচে কালো কষ্টিপাথরের বৃষমূর্তি নন্দী। মাঝারী আকার। এর পিছনে রয়েছে আর একটি পিতলের নন্দী। আকারে বেশ বড়। এবার উঠে এলাম নাটমন্দিরে। এখানে, একেবারে মাঝখানেই অবস্থান করছে আরও একটি বৃষমূর্তি। তবে এটি পিতল কিংবা পাথরের নয়, সম্পূর্ণ রূপোর। এটাও বেশ বড়।

অনেকগুলি পাথরের স্তম্ভের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে মূল মন্দিরটি। প্রতিটি স্তম্ভেই রয়েছে শিল্পের ছোঁয়া। মূল মন্দিরের দরজা দুটো। দ্বিতীয় দরজা দিয়েই গর্ভমন্দিরে দেখা যায় প্রভু একলিঙ্গজীর অবস্থান। আর একটি দরজা পাশে। সারা দেয়াল আর দরজায় শুধু রূপোর ছড়াছড়ি। সুন্দর নক্সা করা রূপোর চাদরে মোড়া। বেশ বড় বড় রূপোর ঘণ্টা রয়েছে তিনটি। দেখলেই মনে হয়, বেশ কয়েক মণ রূপো লেগেছে এই ঘণ্টাগুলি তৈরী করতে।

মন্দিরমধ্যে স্থাপিত রয়েছে একলিঙ্গজী। কালো কষ্টিপাথরের শিবলিঙ্গ। লিঙ্গের গায়ে বসানো রূপোর চোখ একেবারে ঝকঝক করছে। নেপালের পশুপতিনাথ আর নৈমিষারণ্যের ভূতনাথের মতো। তবে ওখানে মহাদেব পঞ্চানন এখানে চতুরানন। পূর্বদিকের মুখটি সূর্যদেবের, পশ্চিমে ব্রহ্মার, উত্তরে বিষ্ণুর আর দক্ষিণের মুখটি স্বয়ং ভগবান শংকরের। দর্শনার্থীরা শংকরের মুখটিই দর্শন করে থাকেন। অন্য মুখগুলি দুপাশে এবং পিছনে। দর্শন ও পূজা সারতে হয় দূর থেকেই। কেদারনাথ আর বিশ্বনাথের মতো একলিঙ্গজীর নীতি এখানে উদার নয়। তাই স্পর্শ করা বা মন্দিরের ভিতরে যাওয়া নিষেধ।

মূল মন্দিরকে ঘিরে তিনপাশে রয়েছে আরও ১০৮টি মন্দির। কিছু মন্দির ভাঙা আর কিছু আজও রয়েছে অক্ষত, নিখুঁত। কোনটি শিল্পকর্মে ভরা, কোনটি একেবারেই সাদামাটা। মন্দিরগুলির মধ্যে ৭০টি মন্দিরই শিবের, স্থাপিত আছে ছোট ছোট শিবলিঙ্গ। ঠিক যেমনটি দেখা যায় কালনায় এবং বর্ধমানের ১০৮ শিব মন্দিরে। এ-ছাড়া ১০টি মন্দির গণেশের, ১০টি বিষ্ণুর। বাদবাকি মন্দিরগুলির কোনটি রামলক্ষ্মণ, কোনটি ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবদেবীর।

মেবারের রাণাদের গৃহদেবতা একলিঙ্গজী। শিলাদিত্য বংশের রাজপুরুষ বাপ্পা রাওয়াল একলিঙ্গজীকে প্রতিষ্ঠা করেন এখানে। এই মন্দিরের আংশিক সংস্কার করেন মহারাণা মোকল। বর্তমান মন্দিরের স্বরূপ দেন মহারাণা রায়মল আর মুখ্যভাগ নির্মাণ করেন রাণা সংগ্রাম সিং। শত শত বছর ধরে মেবারকে অদ্বিতীয় করে রেখেছে একলিঙ্গজী মন্দিরের ভাস্কর্য ও শিল্পকলা।

পরিষ্কার আকাশকে মাথায় নিয়ে বাস ছাড়লো একলিঙ্গজী মন্দিরের কাছ থেকে। আবার ধরলো পাহাড়ী পথ। বাঁধানো পিচের রাস্তা। দুপাশে আরাবল্লী পর্বতমালা। এখন শীতকাল বলেই হয়তো পাহাড়ে সবুজের সমারোহ কম। বলতে গেলে সারি সারি পর্বতমালা বেশ রুক্ষই। বাস এক টানা চললো আধঘণ্টা। এলাম নাথদ্বার বা নাথদোয়ারা। একলিঙ্গজী মন্দির থেকে ২৫ কি. মি.। শহর উদয়পুর থেকে দূরত্ব ৫০ কি. মি.।

বাস থামলো মন্দির থেকে কিছুটা দূরে। পথ চওড়া নয় তাই বাস ভিতরে যেতে পারে না। দুপাশে অসংখ্য দোকানের ছড়াছড়ি। মন্দিরে যাওয়ার পথেই পড়লো 'দিল্লীওয়ালা ধরমশালা'। আমরা সকলেই উঠলাম এখানে।

একটু বিশ্রামের পর চললাম মন্দিরে। প্রধান ফটক পার হলে ঢালু মতো একটু পথ। তারপর কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলাম একেবারে মন্দিরচত্বরে। অবশ্য এই মন্দিরের প্রবেশদ্বার আছে তিনটে। সাদামাটা মন্দির। সাধারণ বাড়ীর মতো। বিন্দুমাত্র শিল্পকলার ছোঁয়া নেই শ্রীনাথজীর মন্দিরে।

এখানকার মন্দিরে ঝাঁকিদর্শন। মন্দির খুলবে নির্দিষ্ট সময়ে। তার আগে ধীরে ধীরে দর্শনার্থীরা জড়ো হবে মন্দিরের বাইরে। তারপর ঝাঁকে ঝাঁকে দর্শন করবে সকলে—ঝাঁকি দর্শন।

ধাক্কাধাক্কি করে ঢুকলাম মন্দিরে। যেটুকু দেখলাম তাতে তৃপ্তি হয় না মনের। শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিই এখানে শ্রীনাথ নামে প্রসিদ্ধ। কুচকুচে কালো কষ্টি পাথরের বিগ্রহ, যেমন দেখেছি জয়পুরে গোবিন্দ মন্দিরে। অপূর্ব সুন্দর—সুসজ্জিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণের ঘণ্টায় ঘণ্টায় দর্শন আর পরিবর্তন হয় পোশাকের।

এখানকার দর্শনার্থীদের অধিকাংশই বিভিন্ন প্রদেশের অবাঙালী। একটানা কিছুক্ষণ দর্শনের ব্যবস্থা নেই। ফলে মন্দিরের তিনটে দরজা যখন খোলা হয়, তখন হুড়মুড় করে একসঙ্গে ছুটে যায় সকলে। শুরু হয়ে যায় ঠেলাঠেলি। চলতে থাকে সমানে। সুতরাং দর্শন হয় নামমাত্র, সুন্দরভাবে নয়। একে অপরের ঘাড়ে পড়ছে, কেউ পড়ছে পায়ের তলায়। কোন নিয়ম শৃঙ্খলা নেই যেমন দর্শনার্থীদের তেমনই নেই মন্দির কর্তৃপক্ষের। তবে সবকিছু অব্যবস্থার মূলে রয়েছে মন্দির কর্তৃপক্ষ। তারা এই ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামায় না বলেই দর্শনার্থীদের কষ্টের শেষ থাকে না। এইভাবেই দর্শন করে বেরিয়ে এলাম মন্দির থেকে, সঙ্গীরাও।

মেবারে শ্রীনাথজীর প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে রয়েছে একটি অতীত কাহিনী। পঞ্চদশ শতাব্দীর কথা। অন্ধ্রপ্রদেশের কাঁকড়ওয়াড় গ্রামে দক্ষিণী ব্রাহ্মণ বংশে ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে

জন্মগ্রহণ করেন মহাত্মা বল্লভাচার্য। পরবর্তীকালে কিছুদিনের জন্য বসবাস করেন বৃন্দাবনে। এক সময় তিনি মিলিত হন মহাপ্রভুর সঙ্গে।

জনশ্রুতি আছে, বৃন্দাবনে গিরি গোবর্ধন পাহাড়ের আড়ালে গোবর্ধন নাথজীর একটি মূর্তি পড়ে থাকে। কাছের আনিওরা গ্রামের দুজন ব্রজবাসী মানেক চাঁদ এবং সদু পাণ্ডে সন্ধান পান এই দেবমূর্তিটির। পরে তাঁরা দৈবাদেশে নিত্যসেবা পূজা করতে থাকেন এই বিগ্রহের।

একদা মাধবেন্দ্রপুরী আসেন বৃন্দাবনের এই গিরি গোবর্ধন অঞ্চলে। বিগ্রহ দর্শন করে তিনি মোহিত হয়ে যান। তারপর পূজার জন্য নিজ প্রচেষ্টায় নির্মাণ করে দেন একটি কুটির। চলতে থাকে নিত্য সেবা পূজা। কালক্রমে এখানে আসেন প্রেমিক সাধক বল্লভাচার্য। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গোবর্ধন নাথজীর মাহাত্ম্য প্রচার এবং একটি মন্দির নির্মাণ করে সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন এই দেববিগ্রহটিকে। পরে পূজার ভার দেয়া হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভক্ত ব্রাহ্মণদের উপরে। আর বিগ্রহ এবং মন্দিরের অন্যান্য সেবাকর্মের ভার দেয়া হলো বল্লভাচার্যের দুই শিষ্য কৃষ্ণদাস এবং কুম্ভনদাসের উপরে। চলতে থাকে গোবর্ধন নাথজীর নিত্য পূজা।

পরবর্তীকালে নতুন বড় মন্দির স্থাপনের জন্য গোবর্ধনের প্রত্যাদেশ পান এক ধনী ব্যবসায়ী পূরণমল। একটি সুন্দর বড় মন্দির নির্মাণ করে দেন তিনি। প্রায় কুড়ি বছর সময় লাগে এই মন্দির নির্মাণের কাজে। এই সময়ে বিগ্রহের পূজা চলে বল্লভাচার্যের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরেই।

ইতিমধ্যেই বল্লভাচার্যের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধি ও প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে তা প্রসারলাভ করে সমগ্র বৃন্দাবন, রাজপুতানা এবং গুজরাটে।

পরবর্তীকালে কিছু মুসলমান শাসক শুরু করেছিলেন হিন্দুদের পবিত্র স্থান ও মন্দির ধ্বংসের কাজ। এই ধ্বংসলীলার হাত থেকে রক্ষা পায়নি মথুরা বৃন্দাবনও। এই পরিস্থিতিতে মুসলমান আক্রমণের ভয়ে গোবর্ধন মন্দিরের আধিকারিকদের চাতুর্যে এবং অত্যন্ত গোপনে গোবর্ধন নাথজীকে সরিয়ে আনা হয় মেবারে। রাণা রাজ সিং-এর রাজত্বকালে নাথদোয়ারায় প্রতিষ্ঠা করা হয় শ্রীনাথজীকে। কথিত আছে, বল্লভাচার্যের জীবিতকালেই মেবারে শ্রীনাথজীকে স্থানান্তরিত ও প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ঘুরে ফিরে দেখে এলাম বাসে। আবার বাস ছাড়লো নাথদোয়ারা থেকে সহযাত্রীদের নিয়ে। চললো কখনও সমতল, কখনও আরাবল্লীর আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ ধরে টানা চল্লিশ মিনিট। এসে থামলো পাহাড়ে ঘেরা বেশ কিছুটা ফাঁকা একটি জায়গায়। নাম বাদশাহী বাগ। এখানে দেখার মতো কিছু নেই—আছে অতীতের এক রক্তে লেখা ইতিহাস। রাণা প্রতাপের সঙ্গে যুদ্ধের সময় সম্রাট আকবর তাঁর মোঘলসেনাদের সমবেত করেছিলেন এই জায়গাটিতে।

বাদশাহী বাগ থেকে বাস ছেড়ে মিনিটপাঁচেক চলে আবার থামলো। এলাম চৈতক স্মারক। এটিই মেবারের ইতিহাস প্রসিদ্ধ রণস্থল হলদিঘাটী। পরাক্রমী প্রতাপের

সঙ্গে আকবরের মোঘলবাহিনীর প্রবল যুদ্ধ হয় এখানে। আহত মহারাণার প্রাণরক্ষার্থে প্রভুভক্ত ঘোড়া চৈতক ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুন যে ক্ষেত্রটিতে পড়ে প্রাণ ত্যাগ করেছিল, সেখানেই স্থাপিত হয়েছে একটি স্মারকস্তম্ভ। চৈতক স্মারক এখন রাষ্ট্রীয় তীর্থস্থান। এখানকার কিছু পাহাড়ের পাথর আর মাটির রঙ একেবারে হলুদ—আজও। তাই নাম হয়েছে এর হলদিঘাটী। নাথদোয়ারা থেকে ১৬ কি. মি. এবং উদয়পুর শহর থেকে ৫৬ কি. মি. দূরে অবস্থিত আরাবল্লী পর্বতমালার অন্তর্গত রণক্ষেত্র এই হলদিঘাটী।

বাস এবার ছাড়লো হলদিঘাটী থেকে শহরের উদ্দেশ্যে। মোটামুটিভাবে উদয়পুরের দর্শনীয় জায়গাগুলি দেখা হলো দুদিনে। আরও আছে টুকটাক এমন কিছু জায়গা, যেগুলি প্রধানত আকর্ষণ করে না কোন পর্যটকদের তাই আমাদের মতো যান না অনেকেই।

সেই সাতসকালে ভোর পাঁচটায় বেরিয়েছিলাম আবছা অন্ধকারে। আবার ফিরে এলাম উদয়পুর সিটি স্টেশনে। এখন বেলা ১টা।

## পুরাতাত্ত্বিক সৌন্দর্যে ভরা শহর যোধপুর

কাঁটায় কাঁটায় রাত ৮/১৫ মিঃ। আবার ট্রেন ছাড়লো। উদয়পুর ছেড়ে আসার সময় মনে পড়ে গেল বিখ্যাত ইংরেজ কবি রুডইয়ার্ড কিপলিং-এর কথা, যিনি সুন্দর নগরী এই উদয়পুর পরিভ্রমণ করে বলেছিলেন, "উদয়পুর না দেখলে ভারত ভ্রমণ পূর্ণ হয় না।" সত্যিই তাই।

ট্রেনের গতি বাড়লো ধীরে ধীরে। বাইরে গাঢ় অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। তাই বলে চুপ করে বসে রইলাম না। কামরার এ-মাথা থেকে সে-মাথা পর্যন্ত একবার চক্কর দিয়ে এসে বসলাম একটা খোপে, যেখানে বসে আছেন চারজন ভদ্রমহিলা এবং একজন ভদ্রলোক। এরা সকলেই আমার সহযাত্রী। এদের মধ্যে আধাবয়েসি দুজনের মধ্যে একজনের সঙ্গে স্বামী আসেননি। একজন বিধবা মাসী—বয়স্কা। আর কম বয়েসি মহিলা একজন। ভদ্রলোক বয়স্ক। বসে আছেন উপরের বার্থে। স্ত্রী বসে আছেন আর সকলের সঙ্গে নীচে। এদের মধ্যেই আমি একটু জায়গা করে নিয়েছি আমার লেখার রসদ জোগাড়ের জন্যে। কথা কম বলি শুনি বেশী, তাই চুপ করে বসে রইলাম শোনার অপেক্ষায়। বিধবা মাসি বললেন,

—কবে যে দ্বারকায় কৃষ্ণের কাছে পেঁছাবো, কে জানে বাবা! আর ভাল্ লাগছে না। আজ সারাদিন ঘুরে বেশ কষ্ট হয়েছে দিদি। কোমরটা একেবারে ধরে আছে। কিছুতেই ছাড়ছে না। খালি পাহাড় আর দুর্গ, ভাল্ লাগে না। ও-সবের যে দ্যাখেটা কি, বুঝি না বাবা!

উত্তর দিলেন সামনে বসা কম বয়েসি বিবাহিতা,

—রাজস্থানে এ-ছাড়া আর দেখবেনটা কি! রাজস্থান হচ্ছে একটা ইতিহাস। আগেকার ইতিহাসটা তো দাঁড়িয়ে আছে ঢাল তলোয়ার আর দুর্গের উপর। এসব

দেখার জন্যেই তো রাজস্থান, এখানে আসা।
বিধবা মাসীর কথায় সমর্থন জানিয়ে আধাবয়েসী মহিলা বললেন, যার স্বামী আসেননি সঙ্গে,
—এখন আপনার বয়েস কম তাই এসব ভালো লাগবে। আমাদের ও-সব ভালো লাগার বয়েস চলে গেছে অনেককাল আগে।
কথাটুকু বলেই একেবারে সোজা চলে গেলেন সংসারে,
—আজ কতদিন হলো নাতিটাকে দেখিনি। বাড়ীতে গেলেই কোলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ঠাকুমা ঠাকুমা করে। আমার বউমার সব ভালো তবে বড্ড রাগী। এতটুকু ধৈর্য নেই। উঠতে বসতে নাতিটাকে মারে। চোখের সামনে দেখতে পারি না। মুখে যা আসে তাই বলি। এই নিয়েই আমার সঙ্গে বাধে। নইলে দিদি আমার সংসারে আর কোন অশান্তি নেই।
কথাটা শুনেই শুরু করলেন কৃষ্ণপ্রেমিকা বিধবা মাসী,
—আমার দুই ছেলে। দুজনেরই বিয়ে দিয়েছি। ভালো চাকরী করে। দুটো বউই ভালো পেয়েছি দিদি। আমার সংসারেও কোন অশান্তি নেই। ওরাই আমাকে পাঠালো তীর্থ করতে। আমার ছোট বউমা এমনিতে খুব ভালো। তবে বড্ড বাপের বাড়ী ঘেষা। লুকিয়ে লুকিয়ে কাপড় চোপড় দিয়ে আসবে। ছেলের টাকা পয়সার শ্রাদ্ধ করে দিচ্ছে বাপের বাড়ীতে। জানতে পেরে দিদি একদিন বলেছি, ব্যস, আমি হয়ে গেলাম দু-চোখের বিষ। নইলে আমার এমনিতে কোন অশান্তি নেই। আর বড় বউমা, ওর অনেক গুণ। বড় ঘরের মেয়ে। সংসারের সব দেখাশুনো বড় বউমাই করে। রান্নাবান্না, লোকজন, অতিথি আপ্যায়ন—সবই করে। তুলনা হয় না আমার বড় বউমার। তবে আজ কিছুদিন হলো দেখছি, ছেলে কোন খাবার মিষ্টি ফলটল কিনে আনলে লুকিয়ে রাখে। পরে লুকিয়ে লুকিয়ে নাতিটাকে দেয়, নিজে খায়। আমাকে তো দেয়ই না, ছেলেটাকেও দেয় কিনা জানি না। আগে এসব করতো না। এটা আমার ছোট বউমার দেখাদেখি শিখেছে।
এই কথার মাঝেই এক সহযাত্রী এসে বসেছেন আমাদের আসরে। হাইপ্রেসারের রুগী। এবার অল্প বয়স্কা বিবাহিতা জানালেন তাঁর কথা,
—আমার স্বামীর মনটা খুব ভালো। শুধু একটাই দোষ। আমি কোন কথা বললে শুনবে না। দেওর ননদ শাশুড়ী কোন কথা বললে ওদের কথাই শুনবে। সংসারে আমার কোন স্থান নেই। কথায় কথায় স্বামী আমাকে অপমান করে কথা বলে। নইলে দিদি আমাদের সংসারে এমনিতে আর কোন অশান্তি নেই।
কারও সংসারে অশান্তি নেই শুনে হাইপ্রেসার দাদা বললেন বার্থের উপরে বসা বয়স্ক দাদা এবং আর সকলকে উদ্দেশ্য করে,
—আমারও দাদা সুখের সংসার। বেশ আছি ভগবানের দয়াতে। কোন অশান্তি নেই। তবে আমার স্ত্রীর ইচ্ছা আলাদা থাকি। আপনিই বলুন দাদা, মা ভাই বোনকে কি ছেড়ে থাকা যায়? তারা যাবে কোথায়? বোনটার বিয়ে হয়নি।

ভাইটা ছোটখাটো একটা কাজ করে। তাতে ওর নিজের খরচাটা কোন রকমে চলে যায়। মা বোনকে ফেলে কোথায় যাবো বলুন তো! আসলে আমার শ্বশুরবাড়ীর লোক ইন্ধন দেয়। এই নিয়ে বাধে স্ত্রীর সঙ্গে। নইলে আমার আর কোন অশান্তি নেই সংসারে।

একটু থেমে এবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,

—আর একটা কারণে আমি শেষ হয়ে গেলাম। আজ এটা দাও, কাল সেটা দাও, আমার কি তেল কল আছে? শালা ব্যবসা না কি করবে আমাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে হবে। শালীর বিয়ে, আমাকে একটা জিনিষ দেবার দায়িত্ব নিতে হবে। শ্বশুরবাড়ীর বোঝা আমি বইতে যাবো কেন? ওদের বাড়ীতে কিছু হলেই টাকা দিতে হবে আমাকে—কেন? যখনই স্ত্রীর কথায় প্রতিবাদ করি তখনই একটু অশান্তি। নইলে দাদা আমাদের সংসারে কোন অশান্তি নেই।

এবার আমাদের অশান্তিহীন সুখের সংসারে এসে বসলেন সদাশিবের ওষুধখেকো স্ত্রী। সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

—বাসে ওঠার সময় হাঁটুতে গুঁতো খেয়েছিলুম সেই সকালে। এখনও টন্‌টন্‌ করছে। একটু ছড়েও গেছে। রিলাক্সন মলম দিলুম কিছুই হলো না। কোন ওষুধ আছে আপনাদের কাছে?

কথাটা শোনামাত্রই বার্থের দাদা টুক্‌ করে নেমে এলেন উপর থেকে। বসার সিটের তলা থেকে বের করলেন চামড়ার একটা সুটকেশ। তার ভিতর থেকে বের করলেন ছোট আকারের একটা বাক্স। একপাশে বসে খুলে ধরলেন সকলের সামনে। একটা শিশি বের করে খানছয়েক গুলি এক চিলতে কাগজে ঢেলে সদাশিবের স্ত্রীর হাতে দিয়ে বললেন,

—এটা আর্নিকা টু হান্ড্রেড। খান, ব্যথা সেরে যাবে। শোবার সময় একবার আসবেন তখন একটা পুরিয়া দেবো। কালকে দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে।

কর্তা-গিন্নি থেকে শুরু করে আজকাল অধিকাংশ বাড়ীর ঝি চাকর টমি মিনি এমনকি খাঁচায় পোষা ভক্তদাস পর্যন্ত থার্‌টি থেকে টু হান্ড্রেড পর্যন্ত শিখে বসে আছে। পথে ঘাটে হাটে বাজারে কারও কোন রোগের কথা শুনলেই হলো। এদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে থার্‌টি নইলে টু হান্ড্রেড খাও। সব ঠিক হয়ে যাবে।

সদাশিবের স্ত্রী গুলি কটা গালে ফেলে বললেন,

—বাড়ীতে এমন হলে উনি এতক্ষণ কখন ডাক্তার নিয়ে চলে আসতেন। আমার কোন কষ্টই হতে দিতেন না। সব ব্যাপারেই উনি সিরিয়াস। এই দেখুন না, মেয়ে দুটো গ্রাজুয়েট হলো। সঙ্গে সঙ্গেই পার করে দিলেন সুপাত্র দেখে। আমার মেয়েদের কলেজ ছাড়া ঘর থেকেই বেরোতে দিতুম না। এই তো সেদিন আমাদের পাশের বাড়ীর কি ভালো মেয়েটা পালিয়ে গেল পাড়ার একটা নচ্ছার ছেলের সঙ্গে। আজকাল দিদি এমন একটা মেয়ে পাবেন না যার নাকি একটা লেজুড় নেই। এসব ব্যাপারে উনি ভীষণ কড়া। বাইরের কারও সঙ্গে মেয়েদের মিশতেই দিতেন না।

প্রসঙ্গ এবার অন্যমুখী হলো। শুরু হয়ে গেল এক একজনের অভিজ্ঞতার কথা। পাড়ায়, বাড়ীর পাশে, গ্রামে কার মেয়ে কতদিন ধরে প্রেম করছে, পাত্র কেমন, কার ছেলে কার মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছে, পুলিসের সে কি খোঁজাখুঁজি—এমন হাজার কথা। এমন একজন মহিলা বা ভদ্রলোককে আজ পর্যন্ত পেলাম না যিনি বললেন, তার মেয়ে বা ছেলে অবৈধ প্রেমে লিপ্ত হয়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে। কথা শুনে বুঝেছি, সকলের মেয়েই লক্ষ্মী মেয়ে। সকলের ছেলেই লক্ষ্মী ছেলে। এমন ছেলেমেয়ে লাখে একটা হয় না। খাঁচায় পোরা ছিল। বিয়ের দিন পাত্রের হাতে তুলে দিয়েছে। আসলে এমন কথা না বললে যে ইমেজ বাড়ে না। আরও বড় সুবিধা হলো পথে বলার, কেউ তো বাড়ীতে খোঁজ নিতে যাবে না। এমন প্রেমের ঘটনা কারও বাড়ীতে বর্তমানে চললেও মেয়ে বা ছেলের বাবা মা একেবারে অস্বস্তিকর অবস্থায় না পড়লে কারও কাছে সহজে মুখ খোলে না।

এমন জমানো আসরে এসে গেল রাতের খাবার। তারপর শোয়া। ট্রেন চলছে কিন্তু হু-হু করে।

ঘুম ভাঙলো খুব ভোরে। দেখলাম ট্রেন চলছে তখনও। অসম্ভব ঠাণ্ডা। ট্রেন থেকে বাইরে দেখলাম কখনও দু-চারটে বাড়ী আবার কখনও ধু-ধু করছে ফাঁকা মাঠ। সকাল ৮টায় এসে পৌঁছালাম যোধপুর স্টেশনে। আবার কামরাটা কেটে দেওয়া হলো ট্যুরিস্ট প্ল্যাটফরমে। সারারাত চলে উদয়পুর থেকে যোধপুর এলাম ২৭৫ কি.মি.।

ট্রেন চলাকালীনই জলখাবারের পাট চুকে গেছে ট্রেনের মধ্যে। সকলেই তৈরী হয়েছিলাম। ট্রেন থেকে নেমে বেরিয়ে এলাম স্টেশনের বাইরে। অটোতে করে চললাম শহরের মধ্যে দিয়ে।

সাজানো শহর। চওড়া রাস্তা ঝকঝক করছে। শহর যোধপুরের পর থেকেই শুরু হয়েছে মরুঅঞ্চল। তাই মরুর গ্রাস থেকে রক্ষা করার জন্য ১০ কি.মি. পরিধির বিশাল প্রাচীরে ঘেরা শহরের চারদিক।

মিনিট পনেরোর মধ্যে সামান্য পাহাড়ী টিলা বেয়ে অটো এসে দাঁড়ালো এক বিশাল অট্টালিকা উমেদ সিং ভবনের সামনে। সামনে লোহার দরজা। টিকিট কেটে ঢুকে পড়লাম ভিতরে। সামনেই সুন্দর সাজানো বাগান পেরিয়ে 'প্যালেস'।

একদা যোধপুরের মহারাজা ছিলেন উমেদ সিং। তাঁরই বিশাল রাজপ্রাসাদ। এখন সেটি হয়েছে মিউজিয়াম। ঢুকলাম প্রাসাদের ভিতরে। বিশাল বিশাল ঘর। একের পর এক ঘরে ঘরে দেখতে থাকি। কোনটায় সাজানো রয়েছে রাজারাণীদের ব্যবহৃত নানাধরনের মূল্যবান পোশাক, কোনটায় অস্ত্রশস্ত্র, কোনটায় কারুকার্যময় সুন্দর সুন্দর অসংখ্য মদের গ্লাস, বিচিত্র ধরনের আলোকচিত্র, সুদৃশ্য মূল্যবান আসবাব—চোখ জুড়িয়ে যায় এর কাজ দেখলে। এই প্রাসাদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো ঘড়িগুলি। মহারাজের উপহার পাওয়া এবং নিজের কেনা বিচিত্র ও বিভিন্ন

ধরনের ঘড়ির সংখ্যা প্রায় আড়াইশো। একটি বিশাল হলঘরে এসে দাঁড়ালাম। এক সময় এটি ব্যবহার করা হতো রাজপরিবারের সিনেমা দেখার জন্যে। উমেদ সিং ভবনে এগুলি সব রক্ষিত আছে সুন্দর, সুশৃংখলভাবে। গাইডের সহযোগিতায় এসব ঘুরে দেখতে সময় লাগলো খুব কমই—মাত্র চল্লিশ মিনিট।

অটো আবার চলতে শুরু করলো সহযাত্রীদের নিয়ে। সামান্য পথ চলার পর উঠলো পাহাড়ে। এসে দাঁড়ালো যশোবন্ত সিং স্মারক মন্দিরে—যশোবন্ত থাডা। সাদা দুধের মধ্যে শ্বেত পাথরে নির্মিত স্মৃতিমন্দির। এমন নিখুঁত কারুকার্য সারা স্মৃতিমন্দিরের দেয়ালে, দেখলে মনে হয় যেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার হাতের স্পর্শে গড়ে উঠেছে এই স্মৃতিমন্দির। জড় পাথরের দেয়ালগুলি জীবন্ত হয়ে যেন সত্যি সত্যিই হাতছানি দিয়ে ডাকে অজ্ঞাত শিল্পীর অনবদ্য শিল্পকলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। যোধপুরে এসে কেউ যদি এই স্মারক মন্দিরটি না দেখে তবে তার কিছুই দেখা হবে না। হারাবে সারা জীবনের মতো একডালি শিল্পকলা সম্ভার। মহারাজা যশোবন্ত সিং-এর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় এখানেই। তাছাড়া আরও ৪২ জন রাজপুত রাজার সমাধি রয়েছে এখানে। এই স্মারক মন্দিরের পাশেই দেখছি বিশাল বাঁধানো একটি সরোবর। একটু দূরে, এখানে দাঁড়িয়েই সুন্দরভাবে দেখা যায় যোধপুর দুর্গ।

এবার অটো চললো যোধপুর দুর্গে আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ ধরে। এত সুন্দর এত মসৃণ পথ—এ-পথে না এলে কারও বোঝার উপায় নেই কত যত্ন ও সংরক্ষণে রেখেছে রাজস্থান সরকারের পর্যটন বিভাগ।

শুধু ভারতেই নয়, পৃথিবীর মধ্যেও ঐতিহাসিকভাবে এবং পরিকল্পনার দিক থেকে যোধপুর কেল্লা যেমন অতুলনীয় তেমনই ঐতিহ্যমণ্ডিত। পুরাতাত্ত্বিক সৌন্দর্যে ভরা এই দুর্গ। যদিও যোধপুর বারংবার আক্রান্ত হয়েছে শক্তিশালী অত্যাচারীদের দ্বারা, তবুও এখানকার শাসনকর্তারা যে কতটা শিল্প ও স্থাপত্যকলার অনুরাগী ছিলেন তা এই দুর্গ নিজের চোখে না দেখলে কারও কল্পনাতেও আসবে না।

মেবারের রাণা সংগ্রাম সিং-এর ( সাঙ্গা ) পরে সেই সময় সবচেয়ে শক্তিশালী হিন্দু-শাসক ছিলেন যোধপুরের রাও মালদেও। তিনি এক ভয়ংকর যুদ্ধ করেছিলেন তৎকালীন ভারত সম্রাট শেরশাহ সুরীর সঙ্গে। যদিও সম্রাট সৈন্যবাহিনীর কুশলতা আর ভাগ্যের সহায়তা পেয়েছিলেন তবুও তিনি রাঠোরদের বীরত্বে অনুপ্রাণিত এবং বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, কতিপয় বীরের জন্য তিনি সমগ্র হিন্দুস্থান হারাতে বসেছিলেন। শেরশাহ সুরীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রায় মালদেও আবার দখল করে নিয়েছিলেন যোধপুর কেল্লা। এই কেল্লাটি বহু যুদ্ধের সম্মুখীন হলেও এটি পশ্চিম রাজস্থানের আকর্ষণীয় ইমারত হিসাবে আজও আছে প্রতিষ্ঠিত—অক্ষত।

মিনিট সাতেকের মধ্যে অটো এসে দাঁড়ালো যোধপুর কেল্লার দোর গোড়ায়। যশোবন্ত স্মারক মন্দির থেকে এর দূরত্ব মাত্র ২ কি. মি.। ৪০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের উপর

অবস্থিত এই কেল্লাটি ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করেন ভারতইতিহাসের সবচেয়ে গর্বিত ও পরিশ্রমী ব্যক্তিত্ব যোধারাও। লম্বায় কেল্লাটি ১৫০০ ফুট, চওড়ায় ৭৫০ ফুট।

আমরা সদলবলে ধীরে ধীরে ঢুকলাম কেল্লার ভিতরে। এই কেল্লায় ঢোকার মূল প্রবেশদ্বার হলো দুটি—ফতেপোল এবং জয়পোল। এ-ছাড়াও আছে আরও পাঁচটি প্রবেশদ্বার। ফতেপোল বা বিজয়তোরণ ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা অজিত সিং নির্মাণ করেন মোঘলদের সঙ্গে যুদ্ধজয়ের স্মৃতিকে অমর করে রাখতে। কেল্লার পশ্চিমদিকে এটি অবস্থিত।

ফতেপোলের পর আরও দুটি তোরণ গোপালপোল আর ভয়রোণ পোল। ভয়রোণ পোল নাম হয়েছে হিন্দুতান্ত্রিক দেবতা ভৈরবের একটি মূর্তি এই তোরণের কাছে রয়েছে বলে। দ্বিতীয় প্রবেশদ্বারটি জয়পোল কেল্লার পূর্বদিকে। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন মহারাজা মানসিং (দ্বিতীয়)। জয়পুরের মহারাজা জগৎ সিং-কে পরাজিত করার স্মৃতিকে অমর করে রাখতে এই দ্বারটি তাঁরই অবদান। বর্তমানে এটিই কেল্লার প্রধান প্রবেশদ্বার যে পথে আমরা ঢুকেছি।

জয়পোল প্রবেশ পথের বাঁপাশেই রয়েছে ছোট্ট একটি সমাধিক্ষেত্র। এটি ভুকান গ্রামের কিরাত সোধার, যিনি জয়পুর বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধের সময় প্রাণ দিয়েছিলেন এখানে। তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই সমাধি।

এর পরের তোরণদ্বারটি হলো লকনাপোল। ষোল শতাব্দীতে এটি নির্মাণ করেন রাও মালদেও। যোধপুর কেল্লার এই দ্বারটির একটি প্রধান দর্শনীয় বিষয় হলো, লোহার দরজা আর পাথরের দেয়ালে কামানের গোলার দাগ রয়েছে আজও। জয়পুরবাহিনী এই প্রবেশদ্বার দিয়ে কেল্লা দখল করতে ব্যর্থ হয়ে তাদের নিদর্শন রেখেছিল কামানের গোলা দিয়ে।

লকনাপোল পেরিয়ে কয়েক পা এগোতেই পেলাম একটি সমাধি স্মৃতিস্তম্ভ। এটি নির্মিত হয়েছে রাজপুত বীরদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। দশটি পাথরের স্তম্ভের সাহায্যে নির্মিত বক্রাকৃতি গম্বুজ। এই সমাধিস্থলটি ভিয়ান চৌহান এবং ধানা গেহলট-এর, যাঁরা ছিলেন যোধপুরের প্রধানমন্ত্রীর দেহরক্ষী। তাঁদের বীরত্বের ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে নির্মিত হয়েছে এই সমাধিস্থলটি।

লকনাপোল পেরিয়ে বাঁদিকে ঘুরতেই পড়লো আরও একটি তোরণদ্বার অমৃতপোল। এর কাছেই রয়েছে জলের একটি কুণ্ড অমৃত বাউরী। আরও একটু এগিয়ে বাঁদিকে দেখলাম যোধারাও-এর 'ফলসা'। ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এটাই ছিল কেল্লার প্রথম প্রবেশদ্বার।

যোধপুর কেল্লার লোহাপোলটি পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মাণ করেন যোধারাও। পরে এই দরজার সামনের কারুকার্য করা অংশটি যুক্ত করেন রাও মালদেও। এই দরজায় আজও দেখা যায় তৎকালীন সতী নারীদের হাতের হালকা আবছা ছাপ, যাঁরা তাঁদের যুদ্ধে মৃত স্বামীদের সৎকারের সময় দিয়েছিলেন আত্মবিসর্জন। লোহাপোল পার

হতেই চোখে পড়লো অশ্বারোহী রাওয়াল মল্লীনাথের একটি প্রতিকৃতি, যিনি ছিলেন একাধারে মহান যোদ্ধা এবং সন্ন্যাসী।

লোহাপোল পার হয়ে এলাম ডানদিকে কেল্লার রাজপ্রাসাদের উঁচু বাইরের একটা অংশে, যেখানে রয়েছে চোখ জুড়ানো পাথরের উপর কারুকার্য। ওই একই পথ ধরে সোজা এগোতেই পড়লো কনৌজের রাঠোরদের গৃহদেবতা নাগচেনজীর মন্দির। মাড়োয়ার রাজাদের বিবাহ উৎসব পালন করা হয় এই মন্দিরে। এর দেয়ালের গায়ে পাথরের সূক্ষ্ম কাজগুলি যেমন নিখুঁত সুন্দর তেমনই আকর্ষণীয়।

কেল্লার ভিতরে বেশ কিছুটা হাঁটার পর একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে এলাম চামুণ্ডা-দেবীর মন্দিরে। ছোট্ট মন্দির। মাঝারী আকারের দেবীবিগ্রহ। পাথরের এই কুলদেবীকে যোধারাও আনেন মাণ্ডোর থেকে। স্থাপন করেন ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে। চামুণ্ডাদেবী মাণ্ডোরের পূর্বতন শাসকদের কুলদেবী। পরে এই দেবীকে কুলদেবী হিসাবে মেনে নেন রাঠোর রাও মালদেও। তবে এই চামুণ্ডা মন্দির কামানের বারুদ বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। মহারাজা তাকত্ সিং এটি আবার নির্মাণ করে দেন ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে।

নাগচেনজী এবং চামুণ্ডা মন্দিরের মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে সালিম ফোর্ট। এর সামনে রক্ষীদের ঘরের উপরে আত্মরক্ষার্থে উঁচু ঢিবিতে আজও রয়েছে যুদ্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের কামান। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সিমভুবন নামে একটি কামান এবং আরও তিনটি চাকাযুক্ত বড় বন্দুক, যেগুলি মহারাজা অভয় সিং আমেদাবাদের শাসক সরবুলন্দ খানকে পরাজিত করে এই কেল্লায় আনেন ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে। সঙ্গে আনেন আরও একটি কামান। কামানটির নাম গজনী খান। গজনী খান—যিনি বিহারী পাঠানদের পরাজিত এবং ঝাঁলোর দখল করে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন কামানটি। সুন্দর কাজ করা এই কামানটির নলে লেখা আছে গজনী খানের নাম। কেল্লার এই উঁচু জায়গা থেকে সুন্দরভাবে দেখা যায় সমগ্র যোধপুর শহর, দূরে দিগন্তে মিশে যাওয়া মাড়োয়ারের স্থলভূমি।

গাইড না হলে সব দেখা আর বোঝা যায় না। আমাদের গাইড কেল্লার বিভিন্ন মহলে নিয়ে গিয়ে দেখাচ্ছেন ঐতিহাসিক জিনিষগুলি। কেল্লার এই মহলগুলি কিন্তু একবারে নির্মিত হয়নি। মাড়োয়ারের শাসনকর্তারা এগুলি নির্মাণ করেছিলেন বিভিন্ন সময়ে। গাইডকে অনুসরণ করে এলাম কেল্লার ভিতরে অবস্থিত শ্রীনগর চৌকিতে, যেখানে যোধপুরের প্রতিটি রাজার অভিষেক হতো। মোঘল আমলের দরবার অনুকরণে এটি নির্মাণ করেন মহারাজা সুরজিৎ সিং-এর প্রধানমন্ত্রী গোবিন্দ-দাস। অভিষেক ক্ষেত্রটি নির্মিত হয় মোঘল আমলেই। প্রথমে লাল বেলে পাথর দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল। পরে মহারাজা ভকত্ সিং শ্বেতপাথরে অলংকৃত করেন ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে।

ঘুরতে ঘুরতে এলাম পালকি ঘরে। মহাদল, পিঞ্জাস, খাসা, তানজাম নামক পালকিগুলি এখানে রাখা আছে সযত্নে। এখানকার রাজারাণীরা ব্যবহার করতেন

এ-গুলি। এর মধ্যে মহাদল পালকিটি মহারাজা অভয় সিং আনেন বিপক্ষকে পরাস্ত করে।

পালকি ঘরে সোনা এবং রুপোর হাওদাগুলির ( বসার জায়গা ) তুলনা হয় না। এর গায়ের কারুকার্যগুলি শুধু দেখার মতো নয়, দেখে মোহিত হয়ে যেতে হয়। অনেকগুলি হাওদার মধ্যে মোঘল বাদশা শাহজাহান যে হাওদাটি ব্যবহার করতেন, সেটিও এখানে রয়েছে অক্ষত অবস্থায়। একসময়ে শাহজাহান একশো ঘোড়া আর এই হাওদাটি উপহার দিয়েছিলেন যোধপুরের মহারাজা প্রথম যশোবন্ত সিংকে সম্মানিত করে। পারস্যশিল্পের অনুকরণেই নির্মিত হয়েছে এই হাওদাটি। এর গায়ে মাছ ময়ূর সিংহ আর ফুলের মধ্যে আঁকা এক রমণীর দৃশ্যটি দেখে পর্যটকমাত্রই বিস্মিত হয়ে যাওয়ার মতো।

পালকি ঘর ছেড়ে ঢুকলাম দীপক মহলে। এই মহলটি যোধপুরের পূর্বতন প্রধানমন্ত্রীর অফিস ঘর হিসাবেই ব্যবহৃত হতো। এর পাশেই চন্দন মহল। মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে রাজ্য শাসনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো এই মহলে।

বিশাল বিশাল এক একটা মহল ছেড়ে যাচ্ছি আর একটা মহলে। তৎকালীন রাজা মহারাজারা কোন কাজটাই ছোট করে করতে শেখেননি। বড় মন, বড় বড় কাজ তাই ঘরগুলিও করেছিলেন বড় বড়। ঝান্‌কি মহল দেখে এখন সে-কথাই মনে হলো। লম্বা এই মহলটি আগে ব্যবহৃত হতো মহারাণী এবং অন্যান্য রাজরাণীদের উৎসব দেখার জন্যে। এই মহলের জানলা দিয়ে নীচে অনুষ্ঠিত উৎসব অনুষ্ঠানগুলি দেখতেন তাঁরা। বর্তমানে এখানে দর্শকদের দেখার জন্যে রাখা আছে কারুকার্যে ভরা অনেকগুলি দোলনা, যেগুলি একসময়ে ব্যবহৃত হয়েছে রাজশিশুদের জন্যে।

ঝান্‌কি মহল থেকে পায়ে পায়ে এলাম সিংহাসন রাখার ঘর মোতিমহলে। এই মহলের শিলিং সোনায় অলংকৃত। লাগানো রয়েছে মূল্যবান আয়না। স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয় এর সৌন্দর্য দেখলে। সার্থক শিল্পীর শিল্পকলা। শাহজাহানের আমলে পারস্যশিল্পরীতিতে তৈরী এখানকার সিংহাসনটি যেমন আকর্ষণীয় তেমনই দুর্লভ।

এবার যে মহলটিতে এসে দাঁড়ালাম নাম তার সর্দার বিলাস। এই মহলের কাঠের দরজাগুলিতে সুন্দর সূক্ষ্ম কাজ করা হয়েছে হাতির দাঁত দিয়ে। তাছাড়া এগুলি এমন বার্নিশ করা. দেখলে মনে হবে যেন নতুন—এই সেদিন হয়েছে। যোধপুরের স্থানীয় শিল্পের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন এই সূক্ষ্ম কাজ আর বার্নিশ।

একের পর এক মহল দেখছি ঘুরে ফিরে। এবার এসে দাঁড়ালাম ভারতীয় চিত্র-শিল্পের এক অনন্য অবদান উমেদ ভবনে। এখানে রয়েছে যোধপুর ( মাড়োয়ার ), উদয়পুর ( মেবার ), বুন্দি, জয়সলমীর এবং বিকানীর শৈল্পিক রীতিতে আঁকা অসংখ্য ছবি, যে ছবিগুলির মধ্যে স্থান পেয়েছেন তৎকালীন মোঘল বাদশারাও।

মহলগুলি সব পাশাপাশি। এমনটা সব দুর্গেই। তাই একটা ছেড়ে আর একটায় যেতে বেশী সময় লাগে না। উমেদ ভবন থেকে এলাম মহারাজা তখত্ সিং-এর শোবার ঘর তখত্ বিলাস-এ। বিশাল এই মহলটি মহারাজা সর্বশেষ ব্যবহার করেন ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে। যদিও এটি মহারাজা মান সিং-এর আমলের। এখানে সযত্নে রাখা ছবিগুলি যেমন সেকালের শিল্প উৎকর্ষতার পরিচায়ক তেমনই উল্লেখযোগ্য এর কাঠের শিলিং-এ বার্নিশ।

যোধপুর কেল্লার আর এক নাম মেহেরাণগড়। এখন দাঁড়িয়ে আছি কেল্লার অজিত বিলাস-এ। এটি সেকালের সাজসজ্জার ঘর। যোধপুরের মহারাজা, মহারাণী এবং রাজকুমারদের নানা ধরনের পোশাক পরিচ্ছদ সাজানো রয়েছে এখানে। আগেকার রাজা মহারাজাদের যেমন পত্নীর অভাব ছিলনা তেমনই অভাব ছিলনা উপপত্নী আর রক্ষিতার ( Concubine )। যোধপুরের রাজা গজ সিং-এর স্ত্রীরূপে বাস করতেন আনারা বেগম। যদিও তিনি ছিলেন অবিবাহিতা এবং রক্ষিতা। তাঁরই একজোড়া মুক্তা দিয়ে তৈরী জুতো স্থান পেয়েছে অজিত বিলাসে। জুতো জোড়া সত্যিই দেখার মতো।

অজিত বিলাস থেকে এলাম ফুল মহলে। এটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মাণ করেন মহারাজা অভয় সিং। তখন থেকেই এই মহলটি ব্যবহৃত হয়েছে প্রেক্ষাগৃহ হিসাবে। এর চার দেয়াল আর শিলিং ভরা রয়েছে সোনার কারুকার্যে। দেয়ালচিত্রগুলি ভারতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন রাগের—বিভিন্ন ভঙ্গীর। এগুলি যেমন আকর্ষণীয় তেমনই সমগ্র যোধপুর কেল্লার মধ্যে যতগুলি মহল আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী সুন্দর, অন্যতম।

গাইড এবার নিয়ে এলো কেল্লার দৌলতখানায়। বহু আগে এই মহলে প্রদর্শিত হতো বিভিন্ন রত্নালংকার। বর্তমানে তা আর নেই। এখন দর্শনার্থীদের জন্যে রাখা আছে তৎকালীন শিল্পের নিদর্শন হিসাবে মোঘলদের রত্নালংকারের সুন্দর সুন্দর বাক্স, ধূমপানের জন্যে কারুকার্যখচিত রুপোর হুকো, মদ্যপানের জন্যে দারুণ সুন্দর পেয়ালা, গোলাপদানি ইত্যাদি।

এত ঘুরছি তবুও কোন ক্লান্তি নেই দেহমনে। ঐতিহাসিক বিষয়গুলি দেখে বুঝে মাঝে মধ্যে বিস্ময় প্রকাশ করে এগিয়ে চলা ছাড়া আর কিছু ভাববার অবকাশ নেই এখন। গাইড সকলকে এক জায়গায় জড়ো করে তারপর শোনাচ্ছেন ইতিহাসের কথা ও কাহিনী। এইভাবেই চলেছি আমি সহযাত্রীসহ। পথে আর কোন কথা হয়না কারও সঙ্গে। শুধু দেখা আর শোনা।

এলাম কেল্লার অস্ত্রাগারে। এর বিলাসী নাম মানবিলাস। বিশাল এই মহলের চার দেয়ালে সাজিয়ে রাখা হয়েছে সেকালের ব্যবহৃত নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র। যেমন তরবারী, মণিমুক্তাখচিত ঢাল, বর্শা, বন্দুক ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে কিছু আছে যুদ্ধজয়ের ফলে প্রাপ্ত আর বেশীরভাগই মোঘল বাদশারা দিয়েছিলেন উপহার হিসেবে। কোরানের বাণীখচিত তরবারী এবং সোনার পাতে মোড়া খাপগুলি

দারুণ আকর্ষণীয়। এর মধ্যে আরও বেশী আকর্ষণীয় সম্রাট আকবরের নিজের ব্যবহৃত তরবারীটি, যেটি আজও সুন্দর ও সযত্নে রক্ষিত আছে কেল্লার এই অস্ত্রাগার মানবিলাসে।

যোধপুর কেল্লার আকর্ষণীয় প্রেক্ষাগৃহটির নাম রঙ মহল। এটি নির্মিত হয়েছে সপ্তদশ শতাব্দীতে। উদ্দেশ্য, রাজস্থানের লোকসঙ্গীত শিল্পকে অমর করে রাখা। এই মহলটির শিলিং-এ কাঠের কাজ আর দেয়ালে আঁকা ছবিগুলি অপূর্ব।

এছাড়াও কেল্লায় রয়েছে 'মহারাজা মানসিং পুস্তক প্রকাশ' নামে একটি গ্রন্থাগার। বর্তমানে এখানে সযত্নে রয়েছে হাতে লেখা তিন হাজার সংস্কৃত এবং দু-হাজার হিন্দিতে লেখা পাণ্ডুলিপি। অন্যান্য বই আছে হাজার পাঁচেক। বই ও পাণ্ডুলিপিগুলি ভারতইতিহাসে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই আলোকপাত করবে তৎকালীন রাজ পরিবারের শাসন ও প্রথার কথা।

যোধপুর কেল্লার দর্শনীয় যা কিছু তা দেখা হলো সবই। এবার অটো এলো যোধপুর থেকে মাণ্ডোরের পথে সাজানো একটি বাগানে। এখানে রয়েছে সুন্দর একটি হ্রদ—বালসমন্দ হ্রদ। শহর থেকে দূরত্ব মাত্র ৭ কি. মি.। তবে যারা বেড়াতে আসে তাদের কাছে একমাত্র আকর্ষণই হলো যোধপুর কেল্লা।

সমগ্র কেল্লা এবং আশপাশের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখতে সময় লাগলো মোট পাঁচ ঘণ্টা। আমরা আবার ফিরে এলাম যোধপুর স্টেশনে আমাদের সংরক্ষিত কামরায়। এখন অপেক্ষা করতে হবে রাতের জন্যে। জয়সলমীরে যাওয়ার ট্রেন রাতেই। এখান থেকে পথও আলাদা। যাবে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে।

## মরুশহর জয়সলমীর

বাহ্যিক ব্যবহার আর কথাবার্তায় আমরা সকলেই উদার। মনটা আমাদের এ্যাতো বড়, মাপলে হয়তো কয়েক কিলোমিটার হয়ে যাবে। মুখে আমরা সব কিছুই ত্যাগ করে ফেলি কথায় কথায়। কাম ক্রোধ থেকে শুরু করে পৈত্রিক, এমনকি শ্বশুরবাড়ীর ন্যায্য পাওনা বিষয় সম্পত্তি পর্যন্ত। নিজেকে উদারতার মূর্তপ্রতীক হিসাবে বলার মতো লোকের অভাব নেই সংসারে, এই ভ্রমণপথেও। মূলত আমরা প্রত্যেকেই পরে আছি একটা স্বার্থপরতার মুখোশ। এতটুকু স্বার্থক্ষুন্ন হলে কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলিনা। অথচ মুখে বলি ত্যাগের কথা। তবে কে কতটা উদার, আপন পর ভুলে ত্যাগ স্বীকার করতে পারে তা বাইরে না বেরোলে কাউকে বোঝার উপায় নেই। মানুষকে সহজেই চেনা যায় ভ্রমণপথে। গোপন করা চরিত্র, মন ও স্বভাবের প্রকাশ ঘটে যায় অজান্তে। তাই মানুষ চেনার সহজ পথ ভ্রমণই। আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী আর সহযাত্রী, এরা প্রকৃতই কে কেমন মনের তা সহজেই বোঝা যায় ভ্রমণকালীন চলার পথে একসঙ্গে কয়েকদিন থাকলে। দেখা যাবে স্বার্থপরতার আর অন্ত নেই।

আমাদের এই বত্রিশজনের চলতি সংসারে এসেছেন এক গোলগাল ফরসা বাঙাল-

দিদি। সরু ফ্রেমের চশমা চোখে। পোশাকে একেবারে টিপ্‌টপ্‌। বয়েস ষাটের কাছাকাছি। বিধবা। ঢাকা থেকে বহুকাল আগেই এসেছেন লোটাকম্বল গুটিয়ে। কথায় কথায় তিনি বহুবার জানিয়েছেন,

—ঢাকা থেকে কলকাতায় এসে বাড়ী কিনেছি দুটো। তিনটে গাড়ী। সিনেমা হলও আছে দুটো। একমাত্র ছেলে আমার ইঞ্জিনীয়ার। একটা বাড়ী ভাড়া দিয়েছি সরকারকে। তাতে মাসিক আয় একলক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। প্রতিদিন সংসারে দুধ লাগে ৫ কেজি।...

এ-গল্প হাওড়ায় যাত্রা শুরুর পর থেকেই বহুবার শুনেছি বাঙালদিদির মুখে। পানের নেশা আছে। তাই পানওয়ালা এলেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করেন,

—কত দাম ভাই সাদা পানের ?

—এক রুপেয়া।

'ওরে বাব্‌-বা! এতো দাম' বলে মুখ ঘোরাতে দেখছি অনেকবার। অনন্যোপায় হয়ে আবার কিনেছেনও। তবে দেখেছি, একটা পান দু-টুকরো করে খাচ্ছেন দু-বার। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকা সত্ত্বেও ভালো খাবে না, ভালো পোশাক পরবে না, বাজারে কম দামের খারাপ কোয়ালিটির জিনিষ কিনবে, এমন মানসিকতার মানুষের যেমন অভাব নেই, তেমন যাত্রীরও অভাব নেই আমাদের এই চলমান পরিবেশের সংসারে। এরাও চলেছেন পরপারের পাথেয় সংগ্রহ করতে দ্বারকায়, কৃষ্ণের কাছে।

শাশুড়ীমার্কা মহিলাদের অনেককেই দেখছি ভ্রমণে এসে কেনাকাটা করছেন অনেকই। তবে তাদের মধ্যে একজনকে দেখলাম, নিজের বিবাহিতা এবং কুমারী মেয়েদের কাপড় চোপড় আর সব কেনাকাটায় খরচ করেছেন অনেক বেশী। তুলনায় পুত্রবধূর কপাল পোড়া। তার জিনিষের মান এবং দাম দুই-ই দেখেছি কম। আবার শাশুড়ী সঙ্গে আসেননি এমন এক কমবয়েসী বিবাহিতা, এখনও স্বামীকে নিয়ে আলাদা হওয়ার সৌভাগ্য হয়নি, তার কেনাকাটাও ওই শাশুড়ীর মতো। নিজের বাপের বাড়ীর, বিশেষ করে মা ভাই বোনেদের জিনিষপত্রের পিছনে যেভাবে স্বামীর পয়সা ঢেলেছেন, তুলনায় দেওর ননদ শাশুড়ীর বরাদ্দ এবং জিনিষের গুণগত মানও অনেক কম। বৈষম্যটা পুজোর সময় কেনাকাটার মতো, 'ছাড়ো তো, অত দাম দিয়ে কেনার দরকার নেই। ওটা তো ঝি পরবে।'

অনেক আগেই হয়ে গেছে, 'আপনি কেন আমার জায়গায় ব্যাগ রাখবেন ? আমি এ-টুকু জায়গায় বসবো কেন ? আপনি কি মনে করেন আমি বিনা পয়সায় যাচ্ছি ?'

বাথরুমপ্রিয়া মেয়েদের অনেকেই আছেন এই সংসারে। পুরুষের সংখ্যাও কম নয়। তাদের কথারভাবে দেখেছি, তারা পথে এমন বাথরুম চান এবং বাড়ীতে ব্যবহার করেন যেখানে থাকাখাওয়া, অতিথি আপ্যায়ন, রান্না এমনকি রাতের বিছানাও পাতা যেতে পারে। এই ভ্রমণে এসে বার বার নাক সিটকাচ্ছেন। 'গা ঘিন ঘিন করছে। খাই না খাই বাথরুমটা আমার ভালো চাই।'

এমন অনেক মহিলাপুরুষকে পেলাম যারা বাথরুমে ঢুকলে আর কিছুতেই বেরোতে চান না। ছোট্ট উত্তর, 'আমার একটু সময় লাগে দিদি, সেই একেবারে ছোটবেলার অভ্যেস।'

অনেক খুঁতখুঁতে মানুষও এসেছেন এই ভ্রমণসংসারে। 'এটা খাই না সেটা খাই না' তো আছেই, বাড়ীতে কি কি খান সকাল দুপুর রাতে—তার ফর্দ'ই দিয়ে চলেছেন ট্রেনে ওঠার পর থেকে। একইসঙ্গে তাদের মতে, ভ্রমণে বেরিয়ে যা খাচ্ছেন তা সবই অখাদ্য। 'আগে যদি জানতে পারতুম তা হলে আসতুম না।'

কিছু মানুষ আছেন যারা সময়ের কাজ সময় থাকতে করেন না কখনও। বাস বা ট্রেন ধরবেন দৌড়ে। বাজার করবেন দৌড়ে। খাবেন তাড়াহুড়ো করে। ডিউটিতে বেরোবেন দেরীতে—দৌড়ে। হাতে সময় থাকতে এরা কিছুতেই প্রস্তুত হয়ে নেবেন না। এমন 'লেটবাবু'ও আছেন এই বত্রিশের সংসারে। সকলে যখন তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়েছেন ভ্রমণের উদ্দেশ্যে তখন লেটবাবু ভিজে লুঙ্গি ছাড়তে ছাড়তে বলছেন, 'এই যে দাদা আসছি—হয়ে গেছে। জামাটা গলিয়েই আসছি।' অদ্ভুত মানুষ এরা। একজনের বিলম্বের কারণে আর সকলের বিলম্ব হয়, বিরক্তির কারণও হন এরা—লেটবাবুদের মতো বিরক্তিকর জীবগুলি একবারও তা ভাবেন না। কিছু বললে ছ্যাদলা পড়া কিংবা বাঁধানো দাঁতগুলো বের করে একবারে নির্লজ্জের মতো হেঁ হেঁ করে ওঠেন।

লেটবাবুদের মতো কোমর ঘুরিয়ে শাড়ীর কুচি গোড়ালীতে মেরে পাউডার মাখতে মাখতেই ভ্রমণের বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন এমন কিছু সধবা বিধবারা, 'আসছি, বাবু-বা, শাড়ীটাও একটু পরতে দেবেন না দেখছি!'

এদের সকলকে নিয়ে ভ্রমণে কিভাবে যে সময়টা কেটে যায় তা সময় নিজেও টের পায় না।

সারাটা দিন কেটে গেল। রাত হলো। ১০/৪৫ মিঃ ট্রেন ছাড়লো যোধপুর থেকে। এখান থেকেই একটা আলাদা লাইন চলে গেছে, যাবো জয়সলমীর। সারা রাজস্থানে দিনের বেলায় কলকাতায় শীতের সময় যেমন ঠাণ্ডা—তেমন। আর রাতে একেবারে কনকনে ঠাণ্ডা হাড় কাঁপিয়ে দেয়। এখন ট্রেন চলবে সারারাত ধরে···

যখন রাতের অন্ধকার কেটে আকাশ একটু পরিষ্কার হলো তখন দেখি ৭/৩০ মিঃ। জানলা দিয়ে দেখছি ট্রেন চলছে মরুভূমির বুকের উপর দিয়ে হৈ-হৈ করে। পাশেই ধু-ধু করছে শুধু বালি আর বালি। যতদূর চোখ যায় বালি ছাড়া আর কিছুই নেই। মাঝেমধ্যে চোখে পড়ছে বাবলাকাঁটার ছোট ছোট ঝোপ। স্টেশনের সংখ্যাও খুব কম। যাত্রীও নামমাত্র।

সকাল ৯টা। মরুভূমির মধ্যে দিয়ে সমানে চলার পর ট্রেন এসে থামলো জয়সলমীর স্টেশনে। এটা এ-পথের সীমান্ত নগর। এরপর আর ট্রেন যায় না। যোধপুর থেকে জয়সলমীর এলাম ২৮৫ কি. মি.। উত্তর-রেলের ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তেই অবস্থিত ছোট্ট মরুশহর এই জয়সলমীর।

স্টেশনটা একেবারেই ফাঁকা। যাত্রী যে-কজন নামলো তারা ছাড়া আর কেউ নেই প্ল্যাটফরমে। এখানে দাঁড়িয়েই দেখা যাচ্ছে সোনার কেল্লা। স্টেশন থেকে বাইরে এলাম। দেখলাম বেশ কিছু বিদেশী পর্যটক চলেছেন কেল্লার পথে।

আমরা সকলে তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়লাম বেলা ১২টায়। চললাম শহরের সুন্দর পরিচ্ছন্ন পিচের রাস্তা ধরে। স্টেশন থেকে এলাম ৫ কি. মি. গদিসর লেক-এ। সুন্দর লেক। বেশ বড়। এখন এখানে জল কম। সিঁড়ি ভেঙে নেমে এলাম কয়েক ধাপ নীচে। লেকের মধ্যে রয়েছে ছোট্ট একটা দ্বীপ। তার মধ্যে চারপাশ খোলা মন্দিরের মতো আছে একটি বিশ্রামাগার। জয়সলমীরের মহারাজা এখানে বিশ্রাম করতেন অবসর সময়ে। এই লেকের পাড়েই নির্মিত হয়েছে সুন্দর একটি বিশ্রামকক্ষ, মহারাজার গ্রীষ্মকালীন আবাস।

লেকে যাওয়ার ডানপাশেই রয়েছে একটি সংগ্রহশালা। তেমন আকর্ষণীয় কিছু নেই বলে অধিকাংশ পর্যটকই ভিতরে যান না। তবে বিদেশী পর্যটকদের কৌতূহল খুব বেশী। দেখলাম তারা কেউই সংগ্রহশালা না দেখে ফিরছেন না।

এখান থেকে আবার বাঁধানো পিচের রাস্তা ধরলো জীপ। দেখতে দেখতে এসে দাঁড়ালো একেবারে সোনার কেল্লার সামনে। এলাম ২ কি. মি.।

রাজস্থানের প্রতিটি শহরই গড়ে উঠেছে দুর্গকে কেন্দ্র করে। এর থেকে বাদ যায়নি জয়সলমীরও। ২৫০ ফুট উঁচু চিত্রকূট পাহাড়ের মাথায় সুরক্ষিত দুর্গ। লম্বায় ১৫০০ ফুট এবং চওড়ায় ৭৫০ ফুট। শহরের চারদিকে রয়েছে ৫ কি. মি. পরিধির একটি পাথরের প্রাচীর। উচ্চতায় ১৫ ফুট।

দুর্গশহরের জন্যেই বিখ্যাত জয়সলমীর। প্রাচীনত্বের দিক থেকে চিতোরগড়ের পরেই জয়সলমীর দুর্গ। বর্তমানের কিছু বস্তি এলাকা বাদ দিলে এখানকার বাকি শহরটাই দুর্গের ভিতরে অবস্থিত।

যাদব বংশীয় রাজপুত মহারাজা ছিলেন রাওয়াল জয়সল সিং। তিনিই মরুভূমির মধ্যে স্থাপন করেন এই কেল্লা ১১৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। নিজের নামানুসারেই রাখেন স্থানের নামটি। সমগ্র কেল্লাটি তিনি নির্মাণ করেছিলেন হলুদ রঙের পাথর দিয়ে। রোদ পড়লে সম্পূর্ণ কেল্লাটি দেখায় সোনালী রঙের। মনে হয় যেন সোনা দিয়ে তৈরী। তাই এর নাম হয়েছে সোনার কেল্লা। এটি নির্মাণ করতে সময় লেগেছিল সাত বছর। দুর্গের চারদিকে আছে ৯৩টা গম্বুজ, যেখান থেকে তোপ ব্যবহার এবং বড় বড় পাথর ফেলে রক্ষা করা হতো দুর্গকে।

সুরজপোলই সোনার কেল্লার প্রবেশদ্বার। দুর্গের মধ্যে ঢুকতেই প্রথমে চোখে পড়ে আকাশছোঁয়া রাজমহল। তারপর ঘুরপাকের মধ্যে দিয়ে সুরজপোল গণেশপোল হয়ে হাওয়াপোলের বাইরের ঘরে এসে দাঁড়ালাম। এখানে রয়েছে গজবিলাস আর রঙমহল। এর ভিতরে পাথরের উপর খোদাই করা এমন সূক্ষ্ম কারুকার্য, দেখলে একেবারে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। মানুষ যে ছেনি হাতুড়িতে এমন সৃষ্টি করতে পারে, চোখে না দেখলে বিন্দুমাত্র কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।

কেল্লার মধ্যে দেবী ভগবতীর মন্দির এবং সাততলা রাজপ্রাসাদটিও আকর্ষণীয়। এই প্রাসাদের পাশেই রয়েছে একটি বড় কুয়ো। এখান থেকে একটু এগিয়ে গেলেই লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির। এটি নির্মিত হয়েছে চতুর্দশ শতাব্দীতে। মন্দিরের বিগ্রহটি মেরতা থেকে আনেন নেবনরাম নামে এক ব্রাহ্মণ। তখন থেকে আজও তাঁর বংশধরেরা পুজো করে আসছেন এই বিগ্রহের। এ-ছাড়াও আছে চতুর্দশ শতাব্দীর একটি গণেশ এবং মহাদেব মন্দির।

জয়সলমীরের তৎকালীন প্রসিদ্ধ শেঠ ছিলেন পটুয়া। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচুর অর্থব্যয় করে কেল্লার মধ্যে নির্মাণ করেন চারটি প্রাসাদ। এই প্রাসাদগুলিতে পাথরের উপর প্রতিটি জালির কাজ একেবারে মুগ্ধ, স্তম্ভিত করে দেয়ার মতো। এ-ছাড়াও নথমলজী এবং দেওয়ান সালিম সিং-এর প্রাসাদের ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকলাও অনবদ্য।

গাইডের সঙ্গে এলাম কেল্লার আরও ভিতরে জৈনমন্দিরে। প্রাচীন এই জৈনমন্দিরের দেয়ালে, ভিতরে বাইরে মিলিয়ে ছোট বড় নানা আকারের দেবদেবীর খোদিত মূর্তির সংখ্যা মোট ৬৬২০টি। জৈনমন্দির সংলগ্ন আরও মন্দির রয়েছে কয়েকটি। যেমন পার্শ্বনাথ, সম্ভবনাথ, ঋষভদেব, মহাবীর, চন্দ্রপ্রভুস্বামী, শম্ভু, শীতল, শান্তি, আদি, সমুদ্র এবং সূর্যদেবের মন্দিরগুলিও সুন্দর।

বিশাল কেল্লায় রাজারাণীদের ঘরটিও অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত। পাথরের উপরে সব কাজই সূক্ষ্ম খোদাই করা। জয়সলমীরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কিছু নেই মানুষ এখানে প্রকৃতির বুকে নিজ পরিশ্রমে পাথরে ফুটিয়ে তুলেছে শিল্পের অপরূপ সৌন্দর্য।

গাইড এবার নিয়ে এলো সম্ভবনাথ মন্দিরের নীচে 'জিনভদ্র সুরী জ্ঞানভাণ্ডার'। অমূল্য সংগ্রহ বিশেষ করে মাগধী, সংস্কৃত ও ব্রজভাষায় লেখা গ্রন্থ আছে এই ভাণ্ডারে। জিনভদ্র সুরী ছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। তাঁর নামানুসারেই এই নাম। ভারতের প্রাচীনতম বহু পাণ্ডুলিপি যেমন, ১১২৬টি তালপাতার উপরে হাতে লেখা এবং ২২৫৭টি কাগজের পাণ্ডুলিপি রয়েছে এখানে। এখানকার পাণ্ডুলিপিতে লেখা বিষয়গুলি হলো ভারতীয় দর্শন, জৈন সাহিত্য, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বৈদিক, বৌদ্ধ, ন্যায়শাস্ত্র, ভাষাকোষ, জ্যোতিষ ইত্যাদি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণীয় হলো সাড়ে ত্রিশ ইঞ্চি লম্বা তালপাতার পাণ্ডুলিপি।

এবার উঠে এলাম একেবারে কেল্লার উপরে। এখান থেকে সমগ্র জয়সলমীর শহরটা দেখায় ক্যামেরায় তোলা ছবির মতো অপূর্ব। একটাও ইটের বাড়ী নেই। সমস্ত বাড়ীগুলিই তৈরী হয়েছে হলুদ পাথর দিয়ে। এ-পাথর বাইরে থেকে আনতে হয়নি। জয়সলমীরের নিজস্ব সম্পদ। কেল্লার কাছেই জনবসতি পাটোয়ার হাবেলী। এই ছোট্ট শহরের মানুষেরা বাস করেন এখানে।

অসংখ্য বিদেশী পর্যটক এসেছেন সোনার কেল্লা দেখতে। কথা হলো একটি ছেলে

এবং একটি মেয়ের সঙ্গে। ছেলেটি জাপানী এবং মেয়েটি আমেরিকান। ছেলেটি বয়েসে সাতাশ, মেয়েটি চব্বিশ। এরা ঘুরছে একসঙ্গে। একে অপরের বন্ধু। নেপাল ঘুরে এসেছে ভারতে। এ-দেশে এসে ইতিমধ্যেই বেনারস, সারনাথ, দিল্লী, আগ্রা, জয়পুর ইত্যাদি হয়ে এখন এসেছে জয়সলমীরে। ছেলেটি পেশায় জাপানী কোন এক হোটেলের গায়ক। মেয়েটি শিক্ষিকা। এক বছরের জন্যে জাপানে গিয়েছিল শিক্ষকতার কাজে। ওখানেই ছেলেটির সঙ্গে গড়ে উঠেছে বন্ধুত্ব। এরপর এরা যাবে সিঙ্গাপুর। ওখান থেকে ফিরে যাবে যে যার দেশে। জানতে চাইলাম,

—ভারত কেমন লাগলো ?

উত্তরে দুজনেই হেসে জানালেন,

—ট্রেন সার্ভিসটা বাদ দিলে আর সব ভালো।

এবার বললাম,

—আপনারা ভারতের খুব সামান্য অংশই ঘুরলেন। কেমন দেখলেন ?

আমেরিকান মেয়েটি জানালেন,

—এই বয়েসটুকুতে পৃথিবীর অনেক জায়গায় আমি ঘুরেছি। তবে নেপালে কাঠের উপর আর ভারতে পাথরের উপর শিল্পীরা যেভাবে শিল্পের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেছেন, যা পৃথিবীর কোন দেশের কোন শিল্পের সঙ্গেই এর কোন তুলনা চলে না। এ-দেশের পাথর কথা বলে।

সোনার কেল্লা দেখা হলো। অপেক্ষমান জীপ ছিল আমাদের অপেক্ষায়। সহযাত্রীরা সকলেই উঠে বসলেন যে যার জায়গায়। আবার শুরু হলো চলা।

জীপ ছুটলো বাঁধানো সুন্দর পিচের রাস্তা ধরে। বেরিয়ে এলাম শহর ছেড়ে। চারদিকে কোন লোকবসতি নেই। ধু-ধু করছে বালিতে ভরা বিশাল বিস্তৃত ফাঁকা মাঠ। বালি আর বালি, তারই মধ্যে মাঝে মাঝে চোখ পড়ছে কাঁটাগাছের ঝোপ-ঝাড়। এমন মসৃণ রাস্তা সচরাচর দেখা যায় না। জীপ ছুটছে বেশ গতিতে। থামাথামির কোন বালাই নেই। এইভাবে চললো প্রায় ৪৫ মিঃ। সোনার কেল্লা থেকে এলাম ৪৫ কি. মি. শমগাঁও। জয়সলমীর স্টেশন থেকে দূরত্ব ৪৮ কি. মি.।

এই শমগাঁও থেকেই বলা যায় গভীর মরুভূমি শুরু। এখানে আসার উদ্দেশ্য—প্রকৃত মরুভূমির চেহারা কেমন আর মরুভূমিতে সূর্যাস্ত দেখা। সাগরে পাহাড়ে কোথাও দেখেছি সূর্যোদয় কোথাও সূর্যাস্ত। আজ দেখা হবে মরুতে।

জীপ থেকে নামতেই ছুটে এলো বিভিন্ন বয়েসের বাচ্চা থেকে বুড়ো—সঙ্গে রয়েছে উট। এরা সামান্য অর্থের বিনিময়ে উটের পিঠে চড়াবে। ঘুরিয়ে আনবে মরুভূমির মধ্যে 'সানসেট পয়েন্ট' থেকে। কেউ চাইলে তাকে নামিয়ে দেবে বালিয়াড়ীর ঢিবিতে। সূর্যাস্ত দেখার পর আবার নিয়ে আসবে উটে চড়িয়ে।

কোন পর্যটকই উটে চড়ার আনন্দরস থেকে বঞ্চিত হন না এখানে এলে। সহযাত্রী বুড়োবুড়িরা উঠে বসলেন উটের পিঠে—আমিও। উট চললো মরুভূমির মধ্যে। আমাদের সহযাত্রী এক মহিলার চেহারাটা 'এম. ভি. হর্ষবর্ধন'। তিনি একাই

উঠলেন উটের পিঠে। কিন্তু উট আর ওঠে না। অনেক কষ্টে উটের মালিক ওঠালেন তার বাহনকে। এসেছেন অসংখ্য বিদেশী পর্যটক, যেন মেলা বসেছে এখানে। তারাও চলেছেন আমাদেরই মতো।
শমগাঁওতে কোন চাষবাস হয়না। বর্ষাও অতি নামমাত্র। উটের মালিকরা বড়ই গরীব। দারিদ্র্যের ছাপ সারা শরীরে, পোশাকে। এদের মুখেই শুনলাম, ভ্রমণ মরশুমে উপার্জন হয় সামান্য। তাতেই চলে কোনরকমে। পোশাক পরিচ্ছদ এতো ময়লা, দেখে মনে হয় একসময় নতুন পরেছে, ছিঁড়ে গেলে ফেলে দেবে। এদের ব্যবহৃত পোশাক কখনও জলের স্পর্শ পায় না। ৮/১০ বছরের বাচ্চারাও নেমেছে এ-পথে সংসারের প্রয়োজনে। জীপ থেকে নামার পর একজন পর্যটককে উদ্দেশ্য করে একটি বাচ্চার কাতর উক্তি এসেছিল কানে,
—'আজ সওয়ারী মিলা নেই বাবুজী। পাঁচ রুপেয়া দো, হাম ঘুমাকে লে আয়গা।'
ভ্রমণ মরশুমের পরে এদের আর্থিক দুর্গতির খবর রাখে না কেউই। না পর্যটক, না সরকার।
জয়সলমীরের অন্তর্গত এই শমগাঁও-এর পরে আর কাউকে যেতে দেয়া হয় না। কয়েক কিলোমিটার পরেই ভারত ও পশ্চিম পাকিস্থানের সীমান্ত।
ঢেউ খেলানো অনেকটা পথ পেরিয়ে উট এলো উঁচু বালিয়াড়ীর উপরে। অনন্ত বালুকারাশি এখানে ধু-ধু করছে। সাগরে যেমন বিরামহীন ঢেউ তেমনই বালি এখানে অবিরাম ঢেউ খেলে চলেছে সাগরের মতো। কোথাও উঁচু কোথাও নীচু। শুষ্কতায় ভরা মরুভূমি। জল বৃক্ষলতাদির কোন চিহ্ন নেই অথচ প্রকৃতির কি অপূর্ব রূপ ফুটে উঠেছে এখানে।
দূরে, বহু দূরে ধীরে ধীরে সূর্য ঢলে পড়লো পশ্চিম আকাশে। সন্ধ্যা ৬/২৫ মিঃ। গাঢ় লাল হয়ে মিশে গেল যেন বালির সমুদ্রে। এ এক নয়নাভিরাম দৃশ্য।
দেখতে দেখতে অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে এলো। ওই একই পথ ধরে জীপ ছুটতে লাগলো তীব্রবেগে। বেশ ঠাণ্ডাও পড়েছে। স্টেশনে এলাম রাত-৭/৩০ মিঃ। পথের ধকল সামলাতে সকলেই বসে গেলাম বিশ্রামে। রাত-৯/১৫ মিঃ ট্রেন ছাড়লো জয়সলমীর থেকে।

## আবু পাহাড়ে স্থাপত্যশিল্পের চমক
## দিলওয়ারা জৈনমন্দির

সকাল ৭/৩০ মিনিটে আবার এলাম যোধপুরে। এখান থেকেই যাবো আবু রোড। এখন হাতে অনেক সময়। পরবর্তী ট্রেন ছাড়তে এখনও অনেক দেরী। তাই সহযাত্রীরা কেউ স্থানীয় বাজারে, কেউ বা গেলেন কাছাকাছি ঘুরতে।
বেলা ১/৩০ মিঃ। ট্রেন ছাড়লো আবুরোডের উদ্দেশ্যে। ট্রেন সরাসরি যায় না। বিকেল ৫টায় এলাম মাড়ওয়ার জংশন। এখানে কেটে দেয়া হলো আমাদের সংরক্ষিত কামরা। সকলে নেমে এলাম ট্রেন থেকে। কয়েকজনে মিলে গেলাম পাশের একটা

গ্রামে। সময় কাটাতে এ-ছাড়া আর উপায় কি! সন্ধ্যার একটু আগেই ফিরে এলাম স্টেশনে।

এখন কথা ছাড়া হাতে কোন কাজ নেই। ট্রেন ছাড়বে ভোর রাতে। জানি, আবার বসবে পরলোক চর্চার আসর নয়—পরচর্চার আসর। তাই নিজের জায়গা ছেড়ে গিয়ে বসলাম এক মাঝবয়েসী বৌদির কাছে। এঁর স্বামী আসেননি। এসেছেন একাই। বৌদির খোপে বসে আছেন তিনজন মহিলা। বৌদিকে বাদ দিয়ে একজনের বয়েস ৫৫/৬০-এর মধ্যে। সঙ্গে স্বামী আসেননি। আর দুজন স্বামী স্ত্রী। বয়েসে স্বামী সত্তর ছাড়িয়ে। স্ত্রীও ষাট পেরিয়ে। বিবাহিত ভদ্রলোক আছেন একজন। স্ত্রী আসেননি। আধাবয়সী। এদের মধ্যে এসে বসতেই বৌদি বললেন,

—মাঝে মাঝেই খুব চিন্তা হচ্ছে ছেলেটার জন্যে। দেখতে দেখতে কতগুলো দিন কেটে গেল। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। এমনিতে আমার স্বামীর মনটা খুব ভালো। তবে বড্ড উদাসীন। আমি খেলাম কি খেলাম না, ছেলেমেয়েদের পড়া-শুনো, অসুখ-বিসুখ—সংসারের কোন খবরই রাখেন না। নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। একগাদা টাকা দিয়ে মাষ্টার রেখেছি। বড় ইস্কুল। ছেলেটা যে কি করছে কে জানে! অনেকদিনের ইচ্ছা ছিল দ্বারকায় আসার—সুযোগ এলো, বেরিয়ে পড়লাম। নইলে ওঁর হাতে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছে ছিল না আমার।

বৌদির কথা শুনে বাঁধানো দাঁতের দাদুর বয়সী সহযাত্রী বললেন,

—আমার নাতিও পড়ে ইংলিশ মিডিয়ামে। আমিই নিয়ে যাই নিয়ে আসি। আমি নেই, এখন ছেলেই অফিস যাওয়ার সময় ইস্কুলে দিয়ে যায় বৌমা নিয়ে আসে। সুযোগ এলো তাই বেরিয়ে পড়লাম। ওদেরও বড় অসুবিধে হচ্ছে।

এবার পড়লাম মিডিয়ামবৌদি আর দাদুর পাল্লায়। বহুবার বহুক্ষেত্রেই দেখেছি, কারও ছেলে বা মেয়ে যদি একটু নামী ইস্কুল, তার উপরে যদি ইংলিশ মিডিয়াম হয় তাহলে তো আর কথা নেই। নিজে ইংলিশ না জানলেও বহুবার ইস্কুলের নাম ধরে ছেলে বা মেয়েকে মিডিয়াম করে এইসব বাপমায়েদের কথা শুরু হয় যেকোন আত্মীয় বন্ধু কিংবা অনুষ্ঠান বাড়ীতে—এখন ট্রেনেও। ইংলিশ মিডিয়াম এখন স্ট্যাটাস সিম্বল যে! এবার ইংলিশদাদু জিজ্ঞাসা করলেন,

—ভর্ত্তির সময় 'ডোনেশান' দিতে হয়নি?

মিডিয়ামবৌদি ঘাড় নেড়ে জানালেন হ্যাঁ, দিতে হয়েছে।

এবার দাদু বললেন,

—আমার নাতিকে ভর্তি করতে একটা পয়সাও লাগেনি। চার্চের বিশপ তো আমার বাল্যবন্ধু…

শুরু হলো দাদুর কথা। তার সমস্ত কথার ভাবটা শুনে যা মনে হলো এবং দেখেছি, সমাজে একশ্রেণীর মাঝবয়সী থেকে বুড়ো পর্যন্ত আছেন যাদের মুখে প্রায়ই শোনা যায়, সাহিত্যিক সুনীল, সঞ্জীব, এরা তো হালে নাম করেছে।

ছেলেবেলায় তো এরা আমার বাড়ীর উঠোনে ডাঙ্‌গুলি খেলতো। পুলিশ কমিশনার তো আমার পিস্‌শাশুড়ির মেয়ের জামাই। ভীষণ ভালোবাসতো আমাকে। শিক্ষামন্ত্রী তো সম্পর্কে আমার আত্মীয়। এখন তো কোন পরিচয়ই দেয় না। ডাট হয়ে গেছে। অথচ ওর শিক্ষার পয়সা তো আমার বাবাই দিয়েছে। খুব বেইমান ছেলে। দূরদর্শনের স্টেশন ডিরেক্টার তো আমার বন্ধুলোক। আমার এক বন্ধুর ছেলের জন্যে ফোন করলাম—চাকরী হয়ে গেল। সৌমিত্র সাবিত্রী সুচিত্রার সঙ্গে তো কতদিন কফি হাউসে বসে আড্ডা মেরেছি। বম্বের মিঠুন আজ মিঠুন হয়েছে। আমার বাড়ীর রকে বসে আড্ডা মারতো আর 'মোঘলে আজম' বিড়ি ফুকতো। কতদিন কান ধরে বলেছি, যা বাড়ীতে যা পড়গে, নইলে ভবিষ্যতে করবি কি? আমার কপালে এই যে দাগটা দেখছেন, এটা স্বাধীনতা সংগ্রামে ইংরেজ পুলিশের গুলির দাগ। ডাক্তার মুন্সী আমাকে ভীষণ শ্রদ্ধা করেন।...

এক কথায় মিশনের মহারাজ, হাইকোর্টের বিচারপতি থেকে শুরু করে বিশ্বব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানের সঙ্গে এদের পরিচয়। খাওয়াদাওয়া, তাসখেলা, বিড়ি খাওয়ার কথা বলতে এদের মুখে বাধে না। এদের দেখেছি, ধর্মরাজ যম ছাড়া আর সব নামীদামী সকলের সঙ্গেই রয়েছে পরিচয়, হৃদ্যতা। ভাবটা এমন, ইনি মুখের কথা একবার কাউকে বলে দিলেই জগৎ সংসারটা একেবারে ওলোট-পালোট হয়ে যেতে পারে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, এত 'সোর্স' থাকতেও এদেরই ছেলেমেয়ে আত্মীয়দের অনেকেই বসে আছে ইডিয়ট হয়ে—এইসব ইডিয়ট বাবুদের মতো। সংসারে যেমন অগুণতি তেমনই এদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয় এই ভ্রমণপথে।

স্ত্রী সঙ্গে আসেননি যে সহযাত্রী বসে আছেন, তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে ইডিয়ট-বাবু বললেন,

—মশাই একা এলেন যে, স্ত্রী এলেন না?

সহযাত্রী ভদ্রলোক বিবর্ণ ফ্যাকাশে মুখটাকে একটু সিটকিয়ে বললেন,

—আর বলবেন না মশাই, বিয়ের পর থেকে একটা দিনও শান্তি পেলাম না। রোগ গোপন করে বিয়ে দিয়েছিল পরে জানতে পারলাম। বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই আছে। এ্যাতো রোগ আর এ্যাতো মেজাজ, জ্বালিয়ে দিল সংসারটাকে। তারপরে হয়েছে গবেটমাথা। কথা বললে কথা বোঝে না। অকারণ অশান্তি করে। তাই একাই বেরিয়ে পড়ি। বাইরে যে কদিন থাকি সে কদিন শান্তিতেই থাকি।

একটু থেমে আবার বললেন মলিনমুখে,

—মশাই, জ্বলে গেলাম একেবারে। বিয়ে করে যে কি গু খাওয়া কাজ করেছি তা শুধু উপরয়ালাই জানে। যেসব মেয়ের তিন কুলে কেউ নেই, বাপ মা মরে ভূত হয়ে গেছে, সেই মেয়েকেই বিয়ে করা উচিত। বিয়ের পর বউটার শুধু বাপের বাড়ী আর বাপের বাড়ী। বাপ মা ভাই বোনই হয়েছে সব। থাকতো তাদের নিয়ে, বিয়ে করার কি দরকার ছিল? আজ পর্যন্ত বাপের বাড়ীর টান গেল না।

বিয়ের পর যে মেয়েছেলে বাপের বাড়ী বাপের বাড়ী করবে—জানবেন, সে সংসারের শান্তির বারোটা বেজে গেল। আমার পয়সা নিয়ে ওখানে শ্রাদ্ধ করবে, কিছু বললেই মুখ হাড়ি। আমার বাড়ীটা যেন হোটেল। কয়েক দিন পর পরই ছুটবে বাপের বাড়ী। মশাই, জীবনটায় একেবারে ঘেন্না ধরে গেল। সেইজন্যেই তো বউ-ফউ ছাড়াই বেরিয়ে পড়ি।

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ-কথার সমর্থনে ইডিয়ট বাবুর স্ত্রী বললেন,

—আমার ছোট বৌমাও ঠিক এই পদের। ছেলের বিয়ে দেয়ার কিছুদিন পর থেকেই আমাদের বাড়ীর কাউকেই দু-চোখে দেখতে পারে না। আমরা যে ওর কি পাকা ধানে মই দিয়েছি তা ভগবানই জানেন। বাড়ীতে আমাদের কোন আত্মীয়স্বজন এলে মুখ ভার করে বসে থাকবে। বউমার বাড়ীর কেউ এলে চা ডিমের মামলেট করে খাইয়ে বসে গল্প করবে। তখন ফুর্তি লেগে যায়। কিছু বললেই জানি আঁতে ঘা লেগে যাবে। তাই ভয়েতে কিছু বলিনা। আজকালকার বেশীরভাগ মেয়ে কথায় কথায় বিষ নইলে গলায় দড়ি দেয়ার ভয় দেখায়। শেষে একটা কিছু হয়ে গেলে তখন থানা পুলিশ, কোমরে দড়ি পড়বে। তাই কিছু বলি না, মুখ বুজে পড়ে থাকি।

জানি না 'হাইপ্রেসার' আছে কি না! একটু উত্তেজিতভাবেই কথাগুলো বললেন ইডিয়টবাবুর স্ত্রী। আর কোন কথা হলো না। এলো রাতের খাবার। আমরা আবার গিয়ে বসলাম যে যার জায়গায়। মাড়োয়ার জংশন থেকে ট্রেন ছাড়বে ভোর রাতে—চারটেয়। আমেদাবাদগামী ট্রেনের সঙ্গে আমাদের সংরক্ষিত কামরা আবার যোগ হবে। যাবো আবু রোডে।

ঘুমিয়ে ছিলাম তাই বুঝতে পারিনি ট্রেন কখন ছেড়েছে। সকালে যখন ঘুম ভাঙলো তখন বুঝতে পারলাম ট্রেন নির্দিষ্ট সময়ে ছাড়েনি। আবুরোড স্টেশনে এসে ট্রেন দাঁড়ালো বেলা ১১/৩০ মিঃ। দেরীতেই এসে পৌঁছালাম। যোধপুর থেকে এলাম ২৬৯ কি. মি.।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলাম সদলবলে। পাশেই বাসস্ট্যাণ্ড। জীপ ট্যাক্সীও যায় আবু পাহাড়ে। জীপেই রওনা হলাম। সুন্দর নিটোল চওড়া রাস্তা ধরে জীপ ছুটলো ঝড়ের বেগে। প্রায় ৫ কি. মি. সমতলে চলার পর আঁকাবাঁকা পথে উঠতে লাগলাম পাহাড়ে। এ-পথ দেরাদুন থেকে মুসৌরী, গৌহাটি থেকে শিলং, কাঠগুদাম থেকে নৈনিতালে যাওয়ার পথের মতো।

পাহাড়ের উপর যে ছোট্ট শহর তার নামই মাউণ্ট আবু। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে সুন্দর পীচের রাস্তা আর সব পাহাড়ী পথের মতো। চারদিকে প্রায় সমতল মাঝখানে আবু পাহাড় যেন ঠেলে উঠেছে। এ-পাহাড় আরাবল্লীরই সর্বোচ্চ অংশ। আবুতেই রাজস্থানের শেষ তবে তেমন রুক্ষতা নেই এখানে। যত পথ পেরিয়ে এলাম তাতে এ-কথাই মনে হলো আবুতে এসে। এরপর থেকেই শুরু হবে গুজরাট। সবুজে ভরা আবু পাহাড়ের সারাটা দেহ।

আবু পাহাড়ের কথা উল্লেখ আছে মহাভারতে। এর প্রাচীন নাম অর্ব্বুদাচল বা অর্ব্বুদগিরি। আবু পাহাড় সাধুদের যেমন তপোভূমি তেমনই হিন্দু ও জৈনদের পুণ্যতীর্থ। কর্ণেল টড্-ই প্রথম সন্ধান পান এই পাহাড়ের ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমে একে একে বেরিয়ে আসে এর পিছনের ঐতিহাসিক কাহিনী আর স্থাপত্য শিল্পকলার নানা সম্ভার।

আমাদের জীপ এসে দাঁড়ালো অসংখ্য বানর পরিবেষ্টিত একটি শীতলা মন্দিরের সামনে। মন্দিরে দেবীমূর্তি পাথরের। ছোট্ট মন্দির। একদা এ-পথের মনোরম দৃশ্যবৈচিত্র্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন কর্ণেল টড্। আবু পাহাড়ে ওঠা প্রসঙ্গে তিনি তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, **"It was nearly noon when I cleared the pass of Sitlamata and as the bluff-head of mount Abu opened upon me my heart beat with joy as, with the sage of Syracuse, I exclaimed EUREKA."**

অর্থাৎ "শীতলা মাতার মন্দির অতিক্রম করার পর যখন আমার সামনে আবু পাহাড়ের বিভ্রান্তকারী খাড়া শৃঙ্গটি প্রকাশ পেল তখন সবে দুপুর। সেই সময়েই আমার হৃদয় তরঙ্গ পণ্ডিত সায়রাকিউজ-এর মতো আনন্দে উদ্বেলিত হলো এবং আমি বিস্মিত হয়ে চিৎকার করলাম 'ইউরেকা' বলে।"

এবার জীপ এসে থামলো দিলওয়ারা জৈনমন্দিরের কাছে। আবুরোড স্টেশন থেকে এলাম ২৮ কি. মি.। সময় লাগলো টানা একঘণ্টা। জীপ থেকে নেমে একটু হেঁটেই এসে দাঁড়ালাম মন্দিরের প্রবেশপথের সামনে।

একদা চালুক্য রাজা ভীমদেবের মন্ত্রী এবং সেনাপতি ছিলেন বিমলশাহ। বনাস্-নদীর তীরে আবুপাহাড়ের পাদদেশে তখন ছিল অর্ব্বুদদেশের রাজধানী প্রাচীন নগরী চন্দ্রাবতী। রাজার নির্দেশেই বিমলশাহ শাসন করতেন এই নগর। জাতিতে তিনি ছিলেন পড়ুয়া। জন্ম তাঁর মাড়োয়ারের শ্রীমলনগরে। তখন মাড়োয়ার ছিল গুজরাট রাজ্যের অন্তর্গত।

একসময় বহু যুদ্ধে হিংসাজনিত পাপক্ষয়ের জন্যে জৈনাচার্য শ্রীধর্মঘোষ সূরী উপদেশ দিলেন মন্ত্রী বিমলকে, আবু তীর্থ উদ্ধার করতে।

বিমলমন্ত্রী যেমন ধনী তেমনই ছিলেন দেবী অম্বিকার পরমভক্ত, উপাসক। রাজী হলেন জৈনচার্যের কথায়। কথিত আছে, উপবাস করে ধন্যা দিলেন তিনি। প্রীত ও প্রসন্ন হয়ে দেবী দেখা দিলেন। মন্ত্রী বিমল দেবীর কাছে বর চাইলেন দুটি। একটি পুত্র সন্তান লাভের আর একটি বর পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে মন্দির নির্মাণ। এ-কথায় মাত্র একটি বর দিতে সম্মত হলেন দেবী। অনন্যোপায় মন্ত্রী বিমল রাজী হলেন। মন্দির নির্মাণের বরই প্রার্থনা করলেন। অম্বিকাদেবী স্থান নির্দেশ করেছিলেন যেখানে মন্দির নিমাণ করতে হবে। স্থানটি কুড়িতম জৈন তীর্থংকর মুনি সুব্রত-এর সমাধিস্থল।

একদিন দেবীনির্দিষ্ট স্থানটি খুঁড়ে বিমলমন্ত্রী পেলেন তীর্থংকর ভগবানের একটি

মূর্তি। কিন্তু স্থানটি ছিল ব্রাহ্মণদের অধিকৃত। ফলে মন্দির নির্মাণের জন্যে স্থানটি দিতে তারা অসম্মত হলেন। পিছিয়ে গেলেন না বিমল। অর্থের লোভ দেখালেন। রাজী হলেন ব্রাহ্মণেরা। তবে বিমল যতটুকু জায়গা চান ততটুকুতে বিছিয়ে দিতে হবে সোনার মোহর। মোহরের বিনিময়ে সেটুকুই জায়গা দিতে তারা রাজী—রাজী হলেন ধনবান বিমলও।

১০৩১ খ্রীষ্টাব্দ বিমলশাহ নির্মাণ করলেন সারা পৃথিবীর মধ্যে স্থাপত্যশিল্পের চমক দিলওয়ারা জৈন মন্দির। খরচ হয়েছে তৎকালীন মূল্যে ১৮ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা। তারমধ্যে জায়গার মূল্য বাবদই লাগলো ৪ কোটি ৫৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। এ-এমনই এক মন্দির নির্মিত হলো, যে বিস্ময়কর মন্দির দেখে বিশিষ্ট শিল্পবোদ্ধা সাহেব ফার্গুসন তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, "সূচের দ্বারা কাগজের উপর যে সব সূক্ষ্মতম কারুকার্য করা যায় না, সেইসব অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য এখানকার মন্দিরে পাথরের উপর হিন্দুরা করে যে দক্ষতা দেখিয়েছেন—তাও জগতে অপূর্ব।" (Picturesque Illustrations of Ancient Architecture in Hindustan.)

মন্দিরের বাইরে থেকে দেখলে মনেই হবে না ভিতরে কি রয়েছে অবাক করে দেয়ার জন্যে। একেবারেই সাদামাটা। ছিটেফোটাও কাজ নেই বাইরে। গাইড বললেন, বাইরের শত্রুরা যাতে মন্দির দেখে আকর্ষিত না হয়, তাদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যেই বাইরেটা এর সাদামাটা, ল্যাপাপোচা। তবুও এই মন্দিরের শিল্পকর্মের অঙ্গহানি করেন তৎকালীন একশ্রেণীর অত্যাচারী মুসলমান শাসকেরা।

মন্দিরে যেতে দর্শনার্থীদের কোন প্রবেশ মূল্য লাগে না। তবে কোন জিনিস নিয়ে ভিতরে যাওয়া নিষেধ। ফটো তুলতে হলে আলাদা টিকিট করতে হয়। জিনিষপত্র ব্যাগ ইত্যাদি রাখাব ব্যবস্থা আছে মন্দিরেব প্রবেশমুখে।

মন্দিরে ঢুকে প্রথম একনজর দেখেই একেবারে স্তম্ভিত, মুগ্ধ হয়ে গেলাম। স্বর্গের ইন্দ্রপুরী যদি সত্যিই থেকে থাকে—সেখানে এসে দাঁড়ালাম না তো! বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ভাবলাম, পাথরের উপর এ-কাজ—এ কি সত্যিই মানুষের সৃষ্টি, না স্বয়ং দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা আহার নিদ্রা ত্যাগ করে বছরের পর বছর ধরে তাঁর ছোট্ট ছেনি হাতুড়ি দিয়ে ঠুকঠুক কবে পাথর কেটে শিল্পকলাকে জীবন্ত করে তুলেছেন এই জৈন মন্দিরের। চোখ ফেরানো যায় না। শিল্পীমাত্রই, যাঁরা এ-মন্দিরের শিল্পকলা দেখেননি তাঁরা যত বড়ই শিল্পী হোন না কেন, তাঁদের দুর্ভাগ্য।

গাইড সঙ্গে থেকে শিল্পকলার কাজগুলি বুঝিয়ে দিয়ে এগোতে লাগলেন, আমরাও চলতে লাগলাম তারই সঙ্গে।

এই মন্দিরের প্রধান মূর্তিটি হলো আদিনাথের। তামার মূর্তি। চোখের মণিতে হীরে বসানো। গলায় বহু মূল্যবান রত্নশোভিত হার। তবে এখানে প্রথম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল সাদা পাথরের মূর্তি, যেটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জৈন আচার্য

বর্ধমান সূরী। আদিনাথের মূর্তিকে ঘিরে রয়েছে মোট ৫২টি ছোট ছোট মন্দির, গর্ভমন্দির, নবচৌকি, গূঢ়মণ্ডপ, রঙ্গমণ্ডপ প্রভৃতি। সমষ্টিগতভাবে এই জৈন মন্দিরটিকে বলে বিমলবসহি।

তৎকালীন জৈন সংস্কৃতির সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতির এক অপূর্ব চিত্রকলার মিলন ঘটেছে এই মন্দিরে। সাদা ধবধবে পাথরে সূক্ষ্মভাবে খোদিত রয়েছে হিন্দুর অসংখ্য দেবদেবীর নিখুঁত মূর্তি। মূল মন্দিরে নবমণ্ডপের ঠিক মাঝখানে বড় গোল গম্বুজের প্রত্যেকটি স্তম্ভে রয়েছে নিখুঁত সুন্দর ১৬টি জৈন বিদ্যাদেবীর মূর্তি। দেবীরা চতুর্ভুজা এবং হাতে অস্ত্রশস্ত্র। এঁরা রোহিণী, প্রজ্ঞপ্তি, বজ্রশৃঙ্খলা, বজ্রাঙ্কুশ, অপ্রতিচক্রা, পুরুষদত্তা, কালী, মহাকালী, গৌরীগান্ধারী, সর্বাস্ত্রা, মহাজ্বালা, মানবী, বৈরোট্যা, অছুপ্তা, মানসী এবং মহামানসী। মন্দির মূর্তি এবং মেঝে থেকে শুরু করে এখানকার যা কিছু তা সবই সাদা মার্বেল পাথরের।

এই জৈন মন্দিরে রঙ্গমণ্ডপের একটি জায়গায় রয়েছে হাঁসের উপর সরস্বতী এবং হাতির উপরে বসা দেবী লক্ষ্মীর মূর্তি। এখানেই আছে কালীয়দমন আর নৃসিংহদেবের অপূর্ব কারুকার্যখচিত মূর্তি।

বিমলবসহি মন্দিরটির উঠোন লম্বায় ১৩০ ফুট, চওড়ায় ৯০ ফুট। উঠোনের চারপাশে ছোট ছোট মন্দির রয়েছে ৫২টি। এরমধ্যে ২৪টি মন্দিরে আছে এক একজন জৈন তীর্থংকরের মূর্তি। ঋষভ বা আদিনাথকে নিয়ে অজিতনাথ, সম্ভবনাথ, অভিনন্দন, সুমতিনাথ, পদ্মপ্রভ, সুপার্শ্ব, চন্দ্রপ্রভ, সুবিধিনাথ, শীতলানাথ, শ্রেয়াংসনাথ, বাসুপূজ্য, বিমলনাথ, অনন্তনাথ, ধর্মনাথ, শান্তিনাথ, কুন্থুনাথ, অরনাথ, মল্লিনাথ, মুনিসুব্রত, নমিনাথ, নেমিনাথ, পার্শ্বনাথ এবং মহাবীর জৈনের মূর্তি রয়েছে এক একটি মন্দিরে।

এই উঠোনের বাঁদিকে একেবারে কোণে রয়েছে দেবী অম্বিকার মন্দির। মন্দিরমধ্যে দেবী মূর্তিটি কালো পাথরের। বহু রত্নখচিত। অম্বা মন্দিরের সামনেই রয়েছে ভৈরবের মূর্তি। হাতে কাটা মুণ্ড, পাশেই বসে আছে একটি কুকুর। সবই পাথরের।

মন্দিরের ভিতরে এতো অপরূপ কারুকার্য আর শিল্প সম্ভারে ভরপুর—আগেই বলেছি, মন্দিরের বাইরে থেকে দেখে তা বোঝার উপায় নেই। দিলওয়ারা জৈন মন্দিরে পাথরের উপর এমন নিখুঁত সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখে শুধু একটা কথাই বলতে ইচ্ছে করে, যারা পৃথিবীর অনেক বিস্ময়কর শিল্পকর্ম দেখেও আজও এই মন্দিরের শিল্পকর্ম দেখেননি, তারা শিল্পকর্মের অনেক কিছুই দেখেননি। যে শিল্পীর শিল্পকর্ম নিয়ে অহংকার আছে এতটুকুও, তার সে অহংকার মুহূর্তে চূর্ণ হয়ে যাবে এই মন্দিরে এসে দাঁড়ালে।

পৃথিবী বিখ্যাত শিল্পতত্ত্ববিৎ সাহেব ফার্গুসন বলেছেন, "I knew no Spot in India so exquisitely beautiful as Abu ( Jaina Temples )." ( History of Indian and Eastern Architecture by Fergusson.)

"আবু পাহাড়ের জৈন মন্দিরের মতো এমন অত্যুৎকৃষ্ট শিল্প নিদর্শন আমি ভারতের কোথাও দেখিনি।"

মূল মন্দিরে প্রবেশের প্রথমেই উঠোনে রয়েছে হাতিশালা। দশটি হাতি এবং একটি ঘোড়ার মূর্তি রয়েছে এখানে। প্রতিটিই পাথরের। একটির উপরে বসানো রয়েছে বিমলশাহের মূর্তি। সম্বৎ ১২০৪ থেকে ১২০৬-এর মধ্যে হাতিশালাটি নির্মাণ করেন বিমলমন্ত্রীর অগ্রজের প্রপৌত্র পৃথ্বীলাল বিক্রম। এই মন্দিরের জীর্ণোদ্ধারের সময় তিনি এটি নির্মাণ করেন স্বজনের স্মৃতিরক্ষার্থে।

মুসলমান আক্রমণের হাত থেকেও কিন্তু এ-মন্দির রেহাই পায়নি। ১৩১১ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশা আলাউদ্দীন খিলজীর সেনারা ফিরছিলেন জালোর বিজয় করে। পথে পড়লো আবু। জৈন মন্দিরের সমস্ত দেবদেবী এবং মূর্তিগুলির নাক ভেঙে দিয়ে চলে গেলেন তারা। পরে সেগুলি মেরামত করা হয় সুন্দর, নিখুঁতভাবে। এখন দেখে বোঝার উপায় নেই গাইড না বলে দিলে।

দিলওয়ারা জৈন মন্দিরের দেয়ালে, স্তম্ভে, ছাদের অন্তর্দেশে এবং দরজায় তৎকালীন হিন্দু শিল্পীরা যে অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়েছেন তাতে বিস্মিত ও স্তম্ভিত কর্ণেল টডের মতে এককথায়, "হিন্দুস্থানে এমন মন্দির আর নেই।" তিনি বলেন,

"The dome in the centre is the most striking feature and a magnificent piece of work, and has a pendent cylindrical in form and about three feet in length, that is a perfect gem ; and which, where it drops from the ceiling, appears like a cluster of the half-disclosed Lotus, whose cups are so thin, so transparent and so accurately wrought, that it fixes the eyes in admiration." (Annals and Antiquities of Rajasthan by Col. Tod.)

"এই মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত স্তম্ভটির গঠনশৈলী সবচেয়ে আকর্ষণীয়। এটি তৎকালীন স্থাপত্যের এক অসামান্য নিদর্শন। শ্বেতপাথরের উপর ঝুলন্ত এই কারুকার্যটি লম্বায় তিন ফুট, সত্যিই এটি এক দুর্লভরত্ন। এই কারুকার্যটি দেখলে মনে হয়, একগুচ্ছ আধফোটা পদ্মফুল যেন মন্দিরের ছাদ থেকে নেমে আসছে, এই পদ্মফুলগুলির স্বচ্ছ পাতলা পাপড়িগুলি এত সুনিপুণভাবে তৈরী, এটি যে কোন দর্শকের দু-চোখকে বিস্ময়ের আনন্দে বিহ্বল করে তোলে।"

কর্ণেল টড আরও বলেন, "is the most superb of all the temples of India and there is not an edifice besides the Tajmahal (of Agra) that can approach it."

গাইড এবার আমাদের নিয়ে এলো সামনেরই আর একটি দিলওয়ারার প্রসিদ্ধ মন্দির লুনবসহি মন্দিরে। গুজরাটের সোলংকি রাজা ছিলেন ভীমদেব (দ্বিতীয়)। তাঁর মন্ত্রী ছিলেন বস্তুপাল এবং তেজপাল—দু-ভাই আবুর পারমার রাজা সোমসিংহের অনুমতি নিয়ে বিমলবসহি মন্দিরের কাছেই নির্মাণ করলেন একটি

মন্দির। বস্তুপালের ছোট ভাই তেজপালের স্ত্রী অনুপম দেবীর পুত্র লাবণ্য সিং-এর নামেই এই মন্দিরটির নামকরণ করা হয় লুনবসহি।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উঠে এসে দাঁড়ালাম মন্দিরের ভিতরে। মন্দিরমধ্যে স্থাপিত মূর্তিটি বাইশতম জৈন তীর্থংকর নেমিনাথের কালো কষ্টি পাথরের রমণীয় মূর্তি। ১২৩১ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জৈন আচার্য শ্রীবিজয়সেন সূরী। মন্দিরটির নির্মাণ শিল্পী ছিলেন শোমনদেব। তৎকালীন এই মন্দির নির্মাণে ব্যয় হয়েছিল ১৩ কোটি টাকা।

মুসলমান বাদশা আলাউদ্দীন খিলজীর হাতও পড়েছিল এই মন্দিরে। ১৩১২ খ্রীষ্টাব্দে বাদশার সেনারা দারুণভাবে ক্ষতি করেছিল মন্দির এবং শিল্পকর্মের। পরে আবার মন্দিরের ক্ষতে সুন্দরভাবে প্রলেপ দেন তৎকালীন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী চংডাসিং-এর পুত্র পেথড়।

বিমলবসহি মন্দিরের অনুকরণে এই মন্দির নির্মিত হলেও এর কারুকার্য ও শিল্পকলা একেবারে ভিন্ন রুচির, ভিন্ন ধরনের। মন্দিরের মুখ্যদ্বারে প্রবেশ করলেই চোখে পড়ে অত্যন্ত আকর্ষণীয় সব কারুকার্য। ৫২টি 'দেউরিয়া' এবং একটি হাতিশালা রয়েছে এখানে। প্রত্যেক দেউরির সঙ্গে দুটি করে গম্বুজ, যার ছাদে ভরা রয়েছে অপূর্ব কারুকার্য। এই মন্দিরে আছে অম্বিকাদেবী, বস্তুপাল, তেজপাল এবং বিভিন্ন তীর্থংকরের মূর্তি। এখানকার মূল আকর্ষণীয় হলো, শ্বেতপাথরের উপর কারুকার্যগুলি যেমন অতি সূক্ষ্ম তেমনই নিখুঁত। চোখ কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না এগুলি হাতে তৈরী।

বিমলবসহি মন্দিরের মতোই আশ্চর্য কারুকার্যমণ্ডিত এই লুনবসহি মন্দিরটি। উভয় মন্দিরের দেয়াল গম্বুজ মণ্ডপ তোরণ স্তম্ভ—সব একই ধরনের। তবে লুনবসহিতে ফুল গাছ ঝাড় কলস ইত্যাদি বেশী। একইসঙ্গে জীবজন্তুও, যেমন হাতি ঘোড়া বাঘ উট পাখী এবং নানা দেবদেবীর খোদিত মূর্তিও রয়েছে অনেক বেশী। এ-ছাড়াও রয়েছে উড়িষ্যায় কোণারকের সূর্যমন্দিরে খোদিত মূর্তির মতো মানুষের জীবনের নানাচিত্র—বরযাত্রী, রাজদরবার, যুদ্ধযাত্রা, পশুপালন, গৃহীজীবন, বিবাহ ও নানা যজ্ঞানুষ্ঠান, সাধু-সন্ন্যাসী, তীর্থংকরের জীবনী। মূল গর্ভমন্দিরে আছে ভগবান নেমিনাথের কালো পাথরের মূর্তি। হাতিশালায় রয়েছে আদিশ্বব সুন্দর কারুকার্যখচিত ভগবানের বড় একটি মূর্তি।

লুনবসহি মন্দিরের প্রধান শিল্পী ছিলেন শোমনদেব। তবে মন্দিরের সামনেই রয়েছে একটি কীর্তিস্তম্ভ। এর উপরে যেসব কারুকার্য তা বস্তুপাল এবং তেজপালের মা নিজহাতে করেছিলেন বলে জানা যায়।

লুনবসহির রঙমণ্ডপের কারিগরী, সুকোমলতা, সৌন্দর্য এবং উৎকর্ষতা এক বিস্ময় সৃষ্টি করে পর্যটক মনে। এর মাঝে ঝুলানো কলাপূর্ণ ঝুমকাটি দেখায় স্ফটিকের মতো। বিমলবসহি মন্দিরের মতো রঙমণ্ডপের মাঝে স্তম্ভের শিরায় ভিন্ন ভিন্ন বাহনের উপর দাঁড়ানো অবস্থায় রয়েছে ১৬টি বিদ্যাদেবীর অপূর্ব

মূর্তি। রঙমণ্ডপের দুটি কোণায় বালী এবং ইন্দ্রের মূর্তি। দক্ষিণদিকের ছাদে আর দেয়ালে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, কারাগার, গোকুলবাসের মনোরম খোদিত চিত্র। এই মণ্ডপেই আছে ভারতীয় নাট্যকলার এক সুন্দরতম অদ্বিতীয় দৃশ্য, যাতে একটি পদ্মফুলের পাপড়ির উপর ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রায় চিত্রিত আছে ৬৮ জন নর্তকী।

রঙমণ্ডপের আগে সিঁড়ি দিয়ে উঠলেই পড়ে নবচৌকি, যার নয়টি ছাদে রয়েছে বিশ্বের অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠতম, আশ্চর্যজনক এবং অবর্ণনীয় শিল্পকার্য। এই মন্দিরের কাজ দেখে ফার্গুসন সাহেব তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, "প্রতি ক্ষুদ্র কণার উপর অসীম পরিশ্রম করে এবং অসাধারণ শিল্পদক্ষতা ঢেলে হিন্দুরা আগের যুগে তাঁদের মন্দিরকে দেব-বাসযোগ্য করবার সাধনা করতেন।"

কর্ণেল টডের মতে, "এই মন্দিরটি বিমলশাহের মন্দিরের পরিকল্পনারই অনুরূপ। তবে মন্দিরের মণ্ডপটি অনেক উঁচু এবং অনেক অ-নে-ক বেশী কারুকার্য ও শিল্পনৈপুণ্যে ভরা।"

এবার এসে দাঁড়ালাম মূল মন্দিরের দুপাশে নির্মিত 'দু-রাণী জেঠানী কা আলিয়া'। এই মন্দির দুটি বস্তুপাল এবং তেজপাল—দুই ভাইয়ের দুই স্ত্রী নির্মাণ করেন নিজ অর্থ ব্যয় করে।

এখানকার মন্দিরগুলির মধ্যে আরও একটি চৌমুখজীর মন্দির। ব্রহ্মার মতো চারটি মুখ আছে এই বিগ্রহের। মন্দিরটির চারপাশেই রয়েছে দরজা, দেখা যায় চারদিক থেকেই। যেসব শিল্পী এবং মিস্ত্রিরা 'দু-রাণী জেঠানী কা আলিয়া' মন্দিরটি নির্মাণ করেন, তারাই এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন অবসর সময়ে বিনা পারিশ্রমিকে। এখানে মন্দির আছে আরও দুটি—শান্তিনাথ আর বাচ্চা শাহের। দিলওয়ারা মন্দিরের দক্ষিণদিকে রয়েছে আরও কয়েকটি জীর্ণ হিন্দুমন্দির। কোন দেবদেবীর মূর্তি নেই সেখানে।

লুনবসহি মন্দির থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় বাঁদিকে পড়লো কালো পাথরের উঁচু একটি স্তম্ভ। এটি ১৩৪৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করেন মেবারের রাণা কুম্ভ। এই কীর্তিস্তম্ভের নীচে পাথরে খোদিত রয়েছে গাইবাছুরের চিত্র, তারই নীচে কুম্ভের শিলালেখ।

লুনবসহি মন্দিরের কাছেই কুন্থুনাথ স্বামীর মন্দির। এটি দিগম্বর জৈনমন্দির ঃ তেমন আকর্ষণীয় কোন শিল্পকর্মের ছোঁয়া এখানে নেই বললেই চলে।

এই দিলওয়ারাতে লুনবসহি মন্দিরের সামনেই পীতলহর মন্দির। গুজরাটের ভীমশাহ এটি নির্মাণ করেন বলে এর আরও একটি নাম ভীমশাহ মন্দির। মন্দিরে মূল মূর্তিটি আদিশ্বর ভগবান ঋষভদেবের। বিগ্রহটির ওজন ১০৮ মণ। উচ্চতায় এটি আট ফুট, চওড়ায় সাড়ে পাঁচ ফুট।

১৩১৮—১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই মন্দিরটি নির্মাণ করা হয় বলে ঐতিহাসিকদের অনেকে মনে করেন। মন্দিরের জীর্ণদশা মুক্ত করেন গুজরাটের মন্ত্রী সুন্দর

এবং গদা নামক এক ব্যক্তি। তাঁরা প্রথম জৈনাচার্য ঋষভদেবের পাঁচ ধাতুর মূর্তিটি করিয়েছিলেন শ্রীলক্ষ্মীসাগর সূরীকে দিয়ে।

এই মন্দিরে গূঢ় মণ্ডপের বাঁদিকের বড় মূর্তিটি আদিনাথের। ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রাবক 'লিনহা' ও 'রত্ন' তৈরী করেন এটি। এরই ডানদিকে রয়েছে পার্শ্বনাথ ভগবানের মূর্তি।

মন্দিরের নবচৌকির বাঁদিকে শান্তিনাথ, ডানদিকে রয়েছে সম্ভবনাথ ভগবানের বিগ্রহ। এই মন্দিরের ডানদিকের মন্দিরটি সুবিধিনাথ তীর্থংকরের। এটি নির্মিত হয় ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। কোন কারুকার্য বা শিল্পকলার ছোঁয়া পায়নি এই মন্দিরগুলি। শুধু উচ্চতায় বিশাল। মন্দিরের তিনতলা থেকে আবু পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন মনোরম, নয়নাভিরামও।

পীতলহর মন্দিরের দিকে যাওয়ার পথে বাঁদিকে পড়লো জৈন আচার্য জিনদত্ত সূরীর মন্দির, যিনি দাদাসাহেব নামে প্রসিদ্ধ। মন্দিরটির আরও একটি নাম 'দাদা সা-এর ছতরী'। মন্দিরমধ্যে বেদীতে দেখলাম সাজানো রয়েছে তাঁরই পদচিহ্ন।

দিলওয়ারাতে রয়েছে খরতরবসহি—পার্শ্বনাথ মন্দির। এই মন্দিরের তিনতলায় চারদিকে স্থাপিত আছে ভগবান পার্শ্বনাথের একাধিক মূর্তি। মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন জিনচন্দ্র সূরী, সম্ভবত ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে।

সব নিয়ে বিমলবসহিতে মূর্তি রয়েছে ৩০৮, লুনবসহিতে ১৭৫, পীতলহরে ১০৭, চৌমুখনীতে ৬২ এবং একটি মহাবীর মন্দিরে ১৭টি।

আবু পাহাড়ে দিলওয়ারা জৈন মন্দির প্রসঙ্গে এই পর্যন্ত। শত শত বছর আগে অনুন্নত বিজ্ঞানের যুগে নির্জন পাহাড়ের বুকে অমানুষিক পরিশ্রম করে শিল্পীরা যে চোখ জুড়ানো বিস্ময়কর সৃষ্টি করে গেছেন, তাদের কথা ভেবে কোন কুলকিনারা পেলাম না। শুধু তৃপ্তি ভরা মন নিয়ে এসে বসলাম জীপে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চলে এলাম আবুর পাহাড়ী শহরের প্রাণকেন্দ্র নখী লেক-এ। কৃত্রিম এই লেকটির চারদিকই পাহাড়ে ঘেরা। বিশাল লেক—ডিমের মতো আকৃতি। লেকের পাড় সুন্দর করে বাঁধানো। ঘাটও রয়েছে বেশ কয়েকটি।

প্রবাদ আছে, দেবতারা একদা এখানে এসেছিলেন অসুরদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে যজ্ঞ করতে। জলের প্রয়োজনে এখানে নখ দিয়ে খনন করেন বলে এর নাম হয়েছে নখী লেক। স্থানীয় লোকেরা বলে নখী তালাও।

কাচের মতো জল দ্বিগুণ করে তুলেছে লেকের সৌন্দর্য। অসংখ্য নারীপুরুষ করে চলেছে নৌকাবিহার। লেকের পাশেই পরিকল্পিত সাজানো গান্ধী উদ্যান। লেকে আসার পথেই পড়লো দু-ধারে সারি সারি দোকান। বেশীরভাগই বস্ত্র পোশাকের। শীতবস্ত্র তো আছেই—আছে নানা অলংকার আর ঘর সাজানোর রকমারী বিলাস দ্রব্যের দোকান।

লেকের কাছেই সামান্য উঁচু একটা পাহাড়। তার উপরে প্রকৃতির খেয়ালেই রয়েছে

এমন একটা পাথর, দূর থেকে দেখলেই মনে হবে একটা ব্যাঙ। লেকের জলে ঝাঁপ দেয়ার অপেক্ষায় যেন বসে আছে। নাম এর টড্‌রক।

নখী লেকের পাশ দিয়ে চলে গেছে সুন্দর পাকা রাস্তা। অসংখ্য পর্যটক ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘোড়ায় চড়ে। শত শত বিদেশী পর্যটক, তাদেরও যেন মেলা বসেছে এখানে।

হাঁটতে হাঁটতেই এলাম লেকের দক্ষিণতীরে রঘুনাথজীর মন্দিরে। স্বামী রামানন্দজী এটি প্রতিষ্ঠা করেন চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে। তিনটি গুহা আছে এই মন্দিরের কাছে। একটি গুহার সামনে রয়েছে রামচন্দ্রের মন্দির এবং রামকুণ্ড। রাম লক্ষ্মণ সীতা ছাড়াও মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছে অন্যান্য দেবদেবীর বিগ্রহ।

নখী তালাও-এর কাছে অসংখ্য হোটেল আছে পর্যটকদের জন্যে। থাকার কোন অসুবিধে নেই, আছে ধর্মশালাও। তবে হোটেলে থাকার ব্যাপারটা এখানে বড়ই ব্যয়বহুল।

এই লেকের পাড়ের রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে প্রায় শ-চারেক সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলাম একটি প্রাচীন মন্দিরে। পাহাড়ের গুহার মধ্যেই মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরের ভিতরে পাহাড়ের গায়েই খোদাই করা আছে দেবী মূর্তি। এটি আবুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী অর্ব্বুদা মন্দির। মন্দিরের প্রবেশ পথ অত্যন্ত সরু। বেশ কষ্ট করেই ভিতরে ঢুকতে হয় যাত্রীদের। মন্দিরের পাশে রয়েছে 'দুধ বাউরী' নামে একটি কুণ্ড। এর জলের রঙ দুধের মতো বলেই নাম হয়েছে দুধ বাউরী।

সন্ধ্যে হয়ে এলো। সদলবলে জীপে করে এলাম নখী লেক থেকে ২ কি. মি. দূরে আবু পাহাড়ের 'সানসেট পয়েণ্ট'-এ। যেখানে নামলাম, সেখান থেকে কিছুটা পথ চড়াই। উঠে এলাম পাহাড়ের মাথায়। পর্যটকদের বসার জায়গা আছে এখানে। কয়েকশো লোক বসে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এখানকার সূর্যাস্তের আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য হলো, পাহাড় থেকে দেখা যায় সমতলে সূর্যাস্ত। লাল টকটকে সূর্য ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল পশ্চিম আকাশে। আমরাও নেমে এলাম উপর থেকে। জীপ ছাড়লো আবছা অন্ধকারে। একই পথ ধরে রাত ৭/৩০ মিঃ এলো আবুরোড স্টেশনে।

আবুতে দুটো দিন না থাকলে সব দেখা যায় না। আগেও এসেছি আবারও এলাম। তাই দেখা হয়েছে প্রায় সবই।

আবু শহর থেকে অচলগড় প্রায় ৮ কি. মি.। জীপে করে এলাম। তারপর অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলাম পাহাড়ে। এখানেও আছে দুটি জৈন মন্দির। আগে এখানে দুর্গ ছিল। নবম শতাব্দীতে নির্মাণ করেন প্রমর রাজা। এই দুর্গ-মন্দিরে স্থাপিত আছে দুটি মূর্তি। একটি রাণা কুম্ভের, অপরটি তাঁর পুত্র উদা-র। মন্দিরের দোতলায় রয়েছে চতুরানন আদিনাথের বিগ্রহ। দুটি জৈনমন্দিরে মূর্তি আছে মোট ১৫টি। মূর্তিগুলি তৈরী করতে সোনা লেগেছে ১৪৪৪ মণ।

জৈন মন্দির ছেড়ে এলাম সামনের আর একটি পাহাড়ে। এর চূড়ায় রয়েছে আরও একটি দুর্গ। এটি ১৪৫২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করেন মহারাণা কুম্ভ। এই দুর্গের নীচের দিকে রয়েছে দোতলা একটি গুহা। কথিত আছে, একদা এই গুহায় তপস্যা করেছিলেন রাজা হরিশ্চন্দ্র। 'শ্রাবণ-ভাদ্র' নামে একটি কুণ্ড আছে এখানে। এর পাশেই দেবী চামুণ্ডার মন্দির, ভর্তৃহরি গুহা, ভর্গ আশ্রম, শিরোহীর রাজা মানের সমাধি মন্দির, শান্তিনাথের জৈন মন্দির এবং আরও কয়েকটি ছোট বড় কুণ্ড।

এই পাহাড়ের পাদদেশেই অচলেশ্বর শিব মন্দির। মন্দিরে কোন দেববিগ্রহ বা শিবলিঙ্গ নেই। শিবের আঙুলের ছাপ পুজো করা হয় এই মন্দিরে। প্রবাদ আছে, একদা অচলগড়ের এই পাহাড়টি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। মহাদেব তখন পায়ের চাপ দিয়ে অচল করে দেন সেই বৃদ্ধি। তারপর স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হন এখানে অচলেশ্বর মহাদেব নামে। সেই পায়ের ছাপই প্রতিদিন পুজো হয়ে থাকে। বশিষ্ঠদেবের একটি কুণ্ড আছে এখানে।

মন্দিরটি বহুকালের প্রাচীন। এটি স্থাপিত হয় ৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে। মন্দিরের প্রবেশদ্বারেই রয়েছে একটি বৃষমূর্তি। এর সারা গায়েই দেখা যায় আঘাতের চিহ্ন। আমেদাবাদের তৎকালীন সুলতান মহম্মদ বেগরা এসেছিলেন অচলগড়ে লুণ্ঠন করতে। মন্দিরে এসে দেখলেন পেট মোটা পিতলের ষাঁড়। ভাবলেন, বহু মূল্যবান ধনরত্ন বোধ হয় এর মধ্যে লুকনো আছে। সুতরাং ভাঙার চেষ্টা করলেন। কথিত আছে, এইসময় একঝাঁক বোলতা কোথা থেকে হঠাৎ এসে আক্রমণ এবং দংশন করতে থাকে। ফলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হলো। প্রাণভয়ে সুলতান পালালেন সসৈন্যে। রয়ে যাওয়া আঘাতের চিহ্ন আজও এলে দেখা যায় বৃষমূর্তির গায়ে।

অচলেশ্বর মহাদেব মন্দিরের সামনেই মন্দাকিনী কুণ্ড। এটি লম্বায় ৯০০ ফুট, চওড়ায় ২৪০ ফুট। কথিত আছে, প্রমর রাজা আদিপালের সময়ে কুণ্ডটি থাকতো ঘিয়ে পূর্ণ, যা দিয়ে তিনি যজ্ঞ করতেন। এই মন্দির প্রাঙ্গণে বিষ্ণুর মন্দিরসহ আছে আরও কয়েকটি ছোট ছোট মন্দির।

আবুরোড স্টেশন থেকে অম্বাজী মন্দিরে অসংখ্য বাস যায় নিয়মিতভাবে। ট্যাক্সী এবং জীপও যায়। তবে আবুতে এলে ভ্রমণকারীদের অনেকেই ঘোরেন অনেক জায়গা কিন্তু অনেকেরই বাদ পড়ে যায় এই দেবীমন্দির। বাসে সময় লাগে ৪০/৪৫ মিঃ। জীপ বা ট্যাক্সীতে সময় লাগে আরও কম।

এই মন্দিরের বেদীতে স্থাপিত দেবীমূর্তি সিংহবাহিনী। অম্বাজীমাতা নামেই এঁর প্রসিদ্ধ। একদা অমরাবতীর রাজা ছিলেন অম্বরীশ। তিনিই স্থাপন করেন মন্দিরটি। তাঁর নামেই দেবীর নাম। প্রতিদিন দূর দূরান্তর থেকে তীর্থযাত্রী ও পর্যটকের সমাগম হয় এখানে। প্রসিদ্ধ এই হিন্দুতীর্থের চারদিকই পাহাড়ে ঘেরা। এর মধ্যে একটি পাহাড়ের নাম গাবুর পাহাড়। প্রবাদ আছে, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালের মাথার চুল নাকি কাটা হয়েছিল এখানে।

## প্রাচীন কর্ণাবতীই আজকের আমেদাবাদ

ভোর ৫/৩০ মিনিটে ট্রেন ছাড়লো আবু রোড থেকে। চললাম আমেদাবাদে। দেখতে দেখতে কেটে গেল কয়েকটা দিন। ভ্রমণপথে দেখেছি, সকলের মন উতলা হতে থাকে বাড়ীর জন্যে যদি দু-সপ্তাহের বেশীদিনের ভ্রমণ হয়। কতক্ষণে ভ্রমণের শেষ দর্শনীয় স্থানটি দেখা হবে, এই অপেক্ষায় দিন গুণতে থাকে সকলেই। তার মধ্যে তাদের, বিশেষ করে বাড়ীতে কেউ যদি অসুস্থ মা বাবা স্ত্রী বা সন্তানকে রেখে আসে, সারাটা পথে মানসিক দুশ্চিন্তা অনেকটাই নষ্ট করে দেয় ভ্রমণের আনন্দকে। কথায় কথায় সহযাত্রীদের কাছে ঘুরে ফিরে আসে,

—মনটা বড্ড খারাপ লাগছে, আসার সময় মাকে অসুস্থ দেখে এসেছি, এখন কেমন আছে কে জানে!

মন খারাপ হয় আর একশ্রেণীর ভ্রমণার্থীদের,

—বাড়ীতে কাউকে রেখে আসিনি দিদি, আজকাল যা চোর ডাকাতের উৎপাত, বাড়ীতে গিয়ে যে কি দেখবো তা কে জানে!

এই দুটো শ্রেণীকে বাদ দিলে আর একটা শ্রেণীকে পাওয়া যায় ভ্রমণপথে, তারা এস. টি. ডি-এর বন্যা বয়িয়ে দেয় যেখানে যাবে সেখান থেকে চোদ্দপুরুষের কাছে, কারণে অকারণে।

ভ্রমণপথে আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি, সেটা হলো, এক একজন ভ্রমণার্থী যেন এক একটা ভ্রাম্যমাণ পোষ্ট অফিস। ঝুড়ি ঝুড়ি পোষ্টকার্ড আর ইনল্যান্ড বয়ে নিয়ে বেড়ায় সঙ্গে। ফাঁক পেলেই শুরু হয়ে যায়, 'উদয়পুরে, এই উদয় সিংহের সমাধি মন্দিরে দাঁড়িয়ে তোমায় লিখছি। বাড়ী থেকে আসার পর তোমার কথা সব সময়েই মনে পড়ছে। তুমি থাকলে আরও আনন্দে ভরে উঠতো মনটা। এখানকার মতো আকাশ বাতাস জল মাটি সারাবিশ্বে আর কোথাও আছে বলে মনে হয় না। রাজস্থানে আসার পর তোমার মতো রাণাপ্রতাপের কথাও মনে পড়ছে বার বার। মনে হচ্ছে আমিও প্রতাপের সঙ্গী হয়ে হলদিঘাটীর যুদ্ধে আকবরের সঙ্গে লড়াই করছি। মনে পড়ছে মীরার কথা। ইচ্ছে করছে বিষপাত্র হাতে নিয়ে মীরার মতো গলা ছেড়ে কৃষ্ণের গান গাই···। তোমাদের কোন সংবাদ পাইনা বলে মনটা খুব খারাপ লাগছে। ভালো থেকো তোমরা। আমি ভালো আছি জেনো তবে মাঝে কয়েকদিন আমাশায় আর গ্যাসে কষ্ট পেয়েছি।' ইতি তোমার—

ট্রেন ছাড়ার পর দেখলাম একটা খোপে বসে আছেন একজন বয়স্ক সহযাত্রী এবং পাঁচজন সহযাত্রিনী। বিভিন্ন বয়েসের। এদের মধ্যে সধবা বিধবা আছেন, অল্প বয়স্কাও। আমার বিচরণ সর্বদাই অবাধ। যখন যেখানে মন চায় সেখানেই গিয়ে বসি। কথা বলি কম, শুনি বেশী—সকলের সুখদুঃখের কথা। তবে প্রশ্ন করিনা কারও পারিবারিক বিষয়ে। একান্ত নিরুপায় হলে হু-হাঁ করে উত্তর দিই। যাইহোক, কথায় কথায় সহযাত্রিনীরা শুরু করলেন তাদের কথা, জানাতে লাগলেন মনের

ব্যথা। শুনতে লাগলাম তাদের মধ্যে বসে, লিখতে হবে তো! এমন সুযোগ আর কোথায়ই বা পাওয়া যায়। একজন অল্প বয়স্কা কথাপ্রসঙ্গে বললেন,
—আমার স্বামী ভীষণ ভালো। যেমন শান্ত তেমনই নিরীহ। তবে দিদি দোষ একটাই, বাড়ীর লোকেরা আমার সঙ্গে অকারণে অশান্তি করলে কোন প্রতিবাদ করে না। আমি কিছু বলতে গেলে উল্টে আমাকেই অপমান করে। স্ত্রীর মর্যাদা দেয় না। আগে শ্বশুরটা ভালো ছিল। এখন কিছুদিন যাবৎ দেখছি বুড়োটাও আমার পিছনে লাগছে ওই বুড়ির পরামর্শে। কোথাও বেরোতে চাইলে শাশুড়ী আপত্তি করবে, যেতে দিতে চায় না। এবার দিদি বেরিয়েছি একরকম জোর করেই।
একটু থেমে আবার বললেন মলিন মুখে সকলকে উদ্দেশ্য করে,
—আমার স্বামী একটুও বুঝতে চায় না আমাকে। বিয়ের পর প্রথম প্রথম বেশ ভালোবাসতো। এখন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে দিতে চায় না শাশুড়ী। সব সময় চোখে চোখে রাখে। এখন বুঝি, বাড়ীতে একজন ঝি-এর দরকার ছিল, আমাকে বিয়ে করে সেই প্রয়োজনটা মিটিয়েছে। সংসারে সবার জন্য এ্যাতো করি তবু কারও মন পাই না।
একথা শুনে পঞ্চমহিলার মধ্যে থেকে এক মাঝবয়েসী মহিলা, এঁর আবার দাঁতে নস্যি দেয়ার অভ্যেস আছে। তিনি বললেন,
—আমার স্বামীর এমনিতে সব ভালো। সংসারে আমার কোন অভাব রাখেনি। প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশীই দেয়। আত্মীয়-স্বজন সবার জন্যে ও করে তবে নাম নেই। মনটাও দিদি খুব ভালো। দোষের মধ্যে একটাই—একটু ড্রিংক করে। এই নিয়েই সংসারে আমার অশান্তি। অনেক চেষ্টা করেছি। কিছুতেই ছাড়াতে পারিনি। মা কালীর পা ছুঁয়ে আমার মাথায় হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়েছি কম করেও একশোবার, তবুও ছাড়াতে পারিনি। এখন হাল ছেড়ে দিয়েছি। মদের চেয়ে সতীনের সঙ্গে ঘর করায় অনেক বেশী সুখ।
কথাটা শেষ হতেই পাশে বসা পানপ্রিয়া বয়স্কা সহযাত্রিনী গালে একটা পান গুঁজে তাঁর স্বামীর প্রশংসা করলেন এইভাবে,
—এমনিতে দিদি আমার স্বামীর সব ভালো তবে দোষ একটাই। আমি যা বলবো ঠিক তার উল্টোটা উনি করবেন। অসম্ভব মাথা গরম মানুষ। আর নিজে যেটা ভালো বুঝবেন তার উপরে যাওয়ার উপায় নেই। কিছুতেই আমার কথা উনি শুনবেন না। এই দেখুন না, মেয়েরা এখন বড় হয়েছে। আমি মেয়েমানুষ। কোথায় ছেলে দেখবো বলুন তো? ওনাকে বললে কোন কথাই কানে নেন না। মেয়েদের বিয়ের কোন চেষ্টাই করেন না। আমি কি করি বলুন দেখি?
এই আসরে এবার এসে বসলেন এক আধাবয়েসী সহযাত্রী। চেপেচুপে বসলেন একটু জায়গা করে। তাঁকে জায়গা দিতে আমাকেও একটু সরে বসতে হলো। পানপ্রিয়ার কথা শুনে মুখোমুখি বসা মাঝবয়সী ভদ্রমহিলা বললেন,
—আমার স্বামীর বাজে কোন নেশা নেই। উনি খুব ভালো মানুষ। অফিস

কাছারী পাড়াতে ওঁর খুব সুনাম আছে। সবাই ভালোবাসে। তবে আমার একটা দুঃখ, বিয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত নিজে কোথাও বেড়াতে নিয়ে গেল না। নিজে ফূর্তি করার বেলায় আছে। এই ট্যুরে তো আমি জোর করেই এলাম। ওকে চেষ্টা করেও আনতে পারলাম না। এছাড়াও ডিউটি থেকে ফিরে এসেই যাবে আড্ডা মারতে। আমার সঙ্গে দু-দণ্ড কথা বলতে গায়ে জ্বালা বাধে। এ-রোগটা ওর বিয়ের পর থেকেই দেখে আসছি। ছেলেটাকে যে নিয়ে একটু পড়াতে বসবে, তাও বসে না। এই নিয়েই আমার অশান্তি, নইলে এমনিতে আমার স্বামী বেশ ভালো মানুষ।

এমন প্রশংসার কথা শুনে পরে এসে বসা সহযাত্রী আর থাকতে পারলেন না। গুণ তো মানুষের কখনও চাপা থাকে না। গুণ আগুন যে! এক সময় না এক সময় তাপ পাওয়া যাবেই, সে ছেলেরই হোক বা মেয়ের। সহযাত্রী জানালেন তাঁর স্ত্রীর গুণের কথা,

—আমার স্ত্রীর এমনিতে সব ভালো। বিরাট সংসার আর ছেলেমেয়ে সামলানো, তাদের পড়াশুনো থেকে শুরু করে সবদিকেই ওর নজর। সংসারের কাজে ওর কোন ত্রুটি নেই। তবে দোষ একটাই, ওর জন্যে যতই করি না কেন কিছুতেই ওর মন ওঠে না। আরও চাই আরও দাও। চাহিদার আর শেষ নেই। স্ত্রীর ধারণা আমার দ্বারা কিছুই হবে না। আমি একটা অপদার্থ। একথা আমাকে রোজই শুনতে হয়। ওর কোন আত্মীয় বা পাড়ায় কারও উন্নতি হলে বা চাকরীতে প্রমোশন পেলে আমি ভুগবো অশান্তিতে। অপরাধ, আমার কেন হয় না? আর বাড়ী ফিরতে দেরী করলে কিংবা কোন মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখলেই মুখ হাঁড়ি। এ-টুকু ছাড়া আমার স্ত্রীর এমনিতে সব ভালো।

এইভাবেই চলতে থাকলো ভ্রমণপথের পাঁচালী। বেলা ১/৩০ মিঃ এলাম আমেদাবাদ স্টেশনে। আবু রোড থেকে ১৮৬ কি. মি.। সরাসরি কলকাতা থেকে এলে আমেদাবাদ ২০৮৯ কি. মি.। আগ্রা থেকে এই পর্যন্ত এলাম মিটার গেজ ট্রেনে। মালপত্র নামিয়ে ছেড়ে দিলাম আমাদের সংরক্ষিত কামরা।

বত্রিশজনের সংসারের মালপত্র রইলো স্টেশনে। সকলে বেরিয়ে পড়লাম আমেদাবাদের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখতে। অটো চললো শহরের পথ ধরে। এটা জানুয়ারী মাস। কলকাতায় এখন ঠাণ্ডা অথচ এই আমেদাবাদে বেশ গরম লাগছে।

গুজরাট রাজ্যের একটি জেলা শহর—এখন নাম এর আমেদাবাদ। যখন ভীল-রাজাদের অধীনে ছিল তখন এই শহরের নাম ছিল আশাবল। দশম শতাব্দীর কথা। রাজা কর্ণদেব পরাস্ত করলেন ভীলরাজাদের। অধিকার করলেন আশাবল। নতুন নাম দিলেন তিনি কর্ণাবতী। তারপরেও আবার পরিবর্তন হলো নামের। কর্ণাবতী হলো রাজনগর। পরে কর্ণদেবকে পরাজিত করে রাজনগর অধিকার করেন আমেদশাহের পিতামহ।

গুজরাটে মুসলমান শাসনের সূত্রপাত হয় ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর আক্রমণে। তারপর মালিক কাফুর চতুর্দশ শতাব্দীতে অভিযান চালান গুজরাটে। তখনই প্রতিষ্ঠিত হলো মুসলমানদের অধিকার।

পনেরো শতাব্দীর প্রথম দিকে গুজরাটের শাসনকর্তা ছিলেন মজফ্ফর শাহ (জাফর)। আশাবলে তাঁর পুত্র তাতার খাঁ বন্দী করলেন পিতাকে। তারপর তিনি মহম্মদ শাহ উপাধি বা নাম গ্রহণ করে বসলেন গুজরাটের সিংহাসনে।

এরপর মজফ্ফর শাহের পৌত্রের কথা—অলপ খাঁ। আহম্মদ শাহ নাম ধারণ করে তিনি পরাজিত করলেন রাজপুত এবং মালবরাজকে। অধিকার করলেন সমগ্র গুজরাট রাজ্য। তাঁর আমলে তাঁরই নামানুসারে শহর আশাবল থেকে হলো আহমেদাবাদ বা আমেদাবাদ।

ষোল শতাব্দীর প্রথমার্ধের কথা। সুলতান বাহাদুর শাহের সময় (১৫২৬—১৫৩৭ খ্রীঃ) গুজরাট কিছুদিনের জন্য চলে যায় মোঘল সম্রাট হুমায়ুনের অধিকারে। তবে ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেদাবাদ অধিকার করেন আকবর। তখন গুজরাটে স্থাপিত হয় মোঘল আধিপত্য।

প্রসিদ্ধি আছে, আমেদাবাদের শাসনকর্তা যখন সম্রাট জাহাঙ্গীর ছিলেন, তখন তাঁর মহিষী নূরজাহান পরিচালনা করতেন এই শহরের শাসনকার্য।

জাহাঙ্গীর তাঁর রাজত্বকালে যখন অবস্থান করতেন আমেদাবাদে, তখন ইংরেজ দূত টমাস্ রো-কে তিনি অধিকার দেন আমেদাবাদে বাণিজ্য এবং বসবাসের।

শহর আমেদাবাদের আঁকাবাঁকা পথ ধরে অটো এসে দাঁড়ালো সবরমতী আশ্রমে। রাস্তার ধারেই ছায়াঘেরা আশ্রম। বাঁধানো ঝকঝকে রাস্তা ধরে ঢুকলাম আশ্রম প্রাঙ্গণে। পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে নদী সবরমতী।

আমেদাবাদের দক্ষিণে রয়েছে কিছু পার্বত্য অঞ্চল, বাকিটা সমতল। অতি প্রাচীন নদী এই সবরমতী। পদ্মপুরাণের মতে, ঋষি বশিষ্ঠদেবের তীব্র দৃষ্টিশক্তি বলে একদা ভূপৃষ্ঠে সৃষ্টি হয় দুটি নদী—সরস্বতী আর সবরমতী। আরাবল্লী পর্বতেই সবরমতীর উৎস। তারপর সবরকণ্ঠ, মাহেসেনা, আমেদাবাদ এবং খেদাজেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মিলিত হয়েছে কাম্বে উপসাগরে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে একটি বিশেষ স্থান এই আমেদাবাদের। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মহাত্মা গান্ধী এই শহরের কোচরাব পল্লীতে স্থাপন করেন সত্যাগ্রহ আশ্রম। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে তিনি থাকতেন ওই আশ্রমে। তারপর ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে আশ্রমটি স্থানান্তরিত হয় সবরমতীতীরে। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে লবণ আইন ভঙ্গের জন্যে তাঁর ডাণ্ডী অভিযান শুরু করেন এই আশ্রম থেকে।

মাত্র কয়েকটা ঘর নিয়েই ছোট্ট আশ্রম এই সবরমতী। গান্ধীজী তাঁর জীবনের অনেকগুলি বছরই কাটিয়েছেন এখানে। প্রতিটি ঘরেই রয়েছে মহাত্মাজীর ব্যবহৃত দ্রব্যের স্মৃতি। এই আশ্রমে এসে দাঁড়ালে অনুভব করা যায় গান্ধীজীর দেহের

স্পর্শ। নিজ হাতে বোনা খদ্দরের জামা, ব্যবহৃত ঘড়ি ইত্যাদি রয়েছে আশ্রমের ঘরে। সিল্কের কাপড়ের উপরে মহাত্মাজীর ছবি আছে এখানে, পাঠিয়ে ছিলেন চীনারা। নিজের হাতের লেখা এবং যে চরকা তিনি ব্যবহার করতেন সেটি আজও রয়েছে সযত্নে। এ-ছাড়াও আছে অসংখ্য আলোকচিত্র, যেগুলি মহাত্মা গান্ধীর জন্মের পর থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের।

অনেকটা জায়গা জুড়েই আশ্রমের পরিবেশ। পাশেই নদীতে নামবার সান বাঁধানো ঘাট। সবটা ঘুরে দেখতে বেশী সময় লাগলো না। সহযাত্রীসহ আবার এসে বসলাম অটোতে। শুরু হলো চলা।

একদা শহর আমেদাবাদকে বলা হতো ভারতের ম্যানচেষ্টার। আহমেদ শাহ শহরটিকে প্রাচীরে ঘিরে নির্মাণ করেছিলেন বারোটি ফটক। বর্তমানে সেগুলি আর নেই। কথিত আছে, আমেদাবাদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বিয়ের পর শাহজাহান এসেছিলেন মমতাজকে সঙ্গে নিয়ে, ছিলেন একবছর।

ঔরঙ্গজেব বলেছেন, 'আমেদাবাদ ভারতের সুন্দরতম নগরী।' অথচ এই শহরটির প্রতি সম্রাট আকবর পুত্র জাহাঙ্গীর ছিলেন একেবারেই বীতশ্রদ্ধ। শহরটি তখন ধূলি ধূসরিত ছিল বলে তিনি আমেদাবাদকে আখ্যা দেন গর্দাবাদ। গর্দা শব্দের অর্থ ধূলি।

এখন আমেদাবাদের রাস্তাঘাটের অবস্থা তেমন ভালো নয়, ভাঙাচোরা। চওড়াও বেশী নয়। সেই পথ ধরেই অটো চললো অটোর বাঁধা গতিতে। অথচ ভাবতে অবাক লাগে, ষোল এবং সতেরো শতাব্দীতে অশেষ উন্নতি ও সমৃদ্ধি হয়েছিল এই আমেদাবাদের। 'মিরাট-ই-আমেদী' ( ১৭৫৬ খ্রীঃ ) নামক একটি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, '৩৮০টি উপকণ্ঠ ( suburb ) ছিল আমেদাবাদে। প্রত্যেকটি উপকণ্ঠে এত বড় বড় রাস্তা, বাড়ী ঘর, বাজার এবং উদ্যান ছিল যে, এক একটিকে শহর বললে বেশী বলা হয় না।'

আমেদাবাদের রাস্তা সম্পর্কে টমাস্ রো বলেছেন, 'আমেদাবাদের রাস্তাগুলি ৬০ ফুট থেকে ১৫০ ফুট চওড়া।' এখন আর সে রাস্তাঘাট নেই। কলকাতার মতো সাধারণ রাস্তা ধরেই অটো এসে দাঁড়ালো শহরের এক প্রান্তে কাঁকেরিয়া তালাও।

কাঁকেরিয়া হ্রদটির পরিধি ১½ মাইল। ব্যাস ৬৮৩ ফুট আর লম্বায় ১৮০ ফুট। এই হ্রদের মধ্যে রয়েছে সুন্দর একটি বাগানবেষ্টিত বাড়ী। ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে এই হ্রদটি খনন করান গুজরাটের সুলতান কুতুবুদ্দিন। পুরনো নাম এর হৌজ-ই-কুতুব। এই জলমহলটির আরও একটি নাম নাগিনা বাড়ী। এটি ছিল সুলতানের গ্রীষ্মাবাস। জনশ্রুতি আছে, সুলতান অনেক কুমীর এনে ছেড়েছিলেন এই হ্রদটিতে। তাঁর প্রমোদ সময়ে কেউ বিরক্ত করলে শাস্তি দেয়ার সহজ পথ ছিল তাকে হ্রদের জলে দেয়া। এখন আর একটাও কুমীর নেই। ইংরেজ রাজত্বে সব মেরে ফেলা হয়েছে জল ছেঁচে।

এই হ্রদের নামকরণের পিছনেও রয়েছে একটি জনপ্রবাদ। হ্রদটি যখন খোঁড়া হয়,

তখন একদিন সুলতান আহম্মদ শাহের গুরু শা আলম শা আসেন দেখতে। যখন তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন তাঁর পায়ে ফুটে যায় কয়েকটি 'কাঁক্রি'। সেইজন্যেই তিনি এই হ্রদের নাম রাখেন কাঁক্‌রিয়া তালাও।

কাঁকরিয়া হ্রদের পাশে চিড়িয়াখানাকে ফেলে অটো এগিয়ে চললো শাহীবাগ রোড ধরে। এলাম শাহীবাগে। বহু স্মৃতিবিজড়িত শাহীবাগের বিশাল প্রাসাদটি দেখার মতো। সম্রাট শাহজাহানের কীর্ত্তি হলো এই প্রাসাদ। এটি তিনি নির্মাণ করেন ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে। ব্রিটিশ আমলে প্রাসাদটি ব্যবহৃত হতো তৎকালীন কমিশনারের বাসভবন হিসাবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর চাকরী জীবনে ( ১৮৬৪-৬৭ এবং ১৮৭৬-৮০ খ্রীষ্টাব্দ ) শাহীবাগের এই প্রাসাদে বাস করতেন। তখন তিনি ছিলেন জেলা দায়রা জজ। বিলাত যাওয়ার পথে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথও কিছুদিন ছিলেন এই প্রাসাদে। তাঁর লেখা বিখ্যাত 'ক্ষুদিত পাষাণ' গল্পের পটভূমি ছিল এই শাহীবাগের প্রাসাদটি। শাহজাহানের সময় থেকে আজও প্রাসাদটি দাঁড়িয়ে আছে এঁদেরই জীবনের অতীত-মৌন সাক্ষী হয়ে।

শহর আমেদাবাদের স্থাপত্য এখনও অদ্ভুত, দর্শনীয়। এখানে মোঘল আমলের প্রভাব পড়েছিল ঠিকই তবে হিন্দুর স্থাপত্যকলা তার নিজের বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করেনি কখনও। স্থাপত্যশিল্প সম্পর্কে সুন্দর একটি কথা বলেছিলেন মর্গান ( Morgan ) সাহেব, 'স্থাপত্যশিল্প সব যুগের ছাপাখানা সদৃশ। যে যুগে এটি সৃষ্টি হয়, সেই যুগের সমাজচিত্রের এক জ্বলন্ত ইতিহাস লেখা থাকে এর বুকে।'

এই আমেদাবাদের মোঘল স্থাপত্যের উপর হিন্দু প্রভাব সম্পর্কে সাহেব ফার্গুসন তাঁর 'History of Indian and Eastern Architecture' গ্রন্থের ২২৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

"In Ahmedabad the Hindu influence continued to be felt through. Even the mosques are Hindu or Jain in every detail. Only here and there an arch is inserted not because it was wanted constructively but because it was a symbol of faith."

তৎকালীন আমেদাবাদ প্রসঙ্গে এলফিনটন সাহেবের মতে, 'বিশাল অট্টালিকাপূর্ণ এই আমেদাবাদ ভারতের অন্যতম বৃহৎ শহর।'

শাহীবাগ ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। এখানে দেখতে বেশী সময় লাগে না। মন শুধু আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে যায় এর অতীত স্মৃতির কথা ভেবে। অটো এগিয়ে চললো। সঙ্গীরা সবাই একসঙ্গে থাকলেও চলেছেন অন্য অটোতে। দর্শনীয় স্থানগুলিতে পৌঁছেছি কেউ একটু আগে কেউ বা একটু পরে। অটো একেবারে সোজা এসে হাজির হলো মুসলীম স্থাপত্যের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন জামা মসজিদের দোরগোড়ায়।

জামা মসজিদ, সিদি বসিরের মসজিদ নামেও এর প্রসিদ্ধি। প্রাচীন এই মসজিদটি

নির্মিত হয় ১৪২৩ খ্রীষ্টাব্দে। নির্মাণকাল এবং নির্মাণকারীকে নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেন সুলতান আহমেদ শাহ নির্মাণ করেন আবার কারও মতে, মালেক শাহরঙ্গ শা এটি নির্মাণ করান ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে। এ-কথা জানা গেছে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আলি মহম্মদ খাঁ-এর লেখা 'মিরাট-ই-আমেদী' গ্রন্থ থেকে।

ঐতিহাসিকদের মত যাই হোক না কেন, এ-এক বিস্ময়কর মসজিদ। এটির ছাদের নীচে ২৬০টি স্তম্ভ এবং উপরে গম্বুজ আছে ১৫টি। সবচেয়ে বড় গম্বুজ হলো মাঝেরটি। ভিতরে দোতলা। নানা কারুকার্য খচিত পাথরের দেয়াল। মসজিদের দুপাশে রয়েছে তিনতলা বিশিষ্ট দুটি মিনার। এর ভিতরে সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে ঘুরে ঘুরে। অদ্ভুত ব্যাপার, উপরে উঠে একটু নাড়া দিলেই মিনারটি দুলে ওঠে। মিনার দুটি উচ্চতায় ২০ ফুট। পাথরের তৈরী মিনারের একটিকে নাড়া দিলে নড়ে ওঠে অপরটি অথচ কোন সংযোগই নেই একটির সঙ্গে অপরটির। এই মিনার দুটির নাম ঝুলতি মিনার বা শেকিং টাওয়ার। বিশ্বের অন্য কোথাও এমন স্থাপত্যশিল্প আর নেই।

মসজিদের ডানদিকের মিনারটির উপরের দুটি তলা ভাঙা। অনেকের মতে, মিনারটি নড়ছে অথচ ভেঙে পড়ছে না, কেমন করে এটা হচ্ছে--এই কৌতূহলের সমাধান করতে ভেঙেছেন ব্রিটিশ আমলের স্থপতিরা। আবার কারও মতে এসব কথা ঠিক নয়। ব্রিটিশরা গড়তে ছাড়া ভাঙতে শেখেনি। তাহলে তো তাজমহলটাই গুঁড়িয়ে দিত। আসলে ওটা ভেঙেছে ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দের এক বড় ভূমিকম্পে।

শহর আমেদাবাদ দেখে বিস্মিত ভিন্সেণ্ট সাহেব তাঁর **'Oxford History of India'** গ্রন্থে লিখেছেন,

**"Ahmedabad is one of the handsomest cities in the world for a period of about 3 centuries till 18th century."**

বিখ্যাত শিল্প তত্ত্বজ্ঞ হ্যাভেল লিখেছেন, **"Ahmedabad is however more entitled to be remembered as a great Rajput builder than as a Mohemmedan Sultan." (History of Aryan Rule in India p. 341)**

আমাদের অটোচালক সব কিছুই ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে। তবে মজা হলো, দর্শনীয় জায়গাগুলির নাম না বলে দিলে এরা দূরের জায়গাগুলিতে নিয়ে যায় না। কাছাকাছি যে কটা দেখার তাই-ই দেখিয়ে নিয়ে চলে আসে। এটা করে থাকে ভারতের সমস্ত তীর্থ বা দর্শনীয় স্থানের অটোচালকরা। এবার অটো আমাদের নিয়ে এলো শাহ আলম মকবরা।

শাহ আলম ছিলেন একজন সিদ্ধ ফকির। তাঁরই উদ্দেশ্যে ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন আবুবকর হুসেনী। এর ভিতরের কারুকার্যগুলি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। এগুলি সব হিন্দু শিল্পীদের দিয়েই করানো হয়েছিল। মকবরার দরজাগুলি সব শ্বেতপাথরের, মেঝে কালো মার্বেল পাথরের। এই মকবরার (কবরখানা) গম্বুজটি সোনা আর মূল্যবান পাথর দিয়ে সাজিয়ে দেন নূরজাহানের

ভাই আসফ্ খান। আঠারোটি ছোট এবং তিনটি বড় গম্বুজ রয়েছে মকবরায়। এর পশ্চিমদিকেই আছে একটি বড় জলাশয়। এটি তাজ খান নারি আলির বেগমের কীর্ত্তি। এখন জলাশয়টির নতুন নাম চান্দোলা লেক।

আমেদাবাদ শহরের রাস্তাগুলি খুব একটা চওড়া নয়। মেরামতির অভাবও চোখে পড়ে যথেষ্ট। এই শহরের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে 'তিন দরওয়াজা' গান্ধী রোডের উপর। এটি নির্মাণ করেন সুলতান আহমেদ শাহ। এর নির্মাণ কৌশলও বড় সুন্দর। একই তোরণের মধ্যে দিয়ে পথ তিনটি। উচ্চতায় ৩৭ ফুট। সুলতান শাহ শহরের শোভাযাত্রা দেখতেন এই তোরণের উপরে বসে।

এই শহরের প্রধান বাজারটির নাম মানিক চক্। মানিক মন্দির নামে একটি মন্দিরও আছে এখানে। আহমেদ শাহের রাজত্বকালে এক শক্তিশালী যোগী ছিলেন মানিকবাবা। এই যোগীর যোগশক্তি দেখে মুগ্ধ ও ভক্ত হয়ে যান সুলতান। তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশ্যে তিনি নাম দেন মানিক চক্।

আমাদের অটো শহরের রাস্তা ধরে এসে দাঁড়ালো একেবারে হাতিসিং জৈন মন্দিরের সামনে। মন্দিরটি সবরমতী আশ্রম থেকে খুব বেশী দূরে নয়। দিল্লীগেটের বাইরে শাহীবাগ রোডের ধারে।

জৈনস্থাপত্যের পরিচয়বাহী এই জৈন মন্দিরটি যেমন বড় তেমনই এর কারুকার্য অত্যন্ত মনোহর। সাদা ধবধবে পাথরের তৈরী মন্দিরের কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলাম নাটমন্দিরে। একটু এগোতেই মূল মন্দির। বেদিতে স্থাপিত বিগ্রহ দুটির একটি মহাবীর এবং অপরটি পার্শ্বনাথের। মূল্যবান পাথরে সাজানো। আকারে বেশ বড়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন হাতিসিং নামে তৎকালীন প্রসিদ্ধ এক ধনী ব্যবসায়ী। সেই সময়েই মন্দির নির্মাণে ব্যয় হয় এক কোটি মিলিয়ন টাকা। এই টাকা খরচের অঙ্কেই মোটামুটি একটা ধারণা করা যায় মন্দিরটি কেমন, বিশেষ করে যারা এ-মন্দির দেখেননি। মন্দিরের ছাদে রয়েছে ৫২টি শ্বেতপাথরের গম্বুজ। এ-ছাড়াও মন্দিরে স্থাপিত আছে ২৪ জন তীর্থঙ্করের সুদর্শন মূর্তি।

অল্প সময়ের মধ্যেই দেখা হয়ে যায় জৈন মন্দির। আবার সকলে এসে বসলাম অটোতে। সময় নষ্ট করার মতো সময় নেই। সীমিত সময়ের মধ্যে দেখতে হবে সবই, দর্শনীয় যা কিছু। এবার অটো এসে দাঁড়ালো লাল দরওয়াজা।

সম্পূর্ণ লালপাথরে নির্মিত মসজিদ। সিদি সৈয়দ সাহেব ছিলেন একজন ফকির। তাঁরই সমাধি রয়েছে এখানে। মসজিদের জানলায় লালপাথরের উপর বিভিন্ন গাছপালা, খিলানের উপর পাথরের সূক্ষ্ম নিখুঁত জালির কাজ এমনই নয়নাভিরাম, এ-চোখে না দেখলে কারও একবিন্দু ধারণাতেও আসবে না। সেইজন্যেই হয়তো দূর-দূরান্তর থেকে পর্যটকেরা ছুটে আসে এখানে। পাথরের উপর এমন সুন্দর জালির কাজ, আমার মনে হয় না এ-দেশে আর কোথাও আছে। জানা গেছে, খিলানের একটি জালি খুলে নিয়ে গেছে ইংরেজরা। সেটি সংরক্ষিত আছে

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে।

মসজিদের চারপাশেই সুন্দর সাজানো বাগান। পাশেই ছোট্ট একটি জলাধার। এগুলি সবই যেন মৃত ফকিরকে করে তুলেছে জীবন্ত বাদশা।

আজকের শহর আমেদাবাদের রাস্তাঘাট আর টমাস্ রো-এর আমলের মতো নেই। একটা ঘিঞ্জি শহরে যেমন হয় ঠিক তেমনই। যদিও নতুন করে এই শহরের পত্তন করেছিলেন আহমেদ শাহ ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর অনেক অ-নে-ক ধাক্কা সয়ে এখন শহর বৃদ্ধাবস্থায় এসে ধুঁকে ধুঁকে করে চলেছে পুরনো দিনের স্মৃতিমন্থন।

এ-ছাড়াও সুন্দর জালির কাজে ভরা আহমেদ শাহের মকবরা, কালো মার্বেল পাথরের উপর সাদা মার্বেল পাথরের ফুলপাতা বসানো চমৎকার মকবরা আহমেদ শাহের বেগমদের, মহম্মদ বিগারার বেগম কর্তৃক ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু ও মুসলমান কারুকার্যের সংমিশ্রণে নির্মিত রাণী শিপির মসজিদ, রাজপুত বিবি ও সিদি বসিরের মিনার, ১৪১১ খ্রীষ্টাব্দে আহমেদ শাহ নির্মিত ভদ্রকিল্লা যেখানে স্থাপিত আছে ভদ্রকালীর মন্দির, ছবিতে গীতার সমস্ত কাহিনী চিত্রিত গীতামন্দির, শিশু মনোবিকাশের উদ্দেশ্যে নির্মিত শিশু উদ্যান বাল বটিকা, ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত গুজরাটের সবচেয়ে উঁচু দরিয়া খাঁ-এর গম্বুজ, ৬৪টি স্তম্ভের উপর ফরাসী স্থপতি লি কুর বুসিয়ে-এর পরিকল্পনায় নির্মিত আমেদাবাদ সংগ্রহশালা, হালকা লাল আর ধূসর রঙের পাথরে নির্মিত অপূর্ব ইমারত—দাদাহরি মসজিদ, একটি অভিনব কুয়া আদালজ ভাভ এবং ভবানী মন্দির দেখে অটো একেবারে সোজা এসে দাঁড়ালো আমেদাবাদ স্টেশন চত্বরে। শেষ হলো ঝটিকা সফর। সকলেই এসে বিশ্রাম করতে লাগলাম প্ল্যাটফরমে। আগেও এসেছি আমেদাবাদে, আবারও এলাম।

## পৌরাণিক সুদামাপুরী—পোরবন্দর

সৌরাষ্ট্র এক্সপ্রেস ধরলাম আমেদাবাদ থেকে। আসছে বোম্বাই থেকে, যাবে পোরবন্দর পর্যন্ত। আগেই আমাদের বার্থ সংরক্ষিত ছিল। কাঁটায় কাঁটায় রাত ৮/৪৫ মি.। ট্রেন ছাড়লো আমেদাবাদ থেকে। জয়পুর থেকে এই পর্যন্ত এসেছি মিটার গেজ-এ। এখান থেকে শুরু হলো ব্রডগেজ।

কারও স্বজন চলে গেলে দেখতে দেখতে যেমন দিনগুলো কেটে যায়, ধীরে ধীরে মন থেকে মুছে যায় শোক দুঃখ, উপশম হয় যন্ত্রণার, তেমনভাবেই ভ্রমণপথে দেখতে দেখতে কেটে যায় সময়, দিনও। রাত হয় আবার মুছে যায় অন্ধকার। আগের দিনের ভাবনা অনেক ফিকে হয়ে আসে—আসে আবার নতুন করে। প্রতি মুহূর্তের অতীত থাকে শুধু স্মৃতি হয়ে, চলে যাওয়া স্বজনের প্রাণের কথা, ভ্রমণে দেখার কথা। এটাই জীবন, ভ্রমণও।

এই নিয়মেই কেটে গেল ছোট্ট রাতটা। ঠিক সকাল ৬/৪৫ মি. ট্রেন এসে দাঁড়ালো পোরবন্দর স্টেশনে। আমেদাবাদ থেকে এলাম ৪৭৫ কি. মি.। কলকাতা থেকে আমেদাবাদ হয়ে এখানকার দূরত্ব ২৫৬৪ কি. মি.। সরাসরি জয়পুর থেকে ১০৩৭ কি. মি.।

স্টেশন চত্বর থেকে বেরিয়ে এলাম সকলে। সামনেই Shree Kandhlikrupa Guest House। স্টেশন থেকে হাঁটাপথে দেড় থেকে দু-মিনিট। আগেই ঘর সংরক্ষণ করে রেখেছিল ভ্রমণকারী প্রতিষ্ঠান। সরাসরি এসে উঠলাম গেস্ট হাউসে।

দুপুর একটু গড়াতেই বেরিয়ে পড়লাম ঘুরতে। কাছাকাছি যা কিছু দেখার আছে দেখতে। পরিচ্ছন্ন শহর পোরবন্দর। এখানেও অটো ২ কি. মি. পথ পেরিয়ে এলো কীর্তি মন্দির।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম হয় গান্ধীজীর। যে বাড়ীতে তিনি ভূমিষ্ট হন সেটির বয়েস এখন আড়াইশো। বাড়ীর পুরানো অংশকে একই রকম রেখে তারই চারপাশ দিয়ে আবার নতুন করে গড়ে তুলে নাম রাখা হয়েছে কীর্তি মন্দির। মহাত্মাজীর ভূমিষ্ট হওয়ার ঘরটিকে অক্ষত রেখে করা হয়েছে সংস্কার।

নতুন মন্দিরের উচ্চতা ৭৯ ফুট। অবারিত দ্বার। গান্ধীজীর মৃত্যুকালীন বয়েস হয়েছিল ৭৯ বছর। তাঁর স্মরণেই মন্দিরের এই উচ্চতা। এখানকার প্রাঙ্গণের দেয়ালে খোদিত আছে মহাত্মাজীর জীবনের কিছু বিশেষ ঘটনার দৃশ্য। তাঁরই স্মরণে প্রতিদিন সন্ধ্যায় জ্বালানো হয় ৭৯টি প্রদীপ। মাত্র মিনিট দশেকের মধ্যেই দেখা হয়ে যায় গান্ধীজীর জন্মস্মৃতি মন্দির।

আবার চলা শুরু। সামান্য পথ। স্টেশন থেকে ধরলে দূরত্ব মাত্র এক-দেড় কি. মি.। অটো এসে দাঁড়ালো সুদামা মন্দির প্রাঙ্গণে।

শহরের মাঝে অপরিচ্ছন্ন এক বিশাল প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছে সুদামার মন্দির। প্রাচীরে ঘেরা প্রাঙ্গণ। বেশ কিছু স্তম্ভের উপর নাটমন্দিরযুক্ত সুউচ্চ মন্দির। কারুকার্যের কোন বালাই নেই। মন্দিরে স্থাপিত ছোট্ট পাথরের বিগ্রহটি সুদামার। বাঁপাশে রাধা, ডানপাশে রয়েছে রাধাকৃষ্ণের বাঁধানো একটি ছবি। ব্যাস, আর কিছু নেই। একেবারেই অনাড়ম্বর গর্ভমন্দির। অসংখ্য তীর্থযাত্রী আসছে—আসছে পর্যটকও। কেউ পুজো দিচ্ছে কেউ বা চলে যাচ্ছে শুধু দর্শন করে।

একবার বিবেকানন্দ এসেছিলেন পোরবন্দর রাজসভায়। তখনকার বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন শংকর পাণ্ডুরাং। তখন তিনি বেদের অনুবাদে লিপ্ত ছিলেন। স্বামীজী সেখানে ছিলেন নয় মাস। সেই সময় তিনি পণ্ডিতের কাজে সহায়তা করেছিলেন, একইসঙ্গে পাণ্ডুরাং এর সাহায্যে আয়ত্ত করে নেন বেদ এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্য।

পৌরাণিকযুগে আজকের পোরবন্দরের নাম ছিল সুদামাপুরী। শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০ স্কন্ধের আশি ও একাশীতম অধ্যায়ে সুদামার প্রাসাদ বা পুরী নির্মাণ প্রসঙ্গে একটি সুন্দর পৌরাণিক কাহিনী আছে 'শ্রীদাম ব্রাহ্মণের উপাখ্যান' নামে,

"রাজা পরীক্ষিৎ বললেন, ভগবান অনন্তবীর্য মহাত্মা মুকুন্দের আর যে সমস্ত বিক্রমকাহিনী আছে, আমরা তা শুনতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মণ্, এমন কে আছেন—যিনি ভগবদ্ বিষয়ে সৎকথা শুনতে বিরক্ত বোধ করেন? যে বাক্য তাঁর গুণাবলী

উচ্চারণ করে সেই বাক্যই বাক্য। যে হাত তাঁর সেবাকাজে নিযুক্ত সেই হাতই হাত। যে চিত্ত ভগবানের স্মরণে নিমগ্ন—সেই চিত্তই চিত্ত। যেই কান সেই পুণ্য-কথা শোনে সেই কানই কান, আর যেই মাথা তাঁর চরাচর রূপকে প্রণাম জানায় সেই মাথাই মাথা। যেই চোখ তাঁর স্থাবর ও জঙ্গম এই দুই মূর্তিকেই দেখে সেই চোখই চোখ। আর যে-সকল অঙ্গ ভগবানের পাদোদক রোজ ধারণ করে সেই অঙ্গই অঙ্গ। সূত বললেন, বিষ্ণুভক্ত রাজা পরীক্ষিৎ ব্যাসপুত্র শুকদেবকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বাসুদেবে মনপ্রাণ সমর্পণ করে বলতে লাগলেন।)

শুকদেব বললেন, মহারাজ, কোন এক শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন। তিনি ইন্দ্রিয়ভোগে বিতৃষ্ণ হয়ে জিতেন্দ্রিয় ও প্রশান্তাত্মা হয়েছিলেন। যথাপ্রাপ্ত বস্তু দিয়েই ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ জীবনধারণ করতেন। জীর্ণ মলিন বসন পরে তিনি গৃহে বাস করতেন। তাঁর স্ত্রীও ঐরকম একখণ্ড কাপড় পরতেন আর রোজ ক্ষুধার তাড়নায় কোন রকমে দিন কাটাতেন। একদিন সেই পতিব্রতা নারী ক্ষুধায় কাঁপতে কাঁপতে ম্লান মুখে স্বামীকে বললেন, আমি শুনেছি ব্রাহ্মণহিতৈষী শরণাগতবৎসল স্বয়ং লক্ষ্মীপতি যদুপতি আপনার বন্ধু। তিনি সাধুদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আপনি তাঁর কাছে যান। আপনি সপরিবারে কষ্ট পাচ্ছেন দেখে তিনি আপনার ধনের অভাব পূরণ করবেন। তিনি এখন ভোজ, বৃষ্ণি আর অন্ধকদের রাজা হয়ে দ্বারকায় বাস করছেন। তিনি চরাচর সকলের গুরু। যিনি তাঁর পাদপদ্ম চিন্তা করেন তিনি তাঁকে আত্মদান করে থাকেন। সুতরাং তাঁকে ভজনা করলে তিনি যে অবশ্য অভীষ্টদান করবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ স্ত্রীর দ্বারা বহুবার অনুরুদ্ধ হয়ে ভাবলেন, আর কিছু হোক না হোক পরমলাভ এই যে, শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পাব।

এরকম চিন্তা করে ব্রাহ্মণ দ্বারকা যাওয়ার সংকল্প করে বললেন, কল্যাণী, সখাকে দেখতে যাবো। ঘরে যদি কোন উপহার-সামগ্রী থাকে দাও, আমি নিয়ে যাই। ব্রাহ্মণী তখন অন্যান্য ব্রাহ্মণ বাড়ী থেকে চারমুঠি চিঁড়া চেয়ে এনে পুরনো কাপড়ে বেঁধে স্বামীকে দিলেন। ব্রাহ্মণ সেই চিঁড়াটুকু নিয়ে কি করে তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন ঘটবে, এই চিন্তা করতে করতে দ্বারকায় উপস্থিত হলেন।

দ্বারকায় এসে সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তিন সৈন্যব্যূহ আর তিন কক্ষ অতিক্রম করলেন। তারপর তিনি শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার মহিষীর একজনের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর পালঙ্কে শুয়ে ছিলেন। দূর থেকে তিনি ব্রাহ্মণকে দেখেই উঠে দুই হাত বাড়িয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। প্রিয়সখা ব্রাহ্মণের অঙ্গস্পর্শে শ্রীকৃষ্ণের এত আনন্দ হলো যে তাঁর চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝরতে লাগল। তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুকে পালঙ্কের উপর বসিয়ে তারজন্য পূজা-সামগ্রী আনালেন এবং তাঁর পা ধুয়ে লোকপাবন ভগবান সেই পাদোদক মাথায় নিলেন। পরে তিনি দিব্যগন্ধযুক্ত চন্দন, অগুরু ও কুঙ্কুম বিপ্রের গায়ে মাখালেন আর সুগন্ধি ধূপ আর প্রদীপ দিয়ে আনন্দে তাঁর পূজা করে তাঁকে পান সুপারি

ও গরু দান করে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। ব্রাহ্মণ ছেঁড়া-ময়লা কাপড় পরে ছিলেন, তাঁর শরীরের শিরাগুলি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। স্বয়ং কৃষ্ণের মহিষী সখীদের নিয়ে তাঁকে পাখা করে তাঁর পরিচর্যা করতে লাগলেন। পুণ্যকীর্তি শ্রীকৃষ্ণ নিজের হাতে প্রীতিভরে ব্রাহ্মণকে পূজা করছেন দেখে অন্তঃপুরবাসীরা আশ্চর্য হলেন। তাঁরা ভাবলেন, এই ব্রাহ্মণ নির্ধন, অপরিচ্ছন্ন আর নিন্দিত। এই অধম ব্যক্তি কোন্ পুণ্যবলে শ্রীকৃষ্ণের সম্মানভাজন হল? শ্রীকৃষ্ণ পালঙ্কশায়িতা প্রিয়াকে ছেড়ে এই ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করলেন।

মহারাজ, অতঃপর কৃষ্ণ আর ব্রাহ্মণ পরস্পরের হাত ধরে, নিজেরা যখন গুরুকুলে বাস করতেন, তখনকার সমস্ত মনোরম গল্প বলতে লাগলেন। ভগবান বললেন, বিপ্রবর, দক্ষিণা দিয়ে গুরুকুল থেকে গৃহে ফিরে এসে তুমি কি তোমারই অনুরূপ সহধর্মিণী গ্রহণ করেছ? তুমি বিদ্বান, আমি জানি তোমার মন কামনা দ্বারা অভিভূত নয়। তাই গৃহধর্মে বা ধনে তুমি খুশী হও না। আমি যেমন বিষয়ে আসক্ত না হয়েও লোকের শিক্ষার জন্য কাজ করে থাকি, সে-রকম কেউ কেউ বিষয়-কামনায় প্রমত্ত না হয়ে ঈশ্বরের মায়ায় রচিত বিষয়-বাসনা ত্যাগ করে লোক-শিক্ষার জন্য গৃহস্থধর্ম পালন করে। তুমিও সেই রকম করেছ। ব্রাহ্মণেরা যে গুরুর কাছে বিজ্ঞের পরম আত্মতত্ত্ব জেনে অজ্ঞানের পরপারে গমন করেন, সেই গুরুকুলে আমাদের দুজনের বাসের কথা মনে আছে কি? সখা, এই সংসারে যাঁর থেকে জন্ম হয় তিনি প্রথম গুরু, উপনেতা আচার্য দ্বিতীয় গুরু আর আশ্রমের যিনি জ্ঞানদাতা গুরু তিনিই সাক্ষাৎ আমি। আমি গুরুরূপে উপদেশ দিলে যাঁরা অনায়াসে ভবসিন্ধু পার হয়ে যান, এই পৃথিবীর আশ্রমবাসীদের মধ্যে তাঁরাই প্রকৃত প্রয়োজনে সুপণ্ডিত। গুরুসেবায় আমি যে-রকম খুশী হই, গার্হস্থ্য ধর্ম, ব্রহ্মচর্য ধর্ম, বানপ্রস্থ, কর্ম অথবা সন্ন্যাস ধর্মের আচরণ দ্বারা তা হই না। যখন আমরা গুরুকুলে থাকতাম তখন একদিন গুরুপত্নী কাঠ আনবার জন্য পাঠালে যে ঘটনা ঘটেছিল তা কি তোমার মনে পড়ে? 'ছাত্ররা সব কাঠ নিয়ে এস' গুরু-পত্নীর এই আজ্ঞা পেয়ে আমরা মহা-অরণ্যে প্রবেশ করলাম। আকাশে ভীষণ ঝড় উঠল আর মেঘ দারুণ গর্জন করতে লাগল।

সূর্যদেব অস্তাচলে গেলেন, দশদিক অন্ধকারে ছেয়ে ফেলল। উঁচু-নিচু সমস্ত জায়গায়ই ডুবে গেছে, কোন দিকে কিছু দেখা গেল না। সেই জলপ্লাবিত বনে আমরা প্রচণ্ড বায়ু ও প্রবল জলের বেগে বারবার বাধা পেতে লাগলাম। তখন দিক ঠিক করতে না পেরে আমরা পরস্পরের হাত ধরে কাতরভাবে কাঠের ভার বহন করে নিয়ে আসতে লাগলাম। সূর্যোদয় হতে না হতেই আচার্য গুরু সান্দীপনি খুঁজতে বেরিয়ে আমাদের বনের মধ্যে কাতর অবস্থায় দেখে বললেন, বৎসগণ, প্রাণীদের আত্মাই শ্রেষ্ঠ বস্তু। তোমরা সেই আত্মাকে না মেনে গুরু আর গুরুপত্নীকে শ্রেষ্ঠ মনে বুঝে নিজেরা দুঃখ পেয়েছ। যাঁরা গুরুর জন্য সর্বার্থসাধক দেহ সমর্পণ করেন, যাঁরা আমার শিষ্য হন, তাঁরা এরকম আচরণ

করে গুরুর প্রত্যুপকার করেন। দ্বিজপুত্রগণ, আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হলাম, তোমাদের সকল কামনা পূর্ণ হোক। ইহকালেই কি, আর পরকালেই কি, আমার কাছে অধীত বেদতত্ত্ব যেন তোমাদের মন থেকে বিলুপ্ত না হয়। বন্ধু, গুরুকুলে থাকার সময় আমাদের এরকম যত সব ঘটনা ঘটেছিল সে সমস্তই তোমার মনে আছে তো? গুরুর কৃপাতেই পুরুষ শান্তিপূর্ণ হতে পারে।

ব্রাহ্মণ বললেন, দেবদেব, তুমি পূর্ণকাম। একসঙ্গে যখন আমরা বাস করেছি আমাদের কি আর অপূর্ণ আছে? হে প্রভু, যাঁর দেহ বেদময় ব্রহ্ম আর যিনি নিখিল মঙ্গলের আকর, তাঁর গুরুকুল বাস কেবল লোকশিক্ষার জন্য, তা মানুষের একান্ত অনুকরণযোগ্য।

শুকদেব বললেন, মহারাজ, সর্বঅন্তর্যামী শ্রীহরি সেই আগন্তুক ব্রাহ্মণের সঙ্গে এরকম কথাবার্তা বলতে বলতে প্রেমদৃষ্টিতে তাঁকে দেখে পরিহাস করে বললেন, তুমি গৃহ থেকে আমার জন্য কি উপহার এনেছ? ভক্তরা যদি অল্পকিছু উপহার আনে আমি তাকেই প্রচুর মনে করে সন্তুষ্ট হই। অভক্ত কর্তৃক আনীত প্রচুর উপকরণেও আমি হৃষ্ট হই না। পাতা, ফুল, ফল আর জল ভক্তিপূর্বক আমাকে যে যা দেয় আমি সন্তুষ্ট মনে তাই গ্রহণ করি। এই কথা শুনেও ব্রাহ্মণ লজ্জায় তাঁর বাড়ী থেকে আনা সেই চারমুঠো চিঁড়া কৃষ্ণকে কিছুতেই দিতে পারছিলেন না। তিনি শুধু অধোবদনে বসে রইলেন। সর্বভূতের অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের আগমনের কারণ আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি দেখলেন যে ব্রাহ্মণ সম্পদের জন্য ভগবানকে ভজনা করেন নি, পতিব্রতা স্ত্রীর প্রিয়সাধন করবার জন্যই তাঁর কাছে এসেছেন। তিনি স্থির করলেন যে ব্রাহ্মণকে দেবতাদেরও দুর্লভ সম্পত্তি দান করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে এই ভেবে ব্রাহ্মণের কাপড়ে-বাঁধা চিঁড়া কেড়ে নিয়ে বললেন, সখা, একি, এই তো আমার প্রীতিকর উপহার এনেছ। আমি বিশ্বাত্মা, এই চিঁড়া নিয়েই আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। শ্রীকৃষ্ণ এই বলে একমুঠো চিঁড়া খেয়ে ফেললেন এবং আবার খাওয়ার জন্য যেই দ্বিতীয় মুঠি তুলেছেন, অমনি লক্ষ্মীরূপিণী রুক্মিণী দেবী পরমব্রহ্মের হাত ধরে বললেন বিশ্বাত্মা. ইহলোকে অথবা পরলোকে পুরুষের সকল সমৃদ্ধির জন্য আপনার এই একমুঠি চিঁড়াই যথেষ্ট। আপনি আর দ্বিতীয় মুঠি খাবেন না। এভাবে আমাকে আর মানুষের মধ্যে চিরবন্দিনী করে রাখবেন না।

ব্রাহ্মণ সে রাত্রিতে কৃষ্ণালয়ে থাকলেন, আর পরম তৃপ্তির সঙ্গে পান-ভোজন করে নিজেকে যেন স্বর্গস্থ বলে মনে করলেন। রাত ভোর হলে ব্রাহ্মণ নিজের বাড়ীতে যাবার উদ্যোগ করলেন। বিশ্বস্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে কিছুদূর গিয়ে প্রণাম করে আর বিনয় বচন বলে তাঁকে সন্তুষ্ট করলেন। ব্রাহ্মণ সখার কাছ থেকে অর্থ পেলেন না, আর নিজেও মুখ ফুটে কিছু চাইলেনও না। ব্রাহ্মণ যেতে যেতে ভাবলেন, আহা, ভগবানের কি ব্রহ্মণ্যতা দেখলাম, তিনি বক্ষে লক্ষ্মীকে ধারণ করেন, অথচ আমার মত দরিদ্রতম ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করতে কুণ্ঠাবোধ করলেন না।

কোথায় আমি দীন-দরিদ্র নীচ জন, আর কোথায় কমলার আবাসভূমি শ্রীকৃষ্ণ? আমি ব্রাহ্মণবংশে জন্মেছি বলে তিনি আমাকে আলিঙ্গন করলেন, লক্ষ্মীশোভিত পালঙ্কে ভ্রাতৃজ্ঞানে বসালেন। রুক্মিণীদেবী স্বয়ং আমাকে বাতাস করলেন। ব্রাহ্মণ যেমন দেবতাকে পূজো করে, তেমনই দেবদেব পরম সেবা আর পাদমর্দন ছাড়া আমাকে পূজো করলেন। তাঁর চরণসেবা পুরুষের পরলোকে স্বর্গ ও মুক্তি, পৃথিবীতে সম্পত্তি আর সমস্ত সিদ্ধির মূল। তবু এ দরিদ্র ধন পেয়ে অত্যন্ত মত্ত হয়ে আমাকে আর মনে করবে না, নিশ্চয়ই এই ভেবে পরম দয়ালু আমাকে কোন ধন দেননি।

ব্রাহ্মণ এইরকম চিন্তা করতে করতে নিজের গৃহের কাছে এসে দেখলেন যে সেখানে চন্দ্র, সূর্য আর অগ্নির মত উজ্জ্বল এক মন্দির শোভা পাচ্ছে, বিচিত্র বাগান আর উপবন বিরাজ করছে। সেই বাগানে গাছের শাখায় বসে নানারকম পাখিরা গান গাইছে। নীচে অতি সুন্দর সরোবরে পদ্ম, কহ্লার, শালুক প্রভৃতি জলজ ফুলে শোভা পাচ্ছে। সুন্দর বসন-ভূষণে সজ্জিত নরনারীরা সেখানকার শোভা আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। ব্রাহ্মণ সবিস্ময়ে চিন্তা করতে লাগলেন, এ কার বাড়ী? কিভাবে এ এত সুন্দর হয়ে উঠল। এই সময় দেবতার মত স্ত্রী-পুরুষেরা গীত-বাদ্যের সঙ্গে উপহারসহ এগিয়ে এসে ব্রাহ্মণকে অভ্যর্থনা করল। স্বামী এসেছেন শুনে সতী ব্রাহ্মণপত্নীর অত্যন্ত আনন্দ হল। তিনি স্বামীকে সাদরে অভ্যর্থনার জন্য মূর্তিমতী লক্ষ্মীর মত বাড়ী থেকে বেরোলেন। পতিকে দেখে চোখ দিয়ে তাঁর আনন্দাশ্রু বইতে লাগল। তিনি চোখ বুজে মনে মনে পতিকে নমস্কার ও আলিঙ্গন করলেন। ব্রাহ্মণ দেখলেন, তাঁর পত্নী বিমান-বিহারিণী দেবীর মত দীপ্তি পাচ্ছেন, পদককণ্ঠী দাসীরা তাঁর চারদিকে বিরাজ করছে। এই দেখে ব্রাহ্মণ বিস্ময়ে অভিভূত হলেন, পরক্ষণেই তাঁর আনন্দ হল। তিনি পত্নীর সঙ্গে স্বয়ং ইন্দ্রের ভবনের মত শত-সহস্র মণি-শোভিত নিজের ঘরে ঢুকলেন। সেখানে দেখলেন, সোনার ও হাতীর দাঁতের কাজ-করা খাটে দুধের মত সাদা নরম বিছানা পাতা রয়েছে। ঘরের ভিতরে রত্নপ্রদীপ জ্বলছে। সোনার চাদর, পাখা, কোমল আস্তরণে আচ্ছাদিত বহু আসন আর মুক্তাদামে শোভিত সুন্দর ঝালরও শোভা পাচ্ছিল।

ব্রাহ্মণ নিজের গৃহে এ-রকম আকস্মিক সুখ-সমৃদ্ধি দেখে মনে মনে ভাবতে লাগলেন, আমি এতকাল দুর্ভাগা ও চিরদরিদ্র ছিলাম। নিশ্চয়ই যদুপতির দর্শনলাভই আমার এরূপ সুখ-সমৃদ্ধির কারণ। সখা আমার যদুশ্রেষ্ঠ। তিনি ভূরিভোজ আর বহু দান করেও নিজে তা খুব কম মনে করেন, আর কাউকে কিছু না বলেই মেঘের বর্ষণের মত যাচককে প্রচুর দান করে থাকেন। তাঁর বন্ধুরা যদি তাঁকে কিছু দেয় তবে তা তুচ্ছ হলেও বহু মনে করেন। সেই কারণেই আমার দেওয়া চিঁড়া সেই মহাত্মা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেছিলেন। আমি প্রতিজন্মে যেন তাঁর বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য বা দাস্য লাভ করতে পারি। আমি যেন সেই সর্বগুণাধার, মহানুভব ও মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ করে তাঁর ভক্তজনের সঙ্গে জন্মে জন্মে মিলিত হতে পারি।

ভগবান নিজে বিবেকবান, তিনি ধনীদের গর্বজনিত অধঃপাত দেখবার জন্য তাঁর অবিবেকী ভক্তদের বিত্তবান করতে চান না। শ্রীদাম নামে সেই ব্রাহ্মণ এরকম আলোচনা করে ভগবান জনার্দনের প্রতি আরো ভক্তিমান হলেন। তিনি আস্তে আস্তে ত্যাগ অভ্যাস করতে লাগলেন আর অনাসক্তচিত্তে পত্নীসহ বিষয় উপভোগ করতে লাগলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে ভগবান শ্রীহরি আর যজ্ঞেশ্বর ব্রাহ্মণরাই তাঁর প্রভু এবং দেবতা, তাঁদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। সেই ভগবৎসখা ব্রাহ্মণ এভাবে অন্যের পক্ষে দুর্লভ শ্রীকৃষ্ণকে নিজের ভক্তিদ্বারা বশীভূত ও দর্শন করে তাঁকে ধ্যান করতে করতে অহংকার-পাশ ছেদন করলেন আর শীঘ্রই ব্রহ্মবিদদের গন্তব্য সেই পরমধাম লাভ করলেন। মহারাজ, যিনি শ্রীহরির এই ব্রাহ্মণপ্রীতির বিবরণ শ্রদ্ধা সহকারে শোনেন, তাঁর ভগবদভক্তি লাভ হয়, তিনি কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে থাকেন।"

প্রবাদ আছে, কৃষ্ণসখা সুদামার প্রাসাদটি ছিল পোরবন্দরের এখানকার কোন একটি স্থানে। আবার কারও মতে বেটদ্বারকায়। তবে অতীত বা প্রাচীনত্বের কোন ছাপ নেই আজকের সুদামাপুরীর মন্দিরে।

## সাধুসঙ্গ—সন্ন্যাস জীবন এবং বর্তমান সন্ন্যাসী

সুদামাপুরী মন্দিরের সামনেই বিশাল ফাঁকা চত্বর। হাঁ করে পড়ে নেই। শত শত পায়রা দানা খাচ্ছে। এদের খাবার দিচ্ছেন তীর্থযাত্রীরা। পুণ্যলোভীর অভাব নেই এ-দেশে। পশুপাখীদের খাইয়ে পরপারের কিছু পাথেয় সঞ্চয় করাই এদের লক্ষ্য। এটাই হলো সস্তায় বেশী পুণ্যলাভের সহজ সরল পথ। সারাভারতে এমন জীবসেবীদের মধ্যে খোঁজ করলে দেখা যাবে এদের অনেকেই হয়তো খেতে দেয় না বাবা মাকে। বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে আলাদা সংসার করে বসে আছে গ্যাট হয়ে। কারণ বাবা মা বোঝাটা বড় বেশী। ওতে খরচা বেশী, ব্যাপারটা সারাজীবনের যে। তীর্থ-ক্ষেত্রের পায়রা বা বানরদের খাওয়াতে খরচাটা কম। আটআনা এক টাকাতেই লাভটা মোটা। তাই অনেক তীর্থক্ষেত্রেই দেখা যায় এই ধরনের অসংখ্য পায়রা গরু কিংবা বানরপ্রেমীদের। কথায় আছে, তুমি যে কর্ম করবে তার ফল তোমাকে পেতেই হবে। তাই যদি হয় তাহলে হয়তো এদের পরপারের সঙ্গী হিসাবে একমাত্র সহায় সম্বল হবে পায়রার দানা, নইলে বানরের কলা। বিবেক কখনও কৈফিয়ত চাইলে এরা হয়তো কলাই দেখাবে।

পায়রা যেখানে খাচ্ছে তার পাশেই রয়েছে পর পর কয়েকটা গাছ। গোড়া বাঁধানো। দ্বিতীয় গাছটার গোড়াতেই বসে আছেন এক সাধুবাবা। দেখতে পেয়েছি সুদামা মন্দিরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। দানা দাতা আর ঝাঁক ঝাঁক পায়রাদের পাশ কাটিয়ে সোজা এসে দাঁড়ালাম গাছতলায় সাধুবাবার সামনে। অসংখ্য তীর্থযাত্রী আর স্থানীয় লোকে গমগম করছে এই বিশাল মন্দিরপ্রাঙ্গণ। ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছে অনেকেই।

দেখলাম সাধুবাবা গাছের গোড়ায় বসে আছেন হেলান দিয়ে চোখ বুজে। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল। গায়ের রঙ বেশ ময়লা। জটা নেই মাথায়। ময়লাতেই জটার মতো হয়ে আছে চুলগুলো। পরনে হাঁটুর একটু নীচ পর্যন্ত গেরুয়া বসন। কতকাল যে বসনটা জলের মুখ দেখেনি তা একমাত্র সাধুবাবাই জানেন। গালে দাড়ি আছে তবে খুব বড় নয়। গায়ে একটা কাপড় জড়ানো। মুখশ্রী বেশ সুন্দর। টান আছে। ছিপছিপে চেহারা তবে জৌলুস নেই। পাশেই রয়েছে একমাত্র সহায়সঙ্গী ঝুলিটা। আর সব সাধুদের যেমন থাকে। বয়েস আন্দাজ করলাম, খুব বেশী হলে বছর চল্লিশের মধ্যে।

কাছে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছি সাধুবাবাকে। চোখবুজেই বসে আছেন পরম নিশ্চিন্তে। দাঁড়িয়ে রইলাম মিনিটখানেক। তবুও তাকানোর নাম নেই। ঘুমিয়ে আছেন মনে হলো না। চোখবুজে আছেন। তাই মুখেই বললাম,

—গোড় লাগে সাধুবাবা।

কথার শব্দে তাকালেন। এবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই আটকালেন হাত দিয়ে। সোজা হয়ে বসে বললেন,

—ঠিক হ্যায় বেটা ঠিক হ্যায়। ভগবান তোর মঙ্গল করুন।

আমি জোর করতেই আর বাধা দিলেন না সাধুবাবা। প্রণাম করলাম। কোন কথা বললেন না। আমিই বললাম, দরকারটা যে আমারই।

—বাবার ডেরা কোথায় ?

কোন উত্তর দিলেন না আমার কথায়। মুখের দিকে শুধু তাকালেন একবার। দাঁড়িয়ে ছিলাম। বসতে বললেন না। নিজেই বসলাম বাঁধানো গাছের গোড়ায় পা ঝুলিয়ে। অস্বস্তি হলো একটু। তবুও বললাম,

—বাবা কি এখানেই থাকেন ?

এবার মুখ খুললেন সাধুবাবা। বললেন,

—আমার কোন ঠিকানা নেই। পৃথিবীতে যাদের চিঠি লেখার লোক আছে, ঠিকানা আছে তাদেরই। আমার নেই। আমাকে কেউ চিঠি লেখে না আমিও কাউকে লিখি না। তাই কোন ঠিকানা নেই আমার।

একবার কোন সাধুবাবা কথা বললে তাঁকে আয়ত্বে আনতে পারি। না বললে বড্ড মুশকিল হয় আমার। একটু কায়দা করে এবার বললাম,

—বাবা কি ইউ. পি-র লোক ?

কথাটা শুনে একটুও অবাক হলেন না। বললেন,

—হাঁ, বাড়ী একসময় আমার ইউ. পি-তেই ছিল।

উত্তরপ্রদেশের কথা বললাম আমি আন্দাজ করে। সাধুবাবা হিন্দীভাষী। দেখেছি সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে অধিকাংশই উত্তরপ্রদেশের। আন্দাজে ছোড়া ঢিলটা দেখলাম লেগে গেল। আমার সুবিধাও হলো। তবে সাধুবাবার চোখ মুখের ভাবটা দেখে মনে হলো কথা বলার ইচ্ছা নেই আমার সঙ্গে। এই ভাবটা কাটানোর জন্য সরাসরি

মনের কথাটা জানালাম,
—বাবা, কয়েকটা জিজ্ঞাসা আছে আমার। যদি দয়া করে উত্তর দেন তো বিষয়টা বলি।
এ-কথারও কোন উত্তর দিলেন না সাধুবাবা। কাটলো মিনিট চার-পাঁচেক। এবার আমার কৌশলটা প্রয়োগ করলাম যেটা সাধুরা কথা বলতে না চাইলে সর্বত্রই প্রয়োগ করে থাকি। ঝপ্ করে পা-দুটোতে হাত দিয়ে আবার প্রণাম করলাম। আমার ধারণা ভগবান ভক্তিতে, মানুষ মিষ্টি কথায় আর মানুষের মধ্যে সাধু-সন্ন্যাসীরা বশীভূত হন প্রণামে। তাই প্রণাম করলাম। বাধা দেয়ার কোন সুযোগই পেলেন না সাধুবাবা। শুধু একটু নড়ে বসলেন। মুখের ভাবটারও যেন সামান্য পরিবর্তন হলো বলে মনে হলো। বললাম,
—বাবা, যদি আপনার কোন আপত্তি থাকে তাহলে আপনাকে বিরক্ত করবো না। প্রসন্নচিত্তে যদি উত্তর দেন তবেই প্রশ্ন করবো কয়েকটা।
এবার মুখ খুললেন সাধুবাবা। গম্ভীরভাবেই বললেন,
—আমার নিজের কোন জ্ঞান নেই। লেখাপড়াও কিছু করিনি। সুতরাং তোর প্রশ্নের উত্তর দেবো কেমন করে?
মুহূর্ত দেরী না করেই বললাম,
—না বাবা, আমার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে কোন স্কুল কলেজে পড়ার দরকার হয় না। আপনি মন থেকে যেটুকু বলবেন তাতেই তৃপ্ত হবে আমার মন।
এবার ভাবটা দেখলাম একটু যেন ভেবে নিলেন। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিলেন আশপাশে, কাছাকাছি কেউ আছে কিনা? হঠাৎ ডুগডুগির আওয়াজ এলো কানে। আমার পিছন দিকে তাকালেন। সাধুবাবার দৃষ্টিকে লক্ষ্য করে তাকালাম আমিও। দেখলাম এক ভাল্লুক খেলাওয়ালা ভাল্লুক নিয়ে যাচ্ছে ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে। এবার সাধুবাবা চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে রাখলেন আমার চোখে। বললেন প্রশান্ত কণ্ঠে,
—কি প্রশ্ন আছে তোর?
এতক্ষণে স্বস্তি এলো মনে, জোর পেলাম। কৌশলটা কাজে লেগেছে। দেরী না করেই বললাম,
—বাবা, শুনেছি সাধু-সন্ন্যাসীরা গৃহত্যাগের বারো বছর পর অত্যন্ত গোপনে একবার তাঁর জন্মভিটে বা ভূমি দর্শন করে আসেন, এটা নাকি নিয়ম। এ-কথা কি ঠিক? সত্যিই কি এর প্রয়োজন আছে? কেন এটা করে থাকেন তাঁরা? ফেলে আসা অতীত তো কালের গর্ভে চলে যায়। তাকে আবার বারো বছর পর টেনে আনেন কেন?
কথাগুলো শুনতে শুনতে মাথাটা একটু নাড়তে লাগলেন। কথা শেষ হতেই পুলকিত মনে সাধুবাবা বললেন,
—এসব ঠিক। তবে বাধ্যতামূলক নিয়ম কিছু নেই যে গৃহত্যাগের পর জন্মভিটে দর্শন করতে যেতেই হবে। সংসার ছেড়ে আসার পরও কিছুকাল ফেলে আসা

সংসারের কথা মনে পড়ে সব সাধু-সন্ন্যাসীদেরই। তারপর যত দিন যায়, ততই বিস্মৃতি আসে সংসারজীবন কথায়। দীর্ঘ বারো বছর এ-জীবনে থাকার পরও যদি বাড়ীর স্মৃতি মাঝেমধ্যে মনকে নাড়া দেয়, তাহলে একবার জন্মভূমি বা ভিটে দর্শন করে আসে সাধু-সন্ন্যাসীরা। গুরু দেহে থাকলে তাঁর অনুমতি নিয়ে যায়, না থাকলে তাঁর অনুমতি দেয়াই থাকে। তবে যাদের ওই সময়ের মধ্যে বাড়ীর টানটা একেবারেই কেটে যায় তারা যায় না। প্রয়োজনও হয় না। টান না কাটলে, সংসারচিন্তা মনকে পীড়া দিলে, অস্থির করে তুললে—একটা প্রার্থনা নিয়েই জন্মভূমি বা ভিটে দর্শন করতে যায় সাধু-সন্ন্যাসীরা।

এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা থামলেন। কৌতূহল সামলাতে না পেরে সঙ্গে সঙ্গেই জানতে চাইলাম,

—বাবা, কি প্রার্থনা নিয়ে সাধু-সন্ন্যাসীরা যান তাঁদের জন্মভিটে দর্শন করতে ?

কথা না বলার ভাবটা সাধুবাবার এখন আর মোটেই নেই। আনন্দিত মনেই বললেন,

—বেটা, বাস্তুদেবতা যদি তাঁর সন্তানের বন্ধন মুক্ত করে না দেন তাহলে তার বন্ধন কাটে না সংসারের। মায়া কাটানো একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে, যতই গৃহত্যাগ করে সাধন ভজন করুক না কেন? ঘুরে ফিরে তাঁর ফেলে আসা সংসারের কথা মনে আসবেই আসবে সাধুজীবনে। কারণ, তুই আমি বা যে কেউ বড় হয়েছি বা জন্মেছি তো তাঁরই কোলে। সুতরাং তাঁর টান থাকবে না তোর উপরে! বেটা, গৃহত্যাগের বারো বছর পরও যদি সংসারকথা মনকে পীড়িত করে তাহলে গোপনে গিয়ে দূর থেকে বাস্তুভিটে দর্শন করে প্রার্থনা করতে হয়, 'হে বাস্তুদেবতা, তোমার কোলেই আমার জন্ম। বড় হয়েছি। এ-ঋণ আমার কোন জন্মেই পরিশোধ্য নয়। তুমি আমার সাংসারিক বন্ধন কাটিয়ে পরমপথের সন্ধান দাও। হে দেবতা, কৃপা করে তুমি মুক্ত করো আমাকে।' ব্যস, এটুকু প্রার্থনাতেই কাজ হয়ে যায়। ধীরে ধীরে বাস্তুদেবতার করুণায় সংসারের মায়া একেবারেই মুছে যায় মন থেকে। অতীতে ফেলে আসা সংসারের সমস্ত টান থেকেই মুক্ত হয় মন। ভজনে আর কোন বিঘ্ন হয় না সংসার বিষয়ক চিন্তায়। বাস্তুদেবতা প্রথমেই যাদের মুক্ত করে দেন তাদের গৃহত্যাগের পর আর জন্মভিটে দর্শনে যেতে হয় না, কারণ মনে সংসারের কোন মায়াই থাকে না তাঁর কৃপায়।

কথাটুকু শেষ হতেই একটা কথা মনে এলো। জানতে চাইলাম,

—বাবা, শাস্ত্রে গুরুকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সাধু-সন্ন্যাসীরাও বলেন গু[illegible]ই সব। তাঁর কৃপাতেই জাগতিক এবং পারমার্থিক সব কিছুই লাভ করা যায়। [illegible]াই যদি সত্য হয় তাহলে গৃহত্যাগের পর সংসারের কোন টান যদি কারও মধ্যে [illegible]স, তাহলে জন্মভিটেতে বাস্তুদেবতার উদ্দেশ্যে না ছুটে গুরুকে ধরে বা গুরু[illegible]ণ করে তাঁর কাছে প্রার্থনা করলেই তো হয়। অত ছুটোছুটির দরকার কি ? [illegible]জ সাধু-সন্ন্যাসীরা যেকোন জায়গায় থেকেই তো করতে পারেন!

আমার খোঁচা মারা প্রশ্নে সাধুবাবা একটু সোজা হয়ে বসে বেশ উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন,

—গুরুকে স্মরণ করে ঘরে বউকে রেখে দরজা বন্ধ করে স্বামী বাইরে শুয়ে থাকলে কি 'বাচ্চা পয়দা' হবে? গুরুর কাছে প্রার্থনায় সুসন্তান লাভ করতে পারে তাঁর কৃপায়। তবে স্বামীকে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করতেই হবে। ফলটা কি হাওয়া থেকে হবে? একটা কথা মনে রাখিস্ বেটা, জগতের সব কিছুই নিয়মের অধীন। তার বাইরে চললে কোন কাজই হবে না।

এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন। কোন প্রশ্ন করলাম না। মুখখানা লক্ষ্য করতে লাগলাম। উত্তেজনার ভাবটা মিলিয়ে গেল সামান্য সময়ের মধ্যেই। অপেক্ষায় রইলাম। এবার যেই আমার মুখের দিকে তাকালেন, অমনি প্রশ্ন করলাম,

—বাবা, দীক্ষিত যারা, তারা ইষ্টমন্ত্র জপ করলে কি হয়? সকলেই বলে ভগবানকে পাওয়া যায়, কিভাবে পাওয়া যায়, কেমন করে আসেন তিনি?

কথাটা শুনে সাধুবাবা যেন বেশ অস্বস্তিবোধ করলেন মনে হলো। কি যেন একটু ভাবলেন। এবার বিরত মুখেই বললেন,

—এসব ধর্মজগতের একান্ত গোপন কথা। বলা নিষিদ্ধ তাই বলবো না।

কথাটা শেষ হতে না হতেই বললাম,

—বাবা, ধর্মের কথা যদি সব গোপনই থাকলো তাহলে ধর্ম নিয়ে এত মাতামাতি কেন? তাহলে আপনিই বা এ-পথে এলেন কেন? সংসারী যারা, তারাই বা ভগবানকে ডাকবে কেন? তাঁর বিষয়ে মানুষ যদি কিছু নাই জানতে পারলো তাহলে কি বিশ্বাসে তারা পথ চলবে, তাঁর উপরে ভরসা করবে? অন্ধকারে হাতড়ালে তো তবু অনেক সময় কিছু হাতে বাধে। এই বিষয়টা যদি সব গোপনই থেকে গেল তাহলে মানুষ আর হাতড়াবে কোথায়?

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে চেয়ে রইলাম সাধুবাবার মুখের দিকে। মনে হলো, আমার কথাগুলোর যৌক্তিকতা উপলব্ধি করলেন সাধুবাবা। চুপ করে রইলেন প্রায় মিনিট পাঁচেক। কি যেন সব ভেবে এবার উত্তর দিলেন সরাসরি প্রশান্ত চিত্তে,

—বেটা, গুরু যে মন্ত্র দেয় সেই মন্ত্রের নামই ইষ্টমন্ত্র। জপ করলে বলবীর্য বাড়ে, কার্যসিদ্ধি আর ইষ্টলাভ হয়। ইষ্টমন্ত্র যদি নির্ভুল এবং মন্ত্র জপের সময় মানসিক উচ্চারণ যদি শুদ্ধ হয়, তাহলে মন্ত্ররূপী সমষ্টিগত শব্দ ক্রমশ রূপ বা আকার ধারণ করে কারণ ওই শব্দরূপী মন্ত্রের মধ্যেই ইষ্টরূপী ভগবান বিরাজ করছেন। ইষ্টমন্ত্র কালী দুর্গা গণেশ বিষ্ণু শিব যে দেবদেবীরই হোক না কেন, জপ ক্রমশ দেহে বসতে থাকলে মন্ত্রের শব্দ (ব্রহ্ম) থেকে ক্রমশ ইষ্টের রূপের ছাপ পড়তে থাকে দেহে। মন্ত্র জপ যত বেশী চলতে থাকবে, ইষ্টের রূপ তত বেশী প্রস্ফুটিত হতে থাকবে। জপ আরও বেশী হতে থাকলে দেহের ভিতরে তখন ইষ্ট জ্যোতির্ময় হতে থাকে। জপ আরও—আরও বেশী হতে থাকলে, ইষ্টনামে বিভোর

হয়ে থাকলে তখন ইষ্টমূর্তি আরও বেশী জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে। প্রথম শুরু থেকে ইষ্টের পূর্ণ জ্যোতির্ময় অবস্থায় আসা পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে একইসঙ্গে মানুষের তমো ও রজোগুণের ক্রিয়া লোপ পেতে থাকে। দেহমন পর্যায়ক্রমে সত্ত্বগুণে ভরপুর হয়ে ওঠে। এবার ইষ্টমন্ত্রের সাধক জ্ঞাননেত্রে ( ভ্রূ-মধ্যে ) ইষ্টের রূপ দর্শন করে থাকে। সাধকের সাধনা যদি আরও কঠোর, আরও জোরদার হয় তবে সাধকের ইচ্ছায় ওই রূপ জ্যোতির্ময় দেহ নিয়ে সাধকের সামনে প্রকটিত হতে পারেন, এমনকি স্থূল রক্তমাংসের দেহ নিয়েও ইষ্ট আবির্ভূত হতে পারেন। তবে বেটা, দেহের ভিতরে এসব কাণ্ডকারখানা চললেও সাধকের বাইরেটা দেখে কিছু বোঝার উপায় থাকে না। এসব সাধক বা ইষ্টনাম জপকারীর একান্ত নিজস্ব ব্যাপার যা নিজেই অনুভব উপলব্ধি করে এবং দেখে। তবে একটা জিনিস যেটা বাইরে থেকে দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায়, সাধকের দেহে ফুটে ওঠে একটা অসাধারণ উজ্জ্বলভাব। দেখলেই মনে হয় যেন চোখ মুখ দিয়ে একটা আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে। এইসময় সাধক বা ইষ্টমন্ত্র জপকারী খুব লোকপ্রিয় হয়ে ওঠে। মন এক অনির্বচনীয় আনন্দময় অবস্থায় ভরে থাকে। ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ায় জাগতিক ভাব রুদ্ধ হয়ে যায়। ফলে সকলেই তার আকর্ষণ অনুভব করে, তাকে ভালো লাগে। যারা তার কাছে আসে, এক অদ্ভুত আনন্দ অনুভব করে তারাও। তবে এখানে একটা কথা আছে বেটা, এই অবস্থায় ইষ্টমন্ত্রের সাধক জপ ছেড়ে দিলে তখন সেই জ্যোতির্ময় রূপ ক্রমশ নিষ্প্রভ হতে থাকবে। সত্ত্বগুণের হ্রাস হয়ে ধীরে ধীরে তমো আর রজোগুণের প্রভাব বাড়তে থাকবে। তারপর আবার একটা সময় আসবে যখন দেহ থেকে একেবারেই মুছে যাবে ইষ্টের ছবি। দেহমন ভরে যাবে তমো আর রজোগুণে। অর্থাৎ যে কে সেই হয়ে যাবে। ইন্দ্রিয়ের সেই পুরনো খেলাই আবার চলতে থাকবে দেহমনে। বুঝলি বেটা, ইষ্টমন্ত্র জপ করলে কি হয়? এটা তোকে বললাম খুব সহজভাবে বোঝানোর জন্যে। এটাই মূল সত্য। তবে এ-বড় কঠিন ও জটিল তত্ত্ব। এটুকু জেনে কাজ করলেই সব হবে, সকলের হবে, তোরও হবে। পরে বুঝতে পারবি, বিষয়রহস্যটা ভেদ হয়ে যাবে। জটিলতা আর কিছুই থাকবে না। এখন যেটা শুনলি, সেটা পরের মুখে ঝাল খাওয়া হলো তোর।

কথাটা শুনে আনন্দে মনটা আমার ভরে গেল। আবেগ সামলাতে না পেরে আবার প্রণাম করলাম পায়ে হাত দিয়ে। এবার আর বাধা দিলেন না সাধুবাবা। কথাগুলো ভালোভাবে হজম করার জন্যে কিছুক্ষণ বসে রইলাম চুপ করে। সাধুবাবাও কোন কথা বলে আমার মনের ভাবটা নষ্ট করলেন না। বেশ কিছুটা সময় কাটলো এইভাবে। মনে মনে এবার তৈরী হয়ে নিয়ে বললাম,

—বাবা, সকলেই বলেন জপ করতে কিন্তু অন্তর্নিহিত বিষয়টা কেউই বলেন না, বলতে চানও না। দয়া করে আপনি বললেন বলে জানতে পারলাম। এরজন্যে কৃতজ্ঞ রইলাম আপনার কাছে। এবার জানতে চাই, সাধু-সন্ন্যাসীদের লক্ষ্যই থাকে তাঁকে লাভ করার। সাধু এবং সন্ন্যাসী উভয়েরই লক্ষ্য এক এবং 'সাধু-সন্ন্যাসী'

কথাটা ব্যবহার করে থাকি প্রায় একই অর্থে। আমার প্রশ্ন, সাধু আর সন্ন্যাসী এই দুটো শব্দের মধ্যে, তাদের কার্যকলাপের মধ্যে, জীবনধারণ আর ধারার মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে?

প্রশ্নটা শুনেই সাধুবাবা বেশ খুশী হলেন বলে মনে হলো। এতটুকু দেরী না করেই উত্তরে বললেন,

—হাঁ বেটা, পার্থক্য আছে বলেই তো সাধু আর সন্ন্যাসী দুটো শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। উভয়ের লক্ষ্য এক তবে পার্থক্য শুধু জীবনধারণে, চলার পথে কিছু বিধিনিয়ম নিষেধের। যারা সন্ন্যাস গ্রহণ করে তাদের 'বিরজাহোম' করতে হয়। আত্মপিণ্ড দান করতে হয় মাথা ন্যাড়া করে হোমের সময়। ভাবটা থাকবে এইরকম, হে পরমাত্মা, এই মুহূর্ত থেকে জাগতিক সমস্ত কামনাবাসনা পরিত্যাগ করে জীবিত থেকেও মৃত হলাম আমি। সংসারের সমস্ত বিষয়ের মৃত্যু হলো আমার। সংসারে আমার বলে কেউ নেই, মৃত্যুর পর পিণ্ডদানের জন্যেও রইলো না কেউ। নিজের পিণ্ড নিজে দিয়ে নিজেই গ্রহণ করলাম। জীবিত থেকেও শেষ করলাম মৃত্যুর পর পারলৌকিক ক্রিয়াদি।

একটু থামলেন সাধুবাবা। এবার গাছে হেলান দিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন,

—বেটা, সন্ন্যাসজীবনের ব্রত যে কি কঠোর কঠিন নির্মম তা কেউ ধারণাই করতে পারবে না। সাধুজীবন হেলায় ফেলায় কাটানো যায় কিন্তু প্রকৃত সন্ন্যাসীর জীবন যে কি তীব্র সংযমের তা তুই কল্পনাও করতে পারবি না। সন্ন্যাসীর ব্রত হবে এইরকম, যা শুনেছি আমার গুরুজীর মুখে। তিনি আমাকে বলেছেন, 'বেটা, আমাদের শাস্ত্র-পুরাণে আছে, এমন সুন্দর এই পৃথিবীর কোলে ভূমিশয্যা থাকতে সন্ন্যাসী বিছানায় শোবে কেন? ভূমিশয্যায় বালিশের কি সত্যিই কোন প্রয়োজন আছে? দুটো হাত দিয়েছেন পরমাত্মা। এই হাতদুটোই প্রয়োজন মেটাবে বালিশের। লজ্জা নিবারণের জন্যে তো রয়েছে গাছের বাকল, বস্ত্রের আর প্রয়োজন কি? যদি একান্তই তা না পাওয়া যায়, রাস্তায় কি কারও ফেলে দেয়া এক টুকরো কাপড়ও কি পড়ে নেই? এ-টুকুও যদি না পাওয়া যায় তাহলে সন্ন্যাসী পরিধান করবে শ্মশানে ফেলে দেয়া মৃতের বস্ত্র। যদি কৌপিন বা বাকল ছাড়া অন্য কোন বস্ত্র পরতে একান্তই ইচ্ছা হয় সন্ন্যাসীর, তাহলে লজ্জা নিবারণ আর দেহের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামান্য বস্ত্রটুকুও ধারণ করা চলবে না অঙ্গে। বেটা পুরাণ বলেছেন, এই বিশ্বসংসারে একমাত্র বৃক্ষই নিঃস্বার্থ নির্বিকারভাবে দান করে তার ফল আর ছায়া। সন্ন্যাসী ক্ষুধার্ত এবং ক্লান্ত হলে ফল আর ছায়া চাইলে কি বৃক্ষ তাকে ফিরিয়ে দেবে? যদি তাও না জোটে তাহলে সন্ন্যাসী ভিক্ষা চাইবে সাতটি বাড়ীতে। একবারের বেশী চাইবে না। অন্নাদি কিছু জুটলে তা গ্রহণ করবে। যা পাবে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ভিক্ষান্ন না জুটলে থাকবে অনাহারে। ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হলে, সহ্য ক্ষমতার বাইরে গেলে তবেই সন্ন্যাসী

কোন গৃহস্থের ফেলে দেয়া উচ্ছিষ্ট অন্ন পরমাত্মাকে নিবেদন করে পরে তা নিজে গ্রহণ করবে আনন্দিত চিত্তে। আগের সঞ্চয় করা কোন খাদ্যগ্রহণ করা চলবে না কখনই। অপর কেউ এনে দিলেও হবে না, প্রাণ রক্ষার্থে খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে নিজেকেই।
এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা একটু থামলেন। অবাক হয়ে শুনছি প্রকৃত সন্ন্যাসীদের জীবন ও কঠোর সংযম নীতির কথা। সাধুবাবা এবার হাতটা নেড়ে বললেন,
—শুধু তাই নয় বেটা, সন্ন্যাসীর ভোজনের জন্য আলাদা কোন পাত্র থাকবে না। পাত্রের কি সত্যিই কোন প্রয়োজন আছে? জন্ম থেকে পরমাত্মার দেয়া হাতদুটোই কি যথেষ্ট নয়? দুহাতের করতল সংযোজিত করে খাদ্য গ্রহণ করবে সন্ন্যাসী। আর পানের জন্য, স্নানের জন্য জল? বেটা, এ-দেশের এ-পৃথিবীর নদীনালা পুষ্করিণী কি শুকিয়ে সব কাঠ হয়ে গেছে, হয়ে গেছে কি মরুভূমি? তা যদি না হয়ে থাকে তাহলে প্রকৃতি জীবনধারণের জন্য যা দিয়েছেন তার থেকে আর বেশী কি প্রয়োজন?
কথাগুলো শুনছি আর বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ছি। এখন কোনদিকেই মন নেই আমার। স্থির হয়েই শুনছি সাধুবাবার কথা। তিনি বলে চলেছেন তাঁর গুরুদেবের মুখনিঃসৃত শাস্ত্রে সন্ন্যাসীর প্রকৃত সংজ্ঞার কথা।
—বেটা, সন্ন্যাস নিলে আশ্রয়হীন হয়ে সর্বত্রই ঘুরে বেড়াতে হবে সন্ন্যাসীকে। থাকতে হবে একাকী, কারও আশ্রয় গ্রহণ করে নয়। একরাতের বেশী কোন গ্রামেই থাকার অধিকার থাকবে না সন্ন্যাস গ্রহণের নিয়মানুসারে। যদি মনে করে একটু আশ্রয়ের প্রয়োজন, পাহাড়ের গুহাই হবে তার আশ্রয়। এরও যদি অমিল হয়, বন্ধ হয়ে থাকে তাহলে নিজহাতে নির্মাণ করা লতাপাতার কুটিরে সে আশ্রয় নিতে পারে। বেটা, দেহের কোন মলিনতাই দূর করার কোন অধিকার নেই কোন সন্ন্যাসীরই। সন্ন্যাসগ্রহণের পর সন্ন্যাসী শারীরিক সুস্থতা আর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে কাটতে পারবে না চুল নখ দাড়ি। দেহকে রক্ষা করার জন্যে তো পরমাত্মা আছেন। তাঁর চিন্তা ছাড়া জগতের আর কোন বিষয়ে মন বা ধ্যান দেবার প্রয়োজন আছে কি কোন সন্ন্যাসীর? কমণ্ডলু আর একটি দণ্ড ছাড়া জাগতিক সমস্ত কিছুই পরিত্যাগ করবে সন্ন্যাসী, শুধুমাত্র জীবন বিপন্ন না হলে। সমস্ত ঋতুতেই স্নান করবে তিনবার—সকাল, দুপুর, সন্ধ্যায়। শীতকালে হিমশীতল বায়ু, গ্রীষ্মকালে প্রখর তাপদগ্ধ রোদ আর বর্ষাকালে জলধারা বয়ে যাবে দেহের উপর দিয়ে। এ-সবই সহ্য করতে হবে নির্বিকার চিত্তে। কোন কথা বললে তা সর্বদাই সত্য বলবে। মানুষ মনে বিন্দুমাত্র দুঃখ পায় এমন কোন বাক্য প্রয়োগ এবং আচরণ সন্ন্যাসী কখনও করবে না। মৌনতাই মানুষের কথার সাজা, জাগতিক সমস্ত বিষয়ে অনিচ্ছা প্রকাশই হলো দেহের সাজা আর চিত্তের সাজা হলো প্রাণায়াম। এই তিনটি সাজা যে নিজেকে দিতে পারবে না, তার কোন অধিকারই নেই সন্ন্যাসী হওয়ার। সন্ন্যাসীকে হতে হবে অনাসক্ত, জিতেন্দ্রিয়। পরিভ্রমণ করবে আত্মানন্দে আনন্দিত হয়ে। বেটা, সন্ন্যাসীকে শুধু ইহলোকই নয়, পরলোক বিষয়েও হতে

হবে আসক্তিহীন, বিরত থাকতে হবে জগতের সমস্ত ভোগ্যবস্তু থেকে। অতি ক্ষুদ্র কামনা থেকে মুক্ত হয়ে, আত্মার মধ্যেই পরমানন্দ, সমস্ত জীবের মধ্যেই ব্রহ্ম অর্থাৎ আমার মধ্যে যিনি সকলের মধ্যেই তিনি, এই বিশ্বসংসার আত্মতত্ত্বেও অবস্থানরত, আকাশে চাঁদ উঠলে বিভিন্ন জলপাত্রে ও জলাশয়ে যেমন প্রতিবিম্বিত হয় বিভিন্নরূপে তেমন একই আত্মা বর্তমান আছেন সর্বভূতে ও আত্মমধ্যে—এমন ভাবনায় ভাবিত হয়ে, কারও প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ তো নয়ই বরং সমদর্শী এবং নারায়ণমনা হয়ে নির্বিকার নির্লিপ্তচিত্তে যিনি চলেন—তিনিই সন্ন্যাসী। বেটা, এক কথায় জাগতিক সমস্ত কিছু ত্যাগের নামই সন্ন্যাস।

এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা থামলেন। হালকা হাসি ফুটে উঠলো সারা মুখখানায়। এ-হাসির মধ্যে কেমন যেন রয়েছে একটা প্রচ্ছন্ন রহস্য। প্রকৃত সন্ন্যাসীর কঠোরতার জীবন সম্পর্কে ভেবে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। একটা কথাও সরলো না মুখ থেকে। সাধুবাবাও চুপ করে রইলেন। এমনভাবে কাটলো প্রায় মিনিটপাঁচেক। তারপর সাধুবাবাই বললেন,

—বুঝলি বেটা, সন্ন্যাসী কে আর সন্ন্যাস জীবনটাই বা কি? এবার তুই সারা ভারতের সমস্ত মঠ মন্দির আশ্রম খুঁজে দেখতো. শাস্ত্রের এই নিয়মে চলা কয়েকটা সন্ন্যাসীকেও পাস কি না? মাথা ন্যাড়া করে গেরুয়া পরে যদি সন্ন্যাসী হওয়া যেতো তাহলে আর কোন ভাবনা ছিল না।

সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, আপনি কি তাহলে বলতে চান, আমাদের দেশে এমন কঠোরব্রত পালন করা সন্ন্যাসী মোটেই নেই?

একটু গম্ভীরভাবেই বললেন,

—একেবারে নেই একথা বলার মতো ধৃষ্টতা আমার নেই। থাকলেও থাকতে পারে তবে আমার অন্তত দেখা নেই।

আবার খানিক থেমে বলতে শুরু করলেন,

—বেটা, এমন কঠোরতা সাধুজীবনে নেই। সংযমে থেকে সৎভাবে জীবনযাপন করে যিনি নিষ্ঠার সঙ্গে ভগবানের ভজনা করেন, যিনি তাঁর শরণাগত, এক কথায় বলতে পারিস্ তিনিই সাধু। সে সংসারে থাকুক কিংবা সংসার ছেড়েই থাকুক, তাঁকে সাধু বলেই জানবি। তবে প্রকৃত সাধু কে তা বাইরের মূর্তি দেখে না তুই চিনতে পারবি, না আমি। সাধুকে চিনতে হলে, সাধুকে জানতে হলে নিজেকেও সাধু হতে হবে। নদীর উপরটা দেখলে বোঝা যাবে না নদী কতটা গভীর আর তলদেশটা কেমন? তা জানতে হলে ডুবুরী হতে হবে বুঝলি?

সাধুবাবা আরও বললেন,

—বেটা, আমি তো সাধুপদবাচ্যই নই। তবুও গুরু কৃপায় এই বয়েসে বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণকালীন এমন সব শক্তিধর মহাত্মা দেখেছি, যাদের শক্তি ত্যাগ তিতিক্ষা আর সংযমের কথা তুই কল্পনাও করতে পারবি না কখনও। দেখে তাঁদের বিন্দুমাত্র

বোঝার উপায় নেই নিজেরা ধরা না দিলে, অথচ তাঁরা শাস্ত্রীয় নিয়মমানা সন্ন্যাসী নয় কেউই। এঁরা সব 'আচ্ছা আচ্ছা' মহাত্মা। সর্ববোধ আর বন্ধনের ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন এঁরা। বলতে পারিস্ 'সাধু-সন্ন্যাসী' এসব কোন সংজ্ঞাই খাটে না এঁদের জীবনে।

মহাত্মার কথা বলতে আমার কৌতূহল হলো। বললাম,

—বাবা শক্তিধর কয়েকজন মহাত্মার কথা বলুন না, যাঁদের শক্তির পরিচয় পেয়েছেন আপনি নিজে।

সাধুবাবা বেশ খুশী খুশী ভাব নিয়ে বললেন,

—শুনবি ? শুনলে বলতে পারি তবে তোর বিশ্বাস হবে না। মনে হবে সব 'ঝুট'।

কোন উত্তর দিলাম না আমি। সাধুবাবা নড়ে চড়ে বসলেন। একবার গভীরভাবে দেখলেন আমার মুখের দিকে। এ-দৃষ্টি যেন সমস্ত কিছু ভেদ করে একেবারে অন্তরে গিয়ে আঘাত করলো মনে হলো। স্থির হয়েই বসে রইলাম। তিনি বললেন,

—বলি শোন, একবার তীর্থভ্রমণ করতে করতে গেছি কাশীতে। সেটাই আমার জীবনের প্রথম কাশীতে যাওয়া। কিছুদিন ছিলামও সেখানে। তৈলঙ্গ স্বামীর আশ্রম আছে মণিকর্ণিকা ঘাটের পাশে। একদিন সেই আশ্রম দর্শন করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম ঘাটে। তখনও সন্ধ্যা হয়নি। একটু বাকি আছে। হালকা অন্ধকার নেমে এসেছে চারদিকে। ভ্রমণকারীদের অনেকেই গঙ্গার বুকে ঘুরছে নৌকোয় করে। ঘাটের পাশেই শ্মশান। আগেই ভেবেছি, ঘাটের পাড় ধরে ধরেই চলে আসবো দশাশ্বমেধ ঘাটে। অনেকটা সময় বাঁচবে, তাড়াতাড়িও হবে। এই ভেবে শ্মশানের পাশ দিয়ে চলতে গিয়ে দেখলাম, একজন বৃদ্ধ সাধুবাবা বসে আছেন শ্মশানের একধারে। শতচ্ছিন্ন একটা ন্যাকড়া পরা। গায়ে ভর্তি ময়লা। চুলগুলো উস্কো-খুস্কো। কালো দোহারা চেহারা। পাগল বলেই মনে হলো আমার। বিড়বিড় করে কি যেন বকছে অনেক পাগল যেমন বকে। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকালাম সেই বৃদ্ধের মুখের দিকে। একইসঙ্গে তাকালেন তিনিও। একেবারে চোখাচোখি হয়ে গেল। ইসারায় বৃদ্ধ কাছে ডাকলেন। প্রায় নির্জন শ্মশান। কোন শ্মশানযাত্রী নেই। কয়েকটা নিভে যাওয়া চিতে থেকে হালকা ধোঁয়া উঠছে। বোঝা গেল, কিছুক্ষণ আগেই কেউ স্বজনকে ছাই করে দিয়ে চলে গেছে জল ঢেলে দিয়ে। কয়েকজন বসে আছে শ্মশান থেকে কিছুটা দূরে। বৃদ্ধ ডাকতেই এগিয়ে গেলাম কাছে। তাকালেন আমার মুখের দিকে। বসতে বললেন ইসারায়। কোন কথা না বলে বসলাম উবু হয়ে। এবার আমাকে বললেন,

—তোর কাছে একটু গাঁজা হবে ?

বৃদ্ধকে দেখে আমার একদমই ভক্তি হলো না। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বললাম,

—আছে।

তখন বৃদ্ধ একটু অনুরোধের সুরেই বললেন,

—আমাকে একটু সেজে দেনা, অনেকক্ষণ খাইনি। দে, তোর ভালো হবে। সাধু হয়েছিস্ তোর সিদ্ধিলাভ হবে। স্বামীজীর আশ্রম দর্শন করে এলি বুঝি ?
এবার সরাসরি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,
—বেটা, সেই বৃদ্ধের মাত্রকয়েকটা কথায় একেবারে চমকে উঠলাম। বৃদ্ধ বসে রয়েছেন শ্মশানে, আর আমি যে তৈলঙ্গ স্বামীজীর মন্দির দর্শনে গেছিলাম তা ইনি জানলেন কি করে ? আবার একটু আনন্দও হলো সিদ্ধিলাভের কথা শুনে। এসব কথা আমার মনকে একটু ধাক্কা দিলেও মনটাই কেমন যেন কোন গুরুত্বই দিল না কথাটার। ঝুলি থেকে গাঁজা আর কল্কেটা বের করলাম। তারপর তা সাজতে লাগলাম ধীরে ধীরে। বৃদ্ধ এবার বললেন,
—বেটা, মানুষকে কখনও অবহেলা করতে নেই। সাধুজীবনে এসে মানুষকে অবহেলা করলে তো ভগবানের সান্নিধ্যেই পৌঁছাতে পারবি না কখনও। 'মেরা প্যারে' বেটা, তুই এত বোকা কেন ? ভগবান কি মন্দিরে বসে থাকে ফল মিষ্টি খাওয়ার জন্যে ? তিনি তো রয়েছেন তোর আমার আর সকল মানুষের সঙ্গেই।
বৃদ্ধের কথা শুনে আমার মনে হলো, এসব জ্ঞানের কথা আমার আগেও শোনা আছে তাই আর পাত্তা দিলাম না তাঁর কথায়। গাঁজা সেজে কল্কেটা দিলাম বৃদ্ধের হাতে। তিনি বললেন,
—বেটা, তুই আগুনটা একটু দিয়ে দে।
এবার কল্কেটা ধরলেন মুখে। চারদিক অন্ধকার হয়ে গেলেও কাছাকাছি বসে আছি আমরা দুজনে। দেখতে পাচ্ছি একে অপরকে। আমি গাঁজায় আগুন ধরিয়ে দিলাম। তিনি কয়েকটা লম্বা টান দিয়ে কল্কেটা ফিরিয়ে দিলেন আমার হাতে। আমি সেটা নিতেই বৃদ্ধ এবার ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন মুখ থেকে।
এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা থামলেন। কেটে গেল মিনিটখানেক। আর কোন কথা বলছেন না দেখে কৌতূহলী হয়ে বললাম,
—তারপর কি হলো বাবা ?
একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে সাধুবাবা বললেন,
—তারপর যেটা হলো সেটা শুনলে তোর বিশ্বাসই হবে না। নিজের চোখ দুটোকে আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারি না আজও। তবুও বলি শোন। তারপর সেই ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তিনি ধোঁয়ার সঙ্গেই মিলিয়ে গেলেন আমার চোখের সামনে। আমি আর ভাববো কি, বোকার মতো হাঁ করে একাই বসে রইলাম শ্মশানঘাটে। এইভাবে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর যখন সম্বিৎ ফিরে এলো তখন দেখলাম চারদিক অন্ধকারে ডুবে গেছে। উঠে পড়লাম শ্মশান থেকে। আমার উপর সেই মহাত্মার অযাচিত কৃপা আর সিদ্ধিলাভের আশীর্বাদের কথা ভাবতে ভাবতে চলে এলাম দশাশ্বমেধ ঘাটে।
অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা, এটা কিভাবে এবং কেমন করে সম্ভব হলো ?

সাধুবাবা প্রসন্ন মনেই বললেন,

—বেটা, সাধারণ মানুষের জীবনেও কখনও কখনও এমন অযাচিত কৃপা মেলে অনেক বড় বড় মহাত্মার। ওই বৃদ্ধ যে এত বড় মহাত্মা ছিলেন তা প্রথমে আমি কল্পনাও করতে পারিনি। যত্নের অভাবে হারানোর পর যেমন খোঁজ পড়ে হারানো মাণিকের, তেমন দশাই তখন আমার হলো। আর এটা করা সম্ভব হয়েছে হটযোগের মাধ্যমে। এই যোগে সিদ্ধসাধক চিন্তামাত্র যেখানে খুশী সেখানেই যেতে পারেন। খুব খু-উ-ব কঠিন এ-সাধনা। এমন মহাত্মার দর্শন এযুগে খুব কমই পাওয়া যায়।

এই পর্যন্ত কথার পর আমরা দুজনেই চুপ করে বসে রইলাম মিনিটপাঁচেক। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে বললাম,

—সাধুজীবনে আসার পর এমন কোন আনন্দ বা দুঃখদায়ক ঘটনা কি কখনও ঘটেছে. যা সারাজীবনই আপনার মনে রাখার মতো?

কথাটা শোনামাত্র মুখখানা একেবারে অন্ধকার হয়ে এলো সাধুবাবার। আগের ভাবটা মিলিয়ে গেল পলকে। এদিক ওদিকে চোখদুটোকে একবার ঘোরালেন। শূন্য-দৃষ্টি। মুখ দেখে মনে হলো, এতটুকু না ভেবেই বলতে শুরু করলেন মাথাটা নাড়িয়ে,

—হাঁ বেটা, একটা দুঃখদায়ক ঘটনার কথা মনে থাকবে আমার সারাজীবনই। তখন সবে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়েছি। কিছুদিন এ-তীর্থ সে-তীর্থ করে পরে সোজা গেলাম কেদার বদরী যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী আর গোমুখ দর্শন করতে। এসব তীর্থ আমি হরিদ্বার থেকে পায়ে হেঁটেই করেছি। উত্তরাখণ্ডের তীর্থে যখন যাই তখন একটা সংকল্প করেছিলাম মনে মনে। সেই মতো দুটো তামার ছোট ঘট কিনে নিয়ে যাই হরিদ্বার থেকে। তারপর ফেরার সময় গোমুখ থেকে গঙ্গাজল ভরে মুখটা ভালো করে এঁটে দিলাম। এবার ঘট দুটোর গলায় দড়ি বেঁধে কাঁধের উপর দিয়ে ফেলে একটা পিছনে আর একটা সামনে, এইভাবে গোমুখ থেকে অন্যান্য ধামগুলো দর্শন করে শুরু করলাম যাত্রা। সংকল্প ছিল পায়ে হেঁটে গোমুখ থেকে জল নিয়ে যাবো রামেশ্বরে, ঢালবো রামেশ্বর মহাদেবের মাথায়। শুরু হলো আমার পথ চলা। পথে যখন যেখানে যা পেতাম তাই খেতাম। যেখানে রাত হতো সেখানেই এলিয়ে দিতাম দেহটাকে। কোন কোনদিন আধপেট, কোনদিন ভরপেট আহার জুটতো। কারও কাছে ভিক্ষা চাইতাম না। এইভাবেই চলতে লাগলাম গোমুখ থেকে রামেশ্বরের পথে।

এক নিঃশ্বাসেই কথাগুলো বললেন। থামলেন কিছুক্ষণ। তারপর আবার বলতে লাগলেন,

—এইভাবে দিনের পর দিন চলতে চলতে একদিন চলে এলাম মাদ্রাজে। চলছি আপন মনে শহরের পথ ধরে। হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এলো একটা পুলিশ। কোন কথা নেই মুখে। হাতের লম্বা বাঁশের লাঠিটা দিয়ে সমানে মারতে শুরু করলো আমাকে। সে যে কি মার তা তোর ধারণাতেই আসবে না। গায়ের সমস্ত শক্তি

উজাড় করে মারতে থাকলো আমাকে। মারের চোটে গঙ্গাজলের ঘটদুটো নিয়ে আমি লুটিয়ে পড়লাম মাটিতে। তবুও মারের বিরাম নেই। এই মার আর আমার আর্তনাদ শুনে ছুটে এলো পথচারীরা। সকলে মিলে ঠেকালো পুলিশকে। তখন আমি ওঠার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। কয়েকজন ধরে তুললো আমাকে। জিজ্ঞাসা করলো আমার অপরাধটা কি? হিন্দিতেই বললাম কোন অপরাধ আমি করিনি। গোমুখ থেকে গঙ্গাজল নিয়ে পায়ে হেঁটে যাচ্ছি রামেশ্বরে। হঠাৎই পুলিশটা আমাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এলো। তারপর যা হলো তা তো আপনারা নিজের চোখেই দেখলেন। আমার হিন্দি কথা বুঝলো একজনই। আর কেউ বুঝলো না কারণ ওখানে যারা ছিল তারা কেউই হিন্দি জানে না। এবার হিন্দি জানা লোকটি মাদ্রাজী ভাষায় পুলিশ এবং আর সকলকে বললো আমার কথা। সকলে শোনার পর পুলিশটাকে জিজ্ঞাসা করল আমার অপরাধ কি এবং কেন মারা হলো আমাকে? তাতে পুলিশ যা বলেছিল তার মূল কথা হলো, আমারই মতো দেখতে একটা চোর আছে ওই এলাকায়। প্রায়ই সে চুরি করে। পুলিশ তাকে ধরতে পারছে না। আমাকে সেই চোর ভেবেই সে মেরেছে। বিনা অপরাধে এইভাবে মারার জন্য আমার কাছে ক্ষমাটুকুও পর্যন্ত চাইলো না। তারপর আমার সেই পীড়িত দেহটাকে বয়ে নিয়ে একদিন পৌঁছে গেলাম রামেশ্বর মন্দিরে।

এই পর্যন্ত বলে আবার থামলেন। এমন অত্যাচারের কথা শুনে আমার নিজেরই খুব খারাপ লাগলো। সাধুবাবাও কেমন যেন একটু গুম মেরে বসে রইলেন। মুখ দেখে মনে হলো, অতীতের সেই মারের ব্যথা যেন এইমুহূর্তে কাতর করে দিয়েছে সাধুবাবার সারাদেহটাকে। খানিক পরে সাধুবাবা বললেন,

—গোমুখের জল চড়ালাম রামেশ্বর মহাদেবের মাথায়। তারপর মন্দিরে দাঁড়িয়ে আমার কষ্টের কথা জানিয়ে শুধু বললাম, 'বাবা, কি অপরাধ করেছি আমি যে পথে এমন করে তুমি মারলে? তোমার কাছে আসাটাই কি অপরাধ হয়েছে?' এইভাবেই আমার কষ্টের কথা জানালাম ভগবানকে।

এবার এক অদ্ভুতস্বরে, উদ্দীপ্তকণ্ঠে সাধুবাবা বললেন,

—বেটা, ভগবান যদি সত্য হয়, তাহলে এতদিনে ওই পুলিশের বংশে বাতি দেয়ার মতো আর কেউ আছে বলে আমার মনে হয় না।

কথাটা শুনে একেবারে চমকে উঠলাম। ভাবলাম, এতবড় একটা অভিশাপ দিলেন সাধুবাবা। এটুকু ভাবামাত্রই তিনি বললেন,

—বেটা, অভিশাপ আমি কাউকে দিই না, দিইনি কখনও। আমার দেহমন গুরুতে নিবেদিত। বিনা অপরাধে যে আঘাত ও আমাকে করেছে তাতে এই ক্ষুদ্র সাজাটুকুই ওর প্রাপ্য হওয়া উচিত বলে মনে হয় বলেই ওই কথাটা বললাম।

এরপর আমি আর ওই প্রসঙ্গে গেলাম না। এই ভাবটা কাটিয়ে উঠতে সময় কেটে গেল অনেকটা। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, এখন আপনার বয়েস কত? এ-পথে এলেনই বা কেমন করে?

এ-প্রশ্নে বিরত হলেন বলে মনে হলো না। সহজ স্বাভাবিকভাবেই বললেন,

—বেটা, যে জীবনটার মৃত্যু হয়েছে সেই জীবনের কথা এই জীবনে বলা নিষিদ্ধ বলেই সাধু-সন্ন্যাসীদের পূর্বাশ্রমের কথা বলতে নেই। এতে মনের ভাব নষ্ট হয়। চিত্তের চাঞ্চল্য বাড়ে। ভজনে বিঘ্ন হয়। সংসারের সুখ-দুঃখের কথা বলামাত্রই তা মন ও বুদ্ধির উপর ক্রিয়া করে কথাগুলো। তাই বলতে নেই।

সঙ্গে সঙ্গেই বললাম,

—আমি তো আপনার কাছে ফেলে আসা সংসারের সুখ বা দুঃখের কোন কথাই জানতে চাইছি না। জানতে চাইছি, এ-পথে এলেন কেমন করে?

কথাটা এবার ধরতে পেরেছেন। সাধুবাবা সামান্য কোঁচকালেন তাঁর ভ্রূ-দুটো। তারপর বললেন,

—বেটা, অল্প বয়েস থেকেই আমার নেশা ছিল তাসখেলা। দেশে থাকতে দিনের বেলায় নিজেদের ক্ষেত মজুরদের দেখাশুনা করতাম। আর সন্ধ্যের পর কয়েকজন বন্ধু মিলে তাস খেলতাম। এই খেলায় যত ভালোই খেলতাম আমি, জিততাম খুব কম সময়েই। খেলায় তো হারজিত হয়ই, তাই কিছু মনে করতাম না। তখন আমার বয়েস ২২/২৩ হবে। দিনটা রামনবমী। ক্ষেতে যাইনি। দুপুরবেলা। খাওয়া-দাওয়া সেরে তাস খেলতে বসেছি চার বন্ধুতে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। এই সময়ের মধ্যে খেলায় একবারও জিততে পারলাম না আমি। বার বার হেরে গেলাম। ফলে, আমাকে অবজ্ঞাসূচক কথা বলতে লাগলো বন্ধুরা মিলে। হেরে গেলে ইয়ার্কি'র ছলে এমনটা সবাই করে, আমিও করেছি অনেকের সঙ্গে অনেক বারই। সেদিন হঠাৎ একটা ধাক্কা লাগলো মনে। ভাবলাম, শালা যতবার খেলি ততবারই হেরে যাই। আর খেলবো না। হাতের তাসগুলো বন্ধুদের সামনে রাগ করে ফেলে দিয়ে মনে মনে ভাবলাম, এ-খেলায় হারজিতে কোন লাভ নেই। আমি ভগবান বিষয়ে বা সাধনভজনে কোনদিনই কোনও আকর্ষণ অনুভব করিনি, এসব বিষয়ে বিন্দুমাত্র কিছু ভাবতামও না কখনও। সেদিনই হঠাৎ মাথায় এলো, সংসারে থাকলে যখনই কোন আশায় আমি বঞ্চিত হবো তখনই সৃষ্টি হবে এক অসহ্য মানসিক কষ্টের। এসব কথা মুহূর্তের মধ্যে আমার মনকে একেবারে গ্রাস করে ফেললো। উঠে দাঁড়ালাম খেলা ছেড়ে। ভাবলাম তাসখেলায় নয়, যদি জিততে হয়তো ভগবানকেই জিতবো। ভাবামাত্রই কাউকে কিছু বললাম না। চুপচাপ বেরিয়ে পড়লাম বাড়ী থেকে। ব্যস, আর আমি বাড়ী যাইনি কখনও। সেই থেকে পথই আমার পরমানন্দময় আশ্রয়। আর অযাচিত অন্নই রক্ষা করে চলেছে এই দেহটাকে।

সাধুবাবার গৃহত্যাগের কাহিনী শুনে বিস্মিত হয়ে গেলাম। ভাবলাম, মনের কখন যে কার কি অবস্থা হয়ে যায় তা বোঝার বা ভাবার অবকাশ থাকে না কারও। সামান্য ব্যাপার বা কথা থেকে মানুষের জীবনপথের সাধারণ গতির পরিবর্তন হয়ে চলতে থাকে একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হয়ে। এ-যে কি করে হয়, কেমন করে হয়

তা আজও বুঝে উঠতে পারিনি আমি। তবে এ-যে হয় তা তো দেখতে পাচ্ছি নিজের চোখে অবিশ্বাস্যভাবে। দেখেছি আগেও, অনেকই। তাই এসব কথা এই মুহূর্তে ভেবে আর অকারণ সময় নষ্ট করলাম না। তাহলে অন্য কথা বাদ পড়ে যাবে, জানা যাবে না। এবার জানতে চাইলাম,

—বাড়ীতে আপনার কে কে আছেন, এখন বয়েসই বা চলছে কত?

উত্তর দিলেন সহজভাবেই,

—গৃহত্যাগের সময় বাড়ীতে মা-বাবা ভাই-বোন সকলেই ছিল। 'সাধি-উধি' কিছু করিনি আমি। এখন বয়েস আমার ৪৫ থেকে ৪৮ মতো হবে, এই রকমই। ঠিক ঠিক বলতে পারবো না বেটা।

আবার প্রশ্ন করতে যাবো, সাধুবাবা হাতের ইসারায় বাধা দিয়ে বললেন,

—বেটা, সংসারে যতদিন থাকবি ততদিন কোন বিষয়ে হা-হুতাশ করবি না কখনও। আমাদের কি এমন উপাদান আছে যে আফশোস করতে হবে বা ঠকার ভয় আছে। একটু ভেবে দ্যাখ, তোর আমার কিছুই নেই। তুই যখন দেখবি তোর একটা কিছু গুণ বা কোন কিছু আছে, তখন একটু খোঁজ নিলেই দেখতে পাবি, তোর যা আছে তার চেয়ে অনেক বেশী আছে আর একজনের। এবার তার যা আছে, খোঁজ করলে দেখবি, তার থেকেও অনেক অ-নে-ক বেশী আছে আর একজনের। এইভাবে তুই যদি দেখতে দেখতে যাস্, তাহলে একসময় দেখতে পাবি, অন্যের যা আছে তাদের তুলনায় তোর যা আছে তা ছিটে ফোঁটাও নয়। তার মানে বলতে পারিস্, তোর কিছুই নেই। তাই যখন নেই, তখন আফশোস বা অহংকারের কি আছে আর হারিয়ে যাওয়া বা হেরে যাওয়ার ভয়টাই করবি কেন? আর একটা কথা মনে রাখবি, মানুষের অতি মূল্যবান সময় নষ্ট করে দেয় নেশা। যেকোন নেশা সব সময়েই পরিত্যাগ করবি। অতিমাত্রায় ধর্মের প্রতিও নেশা ভালো নয় বেটা। সেটা তামসিক ধর্মের পর্যায় পড়ে। ঠিক ঠিক ভাবে এগোনো যায় নিয়মে চললে। পৃথিবীতে একটা জিনিস বড়ই দুর্লভ, তা হলো মানুষের কাছে মানুষের উৎকৃষ্ট বাক্য পাওয়া। এই দুর্লভ বস্তুলাভের জন্যে ভালো মানুষের সঙ্গ করবি। জীবনে এমন কোন দিনও তো তাঁর কৃপায় আসতে পারে, একটা বাক্যের জন্যে জগতের সমস্ত বন্ধন তোর মুহূর্তে ছিন্ন হয়ে পরমাগতি লাভ হতে পারে। মানুষ সারাদিন তাঁকে ব্যতিরেকে যেসব কথা বলে তা জানবি সব কু-কথা। তাঁর কথাই হলো সু-কথা।

এবার সাধুবাবা চোখদুটো বুজে বলতে লাগলেন আবেগ ভরা সুরে,

—বেটা, স্ত্রী বশে না থাকলে সংসারজীবন যেমন সুখের হয় না, তেমনই কাম আর ভোগবাসনা বশে না থাকলে ঈশ্বরলাভ হয় না। সংসারে আছিস্, দানটা করে যাস্। সকলের প্রতি, সকল জীবের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ হলো একমাত্র উৎকৃষ্ট দান। এ-দানে অর্থ খরচ হয় না। এ-দানে মন পবিত্র, উন্নত হয়। বেটা, নিয়মের স্বভাবকে জয় করতে পারলেই সংসারবাসনা ত্যাগ হবে।

সাধুবাবার কথাগুলো শুনতে লাগলাম মোহিত হয়ে। কথায় কোন কথা বলে

অযথা কথা বাড়ালাম না। এবার বললেন,
—বেটা, আমাদের এই দেহটা জানবি বিষেভরা একটা বড় পাত্র। গুরু হলেন অনন্তকালের অমৃতের খনি। শুধু মাথাটা দিলে যদি গুরু পাওয়া যায়, জানবি অমৃতের খনি পেয়েছিস্, ইহকাল পরকালের সব পেয়েছিস্ একেবারে বিনা খাটনিতে।
এবার কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক রকমের অথচ আস্তে করে কানের কাছে মুখখানা এনে বললেন,
—আর জানবি খুব সস্তায়ই তা পেয়েছিস্।
এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা তাড়া দিয়ে বললেন বেশ আদরের সুরে,
—যা বেটা, যা যা—অনেক কথা হয়েছে, এবার কাজে যা। এখন আমিও উঠবো।
কোন কথা বললাম না। নির্বাক হয়ে প্রণাম করলাম। এবার মাথায় হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন সাধুবাবা। মুখে কিছু বললেন না। সোজা উঠে এসে দাঁড়ালাম অটোরিক্সার সামনে, যেখানে এসে নেমেছিলাম। ভাবতে লাগলাম সাধুবাবার কথা, দেখতে লাগলাম বিরক্তিতে ভরা কয়েকজন সহযাত্রীর মুখ। বড্ড দেরী হয়ে গেছে।

সুদামা মন্দির থেকে এলাম ভারত মন্দিরে। ভিতরে ঢুকতেই দেখলাম বাঁধানো রাস্তার দুপাশে সাজানো বাগান। বারান্দাযুক্ত বিশাল একটা ঘর। ভিতরে চোখে পড়লো একটি বেদীর উপরে ভারতের সুবিশাল একটি মানচিত্র সিমেণ্ট বালি দিয়ে নির্মিত। ঘরে রয়েছে বেশ চওড়া কিছু স্তম্ভ। তার গায়ে শিবাজী, তুলসীদাস, বাল্মীকি, স্বামী রামদাস প্রমুখ চিরস্মরণীয় ব্যক্তিদের সিমেণ্টে তৈরী মূর্তি। চার দেয়ালে আঁকা রয়েছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের দর্শনীয় কিছু মন্দির। যেমন উড়িষ্যার জগন্নাথদেবের মন্দির, কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল প্রভৃতি। তেমন আকর্ষণীয় কিছু নেই। এ-গুলি ভ্রমণসূচীতে স্থান পায় শুধু সময় কাটানোর জন্যে।
এখান থেকে মিনিট পাঁচেকের পথ। অটো এলো পোরবন্দরের 'রকোড়িয়া হনুমান' মন্দিরের সামনে। নানা গাছে ঘেরা মন্দির প্রাঙ্গণ। সুন্দর বাগানের মধ্যে দোতলা মন্দির। একতলায় রয়েছে সিঁদুর রাঙানো বিশাল হনুমানজীর মূর্তি। এই মন্দিরে একটি জলপাত্রে ভাসছে দশ কিলো ওজনের একটি বড় পাথরের টুকরো। হাত দিয়ে তুলে আবার ছেড়ে দিলাম জলে। দেখলাম, সত্যিই জলে ভাসে পাথর।
সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম দোতলায়। মন্দিরমধ্যে সুন্দর সাজানো তিনটি মূর্তি—রাম লক্ষ্মণ সীতা। মূর্তিগুলি সব পাথরের। নেমে এলাম নীচে।
হনুমান মন্দির থেকে অটো ছাড়লো। টানা পেরিয়ে এলাম ৪ কি. মি. পথ। এসে থামলো সমুদ্রের মনোরম বেলাভূমিতে। পোরবন্দরকে কাঁখে রেখে বয়ে চলেছে আরব সাগর। রইলাম সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তারপর আবার ফিরে এলাম স্টেশনের কাছে গেস্ট হাউসে

জানুয়ারী মাস। তবে এখন মোটেই ঠাণ্ডা নেই এই পোরবন্দরে। চারদিক অন্ধকার। আগেই বলা ছিল তাই বাস এসে হাজির হয়েছে ভোর রাতে ঠিক চারটেয়। ভ্রমণরত সংসারের বত্রিশ সদস্যকে নিয়ে বাস ছাড়লো পাঁচটায়। বাসের হেডলাইটে দেখতে পাচ্ছি রাস্তা যেন নিটোল যৌবনে ভরা। এতটুকু টোল খায়নি কোথাও। চললো হু-হু করে।

আমরা আজকে চলেছি বাসে—প্রভাসে। যাওয়া যায় ট্রেনেও। আমেদাবাদ থেকে ট্রেন ছাড়ে রাতে, সোমনাথ মেল। ভোরে পেঁছায় ভেরাবল স্টেশনে। তারপর স্টেশন থেকে মাত্র ৮ কি. মি. পথ সোমনাথ। এর কাছেই প্রভাস তীর্থ। স্টেশন থেকে অটো যায়, রিক্সাও।

হাওড়া থেকে বম্বে মেলে হাপা কোচ আসে রাজকোট। রাজকোট থেকে ওই কোচই যায় ভেরাবল। তবে কলকাতা থেকে আমেদাবাদ হয়ে প্রভাস সোমনাথ যাওয়ার সুবিধা বেশী। এতে সময় বাঁচে অনেকটা।

বাস চলার পর কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলেন সকলেই। আমার সামনের সিটে বসেছেন তিনজন মহিলা। একজন বয়স্কা সধবা, একজন মাঝবয়সী সধবা আর একজন বেশ বয়স্কা বিধবা। বাসে জানালার ধারে বসা বিধবা মাসীই প্রথমে মুখ খুললেন,

—আর দুদিনের মধ্যেই আমাদের সব দেখা শেষ হয়ে যাবে। আবার সেই সংসার আর সংসার। একদম ভাল্ লাগে না। কয়েকটা দিন বেশ কাটলো।

পাশের দুজন ঘাড় নাড়লেন কথাটা শুনে। সধবা মাসী বললেন,

—দেখতে দেখতে কেটে গেল দিনগুলো। বহুদিনের ইচ্ছে ভগবান পূর্ণ করলেন। আবার সেই সংসারের ঘানিতে ঘুর পাক খেতে হবে।

বিধবা মাসী এবার সোজা চলে গেলেন প্রভাসের পথে বাস থেকে সংসারে,

—আমার দু-ছেলে। দু-জনেরই বিয়ে দিয়েছি। আমার ছোট বৌমা বেশ ভালো। তবে আজকালকার মেয়েরা মোটে কথা শুনতে চায় না। যেমন হয়েছে আমার বড় বৌমা। সারা দুনিয়ার ছেলেদের সঙ্গে কথা বলবে ডেকে ডেকে। বারণ করলেও শোনে না। আমি সন্দেহ করিনা। তবে দেখতে তো খারাপ লাগে। হাজার বলেও বন্ধ করতে পারিনি। কি অত পিরিতের কথা বুঝি না বাবা! কিছু বললেই মুখে মুখে চোপড়া করে। গরীবের মেয়ে এনেছিলাম। ভেবেছিলাম ভালো হবে। এখন দেখছি হাতির পাঁচ পা দেখে বসেছে।

কথাটা শুনে একমুহূর্ত দেরী করলেন না মাঝবয়সী দিদি,

—আমার স্বামীর আবার একটু সন্দেহবাতিক আছে। কারও সঙ্গে কথা বলতে দেখলেই ভাবে তার সঙ্গে বোধ হয় আমার কিছু আছে। কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। এখন কি আর খারাপ হওয়ার বয়েস আছে দিদি?

এ-কথার উত্তরে বয়স্কা সধবা মাসী বললেন সামান্য উত্তেজিত কণ্ঠে,

—আপনার কথা মানতে পারলাম না দিদি। খারাপ হতে কোন বয়েস লাগে না। বুড়ি হয়ে গেছে। পাঁচ বাচ্চার মা এখনও কুচি দিয়ে কাপড় পরে মুখে রঙ মেখে কপালের চুল কেটে প্রেম করছে। সত্যি কথা বলতে কি উপর দিকে থুথু ফেললে নিজের গায়েই পড়ে। আর কারও নয়, আমার স্বামীর কথাই বলছি। বিয়ের পর আর একটা আধাবয়সী মেয়েছেলেকে ধরেছে। তার আবার তিনটে বাচ্চা। অনেক অ-নে-ক চেষ্টা করেছি—ঠাকুরবাড়ী, জ্যোতিষী, তান্ত্রিক, জলপড়া, ভরেপড়া সব করেছি। আজ পর্যন্ত পেত্নীটাকে ঘাড় থেকে নামাতে পারিনি। ছেলেমেয়েরা সব বড় হয়েছে। তারা কি এসব বোঝে না। সবই বোঝে, কিছু বলে না সম্মানের কথা ভেবে। সুতরাং দিদি ওসব কথা বললে আমি বিশ্বাস করবো না। খারাপ হতে কোন বয়েস লাগেনা, হলেই হলো।

তিন সহযাত্রিনীদের কথায় অদ্ভুত একটা যোগসূত্র দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। হঠাৎ বাসটা দাঁড়িয়ে গেল। দেখলাম কয়েকজন নামলেন। তাদের দেখাদেখি ঐক্য বজায় রাখতে নামলেন আরও কয়েকজন। মিনিট দশেকের বিরতি। আবার চলা শুরু হলো। এরই মধ্যে ঠাকুরবাড়ী যাওয়া মাসী বললেন বিধবা মাসীকে উদ্দেশ্য করে,

—আপনার স্বামী অল্প বয়েসে মারা গেছেন, না বয়েসে ?

উত্তরে বিধবা মাসী জানালেন,

—দুটো বাচ্চাকে রেখে উনি যখন চলে গেলেন তখন আমার বয়েস খুব বেশী হলে বছর পঁয়ত্রিশ।

জানলার ধারে বসেই শুনছি এঁদের কথোপকথন। এবার সধবা মাসী যা বললেন তাতে আমি একেবারে 'থ' হয়ে গেলাম,

—কিছু মনে করবেন না দিদি, অল্প বয়সে বিধবা হলে কিংবা শ্বশুর শাশুড়ী জোয়ান থাকলে যদি ছেলের বিয়ে দেয়, তাহলে ঘরের শাশুড়ীরা কখনও পুত্রবধূর সুখ সহ্য করতে পারে না। এ আমি বহু দেখেছি। নিজের জীবনেও দেখেছি, অন্যের জীবনেও। আরও দেখেছি, একছেলের মা বিয়ের পর ছেলেকে আগলাতে গিয়ে বৌ-এর শান্তি নষ্ট করেছে। এক মেয়ের মা বিয়ে দিয়ে মেয়ের সুখের কথা ভেবে তার শ্বশুরবাড়ী নাক গলাতে গিয়ে মেয়ের সুখশান্তি নষ্ট করেছে। আমি বেঁচে থাকতে বাপের এক ছেলে বা এক মেয়ের ফ্যামিলিতে আমার ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেবো না কখনও। সকলের ধারণা, ছোট ফ্যামিলিতে বিয়ে দিলে ছেলেমেয়েরা সুখী হয়, আমি বিশ্বাস করি না।

এই পর্যন্ত বলে চুপ করলেন। দেখলাম, কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মাসীর মুখখানা অন্ধকার হয়ে গেল। বাড়ী কিংবা পাড়ার মহিলামহল হলে হয়তো তর্ক কিংবা ঝগড়া লেগে যেতো। এখানে তা হলো না। এই সাতসকালে চুপ করে গেলেন সকলেই।

বাস এসে থামলো একবারে গীতা মন্দিরের সামনে। টানা আড়াই ঘণ্টা চলে ঠিক

৭/৩০ মি. এলাম প্রভাস তীর্থে। পোরবন্দর থেকে দূরত্ব ১৩৫ কি. মি.।
প্রভাসে গীতা মন্দিরের এই ক্ষেত্রটির নাম দেহোৎসর্গ। কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উঠলাম মন্দির চত্বরে। বিশাল নাটমন্দিরযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির। নির্মিত হয়েছে শ্বেতপাথরে। মন্দিরমধ্যে ধবধবে সাদাপাথরের লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্তি বেশ বড় এবং দাঁড়ানো।

এই মন্দিরের পাশেই এলাম ছোট্ট একটা ঘরে। মন্দিরের চেহারা যেমন হয় ঠিক তেমন নয়। এটির দুটি অংশ। প্রথম ভাগে বাঁপাশে রয়েছে প্রায় সাড়ে পাঁচফুট উচ্চতার সিমেণ্টের তৈরী বলরামের অপূর্ব সুন্দর একটি মূর্তি।

এই ঘরের দ্বিতীয় অংশের প্রবেশমুখেই দেয়ালে লেখা আছে 'নাগস্থান'। আরও একটি নাম আছে এই মন্দিরের—বলরাম গুহা। কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে, তারপর গুহা। গুহার দেয়ালে খোদাই করা আছে একটি কুণ্ডলী পাকানো সাপ। পাথরের দেয়াল তাতে সিঁদুর মাখানো।

শত শত বছর ধরে লোকবিশ্বাস, প্রভাসের এই বলরাম গুহার ক্ষেত্রটিতে বলরাম দেহত্যাগ করেন যোগাসনে বসে। দেহরক্ষার সময় তাঁর মুখ থেকে মহানাগ বেরিয়ে প্রবেশ করে সামনের অতল সমুদ্রে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১ম স্কন্ধের ১৬শ অধ্যায়ে আছে, "মহাত্মা বিদুরও প্রভাসতীর্থে নিজের দেহ বিসর্জন করলেন। তাঁর চিত্ত কৃষ্ণাবেশে তদ্‌গত হয়েই ছিল।'

বলরাম গুহামন্দিরের পাশেই ছোট্ট একটি ঘর। শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি রয়েছে তার মধ্যে। আর আছে শ্রীচৈতন্যদেবের বাঁধানো একটি ছবি। কথিত আছে, সন্ন্যাসজীবনে একদা মহাপ্রভু তীর্থভ্রমণকালীন এসেছিলেন এই তীর্থে। তাঁরই স্মরণার্থে ছবি রয়েছে এখানে।

এখানকার দর্শনীয় স্থানগুলি সব পাশাপাশি। পায়ে হেঁটেই দেখা যায়। আমরা সকলেই এগিয়ে চলি তীর্থ প্রভাসের পথে পথে।

## পৌরাণিক ও অতীত প্রভাস

আজকের প্রভাস তীর্থের পিছনে রয়েছে এক মর্মান্তিক পৌরাণিক ইতিহাস। আনুমানিক ৪৪৩৮ বছর আগের কথা। তখন মহাভারতীয় যুগ। দ্বাপরের শেষ এবং কলির শুরু—যুগসন্ধিক্ষণ। শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে 'যদুবংশের প্রতি ঋষিদের অভিশাপ' শিরোনামে আছে,

"শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বললেন, মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলরাম ও যদুগণ দ্বারা পরিবৃত হয়ে পুতনা, কংস প্রভৃতি দৈত্যদের বধ করে এবং রাজাদের মধ্যে এক বিষম কলহ সৃষ্টি করে পৃথিবীর ভার হরণ করেন। দুর্যোধন ইত্যাদি শত্রুগণ কপট পাশা খেলা, অবজ্ঞা প্রদর্শন, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ প্রভৃতি দ্বারা পাণ্ডুপুত্রদের অন্তরে ক্রোধের সঞ্চার করেছিল। ভগবান সেই পাণ্ডবগণকে নিমিত্ত করে উভয়পক্ষে সমবেত রাজন্যবর্গের সংহার করলে পৃথিবী ভারমুক্ত হয়।

কিন্তু নিজ বাহুবলে রক্ষিত যাদবগণ ভূমণ্ডলের ভারস্বরূপ রাজাদের ও তাদের সৈন্যদের বধ করলেও ভগবান বাসুদেব চিন্তা করতে লাগলেন—আমার মনে হচ্ছে পৃথিবীর ভার এখনও লাঘব হয়নি, কারণ, মহাপরাক্রমশালী যদুকুল এখনও বর্তমান। তারা আমার আশ্রিত এবং বীর্য, ঐশ্বর্য ও অস্ত্র-শস্ত্রের উৎকর্ষ লাভ করেছে; কেউ এদের পরাভূত করতে পারবে না। সুতরাং এদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করে বেণু বনে দাবাগ্নির মতই সকলকে বিনাশ করে শান্ত হব এবং নিজধাম বৈকুণ্ঠে ফিরে যাব। সত্যসংকল্প ভগবান এভাবে মনস্থির করে ব্রাহ্মণদের শাপের ছলে নিজের কুলনাশ করেছিলেন।

তিনি মোহনমূর্তি প্রকাশ করে জগতের সমস্ত লাবণ্য ম্লান করেছিলেন। তাঁর সেই মূর্তি যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের দৃষ্টি অন্য দর্শনীয় বস্তুর প্রতি নিবিষ্ট না হয়ে শুধু তাঁর দিকেই আকৃষ্ট হয়ে থাকত। তাঁর মধুর বাক্য জীবমাত্রেরই চিত্ত আকর্ষণ করত এবং চরণলাঞ্ছিত ধ্বজবজ্রাদি চিহ্ন দর্শন করে লোক যাবতীয় কর্ম থেকে নিবৃত্ত হত। তাঁর কীর্তির কথা শ্রবণ, কীর্তন, মননাদির দ্বারা ভবিষ্যতে মানুষ ভবসমুদ্র অনায়াসে পার হতে পারবে। তাই ভগবান পৃথিবীতে কবিগণের দ্বারা শ্রুতিমধুর কীর্তিকলাপ বিস্তার করে স্বস্থানে গমন করেন।

রাজা বললেন, যদুগণ ব্রাহ্মণভক্ত, বদান্য এবং বৃদ্ধদের সর্বদা সম্মান করেন। তাঁরা নিয়ত কৃষ্ণপরায়ণ; এমন অবস্থায় তাঁরা কেমন করে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হলেন? দ্বিজবর, যেরূপে যে কারণে তাঁদের উপর এই অভিসম্পাত হয়েছিল এবং একাত্মা যাদবগণের মধ্যে বিভেদ ঘটেছিল আপনি সে বিষয়ে আমাকে বলুন।

শুকদেব বললেন, পূর্ণকাম উদারকীর্তি শ্রীকৃষ্ণ যাবতীয় সুন্দর বস্তুর আধার-স্বরূপ মোহনমূর্তি প্রকাশ করে নানা শুভকর কর্ম সম্পন্ন করে পৃথিবীর ভার হরণ করেন। তিনি গৃহে থেকে নানাবিধ লীলা দ্বারা অবশিষ্ট কুলসংহারের ইচ্ছা করলেন। তাঁর সকল কর্মই পুণ্যপ্রদ ও সুমঙ্গল। বসুদেবের গৃহে থেকে তিনি এসকল কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। সে সময়ে তিনি যজ্ঞার্থে আহূত বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব, দুর্বাসা, ভৃগু, আঙ্গিরা, কশ্যপ, বামদেব, অত্রি, বশিষ্ঠ, নারদ প্রভৃতি মুনিগণের দ্বারা যাবতীয় মঙ্গলজনক কাজ শেষ করে তাঁদের দ্বারকার নিকট পিণ্ডারক তীর্থে পাঠিয়ে দিলেন। সেই পিণ্ডারক তীর্থের কাছেই যদু-বংশের অশিষ্ট কুমারেরা একদিন খেলা করছিল। তারা ঋষিদের দেখে জাম্ববতী-পুত্র শাম্বকে স্ত্রীবেশে সাজিয়ে তাঁদের নিকট উপস্থিত হল এবং বিনীত হয়ে তাঁদের চরণ ধরে জিজ্ঞাসা করল, সর্বদর্শী ব্রাহ্মণগণ, এই কৃষ্ণলোচনা গর্ভবতী নারী পুত্র-প্রার্থিনী হয়েছেন, কিন্তু আপনাদের জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করছেন। তাই আমাদের দিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন, এর গর্ভে কি সন্তান জন্মাবে?

মহারাজ, এইভাবে প্রতারিত হয়ে ক্রুদ্ধ মুনিগণ বলে উঠলেন, ওহে মূর্খগণ, এ তোমাদের কুলনাশক এক মুসল প্রসব করবে। একথা শুনে কুমারগণ অত্যন্ত ভয় পেল এবং তখনি শাম্বের দেহের আবরণ-বস্ত্র খুলে সত্যিই এক লোহময় মুষল

দেখতো গেল। তখন তারা 'মন্দভাগ্য আমরা কি সর্বনাশ করেছি, লোকে আমাদের কি বলবে'—এই চিন্তায় অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে সেই মুষলটি নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল। পরে তারা মুষলটি গ্রহণ করে ম্লানমুখে সভাস্থলে উপস্থিত হল এবং সেখানে সমবেত যাদবদের নিকট সেই মুষল দেখিয়ে রাজা উগ্রসেনকে সব কথা নিবেদন করল। অমোঘ ব্রহ্মশাপের বিষয় শুনে এবং মুষলটি দেখে দ্বারকা-বাসীরা সকলেই ভয়ে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে গেল। যদুরাজ উগ্রসেন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা না করেই সেই মুষল চূর্ণ-বিচূর্ণ করে চূর্ণবিশিষ্ট লোহখণ্ড সমেত সবকিছুই সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু কোন এক মাছ সেই চূর্ণ লোহখণ্ড খেয়ে ফেলল এবং অবশিষ্ট চূর্ণাংশগুলি তরঙ্গপ্রবাহে ভেসে এসে সমুদ্রতীরে সংলগ্ন হল। সেগুলি থেকে এরকা (নলখাগড়া) নামক এক জাতীয় তৃণ সৃষ্টি হল। যে মাছ লোহখণ্ড গ্রাস করেছিল সেও অন্যান্য মাছের সঙ্গে এক জেলের জালে ধরা পড়ল এবং জেলে তাকে টেনে তীরে তুলল। জরা নামক এক ব্যাধ সেই মাছের পেটের ভিতর লোহখণ্ডটি পেয়ে তা দিয়ে তার বাণের অগ্রভাগ নির্মাণ করল। সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়েও ভগবান ব্রহ্মশাপের অন্যথা করতে ইচ্ছা করলেন না; বরং তিনি কালরূপী হয়ে সেই ব্রহ্মশাপের অনুমোদনই করলেন।"[৭]

যদুবংশ ধ্বংসের কথা শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ত্রিশ ও একত্রিশ অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে এইভাবে 'যদুকুল সংহার।'

"পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন, মুনিবর, ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে ছেড়ে বদরিকাশ্রমে চলে গেলে ভূতভাবন শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাতে থেকে কি করলেন? তাঁর নিজের বংশ যদুবংশ যখন ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হল তখন শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে দেহত্যাগ করেছিলেন? নয়নের আনন্দ স্বরূপ যে দেহের দিকে একবার তাকালে নারীরা আর চোখ ফেরাতে পারতেন না, যে মধুর বাণী কানের মধ্যে দিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করলে তার থেকে মন আর ফেরে না, যে দেহের শোভা বর্ণনায় কবির কবিত্ব শুধু বেড়েই চলে, কুরুক্ষেত্র অর্জুনের সারথিরূপে যাঁকে দেখে যুদ্ধক্ষেত্রে শায়িত ব্যক্তিরা মোক্ষলাভ করেছেন—সেই দেহ কি করে তিনি ত্যাগ করলেন?

শুকদেব বললেন, মহারাজ, আকাশে সূর্যমণ্ডল, পৃথিবীতে ভূমিকম্প, স্বর্গে দিগ্‌দাহ এইসব নানা অমঙ্গল চিহ্ন দেখে পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সধর্মা নামে সভায় উপস্থিত যদুদের বললেন, যাদবগণ; দ্বারকায় যেসব ভয়ানক উৎপাত দেখতে পাচ্ছি তাতে মনে হচ্ছে মহাকালের ধ্বজা খুব কাছেই এসে গেছে, তাই আমার বিবেচনায় এখানে আমাদের আর এক মুহূর্তও থাকা ঠিক হবে না। বালক, বৃদ্ধ আর স্ত্রীলোকগণ তাড়াতাড়ি করে শঙ্খোদ্ধার তীর্থে চলে যাক। সরস্বতী যেখানে পশ্চিমবাহিনী, আমরা সেই প্রভাস তীর্থে যাব। তার জলে স্নান করে পবিত্র হয়ে চিত্তকে সমাহিত করব। তারপর নানা উপচারে দেবতাদের পূজা করব। এছাড়া অমঙ্গল দূর করবার আর কোন উপায় দেখছি না। দেবতা, ব্রাহ্মণ আর গভীর

অর্চনা দ্বারাই জীবের উত্তম জন্মলাভ হয়ে থাকে।

যদুবীরেরা শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শমত দ্বারকা থেকে নৌকায় সমুদ্র পার হয়ে, তারপর রথে চড়ে প্রভাসে গেলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা কৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে গভীর ভক্তির সঙ্গে নানা মঙ্গলপ্রদ কাজের অনুষ্ঠান শুরু করলেন। কিন্তু অদৃষ্টের বিধানে তাঁদের সব চেষ্টাই বৃথা হল। সেই পবিত্র প্রভাস ক্ষেত্রে যাদবগণ সুমিষ্ট মৈরেয় মদ পান করে অভিভূত এবং উন্মত্তের মত হয়ে পড়লেন। কৃষ্ণমায়ায় মোহগ্রস্ত যাদবরা যখন অতিরিক্ত মদ্যপানে একেবারে বিবেকহীন হয়ে গেলেন তখন তাঁদের মধ্যে এক মহাকলহের সৃষ্টি হল। ক্রোধে জ্ঞান হারিয়ে তাঁরা আততায়ীর বেশে ধনুর্বাণ, খড়্গ, ভল্ল, গদা, তোমর, ঋষ্টি প্রভৃতি নানা অস্ত্র নিয়ে সেই সমুদ্রের ধারে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করলেন। রথ, হাতী, ঘোড়া, উট, গরু, মোষ, সৈন্যসামন্ত ইত্যাদিতে সেই স্থান এক ভয়াবহ রণক্ষেত্রে পরিণত হল। বন্য হাতী যেমন দাঁতের আঘাতে একে অপরকে হত্যা করে, যদুবীরেরাও তেমনি শরের আঘাতে পরস্পর পরস্পরকে নিহত করতে লাগলেন। বধোন্মত্ত হয়ে শাম্বের সঙ্গে প্রদ্যুম্ন, ভোজের সঙ্গে অক্রূর, সাত্যকির সঙ্গে অনিরুদ্ধ, সংগ্রামজিতের সঙ্গে সুভদ্র, গদের সঙ্গে সারণ এবং সুরথের সঙ্গে সুমিত্রা দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু করলেন। এছাড়াও শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মুগ্ধ হয়ে সহস্রজিৎ, শতজিৎ, ভানুমুখ্য, নিশঠ, উন্মুক ইত্যাদিরা মদ্যপানে জ্ঞানহীন হয়ে ভীষণ যুদ্ধে মত্ত হলেন। দশার্হ, ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণি, সাত্বত, মধু, অর্বুদ, মাথুর, শূরসেন, বিসর্জন, কুকুর আর কুন্তীবংশীয়েরা বন্ধুভাব বিসর্জন দিয়ে পরস্পর নির্মম হানাহানিতে প্রবৃত্ত হল। যেন এক বিচিত্র মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পুত্র পিতার সঙ্গে, ভাই ভাইয়ের সঙ্গে, দৌহিত্র মাতামহের সঙ্গে, ভাগ্নে মামার সঙ্গে, মিত্র মিত্রের সঙ্গে, পরম বন্ধুরা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে একে অপরকে শেষ করতে লাগল।

যুদ্ধ করতে করতে এক সময় বাণ নিঃশেষ হল, ধনুক ভেঙ্গে গেল, অন্য অস্ত্রও আর কিছু বাকী রইল না। যোদ্ধারা তখন এক এক মুঠো এরকা (এক রকম জলজ তৃণ) তুলে নিয়ে তা দিয়েই পরস্পরকে আঘাত করতে লাগল। দৈবের কি লীলা! তাদের মুঠোয় ধরা সেই এরকাগুচ্ছ বজ্রের মত কঠিন লোহার দণ্ডে পরিণত হল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাদের ঐ যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলে 'রামকৃষ্ণ আমাদের শত্রু' এই ধারণা করে মোহগ্রস্ত যাদবরা তাঁদের হত্যা করবার জন্য ধাবিত হল। এতে কৃষ্ণবলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে এক এক মুষ্টি তৃণ নিয়ে তাদের মারতে লাগলেন। একে ব্রহ্মশাপ, তার উপর কৃষ্ণের মায়ায় যাদবদের চিত্ত মুগ্ধ। ফলে বেণুবন থেকে উদ্ভূত আগুন যেমন সমস্ত বন দগ্ধ করে, স্পর্ধার থেকে উৎপন্ন বিষম ক্রোধ তেমনি সমস্ত যদুকুল ধ্বংস করল।

এভাবে যখন যদুকুল সম্পূর্ণ নষ্ট হল, শ্রীকৃষ্ণ মনে করলেন, যাক্, এবার পৃথিবীর ভার লাঘব হল। এদিকে বলরাম সমুদ্রতীরে গিয়ে যোগস্থ হলেন এবং পরমাত্মার চিত্ত সমাহিত করে মর্ত্যলোক ত্যাগ করলেন। বলরাম মনুষ্যলোক ছেড়ে নিজধামে চলে গিয়েছেন দেখে দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শোকে মগ্ন হয়ে একটি অশ্বত্থ গাছে হেলান

দিয়ে নীরবে বসে রইলেন। তাঁর জ্যোতিতে দিগ্-দিগন্ত আলো হয়ে উঠল ; চতুর্ভুজ মূর্তিতে প্রকাশিত হয়ে ধূমহীন অগ্নির মত তিনি শোভা পেতে লাগলেন। নবীন মেঘের মত তাঁর শ্যামসুন্দর মূর্তির বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন অঙ্কিত, গলিত সোনার মত পীত বর্ণের দুখানি কৌশেয় বস্ত্রে তাঁর অঙ্গ আবৃত। মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল কেশদামে অলঙ্কৃত। চোখদুটি পদ্মপলাশের মত আয়ত, কটিতে শোভিত কটিসূত্র, গলায় ব্রহ্মসূত্র, মাথায় মুকুট, দুই বাহুতে কটক, অঙ্গদ প্রভৃতি অলঙ্কার। তাঁর কণ্ঠে মণিহার আর কৌস্তুভ, পায়ে নূপুর, আঙ্গুলে আংটি। তার উপর গলায় বনমালা, হাতে শঙ্খচক্র ইত্যাদি আয়ুধে ভগবানের কি অপূর্ব শোভাই না হয়েছিল। পদ্মের মত রক্তিম বাম পাখানি ডান উরুর উপরে রেখে শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষমূলে বসেছিলেন। সেই সময় জরা নামে এক ব্যাধ মুষলের ক্ষয়ে যাওয়া লোহার টুকরো দিয়ে বাণ তৈরী করে হরিণ মারবার আশায় ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে ঐ বনে এসে উপস্থিত হল। দূরে থেকে দেখে সে শ্রীভগবানের পাদপদ্মকে হরিণ বলে ভুল করল এবং তার তীরে সেই চরণ বিদ্ধ করল। পরমুহূর্তেই চতুর্ভুজ পুরুষকে দেখতে পেয়ে ব্যাধ বুঝতে পারল কি মহা অপরাধের কাজ সে করেছে। তৎক্ষণাৎ সে সভয়ে অসুরনাশক শ্রীকৃষ্ণের পায়ে মাথা রেখে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং বলল, মধুসূদন, আমি না জেনে এ কাজ করেছি। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। যাঁকে কেবল স্মরণ করলেই জীবের অজ্ঞান-অন্ধকার দূরে হয়, সেই সাক্ষাৎ বিষ্ণুর প্রতি আমি কি বিষম অন্যায় করেছি। বৈকুণ্ঠপতি, আমার মত একটা মৃগলোভী ব্যাধকে আপনি এখনি সংহার করুন যাতে আমার দ্বারা এমন অন্যায় কাজ আর না হয়। আপনার মায়ায় মোহিত হয়ে ব্রহ্মা নিজে, রুদ্র ইত্যাদি তাঁর পুত্রগণ এবং বেদে পারদর্শী অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তিরাও যখন আপনার অপূর্ব স্বরূপ বুঝতে অক্ষম তখন আমার মত পাপী আর আপনার বিষয়ে কি বর্ণনা করবে ?

ভগবান তখন সেই ব্যাধকে বললেন, জরা, তোমার ভয় নেই। যা ঘটেছে সবই আমারই ইচ্ছা। এতে তোমার কোন দোষ নেই। তাই অনেক সৎকাজের ফলস্বরূপ পুণ্যবানেরা যে স্বর্গলাভ করেন, আমার ইচ্ছায় তুমি সেই দেবলোকে যাও। নিজের ইচ্ছায় যিনি শরীর ধারণ করেছেন সেই ভগবান বাসুদেব এই কথা বললে জরা তাঁকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করল, তারপর রথে চড়ে স্বর্গে চলে গেল। এদিকে শ্রীকৃষ্ণের সারথি দারুক প্রভুকে খুঁজতে খুঁজতে তাঁর চরণে লগ্ন তুলসীর গন্ধে সুরভিত বাতাসের অনুসরণ করে অবশেষে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। অশ্বত্থ মূলে অপূর্ব জ্যোতির্ময় মূর্তিতে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে দেখে আবেগে তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা নির্গত হতে লাগল। রথ থেকে নেমে তিনি প্রভুর চরণে লুটিয়ে পড়লেন এবং বলতে লাগলেন, প্রভু, আকাশে চন্দ্র না থাকলে রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে চোখের দৃষ্টিশক্তি যেমন লোপ পায়, আপনাকে না দেখে আমিও তেমনি অন্ধের মতই হয়ে পড়েছি। এখন কোথায় যাব, কোথায় গেলে শান্তি পাব কিছুই বুঝতে পারছি না।

মহারাজ, সারথি দারুক যখন এভাবে বিলাপ করছিলেন, তখন ধ্বজা, অশ্ব প্রভৃতিসহ গরুড়ধ্বজ রথ দারুকের চোখের সামনেই আকাশে উঠে গেল, শ্রীকৃষ্ণের দিব্য অস্ত্র প্রভৃতিও রথের অনুসরণ করল। বিস্মিত দারুককে সম্বোধন করে ভগবান বললেন, সারথি, তুমি আপাতত দ্বারকায় ফিরে গিয়ে পরস্পর বিবাদে জ্ঞাতিধ্বংস, বলরামের স্বধামে গমন আর আমার এই অবস্থার কথা সেখানকার বন্ধুদের জানাও। তুমি তাঁদের বলবে যে তাঁরা যেন পরিবারবর্গ নিয়ে সেখানে আর না থাকেন। কারণ আমি দ্বারকা ছেড়ে চলে এসেছি বলে সমুদ্র অল্পকালের মধ্যেই তাকে প্লাবিত করে ফেলবে। তাই তাঁরা যেন নিজ নিজ পরিবার আর আমার বাবা-মাকে নিয়ে অর্জুনের আশ্রয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে চলে যান। তুমিও আমার ধর্ম অনুশীলন করে বিষয়চিন্তা বিসর্জন দাও, আর এই দৃশ্যমান জগৎ শুধু আমারই যোগমায়ায় প্রকাশিত হচ্ছে এই জ্ঞান লাভ করে শান্তভাবে থাক।

শ্রীকৃষ্ণ একথা বললে দারুক তাঁকে প্রদক্ষিণ পূর্বক তাঁর পদযুগল মস্তকে ধারণ করে দুঃখিত অন্তঃকরণে দ্বারকায় গেলেন।

...মহারাজ, এদিকে শ্রীহরি দ্বারকা ছাড়ামাত্র সমুদ্র শ্রীভগবানের আবাসটি বাদ দিয়ে বাকী সমস্ত দ্বারকাকে প্লাবিত করল।"...

দ্বারকা ছেড়ে আসার পর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের দেহত্যাগ এবং যদুকুল নিজেদের মধ্যে কলহ ও যুদ্ধ করে ধ্বংস হয়েছিল প্রাচীন তীর্থ এই প্রভাসে। পৌরাণিক স্মৃতি-চিহ্ন এখন হাতেনাতে কিছু নেই। শুধু লোক বিশ্বাসই বাঁচিয়ে রেখেছে এই প্রাচীন তীর্থকে।

বলরাম গুহা থেকে হাত কুড়ি এগোতেই পড়লো একটি স্মৃতিমন্দির। দাঁড়িয়ে আছে মনময় পরিবেশে। চূড়াযুক্ত আটটি স্তম্ভের উপর ছাদ। গোলাকার। চারদিক ফাঁকা। ছোট্ট মন্দির। এর ঠিক মাঝখানেই রয়েছে পাথরের বেদীতে খোদাই করা দুটি চরণচিহ্ন। শ্রীকৃষ্ণের স্মরণউদ্দেশ্যেই নির্মিত হয়েছে এই মন্দির। এটির পাশেই দাঁড়িয়ে আছে বড় একটি নিমগাছ। শত শত বছরের প্রবাদ, প্রভাসের ভালকা নামক স্থানে তীরবিদ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এখানে এসে। যার জন্যে এই ক্ষেত্রটির নাম হয়েছে দেহোৎসর্গ। স্মৃতিবেদীর একটু দূরেই পৌরাণিক নদী কপিলা বয়ে চলেছে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের সাক্ষী হয়ে।

এখান থেকে মিনিটতিনেক হেঁটে এলাম প্রভাসতীর্থের স্নানের ঘাটে। যেখানে মিলন ঘটেছে পৌরাণিক নদী হিরণ্য, কপিলা আর সরস্বতীর। তাই নাম হয়েছে এর ত্রিবেণী সঙ্গম বা তীর্থ প্রভাস। ছোট বড় মিলিয়ে বর্তমানে ঘাট আছে নয়টি। সবগুলিই বাঁধানো। ঘাটের পাশেই রামমন্দির, আছে সাবিত্রী মন্দিরও। ঘাটে দাঁড়িয়ে বাঁদিকে সোজা তাকাতেই চোখে পড়লো একটি প্রাচীন শিবমন্দির। কিছুটা এগিয়ে যেতেই দেখলাম ছোট ছোট কিছু সমাধিমন্দির ও বেদী। স্থানীয় মানুষের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, এগুলি সব হিন্দু সাধু মহাত্মাদের সমাধি-ক্ষেত্র। যাদের দেহ দাহ করা হয়নি তাদেরই সমাধি দেয়া হয়েছে এখানে।

ভাবছি অতীত প্রভাসের কথা। মহাভারতীয় যুগে প্রভাসে সাত ক্রোশব্যাপী এই ক্ষেত্রটির প্রসিদ্ধি ছিল যাদবস্থলী নামে। যাদবকুল এখানে ধ্বংস হয়েছিল বলেই হয়তো এই নাম। প্রভাসের এই ত্রিবেণী সঙ্গমেই একদা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণ বলরামের। এখানে, এই প্রভাসতীর্থেই একসময় স্বয়ং অর্জুন শোকে অধীর হয়ে শ্রীকৃষ্ণের আদেশ মতো যদুকুলের স্ত্রী বালক এবং বৃদ্ধদের সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয়ে নিহত এবং নষ্টবংশ বন্ধুদের পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে পিণ্ড ও জলাদি দান করে প্রমাণ দিয়েছেন সখ্যভাবের। তারপর আবার ফিরে গিয়েছেন ইন্দ্রপ্রস্থে।

এখানকারই প্রজ্বলিত কোন অগ্নিকুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম এবং প্রদ্যুম্নের স্ত্রীরা নিজের স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে নিজেরাও দিয়েছিলেন আত্মবিসর্জন। এ-থেকে বাদ যাননি কৃষ্ণপ্রাণা রাজমহিষী রুক্মিণীও। প্রভাসের এই সমুদ্র থেকে জরা ব্যাধ এখানেই পেয়েছিলেন মাছের পেট থেকে লোহার মুষলখণ্ড, যা দিয়ে তিনি তৈরী করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রাণঘাতি বাণের ফলা। এই তীর্থের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে,

"পুলস্ত্য বললেন ভীষ্মকে,

বীর, রাজশ্রেষ্ঠ! তাহার পর উত্তম প্রভাসতীর্থে গমন করিবে ; সেখানে দেবগণের মুখস্বরূপ, বায়ুসারথি ও জ্বলিতমূর্ত্তি স্বয়ং অগ্নিদেব সর্ব্বদাই সন্নিহিত রহিয়াছেন ॥

মানুষ পবিত্র ও সংযতচিত্ত হইয়া, সেই প্রভাসতীর্থে স্নান করিয়া, অগ্নিষ্টোমযজ্ঞ ও অতিরাত্রযজ্ঞের ফললাভ করিবে ॥" ( মহাভারত, বনপর্ব সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ। )

একদা এই তীর্থে এসে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের তপস্যার কথাও বলা হয়েছে মহাভারতে। যেমন, বনবাসকালে যুধিষ্ঠির, "ভ্রাতৃগণ ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় সমুদ্রের সেই তীর্থপথ দিয়া যাইতে থাকিয়া পৃথিবী বিখ্যাত প্রভাসতীর্থে আগমন করিলেন ॥

বিশাল লোহিত নয়ন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত প্রভাসতীর্থে স্নান করিয়া দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন ; আর দ্রৌপদী এবং সেই সকল ব্রাহ্মণেরাও লোমশের সহিত ( যথাসম্ভব ) স্নান ও তর্পণ করিলেন ॥

তদনন্তর ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির বারদিন পর্যন্ত জল ও বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া, রাত্রিতে ও দিনে স্নান করিতে থাকিয়া এবং সকল দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তপস্যা করিলেন ॥" ( মহাভারত, বনপর্ব, নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ। )

প্রভাসতীর্থের আরও দুটি নাম প্রভাস পত্তন বা সোমনাথ পত্তন। সোমনাথ পত্তন নামের পিছনে রয়েছে একটি সুন্দর পৌরাণিক কাহিনী। যেমন,

রাজা দক্ষপ্রজাপতির ছিল সাতাশটি কন্যা। চন্দ্রের আর এক নাম সোমদেব। সাতাশটি কন্যাকেই বিবাহ করেছিলেন তিনি। স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী রূপলাবণ্যবতী ছিলেন রোহিণী। তাঁর উপরেই সোমদেবের আসক্তি ছিল অতি-মাত্রায়। ফলে যা হবার তাই-ই হলো। অন্য স্ত্রীরা ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে রাজা

দক্ষের কাছে জানালেন তাঁদের প্রতি সোমদেবের অবহেলা আর অবজ্ঞার কথা। জামাই যত বদমাসই হোক না কেন, প্রথম অবস্থায় কোন মেয়ের পিতাই চায় না ডিভোর্স হোক বা মেয়ের সংসার ভাঙুক। তাই দক্ষ উপদেশ দিলেন কন্যাদের, রোহিণী তাঁর স্বামীকে বশীভূত করেছে সোমদেবকে আন্তরিক সেবা আর যত্ন করে। সুতরাং তোমরাও রোহিণীর পথ ধরো। তাতেই সমস্যার সমাধান হবে। তোমাদের প্রতি আসক্ত হবে সোমদেব।

দক্ষের উপদেশে সকলেই আপ্রাণ সেবা করলেন দিনের পর দিন। কথায় আছে, স্বভাব যায় না মলে। তবুও মন পেলেন না সোমদেবের। আবার অনুযোগ করলেন সোমদেবের পত্নীরা পিতা দক্ষের কাছে।

রাজা দক্ষ অনুরোধ করে সংবাদ দিলেন সোমদেবকে কন্যাদের মনোবেদনার কথা জানিয়ে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন সোমদেব। আরও নিষ্ঠুর ব্যবহার করতে লাগলেন রোহিণী ছাড়া আর সব স্ত্রীদের সঙ্গে। এ-সংবাদও পৌঁছালো রাজার কাছে। এবার ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সোমদেবকে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হওয়ার অভিশাপ দিলেন দক্ষপ্রজাপতি।

অভিশাপগ্রস্ত সোমদেব আক্রান্ত হলেন ক্ষয়রোগে। ধীরে ধীরে জ্যোতিঃ গেল ম্লান, নিষ্প্রভ হয়ে। দুঃখিত হলেন দেবতারা। সকলে এসে ধরলেন দক্ষকে। অনন্যোপায় দক্ষ জানালেন, অভিশাপ যখন, তখন একেবারে আরোগ্য হবে না কখনও। তবে প্রভাসতীর্থে শিবের উপাসনা আর স্নান করলে পনেরো দিন ধরে ধীরে ধীরে ক্ষয় পাবে আবার পনেরো দিন ধরে ক্ষয় মুক্ত হয়ে পূর্ণ হবে ধীরে ধীরে।

উপায় নেই সোমদেবের। এলেন প্রভাসতীর্থে নিজ পাপ আর অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে। ঊর্ধ্বপদে, হেটমুণ্ডে কঠোর তপস্যা শুরু করলেন তিনি সোমনাথ মহাদেবের। তপস্যায় প্রীত হলেন মহাদেব। সোমনাথ রোগমুক্তির বর দিলেন সোমদেবকে। প্রভাসতীর্থের সঙ্গমে স্নান করে মুক্ত হলেন রোগ থেকে। কান্তিমান হয়ে পূর্ণ কলেবরে প্রভাবান্বিত হলেন এই তীর্থে, তাই নাম হলো প্রভাস পত্তন বা সোমনাথ পত্তন।

প্রভাসতীর্থের স্নানের ঘাট থেকে উঠে এলাম। ঘাটের বিপরীত দিকে রাস্তার ওপারে এসে দাঁড়ালাম সূর্যমন্দিরে। পাথরে নির্মিত মাঝারী আকারের মন্দির। কোন মূর্তি নেই বর্তমান মন্দিরে। এই মন্দিরের একটি অংশে রয়েছে গোল করে আঁকা সূর্যদেব। প্রবাদ আছে, সোমদেব জ্যোতিঃ ফিরে পাবার জন্যে এই ক্ষেত্রটিতে পুজো করেছিলেন সূর্যদেবের। একইসঙ্গে স্নান করেছিলেন প্রভাসতীর্থের এই সমুদ্রে।

প্রাচীন এই সূর্যমন্দিরের আর একটি অংশে আছে সোমনাথ মহাদেব নামে একটি শিবলিঙ্গ, সঙ্গে বারোটি বাণেশ্বর মহাদেব। এই মন্দির সংলগ্ন একটি প্রকোষ্ঠে স্থাপিত আছে আচার্য শংকরের সুন্দর একটি পাথরের মূর্তি। দ্বারকায় সারদাপীঠ পরিচালিত এটিও একটি সারদাপীঠের শাখা। এর পাশেই রয়েছে পাণ্ডবগুহা। এখানে স্থাপিত মহাদেবের নাম সিদ্ধেশ্বর। কথিত আছে, একসময় পাণ্ডবেরা এসে অবস্থান করেছিলেন এখানে।

এগিয়ে চললাম প্রভাসতীর্থের ঘাট ধরে। একদিকে থৈ-থৈ করছে জল। ঘাট রয়েছে বেশ কয়েকটা। বেশীরভাগই ভাঙাচোরা। অপরিষ্কারও বটে। প্রভাসে কৃষ্ণের দেহরক্ষার পর থেকে আর বোধহয় কেউ সময় পায়নি ঘাট পরিষ্কার করার। কেউ কেউ স্নান করছে, কেউ বা করছে পারলৌকিক ক্রিয়াদি পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে। 'জানানা' বা 'মরদানা' বলে কিছু নেই। নারীপুরুষ সমান সমান। একই ঘাটে স্নান করছে সকলেই।

এই ঘাটগুলির কাছে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছু লোক যারা স্নান করছে না, পারলৌকিক ক্রিয়াদিও নয়। এদের মধ্যে যুবক তো আছেই, আছে আধাবয়সী, বেশ বয়স্কও। এদের কাজ শুধু দেখা। মেয়েদের স্নানের সময় অসতর্ক মুহূর্তটাই এদের কাছে একমাত্র আকর্ষণ। আরও বেশী সতর্ক হলে, কিছু দেখা না গেলেও সিক্তবসন লেপ্টানো দেহের আকর্ষণই বা কম কি ? এটা দেখার জন্যেই এদের হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা। চোখের দিকে তাকালে দেখা যাবে বিশ্বসংসারে আর কোন ভাবনা এদের নেই।

এমন পুরুষের সংখ্যা কম নয় সারা ভারতের সমস্ত তীর্থের স্নানঘাটে। এরা দেখে, এদেরও যে কেউ দেখে, এরা তা দেখে না। হরিদ্বারের হর কি পেয়ারী, কাশীর দশাশ্বমেধ, অমরনাথের অমরগঙ্গা, কলকাতার কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, মধ্যপ্রদেশের নর্মদা কুণ্ড থেকে শুরু করে এমন কোন ঘাট নেই, যেখানে দণ্ডায়মান এই কামাতুর পুরুষগুলো নেই। এদের চোখগুলো যেন গিলে খাচ্ছে স্নানরতাদের। পলক পড়ে না। একেবারে বকচক্ষু। কোন বিশেষ তিথিউৎসবে যেকোন তীর্থের স্নানঘাটে মেয়ে স্নানার্থীর সংখ্যা বাড়ে, এদের সংখ্যাও বাড়ে। এমনও দেখেছি, নিজ পরিবারের কেউ স্নানে নামলে তাদের জামাকাপড় নিয়ে বসে থাকে ঘাটে। ভাবটা এমন, চুরি যেতে পারে তাই কোলে নিয়ে বসে আছি। আর চোখদুটো খুঁজে বেড়াচ্ছে গা থেকে কাপড় সরে যাওয়া মেয়েদের। এরা একবারও ভাবে না, এদের নিয়েও কেউ ভাবে।

এইসব ছেলে বুড়োদের দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি প্রভাসঘাটের লম্বা চত্বর ধরে, সোজা। অনেক দূর থেকেই দেখতে পেয়েছি এক সাধুবাবাকে। এসে গেলাম একেবারে সামনে, যেখানে বসে আছেন তিনি। এখানেই রয়েছে সাধু-মহাত্মাদের সমাধিক্ষেত্র। অসংখ্য বাঁধানো সমাধিবেদী। এরই নীচে চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন কোন সাধু-সন্ন্যাসী। পাশেই রয়েছে একটা শিবমন্দির। এখান থেকে একটু দূরেই থৈ-থৈ করছে নিস্তরঙ্গ জলরাশি।

সাধুবাবা বসে আছেন কম্বল বিছিয়ে। মুখোমুখি বসে আছে আরও দুজন অল্পবয়স্ক ছেলে। এদের দেখে স্থানীয় বলেই মনে হলো। পরনে একেবারেই ময়লা নোংরা পোশাক। দীর্ঘদিনের অভাব ফুটে উঠেছে পোশাকে, দেহে।

দেখলাম সাধুবাবারও ওই একই দশা। ছেঁড়া ন্যাতার মতো একটা কাপড় পরা, ময়লা। একেবারেই ময়লা। ময়লারও আর তিল ধারণের জায়গা নেই। এলোমেলো চুলে মাথা ভরা। একটু খয়েরী রঙের। তেল জলের বালাই নেই তাই এমন হয়েছে হয়তো। মাথার পিছন দিকটায় একটা মাত্র জটা। হাতখানেক লম্বা। জটা একটা, এমনটা খুব কম দেখা যায়। গালদুটো একেবারেই তোবড়ানো। বহু ব্যবহারে তোবড়ানো খালি নারকেল তেলের কৌটোর পেটটা যেমন হয়, তেমনই। প্রায় সব দাড়িই পাকা। এক নজরে সুন্দর চোখ। ইহলোকের সম্পত্তি ছোট্ট ঝুলিটা রয়েছে পাশে। মুখখানা দেখলে বেশ বোঝা যায়, সংসারের কোন আবিলতাই স্পর্শ করেনি সাধুবাবাকে। পৌষ মাস। এই শীতেও গায়ে তেমন শীতবস্ত্র কিছু নেই পাতলা কাপড়ের একটা টুকরো ছাড়া। সারা কপালে মাখানো রয়েছে বাটা চন্দন। ময়লা রঙের উপর ফুটে উঠেছে সাদা চন্দন, দারুণ লাগছে দেখতে। বয়েস আন্দাজ করলে ৭০/৭৫-এর মধ্যে হবে। দেখে মনে হয় এককালে চেহারাটা বেশ বলিষ্ঠই ছিল। ভাঙতে ভাঙতে এই বয়েসে যেমন হয়, এখন তেমনই। মোটের উপর ঝুলি আর জটা—এ-দুটো না থাকলে ভিখারীই বলতো লোকে।

সাধুবাবার পাশে গিয়ে বসতেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো ছেলেদুটো। নিজেরা জড়ানো হিন্দিতে কিছু বললো। বুঝলাম না। ওদের বিরক্তির কোন কারণ হলাম কিনা জানতে চাইলে ওরা দুজনেই একবাক্যে হিন্দিতে বললো—না, তেমন কিছু নয়। তবে জানতে চাইলো হঠাৎ আমি কেন এখানে এসে বসলাম। সাধুসঙ্গই আমার উদ্দেশ্য, এ-কথা জানাতেই খুব খুশী হলো ওরা। আর কোন কথা বললাম না ওদের সঙ্গে, ওরাও না। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম সাধুবাবাকে। মুখে কিছু বললেন না। হাতজোড় করে শুধু কপালে ঠেকালেন।

সাধুবাবা নিজের থেকে কিছু বলেন কিনা, এই অপেক্ষায় বসে রইলাম চুপ করে। কেটে গেল প্রায় মিনিট পাঁচ-সাত। কোন কথাই বললেন না। আগে কথা হচ্ছিলো ওদের সঙ্গে। আমার উপস্থিতিতে সকলেই চুপ। এবার উঠে গেল ছেলে দুটো। ওরা উঠতেই খুশী হলাম মনে মনে। এটাই তো চাইছিলাম। এখন মুখ খুললেন সাধুবাবা,

—কোথা থেকে আসছিস্ ?

মুখে হাসি হাসি ভাব আনলাম একটা। সংসারে অন্যকে খুশী করতে—স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, শাশুড়ী বউমাকে, বউমা শাশুড়ীকে, অফিসে ছোটবাবু বড়বাবুকে—যেকোন পরিবারে, যেকোন পরিবেশে, যে কোনভাবে নিজের স্বার্থসিদ্ধি কিংবা ভালোমানুষী ভাব দেখানোর জন্যে আর সকলে যেমন মিথ্যা হাসি একটা ফুটিয়ে তোলে মুখে তেমন ভাবটাই করে বললাম,

—বাবা, বাড়ী আমার কলকাতায়। দূর থেকে আপনাকে দেখতে পেলাম। ভালো লাগলো। তাই এসে বসলাম আপনার কাছে।

কথাটা শুনে কিছু একটা চিন্তা করলেন মনে হলো মুখের ভাবটা দেখে। কিন্তু কোন কথা বললেন না। তীর্থযাত্রীদের আনাগোনা লক্ষ্য করতে লাগলেন। আবার মাঝে মাঝেই তাকাচ্ছেন আমার মুখের দিকে। এইভাবে কাটলো আরও কিছুটা সময়। আমিই এবার জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, আপনার ডেরা কোথায়, এখানে ?

একটু অনিচ্ছার সুরেই বললেন,

—'নেহি বেটা', নিরোগ মানুষের যেমন কোন ওষুধের প্রয়োজন হয় না তেমনই কোন ডেরার প্রয়োজন হয় না সাধুদেরও। যখন কোন সাধুর ডেরা আছে দেখবি তখন নিশ্চিত জানবি, সেই সাধুর গৃহীদের মতো কোন কামনারোগে ধরেছে, চিকিৎসার প্রয়োজন।

এ-রকম কাঠখোট্টা কথা বলবেন, ভাবিনি। সঙ্গে সঙ্গেই বললাম,

—এটা কি ঠিক বললেন বাবা ? সাধুদের একটা ডেরা থাকলে শীত গ্রীষ্ম বর্ষার হাত থেকে যেমন বাঁচা যায় তেমনই সাধনভজনেরও তো অনেক সুবিধা হয় বলেই আমার মনে হয়, আপনার কি মত ?

চুপ করে রইলেন কথাটা শুনে। মনে হলো, কোন প্রয়োজন মনে করছেন না উত্তর দেয়ার। কাটলো বেশ কিছুটা সময়। আমিই বললাম একটু অনুনয়ের সুরেই,

—বাবা, আপনাকে প্রশ্ন করায় মানসিক দিক থেকে কি অপ্রসন্ন হয়েছেন আপনি ? যদি তেমন কিছু হয়ে থাকেন তাহলে উঠে যাচ্ছি আমি। আপনার কোন অসুবিধা হোক, এমন উদ্দেশ্য আমার নয়।

কথাটা বলে একটা অভিমানের ভাব নিয়ে যেই উঠতে যাবো, ওম্‌নি সাধুবাবা বললেন,

—বোস্‌ বোস্‌ বেটা, বোস্‌। মানসিক দিক থেকে অপ্রসন্ন হইনি আমি। তোকে দেখার পর থেকেই ভাবছি হাজার প্রশ্ন করবি আমাকে, এই ভাবনাই ভাবিয়ে তুলেছে আমাকে। আর কিছু নয়।

কথাটা শুনে মনে হলো বেশ কাজ হয়েছে। অভিমানের ভাব দেখানোটা বেশ কাজে লেগেছে। তাই আগের কথার রেশ টেনেই বললাম,

—বাবা, আগে যে কথাটা বললাম, সেটা কি ভুল বলেছি ?

এবার সাধুবাবার কণ্ঠে ফুটে উঠলো প্রতিবাদের সুর। বললেন,

—তোর কথার সঙ্গে আমি একমত নই। কেন জানিস্‌ ? জপ করবে মন। তাঁকে ডাকবে মন। মন মনেতেই করবে যাগযজ্ঞ হোম-পূজাদি। এরজন্যে ডেরার কি প্রয়োজন বলতো শুনি ? এই ঘাটে বসেই তো নিরবচ্ছিন্ন জপ করা যায়। আকুলভাবে ডাকা যায় তাঁকে। প্রাণ খুলে কাঁদা যায় তাঁর জন্যে। এরজন্যে কি কোন ডেরা বা প্রাসাদের প্রয়োজন আছে ? আর ডেরাই যদি সাধুরা করবে তাহলে বাড়ীঘর ছেড়ে পথে বেরোনো কেন ? নিজের বাড়ীর চেয়ে ভালো ডেরা কি কারও পথে ঘাটে অন্যের জমিতে হতে পারে ?

কথাটা শেষ হতে না হতেই বললাম,
—তাই যদি হয় বাবা, তাহলে জপের কাজটা তো ঘরে বসেও করা যেতো অনায়াসে। আপনি কেন তাহলে ঘর ছেড়ে পথে বেরোলেন? তাঁকে ডাকার কাজটা যখন মনেরই, তখন মনটা তো ঘরেও এ-কাজ করতে পারতো, তারজন্যে গৃহত্যাগের প্রয়োজনটা কোথায়, কেন ঘর ছাড়লেন আপনি?
এমন পাল্টা প্রশ্নে সাধুবাবা একটু দমে গেলেন মনে হলো। তবে মুহূর্তে সে ভাবটা কাটিয়ে উঠলেন, মুখ দেখে তাও মনে হলো। এবার হালকা একটা হাসির ভাব ফুটে উঠলো সাধুবাবার মুখে। বললেন,
—'হাঁ বেটা, তু সহি বাত বোলা।' তাঁকে ডাকবে মন, তা ঘরে বসেও ডাকা যায়। তবে আমার কথাই বলি, ঘর ছেড়েছি আমি ভগবানেরই প্রেরণাতে। ভিতর থেকে একদিন মনে হলো সব ছেড়ে দে। মনে হওয়ামাত্রই বেরিয়ে পড়লাম সব ছেড়ে। আর ফিরেও তাকালাম না পিছন দিকে। তবে একটা কথা আছে বেটা, আমরা কিন্তু কেউই সংসার ছাড়িনি —না তুই, না আমি। আমরা সকলেই আছি কিন্তু পরমাত্মার সংসারে। এখানে এসেছি বেড়াতে। সময় হলেই চলে যাবো, তুইও।
সাধুবাবা ঘাড় ঘুরিয়ে চারপাশটা একবার দেখে নিলেন। তারপর আমার মুখের দিকে তাকাতেই বললাম,
—বাড়ী কোথায় ছিল আপনার?
—উত্তরপ্রদেশের সীতাপুর জেলায়।
কোন রকম বিরক্তি প্রকাশ না করেই উত্তর দিচ্ছেন সাধুবাবা। আনন্দে মনটা আমার ভরে উঠেছে। এমন আনন্দ হয় আর সকলেরই, কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কারও কাছে গেলে সেখানে কার্যসিদ্ধি এবং ব্যবহার ভালো পেলে। এখন আমার মনের অবস্থাটা ঠিক সেই রকমই। জিজ্ঞাসা করলাম,
—প্রভাসে আছেন কতদিন?
—মাসখানেক হলো, এবার চলে যাবো।
জানতে চাইলাম,
—কোথায় যাবেন এখান থেকে?
হাসতে হাসতেই বললেন,
—তার কি কোন ঠিক আছে বেটা! কোন কাজই সাধুদের ভেবে করার উপায় নেই। তাঁর ইচ্ছাতেই যে চলতে হয়। সাধুদের ইচ্ছাটা তো তাঁর ইচ্ছার উপরেই ছেড়ে দেয়া। তাই কোন কাজ আগের থেকে ভেবে করার উপায় নেই। তাঁর প্রেরণাতেই করতে হয় সবকিছুই। 'ইচ্ছার' দায়িত্বটা নিজের ঘাড়ে রাখলে হালকা হয়ে চলা যায় না। বোঝাটা নামিয়ে দিয়েছি বহুকাল আগেই।
সাধুবাবার কথায় মনে পড়লো রেলের কথা। লাগেজ কম, ভ্রমণে আরাম বেশী। কিন্তু আমি দেখেছি এই ভ্রমণপথে, এক একটা পরিবার আছে যারা ভ্রমণে বেরোয় শুধু বাড়ীটা বাদ দিয়ে সারা বিশ্বসংসার বাক্স প্যাটরায় ঢুকিয়ে নিয়ে। এরা

পথে বেরোয় বোঝা বইতে। এদের জন্মই হয়েছে বোঝা বইবার জন্যে, বয়ে থাকে অনন্তকাল ধরে। মরার সময় বোধ হয় শীল নোড়াটাও রেখে যাবে না, ফেলে যাবে না হুকহীন ব্লাউজের সেপটিপিনগুলো। অথচ দেখেছি, এরা যা নিয়ে বেরোয় তার অর্ধেকও কাজে লাগে না পথে, তবুও নিয়ে যাওয়া চাই-ই। অনেকে অনেক কিছুই নিয়ে যায়। তারমধ্যে পোশাকই বেশী, লোক দেখানোর জন্যে। ফিরেও দেখে না কেউই কারণ নিজেকে সাজিয়ে, নিজেকে দেখতে, নিজেকে নিয়েই বেশী বড় ব্যস্ত, ভালোও বাসে তাই—তাই অপরকে দেখার সময় কোথায়? ওঁরাই প্রকৃত বাবু, এরা কুলি যে!

আমরা দুজনে ঘাটগুলো থেকে একটু দূরে বসেই কথা বলছি। কোলাহল বা বিরক্ত হওয়ার মতো কোন পরিবেশ নেই এখানে। কাছাকাছিও কেউ নেই। তবে তীর্থ-যাত্রীদের আনাগোনাটা দেখতে পাচ্ছি। কোলাহলের হালকা আওয়াজ ভেসে আসছে স্নানের ঘাট থেকে। তাতে কোন ব্যাঘাত ঘটছে না আমাদের কথাবার্তায়। জিজ্ঞাসা করলাম সাধুবাবাকে,

—বাবা, বিয়ের পর গৃহত্যাগ করেছেন, না কুমার ব্রহ্মচারী?

ডানহাত দাড়িতে একবার বুলিয়ে হাসিমুখেই বললেন,

—না বেটা, সেই বারো বছর বয়েসে গৃহত্যাগ করেছি, 'সাদি-উদি' কিছু করিনি আমি।

—এখন বয়েস কত হবে আপনার?

ভুরুটা একটু কুচকে বললেন,

—কত আর হবে, পঁচাত্তর আশি।

এবার একেবারে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলাম,

—আপনি বললেন বারো বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেছেন। তখন তো একেবারেই বাচ্চা। ওইটুকু বয়েসে 'ভগবানের প্রেরণা'র কি বুঝেছিলেন, কি উপলব্ধি হয়েছিল আপনার যে একেবারে গৃহত্যাগ করলেন, অন্য কিছু মাথায় এলো না?

আবেগভরা কণ্ঠে সাধুবাবা বললেন,

—বেটা, তখন আমি একেবারেই নাবালক। ভগবানের কথা আমি কিছুই বুঝি না। অথচ তখন মনে এমন একটা ভাব, এমন একটা প্রেরণার উদয় হলো প্রাণে, আমার আর কিছুই ভালো লাগলো না সংসারের। কিছুতেই পারলাম না ঘরে থাকতে। একদিন ছুটে বেরিয়ে পড়লাম সংসারের সকলকে, সবকিছুকে ত্যাগ করে।

কথাটা শুনে মনের খট্‌কা গেল না। বললাম,

ওই বয়েসে হঠাৎ করে মনের এমন অবস্থা হয়? আর প্রেরণাই বা কি, আমার ঠিক বোধগম্য হলো না বাবা।

এবার সাধুবাবা যা বললেন তাতে আমার কিছু আর বলার রইলো না। প্রসন্ন মনেই বললেন,

—'বেটা, রমণ সময়ে রমণসুখের অনুভূতি রমণকারী ছাড়া আর কি কেউ বুঝতে

পারে ? আর ওই আনন্দের যে অনুভূতি তা কি দেখানো যায়, না কোনভাবে বুঝিয়ে বলা যায় ? কারও অন্তরে শোকের কথা কি কেউ ভাষায় প্রকাশ করতে পারে ? যে শোক পেয়েছে সে-ই জানে, শোকের সময় অন্তরে যন্ত্রণাটা কেমন হয়। প্রাণে আমার কি প্রেরণা তিনি দিয়েছিলেন তা কেমন করে, কি দিয়ে বোঝাই বলতো ?

কথাটা শুনে মনে হলো কোন শোক বা দুঃখে নয়, মনের তাৎক্ষণিক আবেগবশত হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছিলেন ঘর ছেড়ে, কোন কিছু না ভেবেই। যেটা কোনভাবেই এখন বোঝানো সম্ভব হচ্ছে না সাধুবাবার পক্ষে। এই 'আবেগজনিত' কারণটাই হয়তো সাধুবাবা বলতে চাইছেন ভগবানের প্রেরণা। অথবা জন্মান্তরের সংস্কারগত কোন কারণে হঠাৎ মনের পরিবর্তনে সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন পথে। যাইহোক, এবার আর ও প্রসঙ্গে না গিয়ে চলে গেলাম অন্য প্রসঙ্গে,

—বাবা, আপকা চলতা ক্যায়সে, ভিখ্‌সা করতা ?

এ-প্রশ্নে কণ্ঠের সুর পরিবর্তন হয়ে গেল সাধুবাবার। এবার উত্তর দিলেন বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই,

—'নেহি বেটা, ম্যায় কভি কিসি সে ভিখ্‌সা নেহি মাঙা, মাঙ্‌তা ভি নেহি। ম্যায় সাধু হুঁ, ভিখারী নেহি হুঁ।' কেউ কিছু দিলে খাই, না দিলে খাই না। কারও কাছে চেয়ে খাই না কখনও। পরমাত্মার কৃপায় চলি, জুটে যায়।

এ-কথার উপর এবার প্রশ্ন করলাম কথায় একটু প্যাঁচ মেরে,

—বাবা, আপনার আমার কুকুর বিড়াল, এমনকি সারা জগৎ সংসারটাই তো চলছে পরমাত্মার কৃপায়। সেকথা বলছি না আমি। প্রশ্ন আছে। একটা। এমনও তো কখনও হয় যেমন ধরুন, অসম্ভব ক্ষিদে পেয়েছে আপনার, একটা পয়সাও নেই কাছে। অথচ এমন ক্ষিদে পেয়েছে যে, সেই সময় কিছু না খেলে নয়ই, খেতেই হবে কিছু। সহ্য করার মতো অবস্থাটাই নেই। এমন অবস্থায় ভিক্ষে ছাড়া উপায় কি, কারও কাছে চাইতে হয় নিশ্চয়ই ?

একটু হাসলেন সাধুবাবা কথাটা শুনে। হাল্‌কা হাসি। মুখের তোবড়ানো হনুদুটো একটু নড়ে উঠেই থেমে গেল। মনে মনে ভাবলাম, সাধুবাবার কথায় ফাঁসিয়ে দিয়েছি সাধুবাবাকেই। এতে একটু পুলক সৃষ্টি হলো মনে। বৃদ্ধ সাধুবাবা বললেন,

—এ সব জেনে তুই কি করবি ?

আমিও মুখে একটু হাসি মাখিয়ে বললাম,

—সাধুদের দীর্ঘ সাধনজীবন আর তাঁদের চলার পথের খুঁটিনাটি বিষয়ের উপরেই তো আমার যত কৌতূহল। জানতে ইচ্ছে করে, তাই তো আপনার কাছে জানতে চাওয়া। বললে আর যাইহোক, ক্ষতি তো কিছু হবে না আপনার।

এবার সাধারণ মানুষের মনস্তত্ত্বের এমন কিছু কথা শোনালেন সাধুবাবা, যা শুনে অবাক হয়ে গেলাম আমি। তিনি বললেন,

—বেটা, ভিক্ষা চাইলে তো আমি ভিখারীই হয়ে গেলাম, সাধু রইলাম কোথায়।

তুই যখন জানতে চাইছিস্ তখন বলি শোন্। ধর্ খু-উ-ব ক্ষিদে পেয়েছে। কাছে একটা পয়সাও নেই। কিন্তু কিছু খেতেই হবে অথচ চাইবো না কারও কাছে। তখন কি করি জানিস্? কোন খাবারের দোকানের সামনে গিয়ে বসি। এমনভাবে, এমন জায়গায় গিয়ে বসি যাতে দোকানদার আমাকে দেখতে পায়। বসি, তবে বলিনা কিছু। যদি কিছু খেতে বা ভিক্ষে চাই, একবার যদি দোকানদার বলে বসে 'মাপ করো বাবা', তাহলে সেখানে আর দাঁড়াতে পারবো না। চলে যেতেই হবে। তাই কোন কথাই বলি না। বসে থাকি চুপ করে। ফিরেও তাকাই না দোকানদারের দিকে। এইভাবে বসে থাকলে দোকানদার ভাবে, পথ চলতে চলতে হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তাই বসে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। এমনভাবে কিছুক্ষণ বসে থাকলে দোকানদার নিজের থেকেই বলে, কোথায় থাকি, কোথা থেকে আসছি বা কোথায় যাবো? তখন কথার জবাব দিই। এরপর কথায় কথায় দোকানদারই একসময় বলে, 'বাবা, একটু চা খাবে নাকি?' আমিও বলি, 'যদি দয়া করে দাও তো আমার কোন আপত্তি নেই।' বেটা, চা দিলে শুধু চা-ই দেয় না। সঙ্গে বিস্কুট পাউরুটি বা অন্য কিছুও একটা দেয়। যদি হোটেল হয়, তাহলে দেয় রুটি সব্জি। তখন তাতেই ক্ষিদে মিটে যায় আমার। এবার বুঝতে পারলি, ভিক্ষে চাইতে হলো না আমাকে অথচ ক্ষিদেটাও মিটলো।

বুঝলাম, যেকোন মানুষ সে যদি নিষ্ঠুর কিংবা ধর্মে অবিশ্বাসীও হয়, সাধুদের উপর দুর্বলতা কমবেশী একটা আছেই। আর ধর্মভীরু হলে তো কথাই নেই। সেই দুর্বলতাকে কাজে লাগানোর কথাটা জানতে পেরে অবাক হয়ে গেলাম। আবার এটাও সত্য, কিছু চাইলে প্রায় সময়েই সাধুদের 'মাপ করো বাবা' কথাটা শুনতেই হয়। সুতরাং উপায় কি! এসব কথা ভাবছি একটু অন্যমনস্ক হয়ে মাথা নীচু করে। মাথাটা তুলতেই দেখি সাধুবাবা হাসছেন, হাসছেন মুচ্কি হাসি। রহস্যময় হাসি। হাসতে হাসতেই বললেন,

—বেটা, সৎপথে থাকলে, তাঁর উপর ভরসা থাকলে, আমাকে যেমন—তেমনই তিনি এইভাবেই মানুষের মধ্যে দিয়ে দয়া করেন মানুষকেই। তাঁর দয়া প্রকাশের একমাত্র মাধ্যমই তো মানুষ। আগে মানুষ পরে ভগবান। আর ভগবানের দয়া তো এইভাবেই চোখে দেখা যায় বেটা।

এবার সাধুবাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, কোন্ সম্প্রদায়ের সাধু আপনি?

প্রসন্নচিত্তেই বললেন,

—বেটা, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের চারটে শাখা আছে। যেমন, শ্রীবৈষ্ণব, বল্লভ, নিম্বার্ক আর মধ্ব। এর মধ্যে বল্লভ সম্প্রদায়ের সাধু আমি।

জানতে চাইলাম,

—সাধুজীবনে আসার পর আপনার কখনও কি কোনভাবে মনের পতন ঘটেছে?

উত্তরে একটু গম্ভীরভাবেই সাধুবাবা বললেন,

—এসব কথায় তোর কি দরকার বলতো, কি হবে তোর এসব একথা জেনে ?

বুঝলাম সাধুবাবা একটু বিরক্ত হলেন। তাই একেবারে বিনীত সুরেই বললাম,

—বাবা, নিজে তো এ-পথে আসতে পারলাম না, তাই জানতে ইচ্ছে করে এ-পথের কথা—এ-জীবন, মনের কথা।

কথাটা শুনে সাধুবাবা বসে রইলেন চুপ করে। কিছুটা সময় কেটে গেল এইভাবে। মনেই হলো, অতীত থেকে বর্তমান ভেবে নিলেন তিনি। তারপর একেবারে আমার চোখের উপর চোখদুটো রেখে বললেন,

—বেটা, এই জীবনে এসে সেই বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত কোন গর্হিত কাজ আমি করিনি। সুতরাং মনের পতন বলতে যা, তা আমার হয়নি কখনও। বেটা, যে রমণীর পদ্মফুলের কুঁড়ির মতো সুন্দর স্তনযুগল নেই, সে নারী যেমন কোন পুরুষের কাছেই শোভা পায় না, তেমনই অহংকার গৌরব যশ প্রতিষ্ঠা সম্মান শোভা পায় না সংসারহীন সাধুদেরও। ওসব তো আমার কিছুই নেই, যার সূত্র ধরে মনের পতন ঘটার ভয় থাকবে। তবে হ্যাঁ, লোভটোভ কখনও কখনও হয়েছে। যেমন ধর্, কোন জিনিষ খাওয়ার ব্যাপারে মাঝেমধ্যে লোভ হয়েছে। কখনও কোন কারণে মনে সৃষ্টি হয়েছে ক্রোধের আবার তার উপশমও হয়েছে। এটাকে যদি মনের পতন বলিস্, তাহলে হয়েছে। আর বেটা জীবন তো আমার ফুরিয়েই এলো। আজ পর্যন্ত কোন কিছুর উপরেই আমার কোন মোহ জম্মায়নি। সংসার নেই, থাকা খাওয়ার ঠিকানা নেই, তাই হয়তো মোহটা জম্মাতে পারেনি। মোহ-ভ্রূণের সৃষ্টিই তো সংসারগর্ভে। আর সৃষ্টি হয় সেইসব বেশীরভাগ সাধুদের মধ্যে, যারা এক জায়গায় সংসারের মতো বসে আছে হাঁটুগেড়ে। কোথাও স্থায়ীভাবে বসলেই মোহের গর্ভসঞ্চারের সুবিধা হয় বেশী।

এবার একেবারে সোজাসুজি প্রশ্ন করলাম,

—বাবা, এখন তো আপনার বয়েস হয়েছে অনেকই। এখনকার কথা ছেড়ে দিন। আপনার যৌবনকালের কথাই বলছি। প্রকৃতির নিয়মে যৌবনে নারীপুরুষ সকলেরই দেহমনে কামভোগের বাসনা একটা জাগেই। এই সত্যকে সাধু-সন্ন্যাসী বা গৃহী, একেবারে পাগল না হলে কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। এ-ব্যাপারে আপনি কি বলেন ?

মাথা নাড়িয়ে স্বীকার করেও সাধুবাবা মুখে বললেন,

—হাঁ বেটা, এটা তুই ঠিকই বলেছিস্। এই সুন্দর সত্যকে অস্বীকার করলে বাবা মাকে, চিরন্তন সত্যকেই অস্বীকার করা হয়।

এ-কথায় বেশ জোর পেয়ে গেলাম, বাগে পেয়ে গেলাম সাধুবাবাকে। সঙ্গে সঙ্গেই বললাম,

—এটাই যদি অনাদিকালের সত্য তাহলে আপনার যৌবনে কখনও কি কোনভাবে নারীভোগের বাসনা জাগেনি মনে ?

এ-প্রশ্নে সাধুবাবা বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন বলে মনে হলো না। শান্ত ও ধীর কণ্ঠে

বললেন,

—যখন গৃহত্যাগ করি তখন বয়েস আমার বারো। ঘর ছাড়ার বছরখানেক পর পেলাম গুরুজীর আশ্রয়। সদা সর্বদা থাকতাম তাঁরই কাছে। তখন কামের কোন চিন্তাই আসেনি মনে। কাম—ও-সব কিছুই বুঝতাম না। তারপর কৈশোর থেকে পা দিলাম যৌবনে। তখন প্রাকৃতিক নিয়মেই এলো কামের একটা শিহরণ, অনুভূতি। নারীসঙ্গ বা কামপ্রসঙ্গে কোন আলোচনাই জীবনে কখনও করিনি কারও সঙ্গে। ফলে কামের প্রয়োগ কিভাবে করতে হয় তা বুঝতাম না, জানতামও না। ফলে প্রকৃতির নিয়মেই আসতো দেহ ও মনে উত্তেজনা, আবার শান্তও হয়ে যেতো প্রাকৃতিক নিয়মে। তবে চিন্তা যে একেবারে হতো না, তা নয়। সে চিন্তা নারী সংক্রান্ত নয়। তখন বয়েস অল্প। বুঝি না কিছুই। একদিন গুরুজীকে বললাম, 'দেহে এমন উত্তেজনা আসে কেন?' শুনে তিনি হাসলেন। শুধু একটা কথাই বললেন,

—বেটা, উসকা নাম হ্যায় কাম। কভি কিসিকো নেহি ছোড়তা। সাধনজীবন মে কাম বহুত বড়া দুশমন ভি হ্যায়, দোস্ত ভি। কামকে উপর ধেয়ান নেহি লাগাও তো ওহ্ আপনে ভাগ যায় গা। উসকো উপর মন্ লাগানে সে কাম তুমরা মন্‌কা পিছু কভি নেহি ছোড়ে গা। উস্‌কে লিয়ে কোই চিন্তা না করো। মন্‌সে উড়া দো। কুছ দিনকে বাদ দেখোগে কি সব ভাগ গিয়া।

এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা একবার এদিক ওদিক তাকালেন। কাউকে লক্ষ্য করে নয়, ফাঁকা তাকানো। কথায় গভীর মনোনিবেশ করে কথা বলার সময় সকলে অন্যদিকে যেমনভাবে তাকায়, দেখে না কিছু, তেমন। এবার দৃঢ়কণ্ঠে বললেন,

—বেটা, 'কামকে উপর ধ্যান নেহি লাগাও তো ওহ্ আপনে সে ভাগ্ যায় গা', গুরুজীর এই কথার উপরে প্রতিষ্ঠা করলাম নিজের মনকে। দীর্ঘকাল ও নিয়ে আর কিছুই ভাবলাম না। তাতে আমার যে জ্ঞান হলো একেবারে নিশ্চিত জানবি, দেহের কোন অংশের বা কোন ইন্দ্রিয়ের দীর্ঘকাল সাহায্য না নিলে বা ব্যবহার না করলে ক্রমেই তা প্রাকৃতিক নিয়মে 'প্রকৃতিশূন্য' হয়ে যায়। তাতে প্রকৃতিই করে দেয় 'প্রকৃতিশূন্য'।

কথাটা ভালোভাবে ধরতে না পেরে বললাম,

—বাবা, 'প্রকৃতিশূন্য' কথাটা একটু বুঝিয়ে বললে ভালো হতো।

এবার সাধুবাবা বসা অবস্থায় ডানহাতটা সোজা তুললেন উপরদিকে। ঊর্ধবাহু করে বললেন,

—এই দেখ্, এইভাবে হাতটাকে যদি বছরের পর বছর উপরে তুলে রাখিস্, কখনও নীচে না নামাস্, কোনভাবে কোনও কাজ যদি ওই হাতে না করিস্ তাহলে দেখবি, ধীরে ধীরে হাতটা তোর হয়ে পড়বে অকর্মণ্য, প্রকৃতিশূন্য। প্রকৃতির কোন ক্রিয়াই আর সম্ভব হবে না ওই হাতে। ঠিক সেইরকম, দীর্ঘকাল কামের প্রয়োগ না হলে, চিন্তা এবং লিঙ্গকে ব্যবহার না করলে ধীরে ধীরে তা কর্ম বা প্রকৃতিশূন্য হয়ে পড়ে। সাধুদের তো আর ইন্দ্রিয়সুখের বিষয় নিয়ে কোন মাথাব্যথা থাকে না।

তবে যার থাকে তার থাকে। আমার অন্তত ছিল না। বাল্যকাল থেকেই ওর ব্যবহার হয়নি কখনও। ফলে কৈশোর যৌবন এবং প্রৌঢ়ত্বের দিনগুলোতে কাম-ইন্দ্রিয় ছিল আমার প্রকৃতিশূন্য অবস্থায়। তাই নারীভোগের বাসনা বা কামনা কখনও মনেই আসেনি।

প্রসঙ্গ পাল্টালাম। কারণ হু-হু করে কেটে যাচ্ছে সময়। হাতে সময় অল্প। অথচ জানতে হবে অনেক কথা। তাই জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, সাধুজীবনে যখন আছেন তখন নিশ্চয়ই জানেন, আপনার মতো পথ চলতি সাধু যাঁরা, তাঁদের কোন আশ্রয় নেই—নেই কোন ঠিকানা। আজ এখানে কাল সেখানে, এইভাবেই কেটে যায় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। আমার জিজ্ঞাসা, শেষ দিনটাকে নিয়ে। দেহত্যাগের পরই, কে বা কারা তাঁদের দেহটাকে দাহ করে বা সমাধি দেয়?

প্রশ্নটা শুনে একটা অদ্ভুত প্রসন্নতার ভাব ফুটে উঠলো সাধুবাবার মুখখানায়। একটু ভেবে নিয়ে বললেন,

—বেটা, যেসব সাধু-সন্ন্যাসীরা মঠ মন্দির আশ্রমে আশ্রয় নিয়ে আছেন, তাঁদের দেহত্যাগের পর মৃতদেহ দাহ করে বা বিশেষ নির্দেশ থাকলে সমাধি দিয়ে দেয় তাঁর ভক্তশিষ্যরা। সমাজে এটা হয়তো দেখেই থাকবি। আর আমার মতো 'রমতা' সাধু যাঁরা, তাঁরা বেওয়ারিস্‌ই বলতে পারিস্‌। কিন্তু এঁদের এমনই ভাগ্য, তাঁর নামে পড়ে থাকায় তাঁর এমনই কৃপা এঁদের উপরে, একটু খোঁজ নিলেই দেখতে পাবি এঁরা সচরাচর হাসপাতালে মারা যায় না। দেহটাও পচে গলে পড়ে থাকে না মর্গে, পথেঘাটে। 'গণদাহ'-র মতো পুড়িয়েও দেয়া হয় না এদের মরদেহ। দৈবাৎ কখনও এক-আধটা হলেও হতে পারে, তবে হয় না বললেই চলে। আমি অন্তত এই বয়েস পর্যন্ত দেখিনি কখনও।

একটু থামলেন। এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে নিলেন একটু। কথায় কথা টেনে এনে ছেদ টানলাম না কথায়। সাধুবাবা আবার শুরু করলেন,

—পথচলতি সাধুদের দেখবি, সবসময়েই কোন না কোন তীর্থে অবস্থান করে তাঁরা। বেটা, মন থেকে সব সাধুরা সব কিছু ছাড়তে পারে কিনা জানি না, তবে সব ছাড়তে পারুক বা না পারুক, ভগবানের নামে পড়ে থাকার ফল একটা আছেই আছে। সারাজীবনে অনেকটা পথই তো চললাম। এই চলার পথে দেখেছি, প্রায় সব 'রমতা' সাধুদের মৃত্যু হয় অতি সামান্য রোগে ভুগে। 'রমতা' সাধু দীর্ঘকাল ভুগে ভুগে মারা গেছে এমন তুই পাবি না। আমি নিজেও দেখিনি কখনও। ভগবানের কত দয়া! দেখেছি, মৃত্যুর সময় কোন ভালো মানুষকে তিনি পাঠিয়ে দেন মৃত্যুপথযাত্রী সাধুর কাছে। পাঠিয়ে দেন তিনি শেষ সেবাটুকু আর শেষকৃত্যাদি সম্পন্ন করার জন্যে। আর্থিকসম্পন্ন হলে সে নিজেই বহন করে সমস্ত খরচা। নইলে সে এবং স্থানীয় আর সকলে মিলে সাহায্য তুলেই শেষ করে শেষ কাজটা। কখনও কোথাও কোন সাধুর শেষকৃত্যাদি সম্পন্ন করতে অসুবিধে হয়েছে এমনটা দেখিনি।

তবে খুব আর্থিক অসুবিধে হলে পথচলতি সাধুর দেহটাকে নদী কিংবা গঙ্গার জলেই ভাসিয়ে দেয় সাধারণ মানুষ। তবে সারাজীবনে এমন ভাসিয়ে দিতে দেখেছি এক-আধবার।

একটু থেমে কি একটু ভাবলেন যেন! তারপর আবার বললেন,

—তবে গিরি সম্প্রদায়ের সাধুদের অনেকের দেহকে দেখেছি সলিলসমাধি দিতে। দেহরক্ষার পর মৃতদেহে পরিয়ে দেয়া হয় নতুন বসন। তারপর সুন্দরভাবে সাজিয়ে দেয়া হয় ফুলের মালা দিয়ে। এবার ভারী ভারী পাথর বেঁধে দেয়া হয় মরদেহে। এসব কাজ শেষ হলে দেহটাকে নৌকায় করে নিয়ে যাওয়া হয় মাঝগঙ্গায়। যেখানে গঙ্গা নেই সেখানে কোন নদীতে। নৌকার মধ্যে আসন অবস্থায় বসিয়ে পরে দেহটাকে ধরে ধীরে ধীরে ছেড়ে দেয়া হয় জলে। তারপর দেখতে দেখতে তলিয়ে যায় দেহটা। এইভাবেই দেয়া হয় সলিলসমাধি।

কথাটা শেষ হতেই জানতে চাইলাম,

—বাবা, এইভাবে জলসমাধি দেয়া হয় কেন? এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে, আপনি কি জানেন বা শুনেছেন কিছু?

একটু ভেবে নিয়েই সাধুবাবা বললেন,

—হিন্দুদের দেহ পুড়িয়ে ফেলা, খ্রীষ্টান এবং মুসলমানদের কবর দেওয়ার রীতিই প্রচলিত আছে। জলসমাধি দেয়াটা গিরি সম্প্রদায়ের একটা রীতিই বলতে পারিস্। অবশ্য এর পিছনে কোন কারণ থাকলেও থাকতে পারে। ঠিক বলতে পারবো না। তবে আমার ধারণা, জলসমাধি আর কিছু কিছু হিন্দু সাধুর মরদেহ সমাধি দেয়ার পিছনে একটা কারণ, সাধনভজনে দেহটা নাম-ময় হয়ে যায় বলে। তবে বেটা, হিন্দুদের মৃত্যুর পর দেহটা পুড়িয়ে ফেলার একটা বড় কারণ আছে। সেটা কি জানিস্? মৃত্যুর পর আত্মা দেহ ছেড়ে চলে গেলেও জাগতিক বিষয় এবং দেহটার উপর আকর্ষণ একটা থেকেই যায় প্রথম অবস্থায়, যদি উন্নত ও মুক্ত আত্মা না হয়। দেহ সমাধি দিলে আত্মা ওই দেহের উপর আকর্ষণ অনুভব করে যতদিন না দেহটা মাটিতে মিশে যাচ্ছে, যতদিন না মুক্তি পাচ্ছে বা পুনর্জন্ম হচ্ছে সেই আত্মার। এতে আত্মার কষ্ট বাড়ে। দেহটা পুড়িয়ে ফেললে প্রথম আকর্ষণ দেহটার উপর মায়া কেটে যায় অতিদ্রুত। আত্মার পরিতৃপ্তির জন্যেই মৃত্যুর পর দেহ পুড়িয়ে ফেলার রীতি। বেটা, মৃত ব্যক্তির ফটোও ঘরে রাখা উচিত নয়, প্রকৃতই মানুষ যদি তাঁর স্বজনের আত্মিক কল্যাণ চায়। মৃত ব্যক্তির ছবিও আত্মার মায়া এবং কষ্ট বৃদ্ধির কারণ জানবি।

এবার একেবারে সোজাসুজি সেই আগের প্রশ্নেই ফিরে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, এমন এক অনিশ্চিত জীবন কেন আপনি বেছে নিলেন? আগেই বলেছেন, ভগবানের প্রেরণাতেই ঘর ছেড়েছেন। প্রেরণাটা এলো কেমন করে?

এ-প্রশ্নে এবার একটু থতমত খেয়ে গেলেন সাধুবাবা। তারপরই সে ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে বললেন,

—কোন্ জীবনটা নিশ্চিত বলতে পারিস্ বেটা ? তবুও এ-পথে তাঁকে পাওয়ার একটা আশা থাকে সাধু-সন্ন্যাসীদের। সংসারজীবনে তাঁকে লাভ করা যে কত কঠিন তা একমাত্র সংসারীরাই বলতে পারে। সবকিছুর মধ্যে থেকে ক-জন সংসারী তাঁকে লাভ করেছে ? এ-পথটাও যে তাঁকে লাভ করার জন্যে অতি সরল, তা যে নয় সেটা তো আমি খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছি। আর এ-পথে আসার প্রেরণাটা কেমন করে এলো বলি শোন্। একেবারে ছোটবেলাতেই মারা গেল আমার বাবা-মা। তখন ছোট্ট শিশু আমি। বয়েস বছর পাঁচেক হবে। রইলাম আমি আর দিদি। ওর তখন বিয়ে হয়ে গেছিল, অল্প বয়েসে। আমি বাবা-মায়ের একটু বেশী বয়েসের সন্তান। মায়ের মতো স্নেহ ভালোবাসা যেটুকু তা পেয়েছি দিদির কাছ থেকেই। তারপর দিদিও হঠাৎ একদিন চলে গেল সামান্য রোগে। তখন বয়েস আমার আন্দাজ বারোই হবে। মানসিক দিক থেকে কেউ আমার আর সহায় সম্বল রইলো না। একেবারে অধীর হয়ে পড়লাম শোকে। কথাগুলো বলার সময় বিবর্ণ ফ্যাকাসে হয়ে গেল সাধুবাবার মুখখানা। অন্তরের দুঃখের একটা ছাপ ফুটে উঠলো সারা চোখেমুখে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন,

—নিজের বলতে আমার কেউই রইলো না সংসারে। এমন একটা অবস্থায় ভিতর থেকে কে যেন বলে দিল, বেরিয়ে পড়, বেরিয়ে পড়। রোগ শোক দুঃখ বেদনা আর জ্বালার নামই সংসার। সংসারে থাকলে তোকে ঘর করতে হবে ওদেরই সঙ্গে। যদি শান্তি চাস্, এখনই বেরিয়ে পড়। একদিন নয়, প্রতিদিন একই সুর, একই কথা কে যেন বলতে লাগলো অন্তরে। এতে একেবারে অস্থির হয়ে পড়লাম আমি। একদিন একছুটে বেরিয়ে পড়লাম ঘর ছেড়ে। তারপর স্থির হয়ে গেলাম ধীরে ধীরে। ভগবানকে লাভ করার বাসনা আমার কিছুই ছিল না কখনও। এইভাবেই একদিন বেরিয়ে পড়েছিলাম পথে, নিঃশব্দে। যেমন কেউ টের পায়নি এ-পথে আসার সময়, তেমনই টের পাবে না কেউই, চলে গেলে। বেটা, এ-পথে আসার কারণ এটাই। এটাকেই আমি মনে করি ভগবানের প্রেরণা।

সাধুবাবার বিমর্ষ ভাবটা কাটাতে একটু রসিকতার সুরেই বললাম,

—তাহলে বাবা সংসারের ভয়েতেই বলুন আপনি গৃহত্যাগ করেছেন ?

মুখের তাৎক্ষণিক মলিনভাবটা কাটিয়ে আবার সাধারণভাবেই ফিরে এসে সাধুবাবা বললেন,

—বেটা, বারো বছর বয়েসে সংসারে ভয়, তখন সংসারের বুঝিটা কি ? যদি মনে করিস্ ভয়েতে এসেছি এ-পথে, তাতে ভালোই হয়েছে আমার। ভালো আছি বেটা, বেশ ভালো আছি। পরম শান্তিতে আছি। আমার মতো কটা লোক আছে এমন শান্তিতে, এমন আনন্দে !

অনেক দিনের জমে থাকা একটা প্রশ্ন হঠাৎ মনে পড়ে গেল। বলেই ফেললাম,

—বাবা, ভারতের প্রায় সব সাধকের জীবনীই আমি পড়েছি। তাতে একটা বিষয়

লক্ষ্য করেছি, প্রায় প্রতিটি সাধকই বলে গেছেন 'সংসারে থেকেও তাঁকে লাভ করা যায়।' এসব কথা যাঁরা বলেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রায় কেউই কিন্তু সংসার করেননি। এমন অসংখ্য উদাহরণ আমি দিতে পারি। যাঁরা করেছেন, তাঁরাও কিছুদিনের জন্যে। তারপর বেরিয়ে পড়েছেন সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে। মোটের উপর ওই কথার বক্তা সাধক বা সাধু-সন্ন্যাসীরা শেষ পর্যন্ত কেউই ছিলেন না সংসারে। আপনি বাংলার ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাম শুনেছেন কিনা জানি না। তিনিও বলেছেন ওই একই ধরনের কথা। অথচ তিনিও নিজে গতরে খেটে রোজগার করে, সংসারে থেকে আর পাঁচজনকে খাইয়ে, নিজে খেয়ে সংসার করেননি কখনও। তাঁকেও একটা আলাদা জীবনে এসে থাকতে হয়েছে গ্রাম ছেড়ে এসে। সাধকেরা নিজেরা সংসার করলেন না অথচ জ্ঞান দিলেন সংসারীদের, 'সংসারেই তাঁকে মিলবে', সাধুদের এ-কোন ধরনের উপদেশ? এ-ব্যাপারে আপনার কি মত?
কথাটা শুনে হেসে ফেললেন সাধুবাবা। বললেন,
—বেটা, সাধুজীবন আর সংসারজীবন, সবক্ষেত্রেই লাভ করা যায় তাঁকে। ঘর ছেড়ে বেরোনো সকলের পক্ষেই সম্ভব নয়। সৃষ্টির নিয়মেই এটা সম্ভব নয়। চেষ্টা করেও সম্ভব নয়। সংসারের সার্বিক ভোগের ভিতর দিয়ে তাঁকে ডাকা এক জীবন, সাধুদের ভোগবিহীন সংযম আর কঠোরতার এক জীবনসাধনা—এ-দুই জীবনের পার্থক্য অনেক। আমার ধারণা এবং বিশ্বাস, সংসারত্যাগী মহাপুরুষ বা সাধকেরা ও-কথা বলেছেন এই কারণে গৃহীরা যেন এমন না ভাবে, সংসারে থেকে তাঁকে লাভ করা যায় না। তবে বেটা, সংসারীদের কাঁধে বোঝা নিয়ে চলা, আর সাধুদের ঝাড়া হাত-পা, তফাৎ এই। এবার সংসারীদের মধ্যে কামনা বাসনার বোঝার ভার যার যত বেশী, তার চলার গতিও তত কম। সাধু-গৃহী, কেউ দুদিন আগে কেউ পৌঁছাবে দুদিন পরে, এই আর কি! তবে ছোট্ট একটা কথা এখানে বলে রাখি বেটা, সংসারীরা সাধনবলে সাধনমার্গে অনেক উচ্চাবস্থাপ্রাপ্ত হতে পারে কিন্তু তাদের কখনও বিভূতিলাভ হয় না, এ-কথা একেবারে নিশ্চিত সত্য বলে জানবি।
সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করলাম,
—তাহলে গৃহত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীরা কি সকলেই বিভূতিলাভের অধিকারী হতে পারে? আপনার কি সে লাভ হয়েছে?
হাত আর মাথা নাড়িয়ে সাধুবাবা বললেন,
—না না বেটা, আমার ও-সব লাভটাভ হয়নি। কঠোরতম যোগ সাধনার মাধ্যমেই বিভূতিলাভ হয় যোগীদের। আর লাভ হয় কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্য পালনকারী সাধু-সন্ন্যাসীদের তবে সুকঠিন ও কঠোর তপস্যা তাদের থাকতেই হবে নইলে ও শক্তি লাভ হবার নয়। তবুও বলবো লাখে একটা সাধুর হয় কিনা সন্দেহ!
অনেকটা সময় কেটে গেল এখানে। এবার শেষ প্রশ্নের উত্তরের আশায় কথা পাড়লাম,

—বাবা, একটু আগেই আপনি বলেছেন, গৃহত্যাগের সময় কোন বাসনাই ছিল না আপনার। বাসনাই যখন ছিল না তখন কি নিয়ে, কেমন ভাবে পাড়ি দিলেন জীবনের এতগুলো বছর ?

এ-প্রশ্নে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করেই সাধুবাবা বললেন,

—এ-পথে যখন নেমে পড়লাম তখন সম্বল তো একটা কিছু চাই-ই, যাকে ধরে পথ চলা যায়। তবে আমাকে ধরতে হলো না বেটা। তিনিই আমাকে ধরলেন। তাঁর করুণাতেই গুরুলাভ হলো আমার। তারপর ভগবানের নামস্বরূপকে সম্বল করেই পথ চললাম। তিনিই কেমন করে যেন কাটিয়ে দিলেন জীবনের এতগুলো বছর।

এ-কথার উপরেই প্রশ্ন করলাম সাধুবাবাকে,

—বাবা, সকলেই বলেন ভগবানকে ডাকার একটা ফল আছে। সে ফল কি আপনি পেয়েছেন ? সে ফলটাই বা কি ?

নির্লিপ্ত উদাসীন কণ্ঠে সাধুবাবা প্রভাসতীর্থের সাগর পাড়ে বসে উত্তর দিলেন শেষ প্রশ্নের,

—পেয়েছি মানে! প্রতিটি মুহূর্তেই পাই। বেটা, গুরু আমার বীজ বপন করে দিয়েছেন। তারপর সযত্ন লালনে সে বীজ ফুটে গাছ হয়েছে, বড়ও হয়েছে ধীরে ধীরে। একসময় দেখলাম ফলও হয়েছে গাছে। সে ফলটা কি জানিস্, পরমানন্দ। আত্মার গাছ আমার ভরে গেছে পরমানন্দ ফলে।

কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই টস্‌টস্ করে কয়েক ফোঁটা জল নেমে এলো সাধুবাবার দুচোখ বেয়ে। আর প্রশ্ন করার মতো কিছু রইলো না আমার। মনে মনে ভাবলাম, সার্থক জন্ম তোমার সাধুবাবা। পৃথিবীতে এসে সহসা মানুষ যা পায় না, তা পেয়েছেন নিঃস্ব এই সাধুবাবা। এমন পাওয়া মানুষটাকে কাছে পেয়ে আমারই বা কি কম পাওয়া হলো! প্রণাম করলাম সাধুবাবাকে। মুখে কিছু বললেন না। হাতটা শুধু একবার স্পর্শ করলেন মাথায়। তারপর ধীরে ধীরে পা বাড়ালাম আমার পথে।

## অমরতীর্থ সোমনাথ

প্রভাসের স্নানঘাট থেকেই পীচের রাস্তা চলে এসেছে সোমনাথ মন্দির পর্যন্ত। পথের দুধারে ঝাউ বীথিকার বন। এখানেই একদা পরশুরামের তপোবন ছিল বলে প্রবাদ আছে। এমন সুন্দর পরিবেশের মধ্যে দিয়েই এগিয়ে চললাম আমি, সহযাত্রীরা সকলে। মাত্র মিনিট পাঁচ সাতেকের পথ। এলাম সোমনাথ ক্ষেত্রে। প্রথমেই পড়লো বিশাল ফাঁকা প্রাঙ্গণ। দাঁড়িয়ে আছে কিছু বাস, টাঙ্গা। পাশেই রয়েছে দু-চারটে ছোট ছোট মনিহারী দ্রব্যের দোকান। আরও কিছুটা এগিয়ে যেতেই ডানদিকে দেখলাম রাণী অহল্যাবাঈ প্রতিষ্ঠিত সোমনাথ মন্দির। পাথরে গাঁথা মাঝারী আকারের মন্দির। তোরণদ্বার পেরিয়ে উঠে এলাম মন্দির চত্বরে অল্প কিছু সিঁড়ি ভেঙে।

মন্দিরটি দোতলা। উপরের প্রকোষ্ঠে রয়েছে গৌরীপট্টে ধবধবে সাদা শিবলিঙ্গ। নাম অহল্যেশ্বর মহাদেব। এই প্রকোষ্ঠের পাশেই সরু একটি পথ চলে গেছে নীচের তলায় গর্ভমন্দিরে। পথ এত সরু, পাশাপাশি যেতে অসুবিধে হয় দুজনের। ওই পথ দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এলাম নীচে। এবার ডানদিকে বাঁক নিতেই দেখলাম ছোট্ট গর্ভমন্দির। এরই মাঝখানে স্থাপিত রয়েছে বেশ বড় আকারের একটি শিবলিঙ্গ। কুচকুচে কালো পাথরের। একেবারে চক্‌চক্‌ করছে। তবে এটির গৌরীপট্ট সাদা পাথরের। শিবলিঙ্গ কালো আর গৌরীপট্ট সাদা এমনটা দেখিনি কোথাও। সামনেই রয়েছে মহাদেবের বাহন নন্দী। এটির রং সাদা। গর্ভ-মন্দিরের দেয়ালে চারপাশে খোদিত রয়েছে নারায়ণের দাঁড়ানো মূর্তি। এগুলি অবশ্য কালো পাথরের। গর্ভমন্দিরের এই শিবলিঙ্গের নাম সোমনাথ। প্রাচীন সোমনাথ মন্দির বহুবার ধ্বংস হয়েছে বিধর্মীদের হাতে। তাই হয়তো উপরে অহল্যেশ্বর মহাদেবকে প্রতিষ্ঠা করে নীচে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সোমনাথ শিবলিঙ্গকে। মন্দির সংস্কার হয়নি বহুকাল। তাই কালচে ছোপ পড়ে গেছে সারা মন্দিরের দেয়ালে।

একের পর এক আসছেন তীর্থযাত্রী। অধিকাংশ যাত্রীই অবাঙালী। দুধ আর জল ঢালছেন শিবলিঙ্গে, চলে যাচ্ছেন। এখানে সোমনাথ উদার। দর্শন ও স্পর্শনে কোন বাধা নেই তীর্থযাত্রীদের। পূজারীও আছেন। তিনি পূজোপোকরণ নিয়ে নিবেদন করছেন দেবতার উদ্দেশ্যে। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এইভাবেই চলছে অহল্যেশ্বর মহাদেব আর সোমনাথের পূজো।

## সোমনাথ মন্দির—অতীত ও বর্তমান

ভারতের পশ্চিম আরব সাগরের উপকূলেই সোমনাথ মন্দির, গুজরাটে। লোক-বিশ্বাস এবং পৌরাণিক মতে বিশ্বসৃষ্টির সময় থেকেই ভগবান শংকর এখানে অবস্থান করছেন সোমনাথ নামে। এই শিবলিঙ্গের উল্লেখ আছে স্কন্দপুরাণে। পৌরাণিক মতে সোমনাথ স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ। ভারতে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একটি সোমনাথ। যেমন,

"সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুনম,
উজ্জয়িন্যাং মহাকালম্ ওঁকারম্ মল্লেশ্বরম।"

প্রভাসতীর্থ এবং সোমদেবের সোমনাথ উপাসনার কথা উল্লিখিত হয়েছে মহাভারতে। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় এই তীর্থের বয়েস কম হলো না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়কাল ধরলে সোমনাথের বয়স আনুমানিক ৪৪৩৮ বছর পাওয়া যায় এখানেই। তার আগেও সোমনাথ এখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে কালপ্রভাবে এই তীর্থ থাকে অপ্রকাশিত অবস্থায়। আবার তা প্রকটিত হয়েছে কালপ্রভাবেই।

দ্বাপরযুগের কথা। কংসকে হত্যা করলেন শ্রীকৃষ্ণ। অধিকার করলেন মথুরা। এবার কংসের শ্বশুর জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করে পরাজিত করলেন যদুপতি

কৃষ্ণকে। ভীত শ্রীকৃষ্ণ যদুকুলসহ প্রথমে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিলেন প্রভাসে। তারপর রাজধানী স্থাপন করলেন দ্বারকায়। প্রতিষ্ঠিত হলো যাদবরাজ্য। এই সময় অর্জুন সোমনাথ দর্শন করতে এসে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে হরণ করেন সুভদ্রাকে। এ-কথা ও কাহিনী মহাভারতের। সুতরাং পৌরাণিক এ-তীর্থের প্রাচীনত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় পুরাণেই।

ইতিহাসের কথা অনেক। অতি সংক্ষেপে বলি সোমনাথ মন্দিরের অতীত ইতিহাসের কথা। আঘাতের পর আঘাতে জর্জরিত হয়েছে সোমনাথ, মন্দিরও। তবুও সোমনাথ অমর, অমরতীর্থ এই সোমনাথ।

খ্রীষ্টপূর্ব ১৮৪ অব্দে গ্রীকরাজা মিনাণ্ডা এসেছিলেন ভারতে। তাঁর অধিকারে আসে সৌরাষ্ট্র, সোমনাথ। তবে কোন হিন্দুমন্দির ধ্বংসের কাজে তিনি ব্রতী হননি কখনও। ভারতের মাটিতে পা দিয়েই তিনি পরম শান্তির পথ খুঁজে পান বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। ভারতবর্ষ—এ যে অধ্যাত্মভূমি, মোক্ষভূমি ভারতবর্ষ। সেইজন্যেই তো তিনি এসেছিলেন এ-দেশে, পেয়েছিলেন মানুষের পরম আকাঙ্ক্ষিত ধন, শান্তি।

এর দুশো বছর অতিক্রমিত হলে প্রভাসতীর্থসহ সোমনাথ আসে শক ক্ষত্রপদের অধীনে। কালপ্রভাবে হারিয়ে যাওয়া এই তীর্থকে পুনর্জীবিত করে তোলেন তৎকালীন ব্রাহ্মণ রাজা নাহপান।

এরপর সাতবাহন বংশের প্রসিদ্ধ রাজা গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী তাড়িয়ে দিলেন শকদের। তখন তাঁর অধিকারে এলো প্রভাস তথা সোমনাথ। ঠিক এ-সময় এই তীর্থের প্রভাব প্রতিপত্তি কমে গেল অনেক। বেড়ে গেল জৈনধর্মের প্রভাব। পার্শ্ববর্তী গিরনার রাজ্য হয়ে উঠলো মন্দিরময় জৈনতীর্থ। এই পর্যন্ত সোমনাথ তীর্থ ছিল সুন্দর, অক্ষত।

এবার আসি গজনীর সুলতান মামুদের কথায়। তিনি ভারতে অভিযান করেছিলেন মোট সতেরো বার। সব অভিযানের ইতিহাস একই, হত্যা লুণ্ঠন ধ্বংস আর দেবদেবীর মন্দির চূর্ণ করা। ১০২৪ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটের সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠনই মামুদের সর্বশেষ বিখ্যাত অভিযান। তখন সৌরাষ্ট্রের রাজা ছিলেন প্রথম ভীমদেব। মামুদ আক্রমণ করলেন সোমনাথ মন্দির। রাজা ভীমদেব আর স্থানীয় কিছু ভূস্বামীরা একযোগে দুদিন পর্যন্ত মুসলমান সেনাদের পরাভূত করে রক্ষা করলেন সোমনাথক্ষেত্র। তৃতীয় দিনের যুদ্ধে মুসলমান সেনারা প্রায় পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু মামুদের অদ্ভুত রণকৌশলে শেষ পর্যন্ত পরাজয় ঘটলো হিন্দুদেরই।

Meadows Taylor সাহেব তাঁর 'History of India' গ্রন্থের ৩০ পৃষ্ঠায় তুলে ধরেছেন মামুদের সোমনাথ আক্রমণ এবং ধ্বংসের এক জ্বলন্ত চিত্র। রাজা ভীমদেব তাঁর সেনাসহ পরাস্ত হলেন। মামুদ তখন মন্দিরে প্রবেশ করতেই তৎকালীন ব্রাহ্মণ পুজারীগণ প্রচুর ধনরত্ন দিতে চেয়েছিলেন বিগ্রহ রক্ষার জন্যে। কিন্তু মামুদ বলেন, 'আমি চাই যে, ভবিষ্যতে লোকে আমাকে বলুক 'মূর্তি-ভগ্নকারক' (Idol-breaker),

কেউ যেন আমাকে 'মূর্তি-বিক্রেতা' (Idol-seller) না বলে।' নিজ হাতে গদাঘাতে প্রথমে সোমনাথ জ্যোতির্লিঙ্গের উপরের অংশ, পরে ভেঙে দেন নীচের অংশটি। তারপর অপহরণ করেন হীরা মাণিক প্রভৃতি মূল্যবান পাথরের অলংকার আর সমস্ত ধনরত্নাদি।

সোমনাথ অভিযানে অপরিমেয় ধনরত্ন হস্তগত হয়েছিল সুলতানের। এর আগে আর কোন অভিযানে এত ঐশ্বর্য হস্তগত করতে পারেননি তিনি। সুলতান ফিরে যাওয়ার সময় মন্দির ভেঙে মুসলমান সেনাদের সাহায্যে গজনীতে নিয়ে গিয়েছিলেন ৫৬টি কারুকার্যখচিত স্তম্ভ, চন্দনকাঠের দরজা আর সোমনাথলিঙ্গের নীচের ভাঙা পাথরের অংশ।

কথিত আছে, মামুদ গজনীর জামি মসজিদের সিঁড়িতে বসিয়েছিলেন শিবলিঙ্গের ভাঙা অংশটি। মুসলমান সাধকেরা মসজিদে ঢুকতেন ওই পাথরের উপর পা দিয়ে।

উৎকট ধর্মান্ধে নিদারুণ কলুষিত চরিত্র মামুদের এসব কথা জানা যায় সাহনাম রচনাকারী ফেরদৌসি, আলবেরুণীর রচনা থেকে।

সোমনাথ লুণ্ঠনের পর মামুদ আর কখনও ভারতে আসেননি। তারপর পারস্যের অধিকাংশ জয় করে ক্যাম্পিয়ান হ্রদ পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন তাঁর রাজ্য। ১০২৪ খ্রীষ্টাব্দে গজনীতে যে মসজিদের দরজার কাছে সোমনাথ লিঙ্গের ভাঙা অংশ বসিয়েছিলেন, ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে জুম্বা নমাজের সময় মসজিদে ঢুকতে গিয়ে সেই ভেজা পাথরে পা পিছলে তিনি পড়ে যান। তাতে যে আঘাত মামুদ পেয়েছিলেন সেই আঘাতের জেরেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

এরপর গুজরাটের রাজা ভীমদেব আর মালবের রাজা ভোজ আবার নির্মাণ করলেন সোমনাথ মন্দির। স্থাপিত হলো শিবলিঙ্গ সোমনাথ। সুতরাং সোমনাথে আর ধ্বংসস্তূপ রইলো না। মুসলমান পর্যটক আলবেরুণী একাদশ শতাব্দীতে এলেন ভারতে। প্রভাসতীর্থের কাছে সোমনাথ মন্দির দেখে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। মামুদের নিষ্ঠুরতা আর অনাচারের এতটুকু চিহ্ন নেই। তিনি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখেছেন, 'গুজরাটে সোমনাথ একটি বিরাট শহর। মুসলমানদের যেমন মক্কা, তেমনই আরব সাগরের তীরে হিন্দুদের একটি মহাতীর্থ সোমনাথ।'

নতুন মন্দির নির্মাণ হলো ঠিকই, তবে আগের মতো তেমন সুন্দর হলো না। ফলে একটা দুঃখ থেকে গেল মন্দিরের পূজারীদের মনে। সেই সময় সোমনাথই সুযোগ করে দিলেন দুঃখমোচনের। একদিন গুজরাটের মহারাজ কুমার পাল এলেন সোমনাথে পুজো দিতে। মন্দিরের মুখ্য পুরোহিত বারাণসীর শৈব সাধক ভব-বৃহস্পতি এবং অন্যান্য পূজারীরা জানালেন তাঁদের দুঃখের কথা।

রাজী হলেন রাজা কুমার পাল। ভব-বৃহস্পতির তত্ত্বাবধানে মন্দিরটি আরও বিস্তৃত, আরও উঁচু করে দিলেন তিনি। সৌন্দর্যও বেড়ে গেল অনেক। চূড়া বাঁধানো হলো সোনা দিয়ে। নির্মিত হলো বিশাল নাটমন্দির। মন্দিরকে করা হলো আরও

সুরক্ষিত। এবার মন্দিরের নতুন নামকরণ হলো, মেরু প্রাসাদ। এসব কাজ সুসম্পন্ন হলো ১১১৪ খ্রীষ্টাব্দে।

এরপর সৌরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন বাঘেলা বংশ। এই বংশের শেষ রাজা কর্ণদেব তখন সৌরাষ্ট্রেরই রাজা। তাঁর সময়কালে ভগবান সোমনাথের কপালে আর সুখ সইলো না। মন্দিরটিও আর টিকলো না। ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সুরাট লুট করে পিতৃব্যহন্তা আলাউদ্দিন খিলজী এলেন প্রভাসে। রাজপুত সেনাদের বাধাদান সত্ত্বেও খিলজীর সেনাপতি আফজল খাঁ ( আলাপ খাঁ ) মন্দিরটি কলুষিত এবং চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলেন সোমনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ। ধ্বংস করলেন সমস্ত দেবদেবীর মূর্তি। অনুসন্ধান চালালেন মন্দিরের মেঝে ভেঙে ধনরত্ন মণিমাণিক্যের।

বিগ্রহশূন্য ভাঙা মন্দির আবার হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুদিন মহাকালের সাক্ষী হয়ে। এইসময় গুজরাট রাজ্যের জুনাগড়ের রাজা ছিলেন মহীপাল। ভাঙা মন্দিরের নতুন করে সংস্কার করলেন তিনি। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর পুত্র।

ভগবান সোমনাথের কপালটাই খারাপ। এ-মন্দিরও গেল। ১৩৯০ খ্রীষ্টাব্দে মন্দির দখল করলেন মহম্মদ বাগদা। বিগ্রহ সরিয়ে করলেন মসজিদ। মন্দির থেকে মসজিদ —মসজিদও গেল। আবার সংস্কার হলো সোমনাথ মন্দির। এরপর ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সোমনাথ মন্দির আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করেন প্রথম মুজফ্‌ফর খান এবং ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় মুজফ্‌ফর খান।

এখানেই ব্যাপারটা শেষ হলো না। দুর্ভাগ্য নেমে এলো সোমনাথের কপালে। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে বৃদ্ধ সম্রাট ঔরঙ্গজেব প্রাণত্যাগ করেন আহম্মদ নগরে। কবরে যাওয়ার আগে ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মান্ধতার রোগে আক্রান্ত সম্রাট, তাঁরও হাতের শেষ স্পর্শ পেল সোমনাথ। এই মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের উপাদান দিয়েই গড়ে তুললেন মসজিদ। ভগ্ন হৃদয়ে, ভগ্ন অবস্থায় সোমনাথ পড়ে রইলো আরব সাগরের পাড়ে।

১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা। এবার এগিয়ে এলেন মহারাণী অহল্যাবাঈ। সোমনাথের একটি নতুন মন্দির নির্মাণ করলেন পুরনো মন্দির থেকে একটু দূরে। তবে প্রাচীন মন্দিরের মতো কারুকার্যখচিত হলো না, ঐতিহ্যমণ্ডিতও নয়। আগের মন্দিরের বহু কারুকার্যখচিত ভাঙা অংশ আজও ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে এখানে। কিছু আছে এখানকার সংগ্রহশালায়।

প্রবাদ আছে, সত্যযুগে সোমনাথ মন্দির নির্মিত হয়েছিল সোনা দিয়ে। যুগের অবসান হলো। ধ্বংসও হলো সে মন্দির। এলো ত্রেতাযুগ। লঙ্কেশ্বর রাবণ সোমনাথ মন্দির নির্মাণ করলেন রুপো দিয়ে। ত্রেতার অবসানে সে মন্দিরও হলো হৃতশ্রী। এরপর দ্বাপর। শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের দুরাবস্থা দেখে নির্মাণ করলেন চন্দনকাঠ দিয়ে। সে মন্দিরও গ্রাস করলো মহাকাল।

আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৩২১ অব্দ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১৮৪ অব্দ পর্যন্ত ছিল মৌর্য সাম্রাজ্যকাল। কথিত আছে, এই সময়কালের মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী চাণক্য প্রথম মন্দির নির্মাণ করেন পাথর দিয়ে। এরপর সোমনাথ মন্দির নির্মাণে

ভীমদেবের অবদান অনস্বীকার্য।

একাদশ শতাব্দীতে ভারতে আসেন ঐতিহাসিক আলবেরুণী। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে তিনি বলেছেন, প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত এই মন্দির পরিচালনা এবং ব্যয়ভার বহনের জন্য খাজনা তোলা হতো দশ হাজার গ্রাম থেকে। মন্দিরে তিনশো জন বাদ্যকার, দেবদাসী আর নর্তকী ছিল পাঁচশো জন। মন্দিরে পালাক্রমে সোমনাথের পুজো করতেন দু-হাজার পুরোহিত। তীর্থযাত্রীদের ক্ষৌরকর্ম করতো তিনশো জন নাপিত। অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী এই মন্দিরে বহু ধনরত্ন নিবেদিত হতো পুজোয়। মন্দির সর্বদা মণিমুক্তাতে আলোকিত সোমনাথ সুসজ্জিত হয়ে থাকতো মন্দিরের গর্ভগৃহে।

মহাভারতীয় যুগে গোকর্ণ থেকে আসার সময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন এবং বলরামও এসেছিলেন সোমনাথে।

এখন থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগের কথা। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এসেছিলেন প্রভাসের দেহোৎসর্গে। ভাবসমাধি হলো মহাপ্রভুর। দেহোৎসর্গের ঘাট থেকে ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন কিছুটা পথ। তারপর একটি জায়গা লক্ষ্য করে প্রণাম করলেন তিনি, একসময় যেখানে সুদূর অতীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল ভগবান সোমনাথ-লিঙ্গ।

এতো গেল অতীতকথা। এখন আসি এখনকার কথায়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে। নতুন মন্দির নির্মাণের কথা ঘোষণা করলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করলেন নও-নগরের মহারাজা জামসাহেব। পুরনো মন্দির ক্ষেত্রে শুরু হলো নতুন মন্দির নির্মাণের কাজ। এগিয়ে চললো দ্রুতগতিতে। এক বছরের মধ্যেই শেষ হলো একতলা। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে মন্দিরমধ্যে নতুন করে সোমনাথ লিঙ্গ স্থাপন করলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ। তবে মন্দির নির্মাণের কাজ শেষ হয়নি এখনও। চলছে প্রতিদিন পুর্ণোদ্যমে। বড় বড় পাথরের চাঁইতে সুন্দর কারুকার্য খোদাই করে চলেছেন প্রস্তর শিল্পীরা।

ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালাম মন্দিরের তোরণদ্বারে। এর বাঁপাশেই রয়েছে একটি শো-কেস। তার মধ্যে আছে বর্তমান মন্দিরের একটি সুন্দর মডেল। মন্দিরের কাজ সম্পূর্ণ হলে চেহারা কেমন দেখাবে, এ-তারই একটি নমুনা। মডেল দেখে যা মনে হলো, এ-মন্দির নির্মাণ শেষ হলে সোমনাথ আবার ফিরে আসবে সোমনাথে—প্রাচীন ঐতিহ্যে, গরিমায়।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলাম মূলমন্দিরে। প্রবেশপথের ডানদিকে অলিন্দে রয়েছে একটি বড় হনুমানমূর্তি। সাদা পাথরের ধবধব করছে। বাঁপাশে স্থাপিত মূর্তিটি গণেশের। তবে হনুমানমূর্তির চেয়ে আকারে ছোট। গণেশও সাদা। এই দুটি বিগ্রহ সচরাচর সাদা হয় না। এখানেই প্রথম চোখে পড়লো।

সোমনাথ মণ্ডপের বাঁদিক দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। ধীরে ধীরে উঠে এলাম

ছাদে। এখানেও ব্যস্ত রয়েছে শিল্পীরা। চলছে ঠুক্‌ঠুক্‌ করে ছেনি হাতুড়ির কাজ। সামনেই সাগর। শুধু জল আর জল। মন ভরে যায় আনন্দে।
ধীরে ধীরে নেমে এলাম উপর থেকে। দাঁড়ালাম নাটমন্দিরে। অসংখ্য চওড়া স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে সুবিশাল মন্দির। প্রতিটি স্তম্ভই কারুকার্যখচিত। একইসঙ্গে প্রতিটি স্তম্ভের কোণায় কোনটায় নারায়ণ, কোনটায় খোদিত আছে চতুর্ভুজ মহাদেবের মূর্তি। মূলমন্দিরের দুপাশে কোণায় রয়েছে অলিন্দ। তাতে ডানদিকে সাদা বৃষের উপর দেবী ত্রিপুরেশ্বরী, বাঁদিকে স্থাপিত রয়েছে সিংহবাহিনী অম্বাজীর আকর্ষণীয় বিগ্রহ। সবই সাদা পাথরের।
মূলমন্দিরের দরজা রূপোর চাদরে মোড়া। গর্ভমন্দিরের মাঝখানে স্থাপিত আছে বিশাল একটি শিবলিঙ্গ। অহল্যাবাঈ প্রতিষ্ঠিত অহল্যেশ্বর শিবলিঙ্গের মতো এখানে স্পর্শ করা যায় না। ঢুকতে দেওয়া হয় না গর্ভমন্দিরে। দূর থেকেই দেখতে হয় সোমনাথ মহাদেবকে। রাজবেশের জন্যে রূপার নির্মিত শিবমূর্তি, ফণাধর সাপ রয়েছে পাশে। শিবও সুন্দর, মন্দিরও সুন্দর।
গর্ভমন্দিরের ভিতরে দেয়ালের গায়ে পাথরে খোদিত আছে ব্রহ্মা আর নারায়ণের মূর্তি, সঙ্গে পার্বতীও। প্রতিটি মূর্তিই সুন্দর, মনোহর। তীর্থযাত্রীরা আসছেন, পূজার ডালি তুলে দিচ্ছেন পূজারীর হাতে। তিনি পূজা দিয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছেন সোমনাথ মহাদেবের প্রসাদ।
বিশাল প্রাচীরে ঘেরা সোমনাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণ। আরব সাগর এখানে বয়ে চলেছে মন্দিরপ্রাচীরের গা ঘেঁষে। ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে তার গায়ে। মানুষ আর সাগরের এত অত্যাচার অনাচার আর আঘাতের পরও সোমনাথ অক্ষয়, মৃত্যুঞ্জয় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আজও। তাই তো সোমনাথ অমর, অমরতীর্থ সোমনাথ।

## সাপ্রসঙ্গ—সৃষ্টি কাম ও নারীমন প্রসঙ্গে সন্ন্যাসিনী

সোমনাথ মন্দির চত্বর। বিশাল বিশাল স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি। ঠিক গণেশ মূর্তির পাশেই রয়েছে একটি স্তম্ভ। তাতে সুন্দর একটি নারী মূর্তি বসে আছেন হেলান দিয়ে। যাত্রীদের আনাগোনায় বিরাম নেই। একেবারে কোণের দিকে স্তম্ভ। তাই যাত্রীরা কেউ লক্ষ্য করছে না। সকলের লক্ষ্য সোমনাথ মহাদেব। আমি লক্ষ্য করলাম, এই নারীমূর্তি লক্ষ্য করছে সকলকে। চেহারায় যা লাবণ্য তাতে মনে হলো, বেশ বড় ঘরের মেয়ে। ফরসা গায়ের রঙ ধবধব করছে। পরনে গেরুয়া বসন। ময়লা তেলচিটে মারা নয়। বেশ পরিষ্কার। একটু ফ্যাকাসে। খোপা বাঁধা নেই মাথায়। এলো চুল নেমে এসেছে কোমর পর্যন্ত। থাক্‌ থাক্‌ ঢেউ খেলানো। বসে আছেন বাবু হয়ে। সিঁথেয় সিঁদুর নেই। শুধু সিঁদুরের একটা ফোঁটা রয়েছে কপালে। জ্বলজ্বল করছে। গৃহস্থ ঘরের বউরা যেমন পরে। পাতলা ঠোঁট। টিকালো নাক। টানা ভ্রূযুগল। চোখদুটো কালো কালো—টানা। দেবী প্রতিমার মতো। মোটা নয়। সুন্দর মাঝারী গড়ন। কোন নারীকে

পুরুষের চোখে আকর্ষণীয় করতে দেহে যা যা প্রয়োজন বিধাতা সবই দিয়েছেন এই নারীমূর্তিতে।

এসব লক্ষ্য করলাম একটু আড়াল থেকেই। পাশেই রয়েছে একেবারে ছোট্ট একটা ঝোলা। দেখে বেশ ফাঁকা ফাঁকাই মনে হলো।

পথে ঘাটে তীর্থপথে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসিনীর দেখা পাওয়া যায় না সচরাচর। বৃন্দাবনে আছে কিছু তবে বৃদ্ধা। ওখানে বয়স্কাদের সংখ্যাই বেশী। ওদের অধিকাংশই পড়ে আছে আশ্রমে। পেটের জ্বালায়। গেরুয়া পরে। এদের কারও স্বামী নেই। কেউ স্বামী পরিত্যক্তা। কেউ বা সংসার থেকে বিতাড়িত, সংসারের বোঝা বলেই তাড়িয়ে দিয়েছে। সন্ন্যাসিনী বলতে যা—তা না বলাই ভালো। বরং বলা ভালো ওরা গৃহত্যাগী। তবে ভগবান ছাড়া আর দেখার কেউ নেই। তাই বৃন্দাবনে কৃষ্ণই ওদের শেষ বয়সের আশ্রয়। নিয়মিত নাম করে কোন মন্দির বা আশ্রমে। পেটটা চলে যায় কোনরকমে। সাহায্য পায় আশ্রম থেকে। এমন অসংখ্য গৃহত্যাগী মহিলা শুধু বৃন্দাবনে নয়, আছে অনেক মঠ মন্দির আশ্রমেই। তবে বৃন্দাবনেই ওদের যেন মেলা বসেছে।

ওদের কথা ভাবলাম এক ঝলক। এবার মেলাতে চেষ্টা করলাম এই নারীমূর্তির সঙ্গে। কোনদিক থেকেই মিল হলো না। মেয়েদের বয়েস সব সময় ঠিক আন্দাজ করা যায় না। অনেক অল্প বয়েসের মেয়েকে বুড়ি বুড়ি লাগে। আবার বয়স্কা মহিলার চেহারার বাঁধুনীতে কম বয়েস বলেই মনে হয়। এই নারীমূর্তিকে দেখে বয়েস আন্দাজ করলাম ৩৯ থেকে ৪২/৪৩-এর মধ্যে।

কোন সাধুবাবা হলে এতক্ষণ হয়তো বসেই যেতাম কথা বলতে। জীবনে এই প্রথম তীর্থপথে দেখা পেলাম সন্ন্যাসিনীর। তাও আবার একা। আর কেউ সঙ্গে আছে কিনা বা কাছাকাছি কোথাও গেছে কি না বুঝতে পারছি না। তবে এখনও দেখছি একা। কথা বলতে ভিতরে কেমন যেন একটা সংকোচ আর লজ্জা করছে। এক কথায় বড্ড অস্বস্তি হচ্ছে মনে। দেখছি আড়াল থেকে তবে সাহস হচ্ছে না। কিছুতেই এগোচ্ছে না পা-দুটো। এইভাবে কাটলো প্রায় মিনিট পাঁচ সাত। একবার ভাবছি যাই, আবার ভাবছি দরকার নেই। আবার ভাবছি, যদি উঠে পড়ে তাহলে আর কথাই হবে না। এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই ভাবলাম, চলেই যাই। কথা বললে বলবো। নইলে চলে আসবো। নির্জনে তো নয় যে ভাববে কোন কু-মতলব আছে। এইসব ভেবে একটু স্থির করে ফেললাম মনটাকে। তারপর এগোলাম খুব ধীর পদক্ষেপে। মনে অস্বস্তি কিন্তু একটা চলছেই। এবার কাছাকাছি এসে দাঁড়াতেই সোজা তাকালেন আমার মুখের দিকে। কোন কথা না বলে চট্ করে প্রণাম করলাম পায়ে হাত দিয়ে। কোন সুযোগই পেলেন না বাধা দেয়ার। হাতজোড় করে ঠেকালেন কপালে। কোন কথা বললেন না, বসতেও না। আমিই বসলাম নিজে। আরও গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন। আমি সরাসরি তাকাতে পারলাম না। অস্বস্তি ক্রমেই বাড়লো।

দেরী না করেই বললাম হিন্দিতে,

—মা, আমি ভ্রমণে বেরিয়েছি। এসেছি কলকাতা থেকে। আপনাকে দেখে বেশ ভালো লাগলো। তাই এলাম আপনার কাছে। আমার মনে কিছু কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা আছে যারা গৃহত্যাগী তাঁদের সম্পর্কে। দয়া করে আপনি যদি কিছু বলেন তাহলে আশাটা আমার মেটে।

এ-কথায় সরাসরি জবাব দিলেন বাংলায়,

—কলকাতায় তুমি থাকো কোথায় ?

বাঙালী! আনন্দে মনটা আমার ভরে গেল। কি যে আনন্দ হচ্ছে তা বলে বোঝানো যাবে না! যদি অনুগ্রহ করে তবে অনেক কথা বলা যাবে প্রাণভরে। তৈরী করে নিলাম মনটাকে। এখানে একজন সন্ন্যাসিনীকে পাবো, তার উপরে বাঙালী, এমন নিঃসঙ্কোচে কথা বলবেন, এর কোনটা তো ভাবতেই পারিনি, কল্পনাও করিনি কখনও। এমন একটা যোগাযোগ যেন নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না। সন্ন্যাসিনীর প্রথম দফায় প্রশ্নের উত্তরে কলকাতায় কোথায় থাকি, কি করি, কি উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি সবই বললাম। শুনে তিনি যে খুশী হলেন, মুখের ভাব দেখেই তা মনে হলো। এবার বললেন,

—তোমার আজ্ঞাচক্র দেখে মনে হচ্ছে দীক্ষা হয়েছে, সিদ্ধ মন্ত্রও পেয়েছো। এখানে ওখানে সাধুদের পিছনে না ঘুরে ঠেসে জপ করো। তাতে তোমার কল্যাণ হবে। সাধুদের পিছনে ঘুরে তোমার কি লাভটা হবে বলতে পারো ?

উত্তরে মাথাটা নীচু করেই বললাম,

—এটা আমার কৌতূহল। ঘরে থাকতে পারিনা। অশান্তি হয় মনে। কে যেন বের করে দেয় ঘাড় ধরে। তাই তো বেরিয়ে পড়ি। পথে পথে থাকলে বেশ আনন্দেই থাকি।

হাসিমাখা মুখে বললেন,

—এর চাইতে অনেক অনেক বেশী আনন্দে তুমি থাকতে পারবে যদি মন্ত্রের সাধনে লেগে পড়তে পারো। আসলে তোমার বয়েস এখন কম। মন এ-বয়েসে অস্থির একটু হবেই। আচ্ছা বাবা এবার তুমি বলো তো দেখি, সাধুসঙ্গ তো অনেকই করেছো, কি পেলে ?

সঙ্গে সঙ্গেই বললাম,

—সাধুদের কাছে কিছু পাওয়ার আশায় সাধুসঙ্গ করি না আমি। ভালো লাগে তাদের জীবন ও মনের কথা জানতে তাই তাঁদের সঙ্গ করি। আর লাভ যে একেবারে কিছু হয়নি বা হয় না তা নয়। যখন সঙ্গ করি তখন এক অপূর্ব আনন্দের বন্যা বয়ে যায় মনের মধ্যে, যেটা হয় না আর কারও সঙ্গ করলে। লাভ আমার এইটুকুই। বলে চুপ করে রইলাম। ভাবলাম, একটা কথাও জিজ্ঞাসা করতে পারছি না। উল্টে জেনে নিচ্ছেন আমার হাঁড়ির খবর। এতক্ষণ থামে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। এবার সোজা হয়ে বসে বললেন,

—তোমার হাঁড়ির খবর নিচ্ছি না বাবা। ওতে আমার কাজ নেই। তোমার অসুখ হলে তোমার মা যেমন খুটিয়ে খুটিয়ে জানতে চান শরীরে কোথায় কি অসুবিধে হচ্ছে, আমি জানতে চাইছি তোমার মনের অসুখটা কোথায়, ব্যথাটা কিসের ?

লজ্জায় কোন কথা বেরোলো না মুখ থেকে। তিনি বললেন,

—বাবা, গুরুকে যেদিন মন থেকে আঁকড়ে ধরতে পারবে সেদিন থেকে সব ছুটো-ছুটিই তোমার বন্ধ হয়ে যাবে। এরজন্যে অবশ্য সময় লাগবে। দু-একদিনে তা হবার নয়। সংসারের পাকে চরকি খাওয়ার পরেই হবে।

এবার একটু কথার খোঁচা মেরে হাসতে হাসতে বললেন,

—আসলে আমি নয়, তুমিই এসেছো আমার কাছে। কেন এলাম এপথে, চলছে কি করে এইসব জানতে চাইছো, তাই না ?

লজ্জা আর সংকোচে মনটা আমার একটু দমে গেল। মুহূর্তে সে ভাবটা কাটিয়ে নিলাম। সহজভাবে সত্য কথাটা বললাম,

—হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। এসব জানার জন্যেই তো আমি পথে বেরোই, বেরিয়েছি। আপনি যদি অনুগ্রহ…

কথায় ছেদ টেনে দিয়ে বললেন,

—আমি যদি তোমার কাছে বানিয়ে মিথ্যা কথা বলি তাহলে তুমি তাই-ই বিশ্বাস করবে। তাতে তোমার আসল উদ্দেশ্যটা তো সফল হবে না।

আমি বিনীতভাবেই বললাম,

—দেখুন, স্বার্থের সম্পর্ক যেখানে বিন্দুমাত্র আছে, সেখানে মিথ্যেও বসে আছে হাঁটু গেড়ে। আপনার সঙ্গে কোন স্বার্থের সম্পর্ক আমার নেই। পথেই পরিচয়, আবার হারিয়ে যাবো পথেই। সুতরাং আপনি মিথ্যা বলবেন এ-কথায় আমার বিশ্বাস নেই। আর সত্যের সন্ধানে যখন পথে নেমেছেন তখন মিথ্যাকে আশ্রয় করবেন, এ-কথা ভাবতেই পারিনা।

কথাটা শুনে সন্ন্যাসিনী হাসলেন। মনে জোর পেলাম একটু। সাজানো দাঁত। ফুটফুট করছে। পূর্ণিমার আলোর মতো স্নিগ্ধ হাসি। যেন ঝল্‌সে যাচ্ছে মুখখানা। একভাবে মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারছি না। ভিতরে অস্বস্তি হয়। বিশেষ করে মেয়েদের মুখের দিকে একভাবে তাকিয়ে কথা বললে একটা অস্বস্তি হয় উভয়েরই। তাই একবার তাকাচ্ছি মুখের দিকে আবার নামিয়ে নিচ্ছি চোখদুটো। তবে সন্ন্যাসিনীর দৃষ্টি যে আমার উপরে সব সময়েই স্থির হয়ে আছে তা আমি বুঝতেই পারছি। প্রথমেই আমি গৃহত্যাগের প্রশ্নে গেলাম না। যদি একবার 'না' করে দেন তাহলে আর কথায় এগোতে পারবো না। তাই বললাম,

—আপনি তো মনে হয় সমস্ত তীর্থই ভ্রমণ করেছেন। সঙ্গে আর কেউ সঙ্গী আছে, না আপনি একাই ?

বলে মুখের দিকে তাকালাম। হাসিমুখেই বললেন,

—একাই ঘুরি বাবা। আমার ভয়-ডর বলে কিছু নেই। ভয় করলে কি পথ চলা যায়? ভয় করবো কাকে, পুরুষকে? কেন বাবা, পুরুষেরা বাঘ না ভাল্লুক যে ভয় করবো?
দৃঢ়তার সুর ফুটে উঠলো কণ্ঠে। অবাক হয়ে গেলাম। বললাম,
—কথায় আছে, 'একা না বোকা'। পথে একা চলায় পুরুষের চেয়ে মেয়েদের ভয়টা অনেক বেশী। বিশেষ করে আপনার বয়েসের কথা চিন্তা করেই কথাটা বলছি।
সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিলেন সন্ন্যাসিনী,
—তোমার কথা আমি বুঝেছি বাবা। তবে আর যাইহোক, আমাদের দেশে এই গেরুয়া বসনের আলাদা একটা মাহাত্ম্য আর আকর্ষণ আছে জানবে। একমাত্র পশু প্রবৃত্তির মানুষ না হলে এর মর্যাদা কেউ কখনও ক্ষুণ্ণ করে না।
কথাটা শুনে বলেই ফেললাম,
—মা, সংসারে তো এমন লোকের অভাব নেই। চলার পথে তাদের পাল্লায় পড়েননি কখনও?
হাতজোড় করে প্রণাম করলেন ভগবানের উদ্দেশ্যে। তারপর বললেন,
—না বাবা, সেই তেইশ বছর বয়েসে বেরিয়েছি। এখন প্রায় বিয়াল্লিশ হলো। তেমন কোন মানুষের সামনে পড়িনি কোথাও। আর ও-সব চিন্তাও করিনে আমি। বাছুরের উপর যেমন গাভী মায়ের দৃষ্টি থাকে তেমন আমার উপরেও মায়ের দৃষ্টি আছে বাবা। তাই আর যাইহোক, ভয়টা নেই। বাছুর যেখানে যায়, গাভীও যায় সেখানে।
'মায়ের দৃষ্টি' কথাটা শুনেই বুঝে গেলাম সন্ন্যাসিনী শক্তি উপাসনা করেন। তাই জিজ্ঞাসা করলাম,
—আপনার কি মা শক্তির বীজ?
হেসে বললেন,
—বাংলার মেয়ে আমি। মাকে ছেড়ে কি বাঁচতে পারি, না বাঁচা যায়? সব পথই তো এক। কেউ কালীকে ধরে কেউ ধরে কৃষ্ণকে। রূপের ভেদমাত্র। আলাদা কিছুই নয়। পরে বাবা সব একাকার হয়ে যায়।
জানতে চাইলাম,
—তীর্থে তীর্থে ঘোরেন। স্থায়ীভাবে কোন আস্তানা আছে কোথাও?
ঘাড় নেড়েও আবার মুখে বললেন,
—না বাবা, ও-সব করিনি আমি। স্থায়ীভাবে কোথাও আখড়া করলে প্রয়োজন আর উৎপাত একেবারে জোঁকের মতো আঁকড়ে ধরবে। তাই ও-সবে আর যাইনি।
একটু অবাক হয়ে গেলাম কথাটা শুনে। উৎসুক হয়ে বললাম,
—একা চলেন। মেয়েমানুষ আপনি। নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন না? পথচলতি সাধুদের দেখেছি তারা যখন যেখানে পারলো কোন না কোন ভাবে রাতটা কাটিয়ে দিল। একদিন নয়, দিনের পর দিন। কখনও প্ল্যাটফরমে, কখনও

কোন মন্দির চত্বরে, কখনও বা পথের ধারে গাছের তলায়। আপনার পক্ষে তো সেটা সম্ভব নয়। আপনি তীর্থে গেলে থাকেন কোথায় ?

সন্ন্যাসিনী মা আমার প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন আন্তরিকভাবে প্রশান্ত হাসিমাখা মুখে। বললেন,

—তোমাকে দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছি, সঙ্গে সঙ্গেই তুমি ভাবলে আমি তোমার হাঁড়ির খবর নিচ্ছি, আর এখন বাবা তুমি কি করছো ?

আমি মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললাম। তারপর মাথাটা নীচু করেই বললাম,

—আমি তো সংসারে আছি। সংসারে সকলের হাঁড়িই এক। কারও একটু ছোট, কারও বা একটু বড়—এই যা। সাধু-সন্ন্যাসীদের হাঁড়ির খবর ক-জনা পায় তাঁরা দয়া করে না জানালে। এই দেখুন না, আপনি অনুগ্রহ করে না বললে কি কিছু জানতে পারবো আপনার মতো যাঁরা আছেন এ-পথে তাঁদের কথা ?

হাসতে হাসতেই মা বললেন,

—তুমি তো দেখছি কথায় বড় কৃতজ্ঞ। অকৃতজ্ঞদের ভগবান দুচোখেই দেখতে পারে না। শোন বাবা, তুমি ঠিকই বলেছো। আমি মেয়েমানুষ। যেখানে সেখানে পড়ে থাকতে পারি না। পুরুষের ক্ষেত্রে যেকাজ সহজে সম্ভব মেয়েদের পক্ষে তা সবক্ষেত্রে সহজ নয়, সম্ভবও নয়। নিরাপত্তার অভাববোধ করি না, তবে নিরাপদে থাকার চেষ্টা করি। যখন যে তীর্থে যাই তখন সেই তীর্থের কোন না কোন আশ্রম বা ধর্মশালায় থাকি আর সব যাত্রীদের মতো। নির্ভয়ে থাকি। মনে ভয় আসে না। তবে সতর্কভাবে চলাটা সকলের কর্তব্য, আমিও চলি।

আমাদের কথোপকথনের মধ্যে সামনে এসে দাঁড়ালেন দুজন তীর্থযাত্রী। অবাঙালী স্বামী-স্ত্রী। দাঁড়ালেন মিনিটখানেক। তারপর দুজনেই হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে চলে গেলেন। ওরা চলে যেতেই বললাম,

—পথে অসুস্থ হলে তখন কে আপনার সেবাযত্ন করে ? একজন পুরুষ অসুস্থ হলে অন্য কোন পুরুষের পক্ষে তার সেবা করা যতটা সহজ, আপনার ক্ষেত্রে চট্ করে সেটা করা বা সেবা গ্রহণ করা তো সম্ভব বলে মনে হয় না আমার। আপনি কি বলেন ?

মাথাটা একটু নাড়িয়ে সম্মতি জানালেন। বললেন প্রসন্নভাবেই,

—হ্যাঁ বাবা, তোমার কথাটা ঠিক। তবে পড়ে থাকার মতো বড় কোন রোগব্যাধি এখনও পর্যন্ত হয়নি কখনও। টুকটাক শরীর খারাপে ওষুধও খাইনা, গ্রাহ্যও করি না। আমার বিশ্বাস, মা আমাকে এমন কোনও অসুবিধায় ফেলবেন না যাতে আমার কোন অসুবিধে হয়।

সঙ্গে সঙ্গেই বললাম,

-ধরুন সে রকম কোন অসুস্থতা দেখা দিল। বিছানায় পড়লেন। তখন কি করবেন ? অনেক উচ্চমার্গের সাধুও তো বড় বড় রোগে ভুগেছেন। আপনার যে হবে না এমন গ্যারাণ্টি কোথায় ?

সন্ন্যাসিনী মা আমার হাসতে হাসতেই বললেন,
—বাবা, সংসারী মানুষদের মধ্যে শতকরা একশোজনই তো রুগী। কেন জানো? তোমার কথাতেই বলি কেমন। এই যেমন—যদি, মনে হচ্ছে, হতে পারে, এইসব কথা বা শব্দগুলোই তো রোগ সৃষ্টিকারক। এ-গুলোই তো নানা রোগ সৃষ্টি করে সংসারীদের রোগে ফেলে। এতে নিজে ভোগে, সঙ্গে আর পাঁচজন। আর বাবা এই কথাগুলো এমনই সংক্রামক যে, সুস্থ মনের মানুষকেও মুহূর্তে সংক্রামিত করে অসুস্থ রুগী করে তোলে দেহে নইলে মনে। বাবা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন এই কথাগুলোকে কথায় এড়িয়ে চলো, শান্তিতে থাকবে। আর যাইহোক, মানসিক রোগে পড়বে না কখনও।
কথাগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ শুনে অবাক হয়ে গেলাম। বুঝলাম আগাম ভাবনাই মানুষকে রোগগ্রস্ত করে—করে সংসারের শান্তি নষ্ট। অনেকক্ষণ ধরেই কথা হচ্ছে। কথা এগিয়েছে অনেকটা। এবার বললাম,
—মা, মানুষের জন্ম-জন্মান্তরের কর্মফল ভোগ বিনা খণ্ডন হয় না শুনেছি। ভোগ ছাড়া আর কোনওভাবে কি কাটানো যায় না?
উত্তরে সন্ন্যাসিনী মা বললেন,
—হ্যাঁ বাবা, কাটে। না কাটলে তো মানুষ কখনও মুক্তিই পাবে না। অতীত এবং বর্তমান জন্মের কর্মফল কাটে একমাত্র জপ-তপে। নিষ্ঠার সঙ্গে ইষ্টমন্ত্রের সাধন করলে তিনিই তা কাটিয়ে দেন। জপ-তপে বুদ্ধি নির্মল হয়। নির্মল বুদ্ধির নামই চিত্ত। সাধনে মন ক্রমে ক্রমে তাতে লয় হয়ে যায় একেবারে। মনের অবস্থান আজ্ঞাচক্রে ভ্রু-মধ্যে। মন দেহে কাজ করে প্রাণকে অবলম্বন করে। জপ-তপে প্রাণ ক্রমশ স্থির হয়। প্রাণ স্থির হলেই মনের বাহ্যিক কার্যকরী শক্তি ধীরে ধীরে কমে যায়। মনের এই কার্যশক্তি কমে যাওয়া মানেই পার্থিব জীবনের বিষয়ে আসক্তি কমে যাওয়া। আর সেটা কমলে নতুন ভোগ সৃষ্টি হয় না। তখন ধীরে ধীরে কমতে কমতে এমন একটা অবস্থায় আসে, যখন কর্ম একেবারে রুদ্ধ হয়ে যায়। এবার সঞ্চিত কর্ম ক্ষয় হতে থাকে আরও সাধন-তপে। এইভাবে কর্মফল ভোগ ছাড়াও খণ্ডন হয়। তবে বাবা গুরুই বলো আর ভগবানই বলো, তিনি দয়া না করলে কিছু করার উপায় নেই, হওয়ারও নয়।
একটু থামলেন। তারপর আবেগ জড়ানো কণ্ঠে বললেন,
—বাবা, আমাদের এই দেহটা একটা তূণী। প্রতিটা নিঃশ্বাসই হলো এক একটা তীর। ক্রমে ক্রমে চলে যাচ্ছে। বহু বহু-মূল্য একটা নিঃশ্বাসের। এর মূল্য বাবা কোন মূল্যেই তুল্য হয় না। একবার বেরিয়ে গেলে এ-বিশ্বসংসারে তা কোনদিনই খুঁজে পাওয়া যাবে না। ফিরিয়েও আনা যাবে না কখনও। তাই যত পারো তাঁর নাম করে যাও। সাধনে লেগে পড়ো। সব হবে, সবই পাবে যা চাইবে তুমি।
এতক্ষণ কোন কথা না বলে চুপ করেই ছিলাম। এবার বললাম,
—মা, মনে মনে তো ভাবি। মাঝে মাঝে উঠে পড়ে লাগতেও চেষ্টা করি। কিন্তু

হয় না। কেমন যেন সব ওলট পালট হয়ে যায়। কেন এমনটা হয়?
প্রশান্ত মধুর কণ্ঠে বললেন,
—বাবা এটা শুধু তোমার নয়, জগতের সমস্ত নারীপুরুষেরই এমন দশা। আসলে বাবা এখন তোমার যৌবনকাল। গায়ে রক্ত ফুটছে টগবগ করে। ভিতরে রয়েছে মিলনের এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা আর বাসনা। মুখ ফুটে তুমি বলতে পারছো না। অবশ্য একথা বলাও যায় না। একা থাকলে তুমি বুঝতে পারবে তোমার মনের এই গতির কথা। এই বয়েসে নারীপুরুষের ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলেও ঈশ্বরে প্রেম থাকে না এতটুকুও। যৌবনকালের তেজ কমলে তখন আসে ঈশ্বরে ভরসা। এটা একটা কারণ। আরও দুটো কারণ আছে বাবা। প্রতিটি মানুষের দেহের ভিতরে আছে বায়ু। একটি বিশেষ রাস্তা দিয়েই চলতে থাকে তীব্রবেগে। তা তুমি নিজে বুঝতে পারো না। ওই পথেই এমন জায়গা আছে যেখানে বায়ু ঢুকলে মনের আনন্দভাব চলে যায় সাময়িকভাবে। আসে মনের অস্থিরতা। তারপর বায়ু ওই জায়গা অতিক্রম করলে আবার মনে আসে আনন্দ। অস্থিরতা চলে যায়। বাবা, এই নিয়মের মধ্যে দিয়েই চলতে হয় সাধু-সন্ন্যাসী—সকলকেই। তাই অনেক সময় ভজনে মন বসে না। যখন মনের ওই অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও লেগে থাকতে হয় সাধনে। সমানে তা চলতে থাকলে কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে আসে পূর্বাবস্থা। ছেড়ে দিলে বায়ুর গতি রুদ্ধ হয়। সহজে মনে আর আনন্দ আসতে চায় না, মনও বসে না জপ-তপে। একটু লক্ষ্য করলেই বাবা তুমি এর যথার্থতা উপলব্ধি করতে পারবে।
এই পর্যন্ত বলে সন্ন্যাসিনী মা একটু থামলেন। আমার মুখের দিকে তাকালেন। দেখলাম এ তাকানোর মধ্যে রয়েছে বেশ গভীরতা। আমি একনজর দেখে নামিয়ে নিলাম চোখ দুটোকে। তিনি আবার বললেন,
—বাবা, সংসারে অত্যন্ত বিষয়ী যারা, সব সময়ে যারা পড়ে আছে বিষয় অর্থ সম্পদ স্বামী বা সন্তান ইত্যাদি নিয়ে, মুখে ঈশ্বর সম্পর্কে দু-চারটে কথা গদগদভাবে বললেও এদের সঙ্গ করলে, এদের ছোঁয়া কোন খাদ্যগ্রহণ করলেও মনের আনন্দ নষ্ট হয়ে যায়। জপ-তপে অনীহা আসে। এদের রজোগুণ আর অসৎকর্মে লিপ্ত আছে যারা, তাদের সান্নিধ্যে ও কথোপকথনে তমোগুণের প্রভাবও ভজনকারীদের দেহমনকে কলুষিত করে নষ্ট করে আনন্দভাব। ফলে অস্থিরতা আসে সাধনভজন জপ-তপ ও মনের। তাই আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে যতটা সম্ভব এদের সঙ্গ এড়িয়ে চলাই ভালো। জপ-তপে মন বসে না, ভগবানের নামে রুচি আসে না তাদের, সংসারের আসক্তি বেশী যাদের। যার যত আসক্তি কমতে থাকে তার তত মন বসে ইষ্ট নামে। আর ভগবানের নামে তাদের রুচিও আসে।
জিজ্ঞাসা করলাম,
—সংসারে থাকলে তো বিষয় চিন্তা হবেই। একশ্রেণীর সাধু-সন্ন্যাসীদের দেখেছি ঘর ছাড়লেও বিষয় চিন্তা আর ভোগবাসনা ছাড়তে পারেনি। আমার জিজ্ঞাসা,

সংসারে থেকেও এই বিষয়চিন্তা লোপ করার উপায় কি ?

কথাটা শুনে খুশী হলেন মনে হলো। হাসিমুখেই বললেন,

—হ্যাঁ বাবা, তুমি ঠিকই বলেছো। তবে সংসারে থেকে বিষয়ীলোকের সঙ্গ ত্যাগ করলে বিষয়ে আসক্তি কমে। এদের সঙ্গ করা মানেই গৃহী হোক আর সাধু-সন্ন্যাসীই হোক, জানবে রজোগুণের সঙ্গ করা। ওই গুণের প্রভাবে প্রভাবিত হওয়া। ওদের সঙ্গ ত্যাগ করলে ক্রমে ক্রমে বিষয়বাসনা লোপ পায়। তবে বাবা এখানে একটা কথা আছে। গুরুবাক্য পালন করলে তাঁর কৃপালাভ হয়। তাতেই দেহমনের গ্লানি দূর হয়, সব দোষ কাটে। কামনা আর বিষয়বাসনার নিবৃত্তি হয়। তাঁর কৃপালাভ না হলে সংসারেই বলো আর সংসারের বাইরে সাধুজীবনেই বলো, কোন কিছুই হবার নয়।

সঙ্গে সঙ্গেই বললাম,

—আমরা তো মা সংসারী। সব সময়, সবক্ষেত্রে গুরুর সমস্ত উপদেশ মেনে চলতে পারি না এ-কথা আপনি নিজেও জানেন। এই না মেনে চলা, এতে কি কোন ক্ষতি হয় আমরা যারা সংসারী, তাদের ?

এবারও বললেন হাসির প্রলেপ মাখানো মুখে,

—না বাবা, তাতে ক্ষতি কিছু হয় না। তবে লাভ যেটুকু—সেটুকু আর হয় না। গুরুবাক্য পালন না করলে তিনি শিষ্যের প্রতি রুষ্টও হন না, প্রীতও হন না। কোন দোষ বা অপরাধও নেন না। গুরু সর্বদাই নির্বিকার। ওতে গুরুর কিছু যায় আসে না। তোমার লাভ হলো না কিছু—এই যা। তবে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কোনভাবে, সম্যক বা পরোক্ষে যদি কোন শিষ্য গুরুকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করে তাহলে বাহ্যত গুরু তার প্রতি অসন্তুষ্ট চিত্ত বা রুষ্ট না হলেও জানবে বাবা, তার ফল অতি মারাত্মক। ক্ষতি কিছু তার হবেই হবে। এখানেই শেষ নয় বাবা, কপট বা অতি সামান্য মিথ্যাচারণেও শিষ্যের অমঙ্গল হয় দেহিগুরু শিষ্যের উপর বাহ্যত প্রসন্ন থাকলেও। শিষ্যের অলক্ষ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে দুর্ভোগ কিছু হবেই হবে। এখানে গুরু ক্ষমা করেন না।

এবার প্রসঙ্গ পাল্টাবো বলে মনে মনে ভাবছি, ভাবছি এ-প্রশ্ন করা ঠিক হবে কি না ? আবার ভাবছি করেই ফেলি। দয়া করে উত্তর দিলে জানতে পারবো অনেক কথা, না দিলে জানবো না। এসব ভাবছি কোন কথা না বলে। আমার মনের অস্বস্তির ছাপটি বোধহয় ফুটে উঠেছিল মুখে। সেটা বুঝতে পেরেই সরাসরি সন্ন্যাসিনী বললেন,

—তুমি বাবা যে প্রশ্ন করতে লজ্জা পাচ্ছো তা আমি জানি। লজ্জার কোন কারণ নেই। আমি সংসার না করলেও ইন্দ্রিয়ের বাইরে তো আমার দেহটা নয়। সুতরাং তোমার সঙ্কোচের কোন কারণ নেই।

এইটুকু বলে একবার তাকালেন আমার মুখের দিকে। তাকালেন বেশ গভীরভাবে। কি ভাবলেন জানি না। আমি একবার চোখদুটো তুলে আবার নামিয়ে নিলাম।

আমাকে আর কোন প্রশ্ন করতে হলো না। নিজের থেকেই মা বললেন,

—বাবা, জগৎজোড়া ভগবানের এই সংসার। এখানে ইন্দ্রিয়সুখের সমস্ত উপকরণই আছে অঢেল। এই উপকরণের এমনই গুণ, এমনই এর আকর্ষণ—মানুষ শত শত জন্ম ভোগ করলেও নিবৃত্ত হতে পারবে না ভোগ থেকে। ভগবান এই আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন নিত্য নতুন রূপ দিয়ে, একই ভোগ্যবস্তুকে। রূপস্রষ্টা এই কৌশল ভোগের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন বলেই তো কারও সহজে ভোগনিবৃত্তি হতে চায় না। যেমন ধরো কেউ একটি সুন্দরী নারীকে দেখে মুগ্ধ হলো। তারপর ধরো তাকে ভোগও করলো চুটিয়ে। এবার ধরো রূপ স্রষ্টা তার কাছে পাঠিয়ে দিল আগের চেয়ে আরও সুন্দরী কোন নারীকে। এবারও কিন্তু তাকে ভোগের বাসনা জাগবে আগেরটাকে ছেড়ে দিয়ে। যারজন্যেই তো বাবা জগতের কোন পুরুষই খুশী হতে পারে না একটিমাত্র রমণীতে। ইন্দ্রিয়সুখ ছাড়া কামের মধ্যে তো আর কিছুই নেই। সেটা একটিমাত্র রমণীতেই পুরুষ পেতে পারে। কিন্তু ভগবান এক এক নারীর রূপ দিয়েছেন এক এক রকমের। সুন্দর, আরও সুন্দর—আরও আরও সুন্দর। সুন্দরের আর শেষ নেই বাবা। এই আকর্ষণকে ভিত্তি করেই পুরুষমনে সৃষ্টি হয় এক থেকে আর এক-এ বোধ হয় আনন্দটা বেশী। তাই ভোগের আর নিবৃত্তিই হতে চায় না। এরকমটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সমস্ত ভোগ্যবস্তু বা উপকরণের ক্ষেত্রেই বলা চলে নির্বিচারে সমানভাবে। সংসারে ভোগের জন্যে যা কিছু পাওয়া তা ক্ষণিকের আনন্দ পাওয়া মাত্র। আহার্য কোন বস্তুই বলো আর নারী-পুরুষের মিলনই বলো, ক্ষণিকের ভোগমুক্তি, দেহের আরাম, তাৎক্ষণিক মনের সুখ, তৃপ্তি। তারপর আবার যে কে সেই। ওতে দেহের, ইন্দ্রিয়ের সুখ হয়। আর এরজন্যেই তো সংসার। প্রকৃত মনের সুখ, আনন্দ আসবে কোথা থেকে? দেহ মনকে হত্যা করে তো কাম। নারীপুরুষকে সংসারে সৃষ্টিমুখী করে তোলে তো কামই। বিশেষ করে যৌবনকালেই এর তাড়নাটা বড্ড বেশী। এসব কথা বাবা শুধু পুরুষ নয়, নারীর ক্ষেত্রেও জানবে সমানভাবে। তারা তো আর বিশ্বজননী এই প্রকৃতির বাইরে নয়।

এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন। তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। দেখলাম গভীর একটা চিন্তার ছাপ পড়েছে মুখখানায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন,

—বাবা, বিধাতার এক অদ্ভুত মহৎ কৌশল হলো রূপ সৃষ্টি। নারীকে একেবারে রূপের আধার করেছেন পুরুষের চোখে। পুরুষের চোখে পুরুষের রূপ প্রকট হয় না। কোন পুরুষই কোন পুরুষকে রূপে সুন্দর দেখে না। নারীর রূপই পুরুষের চোখে সুন্দর, বাড়িয়ে তোলে আকর্ষণ। বিপরীতভাবে নারীর চোখে নারী নয়, পুরুষই সুন্দর। ফলে একে অপরের আকর্ষণে আকর্ষিত হয়। এই আকর্ষণ থেকেই সৃষ্টি হয় কামের। এটাই বিধাতার কৌশল। চাতুরীও বলতে পারো। তবে এ-কৌশল বাবা তাঁর সৃষ্টি রক্ষার প্রয়োজনেই। সৃষ্টির ধারা বজায় রাখতেই তিনি এই কৌশলে নারীপুরুষের মিলন ঘটান। বিধাতার এই

কৌশল আগে ভাগে বুঝতে পেরে যে সরে এলো, সেই-ই সংসারের যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেল। যে পারলো না সে সংসারের পাঁকে পড়ে চরকি খেতে থাকলো।

আবার থামলেন। এদিক ওদিক একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তীর্থযাত্রীদের আনাগোনা এখন একটু বেড়েছে। আমরা দুজনে মন্দিরের একপাশে বসেই কথা বলছি। তিনি বললেন,

—তবে বাবা এখানেও একটা কথা আছে। কোন পুরুষ কোন নারীর কাছ থেকে সবকিছু পেলেও নারীর আকর্ষণ কিন্তু মোটেই কমে না। কেন জানো ?

ঘাড় নেড়ে জানালাম, জানি না। সন্ন্যাসিনী মা বললেন,

—কোনদিনই কোন নারীর মনের খবর পায় না কোন পুরুষই। নিজের থেকে ভাবের বশে যতটুকু পুরুষের কাছে প্রকাশ করে তার বেশী এতটুকুও জানতে পারে না নারীর মনের খবর। আবার মনের কথা যেটুকু প্রকাশ করে, জানবে ভাবের বশে প্রেম ও সোহাগবশত। এইজন্যেই তো নারী অনন্তকাল ধরে পুরুষের কাছে এত আকর্ষণীয়। এ-স্বভাব বিধাতার ইচ্ছায় নারীর জন্মগত। এটাও জানবে বাবা বিধাতার কৌশল, সৃষ্টির ধারা বজায় রাখতে। অর্থাৎ বিধাতা তাঁর সৃষ্টির ধারা বজায় রাখতে যত রকমভাবে পেরেছেন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছেন পুরুষকে—নারীকে, নারীর রূপকে সামনে রেখে। পুরুষ বিমুখ হলে যে সৃষ্টি ব্যাহত হবে। শুধু রূপ দিয়ে আর সবকিছুই নারীর গোপন করে রেখেছেন পুরুষের কাছে। এরজন্যেই তো জীবসৃষ্টির গতি আজও রয়েছে অব্যাহত, থাকবে অনন্তকাল ধরে। সেখানে কোন নারীর প্রতি তোমার বা কারও যদি প্রেমভালোবাসা কিংবা মিলনের বাসনা জাগে মনে, নারীর রূপসৌন্দর্য দর্শনে মন চঞ্চল হয়, কামইন্দ্রিয়ের তাড়না যদি অধীরও করে তোলে, তাতে কোন পুরুষেরই কোন দোষ বা অপরাধ হয় না কিছু। বাবা, এ-ক্ষেত্রে নারীও বাদ নয়। তাই মনে পাপবোধও জাগার কথা নয়। নারীপুরুষের মন তো সৃষ্টিমুখী। জীবসৃষ্টির জন্যে উন্মুখ হয়ে রয়েছে কৈশোর থেকে যৌবনে পা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে। এটাই তো সৃষ্টির সুপ্ত নিয়ম। এই নিয়মের অধীনেই সকল নারীপুরুষকে চলতে হয় বাবা। ছেড়ে পালাবে কোথায় ? এ যে দেহমন নিয়ে বিশ্বজননীর সবচেয়ে বড় খেলা। আরও একটা কথা মনে রেখো, বিধাতারও কিন্তু শান্তিতে থাকার উপায় নেই যতক্ষণ না তিনি তাঁর নিয়মে নারীপুরুষের মিলন ঘটাতে পারছেন। মিলনেই তাঁর শান্তি। তারপর যা চলবে তা সৃষ্টির নিয়মেই চলবে। সৃষ্টি থেকে আবার সৃষ্টি, আবার সৃষ্টি—এই গতি আর রোধ হবে না কখনও তাঁর ইচ্ছা না হলে। তবে এই গতি রোধ হবে ইন্দ্রিয়ের তাড়না রোধ করতে পারলে। তা একমাত্র সম্ভব ইষ্টনামে। নিয়মিতভাবে ইষ্টনাম নিষ্ঠার সঙ্গে জপ করলে শুধু কামইন্দ্রিয় নয় বাবা, সমস্ত রিপুর বেগ কমে যাবে ক্রমে ক্রমে। তারপর এমন একটা সময় আসবে যখন জগতের কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বা বিষয়ের প্রতি কোন আকর্ষণই আর অনুভূত হবে না। একমাত্র তখনই মানুষ পারবে বিধাতার কৌশলকে কলা দেখাতে। তার আগে আর কোনভাবেই সম্ভব নয় সৃষ্টির ধারা

থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা। আর তা না করতে পারলে সংসারের যে নিয়ম, সেই নিয়মেই চলতে হবে সকলকে। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মায়া রোগ শোক—সমস্ত কিছুর বোঝা বহন করেই চলতে হবে ইহকালে। আবার তার সংস্কার নিয়ে ফিরে আসতে হবে সংসারে সৃষ্টির ধারা বজায় রাখতে। এমনটা যে কতবার আসতে হবে বাবা, তার কোন ইয়ত্তা নেই। আর সে কথা বলা কারও পক্ষে সম্ভবও নয়।

এবার প্রসঙ্গ পাল্টালাম। মানসিক দিক থেকে প্রসন্নভাবে আছেন বুঝে বললাম,

—মা, আপনি তো মেয়ে। স্নেহ ও ভাবপ্রবণ মন আপনার। নারী জীবনটাই সেবাকর্মের জীবন। সেটা থেকে বঞ্চিত হলে মেয়েদের থাকলোটাই বা কি? সংসার জীবনে প্রতিটি নারীরই একান্ত কাম্য থাকে স্বামী সন্তান আর সুখের সংসার। এ-গুলোকে ছেড়ে কেন এলেন এপথে?

হঠাৎ এমন প্রশ্নে মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গেল সন্ন্যাসিনীর মুখখানা। সেটাও সামলে নিলেন মুহূর্তে। নারী সত্তায় ঘা দিয়েছি বলেই মনে হলো। তিনি বললেন,

—হ্যাঁ বাবা তোমার কথা ঠিক। নারীর জীবনটাই সেবাকর্মের জন্যে উৎসর্গীকৃত। সেটা মূলত স্বামীকে নিয়ে সৃষ্টির মাধ্যমে। কিন্তু আমাকে দিয়ে সৃষ্টিরক্ষেত্রে বিধাতার কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না বলেই হয়তো তিনি আমাকে এনেছেন এ-পথে। বাবা, জগৎ সংসার বড় বিচিত্র। এখানে অনেকেই অনেক ক্ষমতার অধিকারী। অনেকের অনেক গুণও আছে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা প্রকাশে তিনি বঞ্চিত করে রাখেন। সেটাও বাবা সৃষ্টির কারণেই তিনি করে থাকেন। স্বামী সন্তান সংসার আর পাঁচটা মেয়ের মতো আমারও তো পাওয়ার কথা ছিল। সৃষ্টির জন্যে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই হয়তো বিধাতা আমাকে দেননি।

এবার জানতে চাইলাম,

—আপনি কথায় কথায় শুধু 'বিধাতা'র কথা বলছেন। বিধাতা কে?

সন্ন্যাসিনী প্রশান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,

—এই বিশ্বসংসার যিনি তাঁর নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছেন অনাদি অনন্তকাল ধরে, তিনিই বিধাতা—জগৎস্রষ্টা।

এবার একেবারে একটা ছেলেমানুষী প্রশ্ন করে বসলাম,

—মা, আপনার জ্ঞান বিকাশের পর আর পাঁচটা মেয়ের মতো স্বামী সংসার সন্তান, এসব নিয়ে কখনও কল্পনা বা ভাবনা মনে আসেনি?

হাসতে হাসতে বললেন,

—সংসারে আর পাঁচটা মেয়ের যেসব স্থূল ভাবনা সেগুলো তো আমার মধ্যেও ছিল। তা থেকে সরে আসবো কেমন করে!

সঙ্গে সঙ্গেই জানতে চাইলাম,

—তাহলে এ-পথে এলেন কেন, কি কারণে?

একটু গম্ভীর অথচ উদাসীনকণ্ঠে বললেন,

—কেন এ-পথে এলাম, কি কারণে—এসব কথা বাবা তুমি জানতে চেয়ো না।

অতীতটা আমার অতীতের গর্ভেই থাক্। তাকে আর প্রসব করিয়ে কাজ নেই। বাবা অতীতে ফিরে যাবো না বলেই যখন এ-জীবনে আসা, তখন ওসব কথা বলে যেমন আমার লাভ হবে না তেমন তোমারও। এমনি কথা বলো, সাধ্যমতো উত্তর দেবো।

পুরুষ সাধু হলে যেভাবে জোর দিয়ে কথা বের করি এখানে তা পারলাম না। তাই মনটাই আর চাইল না সন্ন্যাসিনীর গৃহত্যাগের কথা জানতে। পুরুষ হয়ে আর একজন পুরুষের কাছে খোলাখুলিভাবে যেসব কথা বলা সম্ভব তা মেয়েদের ক্ষেত্রে সব সময় সহজও নয়, সম্ভব তো নয়ই। অনেকের জীবনে এমন অনেক ঘটনার কথা, এমন অনেক কথা আছে যা মৃত্যু পর্যন্ত কোনদিন, কোনভাবেই তা সম্ভব হবে না প্রকাশ করা। তাই ও-প্রশ্নে না গিয়ে গেলাম অন্য প্রশ্নে,

—চলার পথে তো আপনি অনেক ঘরেরই শিশুদের দেখেন। সব মেয়েদের মনেই আছে একটা বাৎসল্যভাব। ওদের দেখার পর সেই ভাবটা কি আপনার মনে আসে?

এতটুকু দেরী না করেই বললেন,

—হ্যাঁ বাবা, আসে বৈ-কি? মেয়ে যখন—তখন মাতৃভাবটা যাবে কোথায়? কাছাকাছি থাকলে আদর করি। তবে কোন রেখাপাত করে না মনে। কেন জানো, সংসারীদের মন নিয়ে আমার মনটা তো তৈরী হয়নি তাই মনে কোন ছাপ ফেলে না। একটু আগেই তুমি বলেছিলে নারীর সেবাকর্মের কথা। বাবা, সংসারে স্বামীপুত্র ছাড়া কি আর সেবাকর্মের কোন বস্তু নেই! একটা পশু বা গাছের নিত্য পরিচর্যাও সেবাকর্ম। কারণ সংসারে যা কিছু দেখো তা সবই ভগবানের অংশবিশেষ। শুধু প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন রূপ, আকৃতিতে। একটা গাছের সেবা করার যে ফল, মানুষকে সেবা করার ফলের সঙ্গে তারতম্য নেই এতটুকুও। পার্থক্য শুধু আকৃতি আর প্রকৃতিতে।

এবার জিজ্ঞাসা করলাম,

—মা আপনাকে দেখে তো মনে হয় কখনও ভিক্ষে করেন না। কেমন করে চলে আপনার?

এ-কথায় হেসে ফেললেন সন্ন্যাসিনী মা। হাসতে হাসতেই বললেন,

—বাবা, সন্তান জন্মের আগেই বিধাতা যেমন মায়ের বুকে দুধ মজুত করে রাখেন তেমনই জানবে, সারা বিশ্বসংসারে প্রতিটি মানুষের আহারের ব্যবস্থা আগে করে, পরে তিনি জীবসৃষ্টি করেছেন। একটা কথা মনে রেখো বাবা, এ-পথে যাঁরা নেমেছেন তাঁরা কখনও খাওয়ার চিন্তা করেন-না। কিছু না কিছু জুটবেই জুটবে। তবে সব সময় রুচি অনুযায়ী খাবার পাওয়া যায় না।

সন্ন্যাসিনী বসে আছেন একভাবে। এতটুকুও নড়ছেন না। হাতপায়ে কোন চঞ্চলতা নেই। একেবারেই স্থির। এতক্ষণ পর আমার সহজভাবে কথা বলার ভাবটা এসেছে। প্রথমদিকে যে আড়ষ্ট ও অস্বস্তিটা ছিল এখন আর তা মোটেই নেই। এবার জানতে চাইলাম,

—বাড়ীর কথা মনে পড়ে না আপনার ? মা-বাবা ভাই-বোন এদের জন্যে মন চঞ্চল হয় না, মন খারাপ হয় না কখনও ?
সহাস্যে সন্ন্যাসিনী বললেন,
—মাঝেমধ্যে তাদের কথা মনে পড়ে বৈ-কি ? তবে মন খারাপ হয় না কখনও। এটা হয় কালের নিয়মে। কালের নিয়মটা কি জানো বাবা ? দীর্ঘকাল যদি অতি প্রিয়জনের কাজ থেকে দূরে সরে থাকো তাহলে মায়া বা টান তার উপর থেকে কমতে বাধ্য। রক্তের সম্পর্ক থাকলে মনে পড়বে। কখনও কখনও মন প্রথম অবস্থায় অস্থিরও হবে। পরে ধীরে ধীরে সে অস্থিরতা মন থেকে মুছে যায় দিন-মাস-বছরের ব্যবধান যত বাড়তে থাকে। তারপর এমন একটা সময় আসে যখন আর মনেই পড়ে না চট্ করে। এ-কথা বাবা শুধু সাধু-সন্ন্যাসীদের জীবনেই নয়, প্রতিটি মানুষের জীবনেই সত্য। তা না হলে যে মানুষের কর্মের গতি একেবারে রুদ্ধ হয়ে যেতো। তা তো হবার নয়। মানুষের জীবনে অতি বড় শোকও কালের ব্যবধানে মনের উপর কোন ক্রিয়া করতেই সক্ষম হয় না, বুঝলে বাবা!
কথাগুলো শুনেছি মন দিয়ে। অন্য কোন দিকেই মনটা আমার নেই। এক অদ্ভুত আনন্দের সঞ্চার হয়েছে মনে। এ-আনন্দ ওই সন্ন্যাসিনী মায়ের তপোপ্রভাবেরই ফল। নইলে অন্য কারও সঙ্গ করলে তো এমন হয় না। তাই আনন্দিত মনেই বললাম,
—মা, ক্রমশ তো বয়েস আপনার বাড়বে। দেহের শক্তিও তো কমে আসবে। তখন তো আর এই বয়েসের মতো এ-তীর্থ সে-তীর্থ করে বেড়াতে পারবেন না। দেহ হয়ে পড়বে অপটু। তখন কোথায় থাকবেন, কি করবেন, কেমন করে কাটাবেন এ-পথে শেষের দিনগুলো ?
অত্যন্ত শান্তকণ্ঠে স্থির চিত্তে উত্তর দিলেন মা,
—তোমার তো দেখছি বাবা বড় আগাম ভাবনা। তোমার কাছেই আমি জানতে চাই, সুন্দর একটা উত্তরও পেতে চাই তোমার মুখ থেকে, শেষের দিনগুলো কেমন করে কোথায় কাটাবো—কেমন! এবার তুমিই ধরো বিয়ে করলে। সন্তান হলো। হঠাৎ কোন কারণে বউটা সন্তান সমেত মারা গেল। দেহের অপটুতার জন্যে কর্মক্ষমতাও গেল চলে। আয়ের কোন সংস্থান নেই, সঞ্চয়ও নেই। বয়েসও হয়েছে ধরো অনেক। এমন অবস্থায় তোমার পাশে দাঁড়াবার মতো নেই কেউই। ঠিক এ-রকম একটা পরিস্থিতি যখন তোমার হলো, তখন তুমি বাবা ঠিক আমার মতো অবস্থাতেই এলে, একাকী নিঃসঙ্গ হলে। এমন একটা অবস্থায় যে তুমি আসতে পারো শেষ জীবনে, এসব কি কিছু ভেবে দেখেছো কখনও ?
ঘাড় নেড়ে জানালাম 'না, ভাবিনি কখনও।' সন্ন্যাসিনী বললেন,
—শেষের এমন একটা দিনের কথা তুমি গৃহী হয়েও যখন ভাবোনি, তাহলে এ-পথে এসে আমিই বা ভাবতে যাবো কেন ? ঠিক আছে বাবা, ওসব ভাবাভাবির কোন দরকার নেই এখন। তুমি শুধু এটুকুই বলো, ওই পরিস্থিতিতে তুমি কি করবে ?

প্রশ্ন করলাম আমি। ঘুরিয়ে সন্ন্যাসিনীই করলেন আমাকে। কি যে উত্তর দেবো তা বুঝেই উঠতে পারলাম না। এ-প্রশ্ন করেছি আমি বহু সাধু-সন্ন্যাসীকেই। কিন্তু কেউই ঘুরিয়ে প্রশ্নের বোঝাটা আমার কাঁধে কখনও তুলে দেয়নি। মহা অস্বস্তিকর একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে গেলাম আমি। সন্ন্যাসিনীর মুখের দিকে তাকালাম একবার। দেখছি, এমন একটা অবস্থায় ফেলে খুশীতে হাসছেন তিনি। আমার মুখে হাসি নেই। কোন কথাই খুঁজে পাচ্ছি না। তিনিও কোন কথা বলছেন না। বুঝতে পারছি সময় দিচ্ছেন উত্তরটা শোনার জন্যে। কেটে গেল মিনিটপাঁচেক। এবার মা-ই বললেন,

—বাবা, এ-প্রশ্নের উত্তর তুমি সারাজীবন ধরে ভাবলেও পাবে না কখনও। এর উত্তর তুমি একমাত্র পেতে পারো, ভগবানের প্রতি, তোমার গুরু বা ইষ্টের প্রতি শরণাগত হলে। তাঁর শরণাগত হলে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময়কাল পর্যন্ত তিনি তাঁর সন্তানকে আনন্দের সঙ্গে রক্ষা করেন চিন্তা বিমুক্ত করে। তিনি যে বাবা সকল চিন্তার আধার। শরণাগতের চিন্তা তো তিনিই করেন। এটাই চিরন্তন শাশ্বত সনাতন সত্য। এটাই যখন সত্য—তখন, এখন যেমন যেভাবে রেখেছেন, শেষের দিনগুলোও রাখবেন এইভাবে। থাকবোও বাবা তাই।

সন্ন্যাসিনী মায়ের কথাটা শুনে অবাক হলাম না। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। কতটা নির্ভরতা এলে তবেই একজন নারী অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ জীবনকে কোন গুরুত্বই দেয় না, ভাবেও না এক মুহূর্তের জন্যে। পুরুষ হলে তবুও অতটা ভাবনা ছিল না। কিন্তু একজন নারীর পক্ষে একাকী পথ চলার এই জীবনের কথা ভাবাই যায় না।

এবার প্রসঙ্গ পাল্টে বললাম,

—মা, সংসারে এমন একজনকেও দেখলাম না যার ক্রোধ নেই। কামের মতো এটাও তো বড় একটা রিপু। এতে ক্ষতি ছাড়া লাভ তো কিছু হয় না। ছোট বড় নানা কারণেই ক্ষেপে ওঠে মানুষ। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ কি আপনার জানা আছে ?

হাসি হাসি মুখ করেই বললেন,

—হ্যাঁ বাবা, এটাও একটা বড় রিপু। এ-রিপু সাধনজীবন, সাধনপথের অন্তরায়। সংসারে ক্রোধ কাদের বেশী জানো ? ক্রোধ তাদেরই বেশী যারা আত্মপ্রশংসা শুনতে ভালোবাসে। শুধু তাই নয় বাবা, পরের দোষ দেখে আর পরসমালোচনা শুনতে এবং করতে ভালোবাসে যারা, তাদের ক্রোধ বেশী। এই প্রবণতা যার মধ্যে যত বেশী, তার ক্রোধও তত বেশী। আর ক্রোধ বেশী, যাদের কাম বেশী। কাম বলতে বাবা শুধু কামই (sex) নয়, পার্থিব কামনা আর ভোগবাসনা—এক কথায় বিষয়বাসনা যাদের বেশী। এই ক্রোধের জন্মদাতা হচ্ছে অভিমান। পাওয়া না পাওয়ার অভিমান। এগুলো ত্যাগ করলেই বুদ্ধি ধীরে ধীরে স্থির হয়ে যায়। অভিমান ত্যাগ করলেই ক্রোধ আসে না। আর ক্রোধ না এলেই মানুষ তখন অত্যন্ত লোকপ্রিয় হবে। যশ

আর সম্মান, এদুটো তার হাতের মুঠোয় এসে যাবে।

কথা শেষ হতেই আমি বললাম,

—মা,...

কথাটা আমার শেষ হলো না। সহযাত্রীদের একজন এসে বেশ উত্তেজিত কণ্ঠেই বললেন,

—দূর মশাই, আপনি এখানে বসে ভণ্ডামী শুরু করেছেন আর আমরা ওখানে সবাই দাঁড়িয়ে আছি কখন থেকে। আপনার জন্যে আমাদের সময় নষ্ট হচ্ছে। ওসব করতে হলে একা আসবেন। চলুন, বাস দাঁড়িয়ে আছে।

কোন উত্তর দিলাম না। একবার সহযাত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে পরে তাকালাম সন্ন্যাসিনী মায়ের প্রশান্ত মুখের দিকে। হাসলেন, কোন কথা বললেন না। প্রণাম করলাম। দুহাত মাথায় স্পর্শ করে আশীর্বাদ করলেন। উঠে পড়লাম বিষণ্ন মন নিয়ে।

অনেক অ-নে-ক কথা জানার ছিল। জানা হলো না অনেক কথা। চললাম সহযাত্রীর পিছন পিছন, যেমন অবস্থাপন্ন বাড়ীর মানুষ তার শিকলে বাঁধা পোষা কুকুরটাকে টানতে টানতে নিয়ে যায়, তেমন।

## শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাধ এবং ভালকা তীর্থ

বাস ছাড়লো সোমনাথ মন্দিরের কাছ থেকে। শহরের পথ ধরে এলাম মাত্র ৪ কি.মি.। এলাম ভালকা তীর্থে। সোমনাথ থেকে পোরবন্দরে যাওয়ার যে পথ, সেই পথেই পড়লো ভালকা।

বাস থেকে নেমে প্রধান ফটক ছেড়ে ঢুকলাম বিস্তৃত এক প্রাঙ্গণে। সুন্দর, রমণীয় পরিবেশ। বেশ কয়েকটা বড় বড় বট গাছের শীতল ছায়া ঘেরা প্রাঙ্গণ। তীর্থযাত্রী আর পর্যটকেরা এলে বিশ্রাম করেন এখানে বসে। এর ডানপাশেই দাঁড়িয়ে আছে অনাড়ম্বর একটি মন্দির নাটমন্দির যুক্ত হয়ে। ভিতরে ঢুকেই দেখলাম একটি মাঝারী আকারের অশ্বত্থগাছ। বাঁধানো বেদী। তার পাশেই রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর একটি মূর্তি। বসে আছেন পা মেলে। দর্শনার্থীদের বাঁদিকে কৃষ্ণের পাশেই হাতজোড় করে বসা অবস্থায় মূর্তিটি জরা ব্যাধের।

একদা মৃগ ভেবে শ্রীকৃষ্ণের পায়ে তীরবিদ্ধ করার পর জরা ক্ষমাভিক্ষা চাইলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে। ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ অভয় দিলেন,

—"বৎস, তোমার কোন দোষ নেই। পরিতাপেরও কোন কারণ নেই। ত্রেতাযুগে রামরূপে পৃথিবীতে এসেছিলাম আমি। বিনা অপরাধে হত্যা করেছিলাম বানররাজ বালীকে। তখন বালীপত্নী তারাদেবী রোষভরে অভিশাপ দেয় আমাকে, তাঁর পুত্রের হাতেই আমার মৃত্যু হবে। আমার ইচ্ছায় মৃগ ভেবে তুমি আমারই পায়ে তীর বিদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছো। আমার ইচ্ছা ছাড়া তুমি এ-কাজ কখনই করতে সক্ষম হতে না। তুমি আর কেউ নও, সেই বালীরই পুত্র, জন্মান্তরে এখন ব্যাধ

হয়ে জন্মগ্রহণ করে এই অভিশাপবাক্য সত্যে পরিণত করেছো। উভয়েরই আমাদের এখন নিত্যধামে যাওয়ার সময় হয়েছে। সুতরাং আমার আশীর্বাদ রইলো। তুমি স্বর্গারোহণ কর।"

কথিত আছে, ভালুকার এই ক্ষেত্রটিতে একদা শ্রীকৃষ্ণ এসে বসেছিলেন অশ্বত্থগাছে। জরা ব্যাধের তীরে বিদ্ধ হয়েছিলেন এখানে। তারপর আহত শ্রীকৃষ্ণ চলে যান প্রভাসে। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সেখানেই, যে স্থানটি আজ প্রসিদ্ধিলাভ করেছে দেহোৎসর্গ নামে।

প্রবাদ আছে, এখানকার মন্দিরস্থ অশ্বত্থগাছটি মহাভারতীয় যুগের। বংশানুক্রমে মূল গাছটির কলম থেকে চলে এসেছে এই গাছটি। যেমন আজও বেনারসের সারনাথে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন মূল বোধিবৃক্ষ থেকে উৎপন্ন কলমের গাছটি।

ভালুকার কৃষ্ণ মন্দিরের পাশেই অর্থাৎ মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করার প্রথমেই বাঁদিকে রয়েছে একটি মাঝারী আকারের কুণ্ড। পাথরে বাঁধানো চারপাশ। সিঁড়িও নেমে গেছে জল পর্যন্ত। তার পরেই বাঁদিকে রয়েছে একটি শিব মন্দির।

কথিত আছে, জরা ব্যাধের তীরে বিদ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রক্তাক্ত চরণ দুটি ধুয়েছিলেন এই কুণ্ডের জলে। তাই এই কুণ্ডটি প্রসিদ্ধিলাভ করেছে পদমকুণ্ড নামে। এটুকু ছাড়া ভালকায় তেমন কিছু আর দেখার নেই। তবে কথিত আছে, আজকের ভালকা তীর্থ মহাভারতীয় যুগের কাম্যকবন। পঞ্চপাণ্ডব বনবাসকালে এই ভালকাতীর্থ বা কাম্যকবনে বাস করেছিলেন কিছুদিন। মহাভারতের বনপর্বে, ষষ্টোঽধ্যায়ঃ, ১ থেকে ৬ সংখ্যক পর্যন্ত শ্লোক আছে,

"বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ বনবাস উদ্দেশ্য করিয়া, অনুচরবর্গের সহিত মিলিত হইয়া, গঙ্গাতীর হইতে কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন ॥

তাঁহারা সরস্বতী, দৃশদ্বতী ও যমুনা নদীতে স্নান করিয়া, সর্ব্বদা পশ্চিম দিক্ লক্ষ্য করিয়া, বনপথেই কাম্যকবনের দিকে যাইতে লাগিলেন। তাহার পর, তাঁহারা সরস্বতী নদীর তীরে পার্ব্বত্য সমতলভূমিতে নানাবিধ তরুলতা ও সুস্বাদু ফলযুক্ত স্থানে মুনিজনপ্রিয় কাম্যকবন দর্শন করিলেন ॥

হে ভরতনন্দন জনমেজয়! মহাবীর পাণ্ডবগণ বহুতর পশু-পাখি-সমাকীর্ণ সেই কাম্যকবনে বাস করিতে লাগিলেন; তখন মুনিরা তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিতে থাকিলেন ॥

তৎপরে সর্ব্বদাই পাণ্ডবগণের দর্শনাকাঙ্ক্ষী বিদুর একমাত্র রথে আরোহণ করিয়া ফলসমৃদ্ধিসম্পন্ন কাম্যকবনে গমন করিলেন ॥

তাহার পর, বিদুর দ্রুতগামী অশ্বগণে পরিচালিত রথে আরোহণপূর্ব্বক কাম্যকবনে যাইয়া, ব্রাহ্মণগণ, ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সহিত পবিত্রস্থানে উপবিষ্ট যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিলেন ॥"

একদা শ্রীকৃষ্ণ, মহাত্মা বিদুর আর পাণ্ডবগণের পাদস্পর্শে পবিত্র মহাভারতীয় যুগের

কাম্যকবন তথা আজকের তীর্থ ভালকা দেখা হলো। এখানে সময় বেশী লাগে না। মিনিট দশেকের মধ্যে দেখা হয়ে যায়। থাকারও কোন প্রয়োজন হয় না কোন যাত্রীরই। সকলেই একে একে এসে বসলাম বাসে। শুরু হলো চলা। আবার সেই একই পথ ধরে এলাম পোরবন্দরে।

## দ্বারকাধীশের দ্বারকাপুরী

সকাল ৬টা। এখনও অন্ধকার রয়েছে। বাস ছাড়লো পোরবন্দর গেস্ট হাউস, বলা যায় একেবারে স্টেশনের কাছ থেকে। সুন্দর রাস্তা ধরে বাস চললো দ্বারকার পথে।

শহর ছেড়ে বাস ধরলো শহরতলীর পথ। কখনও ধু-ধু করছে ফাঁকা মাঠ। আবার কখনও ছোট ছোট গ্রাম। এমনটা, যেমন দেখা যায় ভারতের যেকোন প্রান্তে দূরে কোথাও যাওয়ার পথে। বৈচিত্র্য কিছু নেই।

আমাদের ভ্রমণপর্ব এবার শেষ হতে চললো। দ্বারকাই ভ্রমণের শেষ পর্ব। এর পর ঘরে ফেরার পালা। সঙ্গী যাত্রীদের অনেকের চোখ মুখে ফুটে উঠেছে একটা আনন্দের ভাব, তাদের আকাঙ্ক্ষিত দ্বারকা দর্শন হবে আজই। বাস চলতে লাগলো আবছা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে।

আজকের দ্বারকার প্রাচীনকালের নাম ছিল কুশস্থলী। একবার ব্রহ্মা স্থির করলেন সমগ্র বিশ্ব মাপবেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না কোথা থেকে শুরু করবেন এই মাপার কাজটা। তখন স্থান নিরূপণের জন্যে একটি কুশ নিক্ষেপ করলেন তিনি। সেটি এসে পড়লো আজকের দ্বারকাক্ষেত্রে। বিশ্ব মাপার কাজ শুরু করলেন এখান থেকে। সেই থেকে এর নাম হয়েছে কুশস্থলী। এ-কথা মহাভারতীয় যুগের অনেক অ-নে-ক আগের কথা।

একদা দ্বারকা ছিল প্রাচীন ভারতে চন্দ্রবংশের রাজা যযাতির রাজ্যের অন্তর্গত। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র যদুকে দান করেছিলেন পশ্চিম ভারতের সমুদ্রোপকূলের অঞ্চল। এই অংশটি তখন ছিল গিণার পর্যন্ত সমগ্র সৌরাষ্ট্রের অনুর্বর অংশ।

যদুবংশের অনর্ত এবং রাজা রিভাত একদা সিংহাসনে আরোহণ করলে তখন দ্বারকার নাম হয় অনর্ত নগরী বা রিভাত নগর।

রাজা শর্য্যাতির কথা। উত্তানবর্হি, আবর্ত ও ভূরিসেন—তিনটি ছেলে রাজার। আবর্তের এক ছেলের নাম রেবত। তাঁর নাম থেকেই সমগ্র সৌরাষ্ট্র ও গিণার পার্বত্য অঞ্চলের নাম হয় রৈবতক। বৈবস্বত মনুর প্রপৌত্র রাজা রেবত কুশস্থলী নগরীর পত্তন করেন। অনেকের মতে, বৈবস্বত মনুর পুত্র সূর্যবংশীয় প্রথম রাজা ছিলেন ইক্ষ্বাকু। তাঁর ভাগ্না অনর্তই নাকি প্রতিষ্ঠা করেন কুশস্থলী নগরী। এই নগরী ছিল অনর্তরাজ্যের রাজধানী। এ-কথা উল্লিখিত হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবত এবং বিষ্ণু-পুরাণে। পরে দ্বাপর যুগে এই কুশস্থলীই হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের যদুবংশের রাজধানী দ্বারাবতী বা দ্বারকাপুরী।

শ্রীকৃষ্ণের মুখেও শোনা গেছে এই কুশস্থলীর কথা। তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন,

—"ক্রমে আমরা সকলেই ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিয়া, জরাসন্ধের ভয়ে পুত্র, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়া, পশ্চিমদিক্ ধরিয়া পলায়ন করিলাম ॥

মহারাজ! ক্রমে আমরা রৈবতকপর্ব্বতশোভিত মনোহর কুশস্থলীনামক নগরীতে যাইয়া সেইখানেই বাস করিতে লাগিলাম ॥ (মহাভারত, বনপর্ব, চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ, পৃষ্ঠা-১৪৫)

১/৪৫ মিঃ বাস চলে এবার থামলো। আমরা সেখানেই এলাম, দেবর্ষি নারদের কথায়, "যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন—সুরাষ্ট্রদেশেও 'চমসোদ্ভেদন' নামে তীর্থ এবং সমুদ্রের উপকূলে দেবগণের প্রভাসতীর্থ রহিয়াছে। সেই দিকে দ্বারকা-নগরী আছে; যাহাতে অনাদিদেবতা সাক্ষাৎ মধুসূদন বাস করিতেছেন।" (মহাভারত, বনপর্ব, ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ, পৃষ্ঠা-৮২২, ৮২৩)

আমাদের ভ্রমণ শুরু হয়েছে জয়পুর থেকে, শেষ হবে দ্বারকাতেই। প্রথমে রেল এবং পরে বাস-পথে পোরবন্দর হয়ে এখানে এলাম ১১৩৭ কি. মি.। সরাসরি কলকাতা থেকে আসা হলে ২৪৫৫ কি. মি. আর বোম্বাই থেকে যারা আসবে তাদের পেরিয়ে আসতে হবে ১০০৭ কি. মি.। আবু রোড থেকে দ্বারকা মাত্র ৫৮২ কি. মি.। হাওড়া থেকে আমেদাবাদ ২০৯০ কি. মি.।

দ্বারকায় আপাতত মিনিটদশেক বিশ্রাম। আবার শুরু হলো চলা। এখন নয়, আগে ভেটদ্বারকা দেখে তারপর এসে থামবো দ্বারকায়। তাই আমাদের বাস এগিয়ে চললো ভেটদ্বারকার উদ্দেশ্যে।

মিনিটকুড়ির মধ্যেই এসে গেলাম আরব সাগরের তীরে পশ্চিম-ভারতের শেষ প্রান্তভূমি ওখায়। দ্বারকা থেকে বাসপথে দূরত্ব ৩২ কি. মি.। ট্রেনও আসে ওখায়। দূরত্ব ৩১ কি. মি.।

সহযাত্রীরা একে একে এলেন স্টিমার ঘাটে। এলাম আমিও। টিকিট কেটে উঠলাম যন্ত্রচালিত নৌকোয়। যেতে হবে ওপারে। জলপথে ৫ কি. মি. পার হতে সময় লাগলো পনেরো মিনিট। এলাম সমুদ্রের মধ্যে ছোট্ট একটা দ্বীপ ভেটদ্বারকার ঘাটে।

ঘাট থেকেই সিমেন্টের বাঁধানো রাস্তা, সামান্য চড়াই। হেঁটে এলাম মিনিটসাতেক। দুপাশে কিছু মনোহারী দ্রব্যের দোকানকে ডাইনে বাঁয়ে রেখে এসে মোড় পড়লো একটা। বাঁদিকে একটু এগোতেই তোরণদ্বার। আরও একটু এগোলাম। আবার এলো আর একটা তোরণদ্বার। পেরিয়ে ঢুকলাম 'ভেট দেবস্থান' চত্বরে।

কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সুদামার আনা 'ভেট' থেকেই নাম হয়েছে এর 'ভেটদ্বারকা'। অনেকের ধারণা, শ্রীকৃষ্ণের মূল দ্বারকাই ছিল এই ভেটদ্বারকা। মত আছে আরও একটা। সুদামা থাকতেন পোরবন্দরে। সেখান থেকে ভেট নিয়ে দেখা করতে আসেন দ্বারকায়। পরে ফিরে গিয়ে দেখেন তাঁর বাসস্থানে বিশাল প্রাসাদপুরী। প্রাচীনকালে তাই আজকের পোরবন্দরের নাম হয়েছিল সুদামাপুরী।

ভেট দেবস্থানের মূল মন্দিরে ঢোকার আগেই বাঁপাশে রয়েছে ছোট্ট একটি শিব মন্দির। ও অনাড়ম্বর মন্দিরে স্থাপিত শিবলিঙ্গটি দ্বারকেশ্বর মহাদেব।

মন্দির প্রাঙ্গণে ঢুকতেই ডানদিকে পড়লো শ্রীরাধিকার মন্দির। ভিতরে প্রতিষ্ঠিত কালো পাথরের সুন্দর মূর্তিটি রাধার। রঙীন কাপড়ে মোড়া দেহে রূপ যেন একেবারে উথলে উঠছে।

মূল মন্দিরটি শ্রীকৃষ্ণের। রূপোর চাদরে মোড়া দরজা। সুন্দর সাজানো রূপোর আসনে কোণ্টিপাথরের শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছে বাঁশি হাতে। কৃষ্ণের এই মন্দিরটিকে ঘিরে আরও অনেকগুলি প্রকোষ্ঠে একাদিক্রমে রয়েছে কৃষ্ণশিষ্য প্রদ্যুম্ন, পুরুষোত্তম ভগবান, ত্রিবিক্রম, কৃষ্ণপত্নী জাম্ববতী, অম্বাজী, লক্ষ্মীনারায়ণ, দেবকী এবং সাক্ষী-গোপাল বিগ্রহ। প্রতিটি প্রকোষ্ঠের মূর্তিই কালো কোণ্টিপাথরের। সবই রয়েছে পাশাপাশি। মন্দিরের কোন আকর্ষণ নেই—নেই শিল্পের এতটুকু ছোঁয়া। যৌথ পরিবারের আদ্যিকালের সাদামাটা বাড়ীগুলি যেমন কোন পরিকল্পনা ছাড়া, তেমন চেহারা এই দেবস্থানের মন্দিরেও। বিশাল একটি বাড়ীর মধ্যে স্থাপিত আছে বিগ্রহগুলি। মিনিট পনেরোর মধ্যেই সব দেখা হয়ে যায়।

ভেটদ্বারকার প্রাচীন নাম শঙ্খোদ্ধার তীর্থ। এ-নামের উল্লেখ আছে মহাভারতেও। মৎস্যাবতারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খাসুরকে মোক্ষদান করেছিলেন এই ক্ষেত্রে, তাই তাঁরই নামানুসারে হয়েছে স্থানের নাম। তবে এই তীর্থের আকৃতি অনেকটা শঙ্খের মতো। প্রবাদ আছে, পৌরাণিক যুগে নারায়ণ শঙ্খচূড়ের ছদ্মবেশে এই ক্ষেত্রটিতে তুলসীর সতীত্ব নষ্ট এবং মহাদেব এখানে বিষ্ণুর সাহায্যে দৈত্য শঙ্খচূড়কে সংহার করেন।

ভেটদ্বারকার মূল মন্দির থেকে মাইলখানেক এগোলেই প্রথমে বাঁধানো, পরে মেঠো পথ ধরে এলাম শ্রীশঙ্খনারায়ণ মন্দির। ভক্ত শঙ্খচূড়ের নাম যুক্ত হয়েছে এখানে ভগবানের সঙ্গে। মন্দিরে শ্বেতপাথরের বেদীতে স্থাপিত রয়েছে দাঁড়ানো কৃষ্ণমূর্তি। মন্দিরের পিছনেই মাঝারী আকারের সরোবর শঙ্খ তালাও। এর চারদিকটাই বাঁধানো, প্রাচীরে ঘেরা। এই সরোবরে স্নান করে শঙ্খনারায়ণের পুজো দেয়াই এখানকার বিধি। এই পুষ্করিণীটি খনন করান দামাজী রাও গায়কোয়াড় ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে। পরে একবার সংস্কার করা হয় ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে।

আবার সেই একই পথ ধরে এলাম ভেটদ্বারকার ঘাটে। তারপর সাগর পার হয়ে এলাম এপারে ওখায়। বাস চললো দ্বারকায়।

ওখা থেকে দ্বারকার পথে ২৮ কি. মি. চলার পর বাস থামলো যেখানে, সেখানে দিগন্ত বিস্তারি মাঠ। তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটি প্রাচীন মন্দির। রুক্মিণী মন্দির নামেই এর প্রসিদ্ধি। কারুকার্যখচিত পাথরের মন্দির। তবে সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় নষ্ট হয়ে গেছে, যেমন নষ্ট হয়েছে উড়িষ্যায় কোণারক মন্দির। দ্বারকাধীশ মন্দির থেকে রুক্মিণী মন্দিরের দূরত্ব মাত্র ২ কি. মি.। শ্রীকৃষ্ণ এবং পত্নী রুক্মিণীর বিগ্রহ আছে এই মন্দিরে—ব্যস, এ-টুকুই।

পুরাণের কথা। শ্রীকৃষ্ণ এবং রাণী রুক্মিণী দেবীর তীর্থগুরু ছিলেন দুর্বাসা মুনি। একদিন মুনিকে আহ্বান করে, টানা-গাড়িতে নিজেরাই টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন অশ্বের পরিবর্তে। প্রাকৃতিক কারণে পথের মধ্যে একবার থামতে হলো কৃষ্ণপত্নীকে। এতে ক্রুদ্ধ হলেন দুর্বাসা। অভিশাপ দিলেন স্বামী বিচ্ছেদের। এই অভিশাপ খণ্ডনের জন্যে আর্তি জানালেন রুক্মিণী। মুনির ক্রোধ উপশম হলো। তিনি বললেন, অভিশাপ তো বিফলে যাবে না। তবে কৃষ্ণের কাছ থেকে অল্প দূরত্বেই থাকবেন, পুজোও পাবেন কৃষ্ণের সমমর্যাদায়। অভিশাপ সফল হলো। কৃষ্ণের সঙ্গে বিচ্ছেদ হলো না তবে কৃষ্ণ মন্দির থেকে ২ কি. মি. দূরে গোমতী তীরে নিঃসঙ্গ অনাড়ম্বর মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা হলেন দেবী রুক্মিণী।

কথিত আছে, দ্বারকাধীশের দর্শনের পর রুক্মিণী দেবীর দর্শন না করলে কোন ফল হয় না দ্বারকা দর্শনের।

রুক্মিণী মন্দির থেকে টুক্ করে বাস ছেড়ে এসে দাঁড়ালো দ্বারকায় মীরা হোটেলের সামনে। দেখলাম, কলকাতার বেশ কিছু ভ্রমণকারী প্রতিষ্ঠান এসে উঠেছে এই হোটেলে। অপরিচ্ছন্ন হোটেল। আমার অন্তত ভালো লাগেনি। ভ্রমণকারী প্রতিষ্ঠান যেখানে তুলবে, আমাদের যেতে হবে সেখানেই। প্রতিবাদ করে কোন লাভ হয় না। সুতরাং উঠতেই হলো। অসংখ্য ভালো হোটেল আছে দ্বারকায়। আসলে সস্তায় কিস্তি মেরেছে।

সামান্য বিশ্রামের পর বেরিয়ে পড়লাম। হোটেল থেকে মিনিটদশেক হেঁটে এলাম দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ মন্দিরের সামনে। মন্দিরকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে ছোট্ট শহর, বাজার। অসংখ্য মনোহারী দ্রব্যের দোকান। আর পাঁচটা তীর্থের মতো। সারি সারি সাজানো দোকানে রয়েছে কাঁচের চুড়ি, গলার মালা, কানের দুল, কৃষ্ণের ফটো, পিতল কাঁসার বাসন, মন্দিরে পুজো দেয়ার জন্যে নকুলদানা আর মিছরীর প্যাকেট। তুলসীপাতা আর ফুলের মালা নিয়েও বসে আছে অনেকে পথের ধারে।

চওড়া ঢালাই করা রাস্তা ধরে একটু উপরে উঠলেই মন্দির চত্বর। দেখছি অসংখ্য তীর্থযাত্রী চলেছে দলে দলে। খুব সামান্য সংখ্যক ছাড়া সবাই অবাঙালী। আর আছে অসংখ্য দেশওয়ালী। কৃষ্ণের নাম গানে মুখরিত হয়ে রয়েছে দ্বারকাধীশ মন্দির প্রাঙ্গণ।

নদী গোমতী থেকে ৪৫ মিটার উঁচুতে স্থাপিত হয়েছে কৃষ্ণ মন্দির। গ্রানাইট আর বেলে পাথরে তৈরী মন্দিরটি সাত-তলা। এদিকে নীচ থেকে ধরে রেখেছে মূলে আটটি স্তম্ভ। গোটা মন্দিরটি ৭০টি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে নাটমন্দিরসহ। মন্দির চূড়ায় ১২৫ ফুট উপরে আছে সোনার কলস। মন্দিরের ধ্বজাবাহী স্তম্ভটি ২৫ ফুট উঁচু। এর উপরেও আছে আরও একটি কারুকার্য খচিত ২০ ফুট স্তম্ভ। তাতে যে পতাকাটি সারা দিনরাত পত্পত্ করে উড়ছে সেটি ৮৪ ফুট কাপড়ের।

দ্বারকা মন্দিরে ঢোকার আগেই বাঁপাশে পড়লো শংকরাচার্য মন্দিরের প্রবেশদ্বার। তার একটু এপাশে যাত্রীদের জুতো রাখার জায়গা। প্রবেশদ্বার আর জুতো রাখার জায়গা, এরই মাঝে একফালি জায়গা পড়ে রয়েছে অকেজো হয়ে। কোন প্রয়োজনে, কারও প্রয়োজনেই এখনও লাগেনি জায়গাটুকু। পড়ে রয়েছে হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে। এমনভাবে পড়ে থাকে সব সময়েই। এর সামনে দিয়ে যাতায়াতের বিরাম নেই যাত্রীদের। এখন এই জায়গায় বসে আছেন এক সাধুবাবা। তিনি উঠে গেলেই আবার ফাঁকা পড়ে থাকবে। গেরুয়া বসন পরা সাধুবাবা বসে আছেন দেয়ালে হেল্যান দিয়ে। একটু আরাম বা বিশ্রাম নিতে মানুষ যেমন হেলান দিয়ে বসে দেয়ালে বা চেয়ারে, ঠিক তেমন ভাবেই বসে আছেন। বসে আছেন হাঁটু দুটো মুড়ে, বাবু হয়ে নয়। আধ কাঁচা আধ পাকা দাড়ি রয়েছে গাল ভর্তি। মাথা ভর্তি লম্বা চুল। কিছু নেমে এসেছে কাঁধ বেয়ে সামনে, কিছু রয়েছে পিছনে। গায়ের রঙ ফরসা। পরিপুষ্ট চেহারা তবে মোটা নয়। বসা অবস্থায় আন্দাজ করলাম লম্বা নয়। আবার বেঁটে বলা যাবে না। মাঝারি উচ্চতা। মুখখানা খুব সুন্দর। বেশ টান আছে একটা। পাশেই রয়েছে ছোট্ট একটা ঝোলা। বসে আছেন খালি মাটিতে। আমি দেখলাম, তিনি দেখছেন যারা মন্দিরে আসছে—যাচ্ছে।

একেবারে সরাসরি গিয়ে বসলাম সাধুবাবার সামনে মুখোমুখি হয়ে। প্রণাম করলাম। সাধুবাবা হাঁটু ভেঙে বসে ছিলেন। আমি বসতেই তিনিও বসলেন সোজা হয়ে, বাবু হয়ে। তাকালেন মুখের দিকে। জানতে চাইলাম,

—বাবা কি দ্বারকাতেই থাকেন, না অন্য কোথাও ডেরা আছে ?

কোন সঙ্কোচ, কোন দ্বিধা না করেই জবাব দিলেন ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে,

—না বেটা, আমার কোথাও কোন ডেরা নেই। দ্বারকাতেই এসেছি। এখানে থাকবো এখন মাসখানেক। আগেও অনেকবার এসেছি। কেন জানি না, দ্বারকাটা আমার বেশ ভালো লাগে।

কথার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর পাবো মোটেই ভাবিনি। চোখমুখের ভাব দেখে মনে মনে ভাবলাম, কথা বলে উত্তর পেতে বেশী বেগ পেতে হবে না। জিজ্ঞাসা করলাম,

—এখানে আসার আগে কোন্ তীর্থে ছিলেন ?

সহজভাবেই উত্তর দিলেন,

—এর আগে মাসদুয়েক ছিলাম বৃন্দাবনে। তারপর মনটা চলে এলো দ্বারকায়, মনের সঙ্গে এলাম আমিও।

কথাটা শুনেই বললাম,

—মন যা চায়, মন যা করে, আপনি কি তাই-ই করেন ?

হাসিমুখেই বললেন,

—হাঁ বেটা, তাই-ই করি। আগে মন কাজ করে। তারপর মনের আজ্ঞায় কাজ করে দেহ।

জানতে চাইলাম,

—বাবা, মন যা চায় তাই-ই যদি আপনি করেন, তাহলে তো দেখা যাচ্ছে মন আপনার ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়েই আছে, আপনার বশে নেই। যদি কখনও কোন কু-ভাব মনে আসে, তাহলে তো দেখছি আপনি ইন্দ্রিয় বশীভূত মনের দ্বারা চালিত হয়ে সেই কাজই করবেন, ঠিক কি না ?

এমন বেয়াড়া ধরনের প্রশ্ন করায় সাধুবাবার মুখের সহজ ভাবটা কেমন যেন হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে গেল। একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন,

—না বেটা, এমন কোন চিন্তা ভগবান আমার মনে কখনও দেন না যাতে আমার মাধ্যমে অন্যের কোন ক্ষতি হয়।

এতটুকু দেরী না করেই বললাম,

—অন্যের না হোক, নিজের চিন্তায় নিজের দেহমন কিংবা অধ্যাত্মজীবনে উন্নতির পক্ষে ক্ষতিকারক বা প্রতিবন্ধক চিন্তাও তো আপনার ক্ষতি করতে পারে ?

কথাটা শুনে মাথাটা দুলিয়ে সাধুবাবা বললেন,

—হাঁ বেটা, তা হতে পারে। হওয়াটাই স্বাভাবিক। এমন অজস্র চিন্তাভাবনা আছে যা শুধু নিজের দেহমনকে নয়, অন্যেরও ক্ষতি করতে পারে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে কাজ না করলেও। তবে আমার মনে তাও আসে না।

এবার জানতে চাইলাম,

—আপনার কথার পরিপ্রেক্ষিতেই প্রশ্ন করি, স্বয়ং উপস্থিত না হয়েও একজনের চিন্তা অন্যের ক্ষতি করে কেমন করে ?

মুহূর্ত দেরী না করেই সাধুবাবা বললেন,

—বেটা, আত্মীয় বন্ধু থেকে শুরু করে যেকোন মানুষের সঙ্গে পরিচয়, হৃদ্যতা কিংবা শত্রুতার সৃষ্টি হোক না কেন—নিশ্চিত জানবি, পূর্বজন্মের কোন একটা সম্পর্ক ছিলই। ফলে যে যেখানেই থাকুক না কেন, এক মন থেকে আর এক মনের মাঝে অলক্ষ্যে সৃষ্টি হয় এক বন্ধনসূত্র। যারজন্যেই তো একে অপরের দুঃখে দুঃখিত, শোকে অভিভূত, আনন্দে আনন্দিত হয়। এগুলো হয় ওই বন্ধন সূত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ থাকায়। একেবারে বেটা ওয়্যারলেসের মতো। তার দেখা যায় না অথচ কথা চলে যায়। যারজন্যে কারও সম্পর্কে কোন খারাপ বা পাপ চিন্তা যেমন অন্যের মনকে অলক্ষ্যে কলুষিত করে, তেমনই ওই চিন্তার উদয় হওয়ামাত্রই তোর মনও কলুষিত হবে। তাই মনে কখনও পাপ বা কুচিন্তা আনতে নেই। অনেক সময় দেখবি মনটা তোর খুব খারাপ লাগছে। কোন কিছুই ভালো লাগছে না। আবার দেখবি, কোন কারণ নেই অথচ মনটা ভরে আছে এক অদ্ভুত আনন্দে। এমনটা হওয়ার পিছনে জানবি তোর সম্পর্কে কারও না কারও ভালো বা খারাপ চিন্তা কাজ করছে। যারজন্যে মনের ভাবেরও পরিবর্তন হচ্ছে। সুচিন্তায় যেমন

অন্যের তেমনই নিজের মনের আনন্দ হয়, আত্মার কল্যাণও হয়। পৃথিবীতে সবচেয়ে অতি তীব্র গতিসম্পন্ন হলো একমাত্র মন। পরিচিতজনের কারও সম্পর্কে ক্রমাগত তীব্র কুচিন্তা তাকে যেমন চরমভাবে বিপদগ্রস্ত, এমনকি মৃত্যুমুখে ফেলতে পারে তেমনই শুভচিন্তা পারে নতুনভাবে প্রেরণা দিতে, পারে আনন্দময় জীবনপথের সন্ধান দিতে। সেইজন্যেই তো বেটা দেশের রাজা অত্যাচারী হলে, কুপথে পরিচালিত হলে যেমন দেশের মানুষের ক্ষোভ ও বিতাড়নের চিন্তা তাকে পদচ্যুত কিংবা তার মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনে, তেমনই সংসারে কারও অনাচার, অত্যাচারেও পতন ঘটে আর সকলের তীব্র বিরুদ্ধচিন্তার ফলে—তার উপরে। তারজন্যেই তো বিশ্বসংসারে অত্যাচারীর অত্যাচার দীর্ঘকাল একভাবে চলতে পারে না। সেইজন্যেই তো বেটা সম্মিলিত প্রার্থনায় মানুষ দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্ত হতে পারে। মৃত্যু পথযাত্রীও ফিরে পায় প্রাণ। মনের যে কি তীব্র শক্তি তা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। সুতরাং সব সময়েই সংচিন্তা করবি। তাতে নিজের যেমন, আর পাঁচজনেরও মঙ্গল হবে। শান্তি পাবি।

তীর্থযাত্রীদের অনেকেই দোকানে জুতো খুলে রাখছে, এক একবার তাকাচ্ছেও আমাদের দিকে। সাধুবাবা এতক্ষণ বসেছিলেন সোজা হয়ে। এবার দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে বসলেন। তাকালেন একবার মুখের দিকে। একবার হাতটা বুলিয়ে নিলেন দাড়িতে। জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, সারাদিন তো আপনার কোন কাজকর্ম নেই। বসে থাকাটাই একমাত্র কাজ। সারাদিন এইভাবে বসে থেকে কি চিন্তা করেন ?

কথাটা শুনে একটু হালকা হাসি ফুটে উঠলো সাধুবাবার মুখে। বললেন,

—বেটা, সারাদিন ধরে শুধু ভগবানের নাম, গুরু যে মন্ত্র আমাকে দিয়েছেন সেই মন্ত্র জপ ছাড়া আর কিছুই করি না আমি। তবে কেউ এসে কথা বললে তার কথা শুনি, বলি। কেউ না এলে বসে থেকে শুধু জপই করি। এছাড়া আর কোন কাজই আমার নেই।

জানতে চাইলাম,

—নিরবচ্ছিন্নভাবে জপ কি সম্ভব ? নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, জপ করতে থাকলে অল্প কিছু জপের পর জপ সরে গিয়ে অন্য চিন্তা মাথার মধ্যে জুড়ে বসে, মন কোথায় চলে যায়।

সাধুবাবা বললেন হাসিমুখে,

—হাঁ বেটা, এটাই নিয়ম। তবে অভ্যাস হয়ে গেলে এটা আর হয় না। কখনও কখনও আমারও বাড়ীর কথা জপের সময় মাথায় ঢোকে। আবার চলে যায়।

সাধুবাবার মুখে 'বাড়ীর চিন্তা' কথাটা শুনে মনে কেমন যেন একটা খট্‌কা লাগলো। বললাম,

—সে কি বাবা, আপনি গৃহত্যাগ করে এসেছেন সাধুজীবনে। এই জীবনে এসেও বাড়ীর চিন্তা, বলেন কি !

গৈরিক বসনে আবৃত দেহের এই সাধুবাবা চমকে দিয়ে বললেন,
—না বেটা, একেবারে গৃহত্যাগ আমার হয়নি। সেইজন্যেই তো মাঝেমধ্যে বাড়ীর জন্যে একটু চিন্তা হয়। তবে তাও খুব সামান্য সময়ের জন্যে।
অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,
—একেবারে গৃহত্যাগ হয়নি মানে ?
হাসিমাখা মুখে সাধুবাবা অকপটে খুলে দিলেন তাঁর নিজ জীবনকথার দরজা। একটু নড়ে-চড়ে বসে বললেন,
—বেটা, আমার বিয়ে হয়েছে বছর পঁচিশ বয়সে। এখন বয়স আমার ৫০/৫২ হবে। বিয়ের বছরখানেক পর থেকে মনটা আমার কেমন যেন হয়ে যায়। বেরিয়ে পড়ি ঘর ছেড়ে। কিছুদিন ধরে নানা তীর্থ ঘুরে আবার ফিরে যাই বাড়ীতে। থাকি মাস ছয়েক। আবার বেরিয়ে পড়ি। বাইরে বাইরে কাটে ছ-মাস, এক বছর কখনও বা দেড় দু'বছর, আবার ফিরে যাই ঘরে। এইভাবেই কাটছে বিয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত।
কথাটা শুনে একেবারে চমকে উঠলাম। বলে কি সাধুবাবা! গেরুয়া বসন, চুল দাড়ি ঝোলাঝুলি থেকে শুরু করে বাহ্যত সাধুদের যা যা থাকা দরকার তা সবই আছে এই সাধুতে। অথচ সাধুবাবা বিয়ের পর থেকে গত ২৫/২৬ বছর ধরে চলেছেন এইভাবে। এটা কেমন জীবন ? এ-কথা শোনার পর কৌতূহল আর হাজার প্রশ্ন এসে গেল মাথার মধ্যে। এবার সাধুবাবার ভিতরে ঢুকতে হবে ধীরে ধীরে। জিজ্ঞাসা করলাম,
—আপনার বাড়ী কোথায় ?
সহাস্যে উত্তর দিলেন,
—কেরল-এ।
—সংসারে কে কে আছেন আপনার ?
—বাবা নেই। ছোটবেলায় মারা গেছেন। বৃদ্ধা মা, স্ত্রী, ভাই-বোন, আর পাঁচটা সংসারের মতো আমার সংসারেও এরা আছে।
জিজ্ঞাসা করলাম,
—আপনার সন্তান কটি ? আপনি তো বাইরে বাইরেই পড়ে থাকেন। সংসার চলে কিভাবে ?
প্রসন্ন মনেই সাধুবাবা বললেন,
—আমার কোন সন্তান নেই। দেশে মুদিখানার দোকান আছে একটা। সেখান থেকে যা আয় হয় তাতেই চলে যায় সংসারটা। বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে। ভাইরা সব টুকটাক্ চাকরী-বাকরী করে। বউটাই আমার দোকানটা দেখাশুনো করে আমি না থাকলে।
সন্তান নেই শুনে মাথার মধ্যে আমার ঢুকলো আর একটা ফ্যাকড়া। সাধুবাবার কি তাহলে শারীরিক কোন ত্রুটি আছে, যার জন্যে সন্তান হয় না বা সেইজন্যেই

স্ত্রীর প্রতি অনীহা? কোন আকর্ষণ নেই। নইলে বিয়ে করে ঘর ছেড়ে বাইরে পড়ে থাকে। আবার ঘরে যাওয়া—এইভাবেই কেটে গেল জীবনের অর্ধেকটা বয়েস। মাথায় যখন প্রশ্ন ঢুকেছে তখন আর ছাড়াছাড়ি নেই। বললাম,

—বাবা, কোন সন্তান নেই বললেন। তাহলে আপনার শারীরিক দিক থেকে কোন অক্ষমতার জন্যেই কি সন্তান হয়নি আর সেইজন্যেই কি ঘর ছেড়েছেন?

কথাটা শুনেই সাধুবাবা খিলখিল করে হেসে উঠলেন। হাসির রেশটা মিলাতে না মিলাতেই বললেন,

—না না বেটা, শরীরে কোন রোগ নেই আমার। স্ত্রীরও না। ভগবানের ইচ্ছাতেই কোন সন্তান হয়নি আমাদের। কোন রোগ নেই দেহে অথচ সন্তান হয় না, এমন অনেকেই তো আছে সংসারে। 'বড়া বড়া' ডাক্তারও এর কোন সদুত্তর দিতে পারে না। অনেক সময় অনেক মানুষ শারীরিক দিক থেকে কষ্ট পায়। ডাক্তারকে বলে। ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। অথচ রোগ আর রোগের কারণ খুঁজে পায় না। অথচ রুগী কষ্ট পায়। এরও কোন উত্তর আধুনিক বিজ্ঞান আর চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী 'আচ্ছা আচ্ছা' ডাক্তারও দিতে পারে না। তাদের জানাও নেই। অনেক সময় যার মারা যাওয়ার কথা সে বেঁচে ওঠে এদের হাতে। আবার যার বেঁচে ওঠার কথা সে মরে যায় অকালে। এমনটা কেন হয়, এরও কোন উত্তরই দিতে পারে না বিজ্ঞানমনস্ক ডাক্তারেরা। এর উত্তর একমাত্র দিতে পারে তিনিই—যিনি এই সংসার রচনা করেছেন।

কি প্রশ্নের উত্তর, কোথায় গিয়ে শেষ করলেন। বললাম,

—সন্তান হয়নি বলে আপনার স্ত্রীর মনে দুঃখ হয় না?

সাধুবাবা হাসি মুখেই বললেন,

—না বেটা, আমার ওসব দুঃখ-টুঃখ হয় না। তবে স্ত্রীর মনে দুঃখ তো একটু আছেই। কারণ ও তো মেয়েমানুষ। কিন্তু ওই বা কি করবে আর আমিই বা কি করবো? তবে এখন আমার স্ত্রীর মনে এ-ব্যাপারে আর কোন দুঃখ নেই বলতে পারিস্। দুঃখ বা যেকোন কষ্ট, সেটা যে ধরনেরই হোক না কেন—দীর্ঘদিন চললে অথবা সে দুঃখ মোচনের সমস্ত রাস্তা বন্ধ থাকলে তা গা সওয়া হয়ে মনের এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করে যখন সেটা আর দুঃখ বলে মনেই হয় না। অভাবে অভাববোধটাও আর থাকে না। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। এখন ওই অবস্থাতেই আছে আমার স্ত্রী।

এবার জিজ্ঞাসা করলাম,

—আপনি তো আপনার স্ত্রীকে বাড়ীতে ফেলে রেখে এসেছেন। এখন তো তাঁর কোন সঙ্গী নেই। মনের কথা, সুখ-দুঃখের কথা বলতে পারে না কাউকে। আপনি কি তার এই মনোব্যথার কথা উপলব্ধি করেন কখনও? আপনার উপরে তাঁর ক্ষোভ বা রাগ হয় না এইভাবে ফেলে বেরিয়ে আসার জন্যে?

কথাটা শুনে সাধুবাবার মুখভাবের কোন পরিবর্তন হলো না। স্বাভাবিকভাবই

বললেন,
—প্রথম প্রথম বেরিয়ে ন-মাস ছ-মাস বা এক বছর পর যখন দেশে ফিরতাম তখন অনেক অনেক অভিযোগ, দুঃখ করতো। আমার উপর তাঁর অভিমানও হতো। তারপর ধীরে ধীরে সেটাও গা সওয়া হয়ে গেছে। এখন আর কিছু মনেই করে না। আর আমি কখনও না বলে বাড়ী থেকে পালিয়ে আসিনা। ঘরে যখন মন টেকে না তখন বাড়ীর সবাইকে বলে বেরিয়ে পড়ি। কবে ফিরবো কিছু বলি না। তবে ফিরবো যে একথা বলেই আসি।
সাধুবাবার অবাক করা কথা শুনে নিজেরই কেমন যেন লাগছে। জীবনে পথচলতি সাধুসঙ্গ কম হলো না। তবে অর্ধেক সংসারে অর্ধেক সাধুজীবনে এমন মানুষ পেলাম এই প্রথম। দুটো আলাদা জীবনের অভিজ্ঞতাই হয়েছে সাধুবাবার। যতটা পারি জেনে নিই। এমন সুযোগ হয়তো আর কখনও পাবো না। এখন সকাল দশটা। সাধুবাবা হয়তো কিছু খাননি। কিছু জলখাবার খাইয়ে কথা বললে সাধুবাবার ওঠার দরকার হবে না। তাই বললাম,
—বাবা, আপনি সকালে কি কিছু খেয়েছেন ?
ঘাড় নেড়ে বললেন, না। আমি বললাম,
—আপনি একটু বসুন, আমি আসছি।
বলেই এক দৌড়ে চলে গেলাম খাবারের দোকানে। কিছু পুরী সব্জি আর মিষ্টি নিয়ে ছুটে এলাম একদৌড়ে। সাধুবাবার হাতে দিয়ে বললাম,
—সামান্য খাবার আছে বাবা, খেয়ে নিন।
কোন সঙ্কোচ না করেই সাধুবাবা নিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন,
—বেটা, তুই খাবি না ?
আমি হেসেই বললাম,
—না বাবা, আমি খাবো না। সকালে খেয়েই বেরিয়েছি।
কথাটা শুনে সাধুবাবা খাওয়া শুরু করলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হলো খাওয়া। সামান্য একটু বিশ্রামের পর আবার শুরু করলাম,
—বাবা, একটু আগেই বললেন ঘরে যখন মন টেকে না তখনই বেরিয়ে পড়েন। কি মনে হয় তখন ?
সাধুবাবা দাড়িতে দুবার উপর থেকে নীচ পর্যন্ত হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন,
—আমার মনের মধ্যেই কেমন যেন একটা অস্থির অস্থির ভাব হয়। কিছুই ভালো লাগে না। নেশাড়ীর নেশা দ্রব্যের অভাব হলে সে যেমন অস্থির হয়ে ওঠে তেমন হয় আমারও। কে যেন আমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় ঘর থেকে। বেরিয়ে পড়লেই মনটা তখন শান্ত হয়। আনন্দে ভরে ওঠে। আবার ধর, এই যে পথে বেরিয়েছি এখন বাড়ীর উপর কোন টান বা আকর্ষণই নেই। যখন তখন মনেও পড়ে না। ন-মাস ছ-মাস এক বা দেড় বছর পর হঠাৎ করে শুরু হয়ে যায় মনের অস্থিরতা। তখন আবার ঘরে ফিরতে না পারলে মনের শান্তিটাই নষ্ট হয়ে যায়।

তাই ফিরে যাই ঘরে। শান্ত হয় মনটা।
জানতে চাইলাম,
—ঘরে ফেরার পর কি করে কাটে আপনার দিনগুলো? তখন কি এই গেরুয়া বসন পরেই থাকেন, না পরিবর্তন করে অন্য পোশাক পরেন?
উত্তরে প্রসন্ন মনেই জানালেন সাধুবাবা,
—বেটা, যখন ঘরে ফিরে যাই তখন সংসারের নিয়মেই চলি। গেরুয়া ধারণ করিনা। ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন না করে এই বস্ত্র পরিধান করাটা অপরাধ। এমন মাহাত্ম্যপূর্ণ এই বস্ত্রকে অপমান করা হয়। বাইরে থাকলে ব্রহ্মচর্যটা বজায় থাকে, গেরুয়া বস্ত্রের সম্মানও ক্ষুন্ন হয় না। তাই বাড়ীতে এই পোশাক পরিনা। বাড়ীতে থাকলে সংসারের কাজকর্ম করি। দোকানটায় গিয়ে বসি। বেচাকেনা করি। তবে মনে মনে গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রের জপটা করি। গুরুজীর কৃপায় ওটাতে আমার ভুল হয় না।
কথায় এবার একটা ধাপ এগিয়ে গেলাম। কৌতূহলের সীমা ছাড়িয়ে গেল। আমার জিজ্ঞাসার উত্তর বলেই দিয়েছেন। তবুও সরাসরি মুখ থেকে শোনার জন্যেই বললাম,
—বাবা, বাড়ীতে ফেরার পর আর পাঁচটা কাজের মধ্যে তো স্ত্রীর দেহ মনোরঞ্জনের কাজও তো একটা আছে। আমি জানতে চাইছি স্বামী-স্ত্রীর মিলনের ব্যাপারটা, সেটাতে কি রত হন?
কথাটা শুনে সাধুবাবার মনে কোন প্রতিক্রিয়া হলো বলে মনেই হলো না। একেবারে নির্বিকারভাবেই বললেন,
—হাঁ বেটা, সংসারে ফিরলে তখন আর ব্রহ্মচর্য রক্ষা করতে পারিনা। স্বামী-স্ত্রীর মিলনটা আমাদের হয়ই। যদি বলি হয় না, তাহলে এই গেরুয়া বসন আর কৃষ্ণের কোলে বসে তাঁর খেয়ে তাঁকেই অস্বীকার করা হয়। অত বড় মিথ্যে কথাটা আমি বলতে পারবো না।
এবার মাথার মধ্যে একটা কুটিল প্রশ্ন ঢুকলো। করেই ফেললাম,
—বাবা, এ-পথে যখন আছেন তখন শাস্ত্রের কথা, শাস্ত্রকারের কথায় নিশ্চয়ই আপনার বিশ্বাস আছে?
মুখোমুখি বসে কথা হচ্ছে আমাদের। এবার মাথাটা নেড়েও সাধুবাবা মুখে বললেন,
—হাঁ বেটা, শাস্ত্রে আমার বিশ্বাস আছে। শাস্ত্রে অবিশ্বাস করলে ভগবানের মাহাত্ম্যকথা, এমনকি ভগবানকেও তাহলে অবিশ্বাস করতে হয়।
কথাটা শুনে বললাম,
—এতটাই যখন বিশ্বাস আপনার, তাহলে একটা কথা জানতে চাই আপনার কাছে। শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, কোন পুরুষ স্ত্রীকে ঘরে ফেলে দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকলে সেই স্ত্রীর চরিত্র নষ্ট এবং ব্যভিচার দোষে দুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এইভাবে মাসের

পর মাস আপনার বাইরে থাকার কারণে শাস্ত্রকারের কথা আপনার স্ত্রীর উপরেও তো বর্তাতে পারে ?
সাধুবাবা কথাটা শুনে একটু হাসলেন। সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিলেন না। তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। কেটে গেল মিনিটখানেক। তারপর স্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠেই বললেন,
—হাঁ বেটা, সংসারে সব নারীপুরুষেরই দেহমনের চাহিদা একটা আছেই। কারও কম কারও বেশী। শাস্ত্রকারের কথাটা অস্বীকার না করেই বলি, সংসারে সব নারীপুরুষই কি সমান ? তা তো নয়। স্ত্রীকে ছেড়ে পুরুষ দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকলে স্ত্রীর চরিত্র নষ্ট বা পরপুরুষে আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা যে একটা থেকেই যায় এর মধ্যে কোন ভুল নেই। বিপরীতভাবে এমনটা তো পুরুষেরও হতে পারে। তবে বেটা ঘরেই বল আর বাইরেই বল, বিশ্বাসটাই বড় কথা। আর বিশ্বাসটা আছে বলেই তো সংসারটা টিকে আছে। প্রবাসে না থেকেও তো অনেক পুরুষ চরিত্রহীন, অন্য নারীতে আসক্ত হয়ে রয়েছে। বিপরীতভাবে অনেক নারীর সদাশিবের মতো স্বামী থাকা সত্ত্বেও তো অন্য পুরুষের সঙ্গে সহবাস করছে। বিশ্বাসের বশে থাকলে শান্তিটা থাকে। তবে কেউ যদি মনে করে সত্যিই খারাপ হবে সে নারী বা পুরুষ যেই হোক না কেন, তাকে চোখে চোখে রাখলেও ঠেকানো যায় না।
এবার সোজাসুজি উদাহরণ দিয়ে আমাকে বললেন,
—যেমন ধর্ তোর বাবার কথা। মনে কর্ প্রবাসে আছে। তুই তোর মাকে নিয়ে আছিস দেশে। তোর মা অন্য কোন পুরুষে মিলিত হলো গোপনে। তুই কিন্তু তা একবারও ভাববি না। মিলিত না হলেও ভাববি না। তোর বিশ্বাস, তোর মা সুন্দর নিষ্পাপ। এমন বিশ্বাস সব সন্তানই তার মাকে করে, স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে। যারজন্যেই তো সংসারের গতিরুদ্ধ না হয়েবয়ে চলেছে অবিচল গতিতে। এ-ধারা কখনও রুদ্ধ হবে না বেটা। যেখানে বিশ্বাসের অভাব হয়েছে সেখানেই অবাধগতির সংসার রুদ্ধ হয়েছে। ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। স্রোতবতী নদী বাধা পেলে যেমন তার গতি ভিন্নমুখী হয়, তেমনই অবাধ বিশ্বাসের ধারা বাধা পেলে সংসারস্রোতও নারীপুরুষকে করে তোলে অন্যমুখী। বুঝলি বেটা!
এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা একটু থামলেন। জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা, এইভাবে দু-নৌকায় পা দিয়ে চলে কি লাভ ? সংসার করলে সংসারই করুন, নইলে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে একেবারে বেরিয়ে পড়ুন চিরদিনের মতো।
বিরক্ত না হয়ে উত্তরে সাধুবাবা বললেন,
—বেটা, তোর অনেক আগেই এটা আমি ভেবেছি। মাঝেমাঝে ভাবি, বেরিয়ে পড়েছি যখন আর ফিরে যাবো না। কি হবে সংসার দিয়ে! কিন্তু বেরিয়ে আসার পর আবার কে যেন ঘাড় ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যায় সংসারে। আবার ঘরে যখন থাকি তখন মনে হয় আর বেরোবো না। কিন্তু কিছুদিন যাবার পরই মন আমার হাঁপিয়ে ওঠে।

তখনও মনে হয় কে যেন আমাকে খোঁচাচ্ছে বেরিয়ে পড়ার জন্যে। না বেরোনো পর্যন্ত শান্তি হয় না মনের। তাই এখন ভেবেছি ভগবানের যা ইচ্ছা তাই করুক। মনের যদি কখনও কোন পরিবর্তন আনে তবে হবে। না আনলে হবে না। আমাকে নিয়ে তাঁর যা ইচ্ছা হয় করুক। কি আর কতটুকুই বা ক্ষমতা আছে আমাদের।
তীর্থযাত্রীরা মন্দিরে যাচ্ছে। অনেকেই দেখছে আমাদের। আমরা চালিয়ে যাচ্ছি আমাদের কথা। সাধুবাবা প্রতিটি কথার উত্তর দিচ্ছেন নির্বিকারভাবে। জিজ্ঞাসা করলাম,
—পথের খরচা আর আহার সংগ্রহ করেন কি উপায়ে?
নির্লিপ্তভাবে বললেন,
—বেটা, বিনামূল্যে সাধুভোজনের ব্যবস্থা আছে এখানে। এমন ব্যবস্থা আছে প্রায় সব তীর্থেই। তাই আহার জুটে যায়। তারপর এমনভাবেই বসে থাকি পথের ধারে। কেউ কিছু দিলে নিয়েনি। না দিলে চাই না কারও কাছে। আর যদি কখনও দূরের কোন তীর্থে যাওয়ার মন হয় তখন হাতে পয়সা থাকলে তাই খরচ করি। না থাকলে দেশে চিঠি লিখি। আমার বউ টাকা পাঠিয়ে দেয়। এই তো গত বছরের কথা। গেছিলাম কেদারবদরী—চারধাম দর্শন করতে। হাতে একটা পয়সাও ছিল না। বাড়ীতে চিঠি লিখলাম। টাকা পাঠিয়ে দিল। চলে গেলাম। এইভাবেই আমি পথ চলি।
অদ্ভুত চরিত্রের সাধু। অবাক করা কথা। সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর দিচ্ছেন অকপটে। এতে আনন্দ আর প্রশ্ন করার উৎসাহও বেড়ে যাচ্ছে আমার। ভাবছি, কি অদ্ভুত জীবনযাপন করছেন এই সাধুবাবা। এমনটাও যে হয় ভাবিনি কখনও। জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা, ঘরে আর বাইরে—এই দু-জীবনের মধ্যে তফাৎ কি কিছু বুঝলেন? একটা বাইরে থাকার মন আর একটা বন্ধজীবনে নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে থাকার যে মন, এই দুই মনের গতি চিন্তাভাবনা এবং বিকার—এর কতটা পরিবর্তন, কি রকম পরিবর্তন হয়, আপনি কি এসব ভেবে কখনও দেখেছেন?
কথাটা শুনে চুপ করে রইলেন সাধুবাবা। চোখ মুখের ভাবটা দেখে মনে হলো বেশ গভীরভাবেই ভাবছেন কথাটা। উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম। কেটে গেল প্রায় মিনিট সাত আট। এবার বললেন,
—বেটা, সে রকমভাবে কোনদিন কিছু ভাবিনি আমি। ঘরে থাকলে অনেক সময়ই ভেবেছি, কবে একটু দ্বারকায় যাবো, কবে যাবো মথুরা বৃন্দাবনে। মন আমার অস্থির হয়ে উঠেছে বেরিয়ে আসার জন্যে। আবার বেরিয়ে এসে বিভিন্ন তীর্থভ্রমণের সময় মাঝেমাঝেই মনে হয়েছে কবে বাড়ী ফিরবো, ওরা সকলে কেমন আছে? মন আমার উতলা হয়েছে। ফিরে গেছি বাড়ীতে। মন আমার শান্ত হয়েছে সকলকে দেখে। মনের যে কি ভাবগতি তা আমার মনই এখনও জানতে পারেনি। তবে পার্থক্য একটা বুঝেছি এই দুই জীবনের মধ্যে। সংসারে খাওয়া পরাটা বাদ দিলে

বাদ বাকিটা একেবারে অনিশ্চিত ভয়ের জীবন। সংসারে আর পাঁচজনের চিন্তাই মনকে চিন্তিত, ভীত করে রাখে। যেটা সংসার গণ্ডীর বাইরে নেই। 'যা হয় হবে' এমন একটা জীবনই এই সাধুজীবন। কালকের কথা কালকে ভাববার জীবনই সাধুজীবন। কিন্তু সংসারে তা হওয়ার উপায় নেই। কাল পরশুর ভাবনাটা আজকেই পেয়ে বসে। নষ্ট করে মনের আনন্দ। এটা আমি বেশ ভালোই বুঝেছি। অনাগত ভবিষ্যৎ চিন্তাই সংসার শান্তির অন্তরায়। এ-জীবনে না আছে অতীত না আছে ভবিষ্যৎ। তাই আনন্দ একটা মনে থাকেই। তবে জপ তপটা বাইরেই ভালো হয় সংসার জীবনের তুলনায়। সংসারে কালকের চিন্তাতেই কেটে যায় আজকের দিনটা। বাইরে কালকের চিন্তা আজকে থাকে না বলেই মনটা জপে বসে বেশী। এটা বললাম আমার কথা। এ-টুকুই আমার উপলব্ধি হয়েছে। এ-ব্যাপারে আর কিছু বলতে পারবো না আমি।

জিজ্ঞাসা করলাম,

—সংসার থেকে বেরিয়ে আসার পর ফেলে আসা দিনগুলোর কথা, স্ত্রীর কথা কি মনে পড়ে? বিব্রত করে কি এই নিঃসঙ্গ জীবনে?

হাসতে হাসতে বললেন সাধুবাবা,

—বেটা, কোন দিনটাই মানুষ কোনদিনই ফেলে আসে না অতীতে। সারাটা জীবনই বয়ে নিয়ে বেড়ায় সঙ্গে করে। কেমন করে বলতে পারিস? অতীতের দিনগুলো আর স্মৃতিই তো বয়ে নিয়ে বেড়ায় মন। দেহ কি অতীত নিয়ে চলে? নারীপুরুষের মিলনের যে তৃপ্তি, আনন্দ—তা কি দেহের? ও তো মনের। কোন সুখ বা দুঃখ—তা কি দেহ ভোগ করে? ভোগ করে তো মন। সুতরাং অতীত তো চলে মনের সঙ্গেই, যেখানেই তুই যাস্ না কেন? এটা বললাম বেটা সাধারণ নিয়মের কথা। এগুলো মন থেকে একেবারে মুছে ফেলার জন্যে যে জীবন, সেটাই তো আসল জীবন, সাধুজীবন। সাধনার জীবন। সেটা ঘরে থেকেই করিস্ আর বাইরে থেকেই করিস্। করতে হবে। তবে এ-জীবনে এসেই বা তা কটা সাধু পারছে? যারা পারছে তারা ভগবানের সান্নিধ্য পাচ্ছে। যারা আজ পারছে না তারা একদিন না একদিন পারবেই, এ-বিশ্বাস আমার আছে। কারণ তাকে তো তিনি টেনে এনেছেন এ-পথে তাঁর কাছে টেনে নেয়ার জন্যেই। সেটা আজ না হলে দুদিন পরে হবে। 'লেকিন' হবেই।

একটু থামলেন। কি যেন একটা ভাবলেন। এবার হাসতে হাসতেই বললেন,

—বেটা, তুই ফেলে আসা দিনগুলোর কথা বলছিস্, শোন তাহলে। একবার শীতকালে গেছিলাম হরিদ্বারে। ভোরবেলাতেই আমার স্নান করা অভ্যাস। তাই ঘাটে আমার ঝুলি কাপড় আর কম্বল রেখে নেমেছি গঙ্গাস্নানে। তারপর স্নান সেরে উঠে দেখি কে আমার কম্বলটা চুরি করে নিয়ে গেছে। ঘটনাটা ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় বছর কুড়ি আগে। কিন্তু সে কথা যখন আজও ভুলিনি তখন বাড়ীর সকলের কথা ভুলবো কেমন করে! ও কথা কি ভোলা যায়? তবে সবসময় কি আর মনে

পড়ে ? কখনও সখনও মনে পড়ে বৈ-কি !
এবার একেবারে লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা, বাড়ীতে গেলে স্ত্রী তো কাছে থাকে। মনে কাম ভাব জাগরিত হলে তখন না হয় স্ত্রীকে দিয়ে দেহমনের কামপিপাসা নিবৃত্ত করেন। কিন্তু যখন পথে থাকেন তখন তো কাম রিপু নিশ্চয়ই মাঝেমধ্যে দেহমনের উপর ক্রিয়া করে। সেই সময় আপনি কি করেন ?
কোন রকম ভনিতা বা সংকোচ না করেই উত্তর দিলেন সাধুবাবা,
—হাঁ বেটা, দেহমনে মাঝেমধ্যে তো কাম রিপুর প্রভাব অনুভব করিই এই পথ চলতি জীবনে। তবে বাড়ীতে স্ত্রী কাছে থাকলে যতটা হয় তার সিকি ভাগও হয় না যখন পথে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু হয়। তবে সেটা নিয়ে গভীরভাবে কিছুই ভাবি না। জপটা করতে থাকি। দেহমনে ক্ষণিকের জন্যে উত্তেজনা এসে আবার তা দেহমনেই মিলিয়ে যায়।
সঙ্গে সঙ্গেই বললাম,
—পথে চলার সময় যেসব মেয়েদের দেখেন, তাদের দেখে কখনও মনে ভোগের বাসনা জাগে না ?
কথাটা শুনে সাধুবাবা হাসিমাখা মুখেই বললেন,
—না বেটা, আমার ওসব মনেই হয় না। কেন হবে বলতো ? দোকানে সাজানো মিষ্টি আছে। ও মিষ্টিটা তোর খাওয়া আছে আগেই। তারপর চলার পথেই দেখলি তোর আগে খাওয়া মিষ্টিগুলোই দোকানে সাজানো আছে থরে থরে। তোর কি তখন লোভ হবে, আবার খাই ? তা হবে না। কারণ তোর আগেই জানা আছে তুই খেয়েছিস্—স্বাদটা কেমন ?
এবার আমিও হাসতে হাসতে বললাম,
—আপনার কথা মেনে নিয়েও বলি, তাহলে তো মানুষ শুধু রসগোল্লাতেই তৃপ্ত থাকতে পারতো। তা তো পারে না। বিভিন্ন স্বাদের মিষ্টিতে মানুষের মন আকৃষ্ট হয় কেন ?
সাধুবাবা এতক্ষণ বসেছিলেন একভাবে। এবার একটু নড়ে বসে বললেন,
—বেটা, মন বলেই তো মনের এই আসক্তি। এটাই তো মনের ধর্ম। নইলে মন বলে কথাটাই থাকতো না। একই মিষ্টি, কারিগর তৈরী করে বিভিন্ন রূপ আর স্বাদের। সেইরকম নারী সহবাসের স্বাদ একই। সুন্দরী বা কুৎসিত—রূপ যাই হোক না কেন। দেহমনের অস্বস্তি মিটলেই শেষ। আর রূপের জন্যে মনের আলাদা তৃপ্তি যেটা, সেটা একান্তই মনের ধর্ম। তবে বেটা তুই বিশ্বাস করবি কিনা জানি না, আমার অন্য মেয়েমানুষের উপর কোন লোভ বা ভোগ করার ইচ্ছা জাগেনি কখনও। গুরুজীর কাছে প্রার্থনা করি ওসব যেন কখনও না জাগে।
কথাটা বলে কপালে হাতজোড় করে নমস্কার করলেন গুরুজীর উদ্দেশ্যে। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বললেন,

—বেটা, যার রূপ আছে সে নারী বা পুরুষ যাইহোক না কেন, একেবারে সত্য জানবি, ওটাই তার নিজের এবং অন্যের দেহমনের প্রথম ব্যভিচারের অস্ত্র। আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায়। সুতরাং বেটা, কখনও রূপের আকর্ষণে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবি না, তাহলে আর সাধনপথে এগোতে পারবি না। ভগবান মানুষের রূপ দিয়েছেন মানুষকে ভুলিয়ে রাখার জন্যে। এটা তাঁর সৃষ্টির একটা বড় কৌশল।

অনেকক্ষণ কথা হলো। আরও অনেক কথা হলো। এবার উঠতে হবে আমাকে। তাই জানতে চাইলাম,

—বাবা, আপনার সঙ্গে কথা না বললে বা আপনি নিজের থেকে অকপটে কিছু না বললে তো এমন এক অদ্ভুত জীবনযাপনের কথা কিছুই জানতে পারতাম না। তবুও একটা কৌতূহল আমার রয়েই গেল যেটা আপনার ব্যক্তিগত ঈশ্বরভাবনা সম্পর্কে। আপনি কি দয়া করে বলবেন, তাঁর সম্পর্কে আপনার উপলব্ধি কি হলো ?

শেষ কথাটাও সাধুবাবা বললেন অকপটে,

—বেটা, সংসার বিষয়ে মমতা ত্যাগ না হলে ঈশ্বরে মমতা আসে না। আমার তো তা হয়নি এখনও। তাই আজও তাঁর দর্শন লাভ ঘটেনি আমার ভাগ্যে। তবে ঘরে যখন থাকি তখন যেমন, বাইরে থাকি যখন, তখনও তিনি এমন এক আনন্দময় অবস্থায় রেখেছেন যে সদা অন্তরে অনুভব করি আছেন, আমার সঙ্গেই আছেন নইলে এমন আনন্দে আছি কেমন করে ?

এই পর্যন্ত কথা হলো সাধুবাবার সঙ্গে। প্রণাম করলাম। সাধুবাবা হাতদুটো স্পর্শ করলেন আমার মাথায়। উঠে দাঁড়ালাম। বললাম,

—চলি বাবা।

হাসিমুখে হাতজোড় করে নমস্কারের ভঙ্গীতে বললেন,

—ঠিক হ্যায় বেটা, সদা খুশ্ রহো।

ধীর পায়ে এগিয়ে চললাম মন্দিরের দিকে। ভাবতে লাগলাম সাধুবাবার সংসার আর পথচলতি, এই দুই জীবনের কথা।

দ্বারকানাথ মন্দিরে ঢুকতেই বাঁদিকে প্রথমে পড়লো প্রদ্যুম্ন মন্দির। প্রদ্যুম্নের কালো পাথরের মূর্তি রয়েছে মন্দিরমধ্যে। পাশের মন্দিরটি সত্যনারায়ণের। এর ডানদিকের মন্দিরটি মাঝারী আকারের, মধ্যে প্রতিষ্ঠিতা আছেন দেবী অম্বিকা। দেবী মূর্তিটি শ্বেতপাথরের।

এই মন্দিরের একটু আগেই ঢুকে ডানদিকে গর্ভমন্দিরে রয়েছে কুশেশ্বর মহাদেব। বেশ কিছু সিঁড়ির নীচে তবে নামতে দেয়া হয় না ভিতরে। বাইরে দাঁড়িয়ে দর্শন করি, দর্শন করতে হয় আর সব তীর্থযাত্রীদের যারা আসেন এখানে।

এই কুশেশ্বর মহাদেব প্রসঙ্গে প্রবাদ আছে, একদা দুর্বাসা মুনি স্নান করছিলেন গোমতীতে। স্নানের সময় কুশ নামে এক দৈত্য বারংবার বাধা দিচ্ছিলেন মুনিবরকে।

তীর্থগুরুর প্রতি এই আচরণে ক্রুদ্ধ হলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। লিপ্ত হলেন যুদ্ধে। শ্রীকৃষ্ণ চক্রাঘাতে যতবার কুশের হাত কেটে দেন ততবারই নতুন হাত গজিয়ে ওঠে মহাদেবের বরে। তখন উপায়হীন হয়ে শ্রীকৃষ্ণ মাটিতে পুঁতে ফেললেন কুশকে। তার উপরে প্রতিষ্ঠা করলেন শিবলিঙ্গ। এরপর আর মাথা তোলেনি কুশ। তাই এই শিবের নাম হয়েছে কুশেশ্বর মহাদেব।

এই ছোট্ট মন্দির থেকে এবার এসে দাঁড়ালাম একেবারে দ্বারকারাজ শ্রীকৃষ্ণের মূল মন্দিরের সামনে। মন্দিরকে প্রদক্ষিণ করার জন্যে প্রশস্ত রাস্তা আছে একটি যেমন থাকে অধিকাংশ দেবদেবীর মন্দিরে। রূপায় বাঁধানো আসনে শ্রীকৃষ্ণ রয়েছেন দাঁড়িয়ে। কালো কোষ্ঠি পাথরের এই বিগ্রহের উচ্চতা এক মিটার। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ প্রজাপালক রাজা তাই এখানকার বেশটাই রাজার। বৃন্দাবনেও শ্রীকৃষ্ণ রাজা, বেশটা সেখানেও রাজার—রাখাল রাজা। নাথদোয়ারা আর জয়পুরের গোবিন্দ মন্দিরে কৃষ্ণ বিগ্রহ যেমন ঠিক তেমনই এই দ্বারকাধামে। মনে হয় যেন একই ছাঁচে গড়া। অপূর্ব কারুকার্যখচিত শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম রয়েছে হাতে। ভক্তপ্রাণ তীর্থযাত্রীর প্রাণ আকুল করে দেয়ার মতো বিগ্রহ এই দ্বারকায়, দ্বারকাধীশের মন্দিরে।

স্কন্দ পুরাণের মতে, দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণের ষোলটি রূপ সম্বলিত মূর্তি দর্শন করলে পার্থিব সমস্ত সুখভোগের মধ্যে থেকেও মানুষ মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। একমাত্র দ্বারকা ছাড়া ষোড়শরূপের শ্রীকৃষ্ণ আর কোথাও নেই।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কীর্তিময় জীবনের বহু কীর্তি দিয়ে সমৃদ্ধ করেছিলেন এই দ্বারকাকে। দ্বারকাধীশ শুধু ভগবানই ছিলেন না, তিনি ছিলেন রাজা। সাধারণ মানুষ এসে জানাতো সুখ দুঃখ আর অসুবিধার কথা, এটি তাঁর রাজ দরবার। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ রাজা, বিচারপতিও বটে। তাই এই রাজমন্দিরে প্রবেশের জন্যে নির্দিষ্ট কিছু সময়ও আছে, যখন তীর্থযাত্রী বা দর্শনার্থীরা এলে রাজা কৃষ্ণের দর্শন পেয়ে থাকেন।

এই মন্দির প্রতিষ্ঠার পর মন্দিরে প্রথম প্রতিষ্ঠিত মূর্তিটির নাম হয় 'রণছোড়জী'। মথুরা থেকে বলরামকে নিয়ে 'রণ' ছেড়ে দ্বারকায় এসেছিলেন বলে দ্বারকাধীশ কৃষ্ণের ওই নাম হয়েছে দ্বারকায়। ১২৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মূল বিগ্রহটি গোপনে নিয়ে গেলেন কিছু পাণ্ডা। প্রতিষ্ঠা করলেন আমেদাবাদের 'ডাকোর'-এর একটি মন্দিরে।

মন্দির শূন্য হলো। দ্বারকার মন্দির ছেড়ে রণছোড়জী চলে গেলেন ডাকোরে। এরপর শূন্য সিংহাসনে আবার প্রতিষ্ঠা করা হলো শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ। সেটিও চুরি হলো। বটদ্বীপের খাড়ীর অপর পাড়ে প্রতিষ্ঠা করলেন এক ভক্ত। এই দ্বীপের আর এক নাম শঙ্খের দ্বীপ। সেখানে দ্বারকাপতির নাম হলো শঙ্খেশ্বর স্বামী।

দ্বিতীয়বার বিগ্রহ চুরির পিছনে রয়েছে একটি জনশ্রুতি। রামদাস বৈরাগী নামে এক কৃষ্ণপ্রেমিক ছিলেন দ্বারকায়। ( মতান্তরে বোধানো নামে এক ভক্ত ) সারাদিন

ধরে কৃষ্ণের নামগান করেই কাটাতেন দ্বারকাধীশ মন্দিরে। এইভাবেই কাটতে লাগলো তাঁর দিনের পর দিন, বছরের পর বছর।

ধীরে ধীরে বয়েস বাড়লো। বৃদ্ধ হলেন রামদাস। প্রায় আশিতে পা দিলেন তিনি। চলাফেরার ক্ষমতা হারালেন। এক সময় অসুস্থ হয়ে পড়লেন বৈরাগী। মন্দিরে গিয়ে নামগান করা আর হয়ে উঠলো না। রণছোড়জীর বিগ্রহ অদর্শনে আকুল হয়ে উঠলেন রামদাস।

একদিন রাতে রণছোড়জীর আদেশ পেলেন দ্বারকামন্দির থেকে বিগ্রহ এনে যেন বাড়ীতে প্রতিষ্ঠা করেন। আদেশ পেয়ে দেরী করলেন না কৃষ্ণপ্রেমিক রামদাস। একদিন তিনি বিগ্রহ চুরি করে আনলেন বাড়ীতে। ধরাও পড়লেন। তখন ঝামেলার ভয়ে সকলের অলক্ষ্যেই কৃষ্ণেরই আদেশে রামদাস বিগ্রহটি ফেলে দিলেন একটি পুকুরে।

স্থানীয় পাণ্ডারা এই ঘটনায় এমন মারলেন রামদাসকে যে সারাদেহ তাঁর রক্তাক্ত হয়ে গেল। তারপর বিগ্রহ পুকুর থেকে তুলেই পাণ্ডারা হতবাক। দেখলেন রণছোড়জীর পাথরের বিগ্রহ থেকে রক্ত ঝরছে। ভীত হয়ে পাণ্ডারা ক্ষমা চাইলেন রামদাসের কাছে। এরপর কৃষ্ণেরই আদেশে অর্থসংগ্রহ করলেন সকলে। নির্মিত হলো রামদাসের বাড়ীতে একটি মন্দির। স্থাপিত হলো দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণ রামদাসের মন্দিরে শঙ্খেশ্বর স্বামী নামে।

এরপর দ্বারকার শূন্য মন্দিরে আবার প্রতিষ্ঠিত হলো বিগ্রহ। আজকের এ-বিগ্রহ 'বিজয় মূর্তি' নামেই দ্বারকায় প্রসিদ্ধ। বিগত প্রায় দু-শো বছরের মধ্যে এত কাণ্ড ঘটলো দ্বারকা মন্দিরের বিগ্রহ নিয়ে। তবুও তিনি আছেন, থাকবেনও। এটাই বড় আনন্দের।

দ্বারকাধীশের দর্শন করে ঘুরতেই দেখি কৃষ্ণের দিকে সোজাসুজি মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের সহযাত্রিনী সদাশিবের হাজার টাকার ওষুধ খেকো স্ত্রী। হাসতে হাসতেই জানতে চাইলাম,

—মাসিমা, সারাটা পথই তো 'দ্বারকায় কৃষ্ণের দর্শন কবে হবে' বলতে বলতে এলেন। এবার দর্শন তো হলো। পুজো দিয়েছেন?

এ-কথায় উত্তরে মুখ সিট্‌কে বিরক্তির সুরে বললেন,

—জানেন, হোটেলের বাথরুমটা কি নোংরা। আজ সকালে কি বিচ্ছিরি পায়খানা হয়েছে আমার।

কি কথায় কি উত্তর। আমি আর কোন কথা না বলে এগিয়ে গেলাম। শ্রীকৃষ্ণের এই মন্দির অঙ্গনেই 'নাগ অবতার বলদেবজী মন্দির'। একেবারেই ছোট্ট মন্দির, চূড়া আছে। মন্দিরের ভিতরে চেপ্টা পাতানো শিবলিঙ্গের মতো। তাতে ছোট ছোট গর্ত রয়েছে কয়েকটা। দ্বারকা মন্দিরের নিয়মানুসারে আগে বলদেবজীর ভোগ আরতি না হওয়া পর্যন্ত পুজো হবে না দ্বারকাধীশের।

দ্বারকা মন্দিরে দাঁড়িয়ে মনে পড়ে যায় কৃষ্ণগতপ্রাণ মীরার কথা। বৃন্দাবনে কিছুকাল

বাস করার পর তিনি এলেন দ্বারকায়। এখানে জীবনের শেষ কটি বছর কাটাবেন এই তাঁর সংকল্প। সাধুসেবা আর রণছোড়জীর চরণ দর্শন করেই কাটতে লাগলো তাঁর দিনগুলো।

এদিকে মেবারের সিংহাসনে তখন উদয়সিং। মীরার চিতোর ত্যাগের পর থেকেই একের পর এক রাজনৈতিক ঝড় বইতে থাকে রাজ্যের উপর দিয়ে। এতে বড় ভীত হলেন উদয়সিং। ভাবলেন, তপস্বিনী মীরার উপর ভূতপূর্ব রাণা বিক্রমজিতের অত্যাচার ও অবিচারেই মীরা হয়েছেন গৃহত্যাগী। যারজন্যেই মেবারের ভাগ্যে নেমে এসেছে এত দুর্দশা।

রাণা উদয়সিং তখন কয়েকজন ব্রাহ্মণকে দ্বারকায় পাঠালেন মীরাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে। তাঁরা এলেন। মীরার দেখাও পেলেন কৃষ্ণমন্দিরে। জানালেন তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা। আরও জানালেন, ফিরে না গেলে আমরণ অনশন করবেন তাঁরা কৃষ্ণমন্দির প্রাঙ্গণে।

এক জটিল সমস্যায় পড়লেন কৃষ্ণপ্রিয়া মীরা। চিরতরে সংসার ছেড়ে এসেছেন। এখন কিভাবে ফিরে যাবেন তিনি। এদিকে ব্রাহ্মণেরা যদি অনশনে দেহত্যাগ করেন তা হবে এক মহাপাপ আর পরিতাপের বিষয়।

পরিশেষে স্থির সংকল্প করলেন মীরা। এ-দেহ তিনি বিসর্জন দেবেন তাঁর প্রাণ প্রিয়তম রণছোড়জীর চরণতলে। একদিন মীরা গেলেন মন্দিরমধ্যে। বিগ্রহের সামনে বসলেন এমন এক গভীর ধ্যানে, যে ধ্যান ভাঙেনি কখনও। তাঁর মরদেহও আর পাওয়া যায়নি।

উত্তরভারতের অগণিত ভক্ত নারীপুরুষ আজও গভীরভাবে বিশ্বাস করে, কোন এক অলৌকিক শক্তিবলে তাপসী মীরার দেহ লীন হয়ে গেছে রণছোড়জীর শ্রীবিগ্রহে, একদা যেমন হয়েছিল জগন্নাথ বিগ্রহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেহ। মীরার এ-ঘটনার সময়কাল আজ থেকে ৩৪৬ বছর আগে ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে।

মীরার কথা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে গেলাম কৃষ্ণমন্দিরের ডানপাশে বলরাম মন্দিরে। বেশ বড় মন্দির। বলরামের মূর্তিটিও বেশ বড়। কৃষ্ণের মতোই কালো পাথরের। অপূর্ব সুন্দর সাজে সাজানো বিগ্রহ। সারাদেহে রুপোর কাজের ছড়াছড়ি।

এই মন্দিরের ঠিক বিপরীত দিকে এলাম এলাহাবাদের প্রয়াগরাজ বেণীমাধবের মন্দিরে। কালো পাথরের সুদর্শন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে ভিতরে।

এবার পায়ে পায়ে এলাম কৃষ্ণ মন্দিরের ঠিক পিছনে দুর্বাসা মন্দিরে। এই মন্দিরে স্থাপিত মূর্তিটি দুর্বাসার। গালে রয়েছে দাড়ি। বাঁহাতে কমণ্ডলু। শ্বেত পাথরের এই মূর্তির ডানহাতটি অভয়মুদ্রাযুক্ত।

আমি এবং সহযাত্রীরা সকলেই হোটেল থেকে বেরিয়েছি একসঙ্গে। তবে ঘুরছি যে যার ইচ্ছে মতো। এখানে দেখা হয়ে গেল হীরের মায়ের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে আছেন ইংলিশ মিডিয়াম দিদি। জিজ্ঞাসা করলাম,

—দিদি, এটাই তো আমাদের ভ্রমণপর্বের শেষ পর্ব। দ্বারকা কেমন লাগছে?
একটু বিরক্তির সুরেই জানালেন দিদি,
—অনেক হয়েছে বাবা, আর ভাল লাগছে না। এবার বাড়ীতে যেতে পারলে বাঁচি। ছেলেটা যে কি করছে তা কে জানে! ইস্কুলে স্ট্যান্ড করতে না পারলে প্রেস্টিজ থাকবে না।
কথাটা বলে এগিয়ে গেলেন দিদি। এগিয়ে গেলাম আমিও। এলাম দুর্বাসা মন্দিরের পিছনে বেশ বড় একটা মন্দিরে। এখন থেকে আনুমানিক ১২৩৬ বছর আগে মাত্র সতেরো বছর বয়েসে আচার্য শংকর এসেছিলেন এখানে। ভারতের চার প্রান্তে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন চারটি মঠ। উত্তরে বদরীনারায়ণের পথে যোশীমঠ, দক্ষিণে রামেশ্বরে শৃঙ্গেরী মঠ, পুরীতে গোবর্ধন মঠ, আর পশ্চিমে এই দ্বারকায় সারদা মঠ। অনেকটা জায়গা জুড়ে এই মন্দিরটিই আচার্য শংকর প্রতিষ্ঠিত সারদা মঠ। শ্বেত পাথরের সাদামাটা মন্দির। কারুকার্য নেই, একেবারেই অনাড়ম্বর। কোন দেবদেবীর বিগ্রহ নেই মন্দিরে। আসনে রয়েছে আচার্যের বাঁধানো একটি বড় ছবি। মন্দিরের দেয়ালে টাঙানো বাইশটি ছবিতে আছে শংকরাচার্যের জীবনী। দ্বারকায় এই মঠ স্থাপনের পর প্রথম অধ্যক্ষ হয়েছিলেন আচার্যের প্রধান শিষ্য শ্রীসুরেশ্বরাচার্য।
শংকরার্যের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর ছবিগুলি দেখতে দেখতে এসে পড়লাম পাশেরই আর একটা মন্দিরে। মন্দির হলেও মাঝারী আকারের ঘর। সারি সারি এই ঘরগুলিতে প্রতিষ্ঠিত আছে জাম্ববতী, রাধিকা, লক্ষ্মীনারায়ণ, লক্ষ্মী, সত্যভামার বিগ্রহ। প্রতিটি বিগ্রহই কালো পাথরের। এরই মধ্যে একটি প্রকোষ্ঠে রয়েছে দেখলাম সাদা পাথরের গোপালকৃষ্ণের বিগ্রহ।
এগুলি ছাড়াও দ্বারকাধীশ মন্দিরচত্বরে রয়েছে রাধাকৃষ্ণ, দেবকী, পুরুষোত্তম এবং গুরু দত্তাত্রেয় মন্দির। যদিও এগুলি তেমন আকর্ষণীয় নয়, তবুও তীর্থযাত্রীরা ঘুরে ঘুরে দেখে থাকেন মন্দির প্রাঙ্গণে। আর আছে শ্রীকৃষ্ণের কুলদেবী অম্বাজীর মন্দির।
একদা এই দ্বারকাধামে এসেছেন, আজও আসেন অসংখ্য সাধু-সন্ন্যাসী এবং উচ্চকোটি সাধক সিদ্ধপুরুষ। তাঁদের চরণধূলিতে ধন্য দ্বারকার প্রতিটি ধূলিকণা। যেমন এসেছিলেন স্বামী নিগমানন্দ। ১২৮৬ সালের ঝুলন পূর্ণিমায় তাঁর জন্ম। সন্ন্যাসজীবনে উত্তরাখন্ড ভ্রমণের পর স্বামী নিগমানন্দের গুরুমহারাজ সচ্চিদানন্দ ফিরে গেলেন পুষ্কর আশ্রমে। এবার গুরুজীর আদেশে পরিব্রাজক নিগমানন্দ যাত্রা করলেন বিভিন্ন তীর্থদর্শনের জন্য। এক সময় রামেশ্বর শ্রীক্ষেত্র এবং অন্যান্য বহু তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে আসেন এই দ্বারকাধামে। এই পরিভ্রমণ সময়ে তিনি লাভ করেন বহু অভিজ্ঞতা। উত্তরকালে তিনি নানা বিচিত্র ঘটনার কথা উল্লেখ করতেন তাঁর ভক্ত-শিষ্যদের কাছে।
ভারতবিশ্রুত সাধক পওহারী বাবা ভূমিষ্ঠ হন ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে। সংসারজীবন

ত্যাগের পর ঘুরতে ঘুরতে এক সময় তিনিও এসেছিলেন এই মোক্ষভূমি দ্বারকায়। রণছোড়জীর দর্শনের পর তিনি গিয়ে ছিলেন গির্ণার পাহাড়ে অবস্থিত তীর্থগুলি দর্শন করতে। সে সময় মন বড় ব্যাকুল হয়েছিল পওহারী বাবার। অসংখ্য তীর্থ, বিগ্রহ আর সাধুদর্শন করলেন তবুও তাঁর ভাগ্যের প্রকৃত পথপ্রদর্শক জুটলো না। সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভ আর নতুন পথের দিশারীর জন্যে অধীর হয়ে উঠেছিলেন তিনি। পরে অধ্যাত্মজীবনের উত্তুঙ্গ শিখরে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন এই মুক্ত পুরুষ।

ষোল শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন ভক্তিসিন্ধ মহাপুরুষ নরসিং মেহতা। বিবাহের পর ইষ্টের আকর্ষণের তুলনায় তাঁর জীবনে কখনই বড় হয়ে দেখা দেয়নি পত্নীর আকর্ষণ। একদা ভ্রাতৃবধূর লাঞ্ছনা আর অপমানের রূঢ় আঘাতে তিনি বেরিয়ে পড়েন ইষ্ট প্রাপ্তির অভিযাত্রার পথে।

পায়ে হেঁটে চলার কয়েকদিন পর তিনি এসে পৌঁছালেন দ্বারকায়। আকুল হৃদয়ে ধূলি পায়ে ছুটে গেলেন রণছোড়জীর মন্দিরে। প্রেম ভক্তির আবেশে উন্মত্ত নরসিং মেহতা কখনও গড়াগড়ি দিলেন আঙিনা জুড়ে, কখনও উন্মত্তের মতো নেচে নেচে গাইলেন প্রভুজীর সুমধুর গান। আবার কখনও নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন বিগ্রহের দিকে, দুচোখ বেয়ে ঝরেছিল কৃষ্ণপ্রেমের অশ্রুধারা।

বাংলা ১৩১৬ সালের কথা। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ রামদাস কাঠিয়াবাবা একদিন ব্রজবিদেহী মহন্ত সন্তদাস বাবাজীকে বললেন, 'বৎস, দ্বারকা নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের তথা আমাদের মুখ্যধাম। এই ধাম একবার দর্শন করে আসা তোমার পক্ষে অত্যাবশ্যক।'

উত্তরে সন্তদাস বললেন, 'মহারাজ, আপনাকেই আমি ভগবান বলে জানি। তাছাড়া শাস্ত্রেও আছে, সমস্ত তীর্থই বিরাজ করছে গুরুর শ্রীচরণে। সুতরাং আপনার চরণ দর্শনেই তো আমার সমস্ত তীর্থ দর্শন হচ্ছে। আর কোথাও যেতে আমার মন চায় না।'

গুরুদেব কাঠিয়া বাবা বললেন, 'আরে, তুই বড় জ্ঞানী হয়েছিস্। তোর মতো জ্ঞানী বুঝি আর কেউ কখনও হয়নি। তোর গুরু দ্বারকা দর্শন করতে গিয়েছেন, দাদাগুরু গিয়েছেন, পর দাদাগুরু গিয়েছেন, আর তুই এম্‌নি জ্ঞানী হয়েছিস্ যে, বলছিস্ তোর কোন তীর্থদর্শনের প্রয়োজন নেই। এসব বুদ্ধি পরিত্যাগ কর্। আমি বলছি, দ্বারকাধাম দর্শন করে আয়।'

এ-কথার পর সন্তদাস বললেন, 'মহারাজ, দ্বারকা কোথায়—কোন দিকে ওই দেশ—কেমন করে যাবো—কিছুই জানি না। আপনি কৃপা করে আপনার কাছেই থাকতে দিন। আপনার সেবা করলেই মন আমার প্রসন্ন হয়।'

কথাগুলো শুনলেন কাঠিয়াবাবা তবে আর কিছু বললেন না। পরদিন বৃন্দাবনের আশ্রমে দুজন সাধু এসে উপস্থিত হলেন কাঠিয়াবাবার কাছে। তাঁদের কাছে কাঠিয়াবাবা জানতে পারলেন তাঁরা দ্বারকাধাম দর্শনে যাবেন। অগত্যা বাধ্য হয়েই তাঁদের সঙ্গে দ্বারকা যাত্রা করলেন সন্তদাস, গুরুজীকে প্রণাম করে।

যাত্রাকালে কাঠিয়াবাবা আশীর্বাদ করলেন, 'তুমি দ্বারকা দর্শন করে এসো। পথে তোমার কোন কষ্টই হবে না। তোমার সমস্ত আবশ্যকীয় বস্তু তোমার বিনা চেষ্টাতেই তোমার কাছে এসে উপস্থিত হবে।'

এরপর সন্তদাস বাবাজীর কথায়, "আমি দ্বারকাভিমুখে প্রস্থিত হইলে রাস্তায় বাস্তবিক আমার কোন প্রকার অভাব বা অসুবিধা ঘটিল না। যেখানে গিয়া মধ্যাহ্নে অথবা সায়াহ্নে আসন স্থাপন করিতাম, সেখানেই লোকজন আসিয়া আমাদের খাদ্য সামগ্রী ও গাঁজা চরস প্রভৃতি সব দিয়া যাইত। রাজপুতানার মরুভূমি পার হইতে বস্তির লোক আপন হইতে শকট গাড়ী জুটাইয়া দিত। এইরূপে দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া দ্বারকানাথের দর্শন করিলাম…।"

এ-ছাড়াও ভারতের উচ্চকোটি মহাপুরুষদের মধ্যে প্রেমিক কবি তুলসীদাস, আচার্য রামানুজ, ভক্তপ্রেমিক কবীরজী, মাধবাচার্য, উদাসীগুরু নানকজী, রামানন্দাচার্য, বল্লভাচার্য, স্বামী রামদাস, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য প্রমুখরা একদা এসেছিলেন মোক্ষভূমি এই দ্বারাবতীপুরীতে।

সারা মন্দির প্রাঙ্গণের অন্যান্য মন্দিরগুলি দেখে সোজা চলে এলাম কৃষ্ণমন্দিরের পিছনে। এখানে সিঁড়ি রয়েছে ৫৬টি। কয়েক ধাপ নামতেই বাঁদিকে দেখলাম একটা আশ্রমের মতো। এখানে প্রতিদিন সাধু-সন্ন্যাসী আর দরিদ্র নারায়ণদের বিনা-মূল্যে বিতরণ করা হয় খিচুড়ীপ্রসাদ। এ-কথা লেখা আছে দেয়ালের গায়ে লাগানো একটি সাইনবোর্ডে।

নেমে এলাম আরও কয়েক ধাপ। এবার ডানদিকে পড়লো একটি মন্দির। ভিতরে স্থাপিত মূর্তিটি আচার্য শংকরের। এই মন্দির থেকে আর কয়েকটা ধাপ পরেই রয়েছে কেদারেশ্বর মহাদেবের মন্দির। তারপরের মন্দিরটি সাক্ষীগোপালের। এই মন্দিরগুলির তেমন কোন আকর্ষণ নেই তীর্থযাত্রীদের কাছে। তবুও চোখের দেখা দেখে ফিরে যায় সকলে।

সমস্ত সিঁড়িগুলি ভেঙে নেমে আসতেই যে মন্দিরটি সামনে পড়লো সেটি গোমতী-দেবীর মন্দির। শ্বেত পাথরের সুন্দর দেবী মূর্তি রয়েছে বেদীতে। তার ডান পাশেই ছোট্ট একটি প্রকোষ্ঠ। তাতে স্থাপিত মাঝারী আকারের মূর্তিটি বশিষ্ঠদেবের। গোমতীদেবীর বাঁপাশের বিগ্রহটি দেবী মহালক্ষ্মীর।

এই মন্দিরের পাশ দিয়েই কিছু সিঁড়ি নেমে গেছে একেবারে গোমতীগঙ্গায়। এখানে উত্তরভারতের নৈমিষারণ্যের বুক চিরে বয়ে আসা গোমতীর মতো নয়। চওড়া তবে গভীর নয়। অনেক সময় পার হওয়া যায় পায়ে হেঁটেই। ওপারে গোমতীর গা বেয়ে উঠেছে বাঁধ। তার পাশ- দিয়েই বয়ে চলেছে সরু জলের ধারা। নৌকায় করে পার হলাম। বাঁধ পেরিয়ে এলাম একটি মন্দিরে। লক্ষ্মীনারায়ণের বিগ্রহ স্থাপিত আছে এখানে। আর সামনেই রয়েছে সুস্বাদু জলের ঝরণা পঞ্চকুয়া।

এটুকু দেখে আবার ফিরে এলাম গোমতী ঘাটে। নদী গোমতীতে শুধু বালি আর বালির চর। একপাশে এর পাথর দিয়ে বাঁধানো উঁচু ঘাট ধরেই এগিয়ে চলি।

ছোট ছোট কয়েকটা মন্দিরকে ফেলে এলাম একেবারে শেষ প্রান্তে। এখানে গোমতী এসে মিশেছে সাগরে। এই মিলনক্ষেত্রের নাম হয়েছে গোমতীনারায়ণ সঙ্গম। পৌরাণিক গঙ্গা এখানে গোমতীগঙ্গা নামেই পরিচিত। আর পবিত্র দ্বারকা গোমতীদ্বারকা নামেই প্রসিদ্ধ। সঙ্গমের কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটি প্রাচীন মন্দির। আড়ম্বর নেই, কোন বিগ্রহও নেই মন্দিরে। হাঁ করে চেয়ে আছে সাগরের দিকে। দ্বারকার সাগর একেবারেই শান্ত যেমন শান্তসৌম্য দ্বারকাধীশ। ঝড়ো হাওয়া নেই। ছোট ছোট ঢেউ সারাদিন রাতই পাড়ের বালি টেনে দিয়ে চলেছে সাদা দুধের মতো সুন্দর ফেনার রেখা।

পৌরাণিক যুগে এই দ্বারকাতে কিছুকাল বাস করেন মারিচী, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, দুর্বাসা প্রমুখ ঋষিরা। এঁদেরই পাদস্পর্শে আজও পবিত্র পুণ্যময় হয়ে রয়েছে দ্বারকা, তাই হয়তো দ্বারকার বুকে বয়ে যাওয়া তাঁদের স্পর্শে পবিত্র গোমতীতে স্নান করলে গঙ্গাস্নানের ফল হয়।

মাঘ মাসের বসন্ত পঞ্চমী, দোলপূর্ণিমা, বৈশাখী অক্ষয় তৃতীয়া আর জন্মাষ্টমীতে বড় মেলা বসে দ্বারকায়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগমন ঘটে অগণিত তীর্থযাত্রীর। কার্ত্তিক মাসে অন্নকূট, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণেও মেলা বসে দ্বারকায়, শ্রীকৃষ্ণের কোলে।

## সাধুসঙ্গ—নিঃস্ব সাধু, পুলিশ এবং চেকারবাবু

দ্বারকার কৃষ্ণ-মন্দিরের পিছনেই রয়েছে ছাপান্নটা সিঁড়ি। নেমে সোজা চলে এলাম। এই সিঁড়ির পরেই গোমতী ঘাট। পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে নদী গোমতী। এতে কোথাও হাঁটু, কোথাও বা কোমর জল। জোয়ারে জল বাড়ে। এখন ভাটা। তাই এখন তিরতির করে জল বয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে। গোমতীর বইতে যেন কষ্ট হচ্ছে। এখানে গোমতী বড় রুগ্না। দেখলেই বেশ বোঝা যায় এক-কালে যৌবন ছিল, রূপও ছিল। বয়েস বেড়েছে। রূপও গেছে—গেছে যৌবনও। এখন গোমতী রুগ্না, বৃদ্ধা। চলার শক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেছে। নারী আর যৌবন মানুষ যেমন অল্পকালই ভোগ করতে পারে, তেমন অবস্থা গোমতীরও। এখন কোন আকর্ষণই নেই। স্তনহীনা নারী যেন। গোমতী এক কালের জমিদার গিন্নি। কালে পড়ে গেছে। তবুও গৌরব তো একটা আছেই। তাই মানুষ শ্রদ্ধা করে, ভক্তিও করে। স্নান করে মুক্তির আশায়।

এই গোমতী ঘাটের পাশেই রয়েছে ছোট্ট একটা শিবমন্দির। এরই ছোট্ট বাঁধানো চাতালে বসে আছেন এক সাধুবাবা। গায়ে গেরুয়া রঙের ফতুয়া। হাঁটুর নীচ পর্যন্ত একটা কাপড় পরা এক পাটা করে। কাছা দেয়া নয়, বাউল কায়দায়। বেশ ফরসা গায়ের রঙ। ঝাঁকড়া চুল নেমে এসেছে কাঁধ পর্যন্ত। পাশেই ছোট্ট একটা ঝোলা। ইহলোকের সম্বল। বসে আছেন নিজের কম্বল পেতে। সঙ্গে আর কিছু দেখলাম না। নাক চোখ মুখ খুব সুন্দর। বসে আছেন আপনভাবে। বয়েসে সাধুবাবা

বৃদ্ধ। বেশ বয়েস।
কালটা শীতের তবে এখানে শীতটা এখন কম। সমুদ্রের ধার বলে। তবুও হালকা শীতের আমেজ একটা আছেই। পাশ দিয়ে অনেকেই চলেছেন স্নানে, ফিরছেন অনেকে স্নান সেরে। আরও কয়েকজন সাধুবাবা বসে আছেন, একটু দূরে। এগোলাম না। বসলাম সাধুবাবারই সামনে—চাতালে। নিজের থেকেই সাধুবাবা ইসারায় বসতে বললেন কম্বলের উপর। মুখেও বললেন,
—বেটা, আমার কম্বলের উপরেই বোস্।
একটু ইতস্তত করে বললাম,
—আপনার আসনে বসবো, আমি তো গৃহী!
কম্বলের একপাশে একটু সরে বসে বললেন,
—বোস্ বোস্, তাতে কিছু যায় আসে না।
এবার উঠে গিয়ে বসলাম। প্রণাম করেই বসলাম। প্রণামে বাধা দিলেন না। শুধু কপালে হাতদুটো ঠেকালেন নমস্কারের মতো করে। বললাম,
—বাবা কি দ্বারকাতেই থাকেন, না অন্য কোথাও?
মুখের ভাবটা প্রসন্ন। তবে হাসি নেই মুখে। সাধারণভাবেই বললেন,
—এখানে এসেছি আজ দিনদশেক হলো। থাকবো আরও কয়েকটা দিন। বাড়ী ছিল আমার টেহেরী গাড়োয়ালে।
মুখোমুখি বসেই কথা বলছি। এখন স্নানের সময়। স্নানযাত্রীরা পাশ দিয়ে চলেছেন দলে দলে। ক্যাচোর ম্যাচোর করতে করতে। সংসারে, কেউ অন্যের কাছে কোন কাজ বা স্বার্থসিদ্ধির জন্যে গেলে প্রথমেই নিজের প্রয়োজনের কথা বলে না। এতে উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটবে মনে করে। যেমন, ভালো আছেন স্যার? বাড়ীর সবাই ভালো তো? জিনিষের কি দাম—ছোঁয়া যাচ্ছে না, আগুন! কোন বাড়ীতে গেলে কাছে বাচ্চা পেলে তাকে, কি সোনা, ভালো আছো তো? কোন্ কেলাসে পড়ছো? তোমাদের ইস্কুলের নাম কি? বাচ্চার মায়ের প্রবেশ, মাসিমা ভালো আছেন? একদম সময় পাই না। মাঝে ছিলাম না, পাটনায় গেছিলাম। যত রাজ্যের অবাঞ্ছিত কথা। তারপরে আসে আসল কথা, যে উদ্দেশ্য নিয়ে যাওয়া। এ ব্যাপারটা সবক্ষেত্রে, সব পরিবারে স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজন যেখানে। আসল কথাটা জানার জন্যে সাধুবাবার ক্ষেত্রে মাসিমা, তোতন সোনাটা করতেই হয়। করলামও,
—বাবার কি সব তীর্থদর্শন হয়ে গেছে?
মুখের ভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি, একইভাবে বললেন,
—হাঁ বেটা, ভারতের প্রায় সব তীর্থদর্শনই হয়েছে ভগবানের কৃপায়।
—এখান থেকে কোথায় যাবেন?
একটু ভেবে সাধুবাবা বললেন,
—শীতটা একটু কমলে চলে যাবে পাহাড়ে। সমতলের চেয়ে পাহাড়ই ভালো।

সাধন-ভজনের উপযুক্ত স্থানই হলো পাহাড়। কেউ বিরক্ত করে না। সমতলে কোথাও একটু শান্তিতে বসার উপায় নেই। বসলেই লোকে বিরক্ত করে। কারও রোগ, কারও সংসারে অশান্তি—কারও না কারও, কিছু না কিছু লেগেই আছে। সব ঠিক করে দাও বাবা। এইভাবে বিরক্ত করে লোকে। তাই পাহাড়ে চলে যাবো।

সঙ্গে সঙ্গেই বললাম,

—বাবা, আপনি তো মানুষ। সাধুরাই তো বলেন মানুষের মধ্যেই ভগবান। তাই যদি হয়, তাহলে আপনি মানুষ হয়ে ভগবানরূপী মানুষকেই উপেক্ষা করতে চাইছেন কেন?

একটু প্রতিবাদের সুরেই বললেন সাধুবাবা,

—বেটা, আমি সাধু। আমি ডাক্তার নাকি যে কেউ এলে আমি তার রোগ ভালো করে দিতে পারবো। রোগের জন্যে তো ডাক্তার রয়েছে। এবার ধর্ কারও স্বামী-স্ত্রীতে বনিবনা হচ্ছে না। নিত্য অশান্তি লেগেই আছে। আমি তাদের কি করতে পারি? আমি বললেই যদি মানুষ রোগ থেকে মুক্তি পেতো, স্বামী-স্ত্রীতে মিল হয়ে যেতো, তাহলে তো আমার জন্যে হাসপাতাল ডাক্তার সব উঠে যাবে। শান্তি এসে যাবে ঘরে ঘরে। তুই বল্, এগুলো কি কোন সাধুর পক্ষে করা সম্ভব। যারা করছে শুনবি, জানবি তারা ভাঁওতা দিচ্ছে, গৃহীদের ঠকাচ্ছে। এখন সাধুদের কাছে এসব ব্যাপার নিয়ে যদি কেউ আসে, তার সমস্যা সাধুদের শান্তি নষ্ট করে কিনা একবার ভেবে দেখতো। যেটা করা সম্ভব না সেটা নিয়ে অন্য কারও শান্তি নষ্ট করাটাও ঠিক নয়। এটাকে যদি ভগবানকে উপেক্ষা করা বলিস্ তাহলে আমার কিছু করার নেই, বলারও নেই।

আমাদের দুজনকে দেখতে দেখতে চলে যাচ্ছে অনেক স্নানার্থীরা। কথার ফাঁকে ফাঁকে তাদের দিকেও চোখ আমার, সাধুবাবারও। কেউ কিছু অবশ্য বলছে না। আমিই বললাম সাধুবাবাকে,

—মানুষের মানসিক শান্তি পাওয়ার পথটা কি আপনার জানা আছে?

এ-কথার উত্তরে বেশ জোর দিয়েই সাধুবাবা বললেন,

—বেটা, 'জিস্‌কা পাস্ ভজন হ্যায়' এবং যার মধ্যে সততা আছে, তার শান্তি করায়ত্ত। এ-দুটোর মধ্যে দুটোই থাকতে হবে। একটা থাকবে আর একটা থাকবে না তাহলে কিন্তু শান্তিও থাকবে না। যেমন ধর্ একজন সমানে ভগবানকে ডাকছে খোল করতাল পিটিয়ে, দানও করছে অঢেল। বাড়ীতে বারো মাসে তেরো পার্বণও লেগেই আছে অথচ অন্তরে ও কর্মে সততার এতটুকুও নেই, এদের কিন্তু শান্তিও নেই। এবার ধর্ কেউ প্রকৃতই অন্তরে সৎ অথচ সাধনভজন নেই, তারও কিন্তু শান্তি নেই।

সঙ্গে সঙ্গেই জানতে চাইলাম,

—এ-রকম হবে কেন এবং হয়ই বা কেন? ভগবানকে ডেকেও শান্তি নেই আর ঈশ্বরকে না ডেকে সততার সঙ্গে জীবনযাপন করেও শান্তি নেই—কেন এমন হবে?

এতক্ষণ পর এবার সাধুবাবা হাসিমুখেই বললেন,
—বেটা, যে সর্বদা ভগবানকে ডাকছে অথচ সততা নেই, তার ভগবানকে ডাকা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে। তাই তার শান্তি নেই। ভগবানের দয়ায়, তাঁর নামে উদ্দেশ্য ও প্রবৃত্তি চরিতার্থ হবে, শান্তি হবে না। আর অন্তর যার সততায় ভরা, তার সততা থেকে অলক্ষ্যে উৎপন্ন হয় অহংকার তাই তার শান্তি হয় না। সততার সঙ্গে ভজন থাকলে ভজনশক্তি তখন অহংকারকে নয়, সততাবৃত্তি চরিতার্থ করে। ফলে শান্তি আসে মনে। সুতরাং ভজন করলেই শান্তি অথবা শুধু সততার মাধ্যমেই শান্তি, তা বেটা আসবে না। একসঙ্গে দুটোকে আঁকড়ে ধরলেই তার শান্তি অনিবার্য। আর ওই দুটো যার নেই তার চোখে ঘুমও নেই। রুগী না হলেও তাকে ট্যাবলেট খেয়েই ঘুমাতে হবে।
এবার জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা, আপনার সাধুজীবনে এমন কোন তিক্ত বা আনন্দদায়ক ঘটনার কথা কি মনে আছে বা ঘটেছে যা কখনই ভুলবেন না। মনে দাগ কেটে রাখার মতো।
সাধুবাবা এতক্ষণ একভাবেই বসেছিলেন। এখন একটু নড়ে বসলেন। এদিক ওদিক চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার। তারপর বললেন,
—হাঁ বেটা, দুটো ঘটনার কথা আমার মনে আছে যা কোনদিনও ভুলবো না আমি।
বলে একটা বড় নিঃশ্বাস ছাড়লেন। তারপর শুরু করলেন,
—বেটা, সারা ভারতবর্ষই ঘুরেছি আমি। বাংলা, ইউ. পি, দিল্লী, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ—দেখেছি, এখানকার পুলিশ আর ট্রেনের চেকাররা বেশ ভালো। সাধুদের এরা মোটেই হয়রাণ করে না। কিন্তু বিহারে ট্রেনের চেকার, পুলিশরা মোটেই ভালো নয়। কিছু ভালো থাকলেও থাকতে পারে তবে আমার নজরে পড়েনি এখনও। এরা সাধুদের যে কি হয়রাণ করে তা তুই চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারবি না।
কথাটা বলে সাধুবাবা একটু গুম্ হয়ে বসে রইলেন। কোন কথা বলছেন না দেখে জিজ্ঞাসা করলাম,
—কেন বাবা, ওরা কি অপরাধ করলো?
সাধুবাবা মুখখানা একটু অন্ধকার করে বললেন,
—একবার শীতের সময় ফিরছি তোদের গঙ্গাসাগর মেলা থেকে। হাওড়া থেকে উঠেছি। বসে আছি ট্রেনে। আমার জন্যে যাত্রীদের কোন অসুবিধে হবে ভেবে বসে আছি বাথরুমের কাছে। ট্রেন চলছে তখন বিহারের মধ্যে দিয়ে। পরে কোন একটা স্টেশন থেকে উঠলো একজন চেকার। সঙ্গে রয়েছে দুজন পুলিশ। ওরা সব সময়েই জানে, টিকিট থাকে না সাধুদের কাছে। তবুও ট্রেনে উঠেই টিকিট চাইলো আমার কাছে। বললাম টিকিট নেই। এবার টাকা চাইলো। বললাম টাকাও নেই। এবার ওরা আমার গায়ে জড়ানো কম্বলের ভিতরে কাঁধ থেকে টেনে বের করে নিল ঝুলিটা। তারপর দুজনে হাতড়ে দেখলো, কিছুই নেই। বেটা,

দুঃখের কথা তোকে আর কি বলবো ? এবার পুলিশ দুটো আমার গা থেকে জোর করে কেড়ে নিল কম্বলটা। অনেক অনুরোধ করলাম। কোন কথাই শুনলো না। সোজা নিয়ে চলে গেল। নেমে গেল পরের একটা স্টেশনে। গরমের সময় হলে কষ্ট হতো না। গায়ে ছিল পাতলা একটা জামা। শীতের রাত। ঠাণ্ডায় দেহটা আমার জমে এলো। কাঁপতে লাগলাম ঠক্‌ঠক্‌ করে। এইভাবে দুটো রাত ট্রেনে কাটিয়ে এলাম দিল্লীতে। তুই তো জানিস্‌, শীতকালে ওদিকটায় কেমন ঠাণ্ডা পড়ে। দিল্লীতে আসার পর এক ভক্ত একটা কম্বল কিনে দিয়েছিল পরে।

একটু থেমে আবার বললেন মলিন মুখে,

—ঝুলিতে দু-চার টাকা থাকলে তাও অনেক পুলিশ, ট্রেনের চেকার কেড়ে নেয়। কিছু বলতে পারি না। টিকিট থাকে না বলে এইসব অত্যাচারী অর্থপিশাচদের অত্যাচারের প্রতিবাদও করতে পারি না। দুঃখের কথা কি বলবো বেটা, অনেক সময় বিহারের কিছু পুলিশ আর চেকার আছে, যারা ভাবে, সাধুরা বোধ হয় নেংটির মধ্যে টাকা লুকিয়ে রাখে। তোর বিশ্বাস হবে না বেটা, ওই সব 'ডাকু'রা ঝুলিতে টাকা না পেলে নেংটি পর্যন্ত খুলে দেখে। এ অভিজ্ঞতা আমার একবারের নয়, অনেকবারই হয়েছে। আমি বহু সাধুর মুখেও ওদের এই ব্যবহার আর অত্যাচারের কথাও শুনেছি বহু জায়গায়, বহুবার। দুদিনের সুখের জন্যে সাধুদের ভিক্ষে করা দু-চার টাকা কেড়ে নেয় এরা। বেটা, সাধুদের সাময়িক কিছু কষ্ট হয় ঠিকই তবে নিশ্চিত জানবি, এর ফল ওদের ভোগ করতেই হবে।

সাধুবাবা ফরসা। দেখলাম, ক্রোধে আর উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে মুখখানা। তারপর উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন,

—কামার্ত নারী যেমন স্থান কাল পাত্র বিচার করে না কাম চরিতার্থ করার জন্যে তেমনই এইসব অর্থলোভীরাও সাধু-সন্ন্যাসী পরান্নভোজীদের কথা ভাবে না একবারও। যে কোনভাবে অর্থলালসা চরিতার্থ করাই এদের উদ্দেশ্য। নইলে কেউ সাধুদের নেংটি খুলে দেখে, টাকা আছে কিনা ?

এই পর্যন্ত বলে চুপ করে রইলেন। আর কোন কথা বলছেন না দেখে বললাম,

—আর একটা কি অভিজ্ঞতার কথা যেটা আপনার মনে আছে, সেটা বলবেন ?

সাধুবাবা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন। কেটে গেল প্রায় মিনিট পাঁচেক। তারপর বললেন,

—বেটা, তখন আমার বয়েস বছর পঁয়তাল্লিশ হবে। বেরিয়েছি ভারতের সমস্ত তীর্থদর্শনে। কোথাও কোন স্থায়ী ডেরা নেই আমার। যখন যেখানে যেমন, তখন সেখানে থাকি সেরকমভাবেই। কখনও গাছ তলায়, কখনও পথের ধারে, কখনও ইস্টিশানে আবার কখনও পড়ে থাকি কোন ধর্মশালা কিংবা মন্দিরের চাতালে। এইভাবেই চলছে আমার পথ আর তীর্থপরিক্রমা, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর।

সেবার গেছিলাম নেপালে পশুপতিনাথ দর্শনে। ফিরছি বিহার হয়ে এলাহাবাদে।

এই এলাহাবাদেই ঘটলো একটা বড় বিপত্তি। ওদিকে যাওয়ার কোন ইচ্ছা ছিল না। ইচ্ছা ছিল জ্বালামুখীতে যাবো। তা ভাবলাম, তার আগে প্রয়াগে একটু স্নান করে যাই। ব্যস, ভাবামাত্রই ট্রেন ধরে সোজা এলাম এলাহাবাদে। নামলাম ট্রেন থেকে। এবার স্টেশনের বাইরে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়েই পা-টা গেল হড়কে। টাল সামলাতে পারলাম না। এমনভাবে পড়লাম, ডান পা-টাই আমার ভেঙে গেল। দুর্ভোগ আর কাকে বলে!

এখন আর কোন উত্তেজনা নেই সাধুবাবার চোখেমুখে। ভাবটা এবার বেশ আগের ভাবেই এসেছে। একটু থেমে আবার বললেন,

—লোকজন সব ছুটে এলো। বসালো ধরাধরি করে। আমার গেরুয়া বসন দেখে কেউ আর হাসপাতালে নিয়ে গেল না। স্থানীয় কয়েকজন রিক্সাওয়ালা বললো, এখানে এক সাধুবাবার আশ্রম আছে। সেখানেই নিয়ে যাই। যা ব্যবস্থা করার তারাই করবে। তখন বুদ্ধি আমার লোপ পেয়েছে। কি করবো বুঝে উঠতে পারলাম না। কিছু বলার মতো মনের অবস্থাও আমার ছিল না। কয়েকজনে ধরে তুলে দিল একটা রিক্সায়। গঙ্গার কাছাকাছি নিয়ে এলো একটা আশ্রমে। স্টেশন থেকে বেশ কিছুটা ভিতরে। রিক্সাওয়ালা আমাকে সেই আশ্রমে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

সাধুবাবা এবার একটা পা ভাঁজ করে আর একটা পা টান টান করে বসলেন। আমার মুখের দিকে তাকালেন একবার। কোন কথা বললাম না। তিনি বললেন,

—আশ্রমে যাওয়ামাত্রই অন্যান্য সাধুরা লেগে গেলেন আমার সেবা করতে। ডাক্তার আনলেন। তারপর পায়ের ফটো তোলা হলো। প্লাসটার হলো। পড়ে রইলাম আশ্রমেরই একটা ঘরে। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ভালোভাবে চলতে আমার প্রায় মাস ছয়েক লেগেছিল। সাধুদের একান্ত সেবা আর যত্ন-প্রচেষ্টায় একেবারে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলাম। ওই সময়েই দেখেছিলাম এক সাধুর পতন, যা সারাটা জীবনই আমার মনে থাকবে।

বলে বড় একটা নিঃশবাস ফেললেন। একটু কৌতূহলী হয়ে নড়ে বসলাম। তাকিয়ে রইলাম সাধুবাবার মুখের দিকে। আবার শুরু করলেন,

—বেটা, তখন আমি প্রায় সুস্থই হয়ে উঠেছি। আশ্রমেই ছিলাম। একদিন দুপুর বেলা, তখন সাধুভোজনের সময়। হঠাৎ দেখলাম একদল গ্রামবাসী লাঠিসোটা নিয়ে হৈ হৈ করে ঢুকলো আশ্রমে, সোজা মহন্তের ঘরে। চুলের মুঠি ধরে একেবারে টেনে নিয়ে এলো আশ্রমের উঠোনে। তারপর শুরু হলো বেদম মার। প্রথমে আশ্রমের সাধুরা কেউ কিছু বুঝতেই পারেনি। পরে যাইহোক করে মোহন্তজীকে ঠেকালেন সকলে মারের হাত থেকে। দেখলাম, অল্প বয়েসের একটা কুমারী মেয়েকে। কাঁদছে আশ্রমের এক পাশে বসে।

এই পর্যন্ত বলে আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করতে লাগলেন সাধুবাবা। আমি একটু অধৈর্য হয়ে বললাম,

—তারপর কি হলো বাবা?

সাধুবাবা গম্ভীর স্বরে বললেন,

—আশ্রমের মোহন্তজীর বয়েস হয়েছিল প্রায় সত্তর। এমন সাধন সুলভ দেহ ছিল যে দেখলে কখনও মনেই হতো না পঁয়তাল্লিশের উপর বয়েস হবে। পাশের গ্রামের মেয়ে পুরুষ শুধু নয়, স্থানীয় অনেকেই আসতো আশ্রমে আর সব আশ্রমে যেমন সকলে যায়। মোহন্ত মহারাজ সকলের সঙ্গেই কথা বলতেন। তাদের সুখে আনন্দ পেতেন, দুঃখে সান্ত্বনা দিতেন। এটা আমি দেখতাম রোজই। আমার সঙ্গেও তাঁর ছিল আন্তরিকতা। কুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন তিনি। মাঝেমধ্যেই তিনি যেতেন গ্রামে, কিছু কিছু ভক্তের বাড়ীতে। অনেকে অনুরোধও করতো যাওয়ার জন্যে। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হলে যেটা হয় আর কি! এই যাওয়াটাই হয়েছিল মোহন্তজীর কাল। এই যাওয়া এবং তাদের আসা, এতেই মোহন্ত মহারাজের সংযমী রিপু ধীরে ধীরে হয়ে পড়লো অসংযমী। মনের গতি তখন বইতে থাকলো অন্য খাতে, সকলের অলক্ষ্যে। কোনও এক দুর্বল মুহূর্তে কাম গ্রাস করে ফেলেছিল মহারাজকে। হয়তো একদিন বা একাধিক দিন মিলিত হয়েছিলেন মেয়েটির সঙ্গে, যে আশ্রমের উঠোনে বসে কাঁদছিল। তারপর আর কি! প্রকৃতির নিয়মকে কি কেউ লঙ্ঘন করতে পারে, না পৃথিবীর কেউ কোথাও পেরেছে কখনও? তার নিয়মেই পেটে বাচ্চা এসেছে মেয়েটির। ব্যাপারটা বাড়ী থেকে গ্রাম হলো। ফল যা হবার তাই-ই হলো। গ্রামবাসীরা মোহন্ত মহারাজকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল গ্রামে। আমি আর আশ্রমে রইলাম না। সম্পূর্ণ সুস্থ না হলেও তখন চলার মতো ক্ষমতা ছিল। সেদিনই বেরিয়ে পড়লাম আশ্রম থেকে। তার পরের ঘটনা কি ঘটেছিল তা আমার জানা নেই। তবে দেখেছিলাম, মোহন্তজী ছিলেন সত্যবাদী। তাই ঘটনাটিকে তিনি মোটেই অস্বীকার করেননি। সকলের সামনেই তাঁর নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করেছিলেন। আজও আমি সেই ঘটনাকে ভুলতে পারিনি।

ঘটনাটি শুনে বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, সারাজীবন সাধন-ভজন করা ব্রহ্মচারী বয়স্ক সাধুর জীবনে যদি এমন ধাক্কা আসে, তাহলে গৃহীজীবনে আধ্যাত্মিক মার্গে উন্নত অবস্থার মানুষেরও তো এমন অবস্থা হতে পারে?

উত্তরে সাধুবাবা বললেন,

—হাঁ বেটা, হতে পারে। সাধু-সন্ন্যাসী আর গৃহী বলে কোন কথা নেই, কামরিপুর এই তীব্র প্রভাব সকলের জীবনেই আসতে পারে। স্থান কাল পাত্র বিচার না করেই তা আসতে পারে। তবে গৃহী সাধকদের ক্ষেত্রে ভয়টা থাকে কম। কারণ নারী-ভোগের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে সে অগ্রসর হয় বলেই কামরিপুর তাড়নাটা কম। আর ব্রহ্মচারীরা সংযমের মধ্যে থাকে বলে কামরিপু বশীভূত হয়। তেমন প্রভাব থাকেনা ভোগের দিকে। তবে অপ্রত্যাশিতভাবে কখনও ভোগের কোন সুযোগ এসে গেলে তখন এর প্রভাব দমন করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। ক্ষুধার্ত সিংহের কাছে হঠাৎ কোন মৃগ এসে পড়লে যেমন অবস্থা হয়, তেমন।

এইটুকু বলে একটু থেমে সাধুবাবা বললেন,
—তুই বিয়ে করেছিস্ ?
ঘাড় নেড়ে বললাম, না। সাধুবাবা মাথাটা নাড়িয়ে বললেন,
—তাহলে তোকে বলে লাভ নেই। বিবাহিত হলে তুই বুঝতে পারতিস্।
কথায় একটু চাপ দিয়ে বললাম,
—বলুন না বাবা, বুঝতে না পারি অনুভব তো করতে পারবো। বিবাহিতদের দেহ, রিপুর সঙ্গে আমার তো কোন কিছু পার্থক্য নেই।
সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে সাধুবাবা বললেন,
—ধর, বিবাহিত কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে রেখে বাইরে গেছে। প্রবাসে কিংবা কোন কাজের উদ্দেশ্যে বা বাইরে চাকুরী করে। এমনভাবে থাকতে হয় প্রায়ই। এই যোগাযোগহীন সময়কালের মধ্যে কামের সাধারণ প্রভাবটুকু স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যেই বর্তমান থাকে। কাম তেমন বেশী পীড়িত করে না দেহ মনকে। কারণ উভয়েই জানে, উভয়ের মিলন কোনভাবেই সম্ভব নয়। এই সময় দেহমনে কামের প্রকট রূপটা প্রকাশ পায় না, যেহেতু একে অপরকে কাছে পায় না বলে। এবার বলি ব্রহ্মচারী সাধু-সন্ন্যাসীদের কথা। তারা থাকেন সংযমে। নারীর দেহমনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কোন প্রশ্নই থাকে না। ফলে প্রবাসে স্বামী এবং ঘরে স্ত্রী—এদের যেমন সাধারণ কামের প্রভাবটুকু থাকে, সংযমী সাধুদেরও এর কোন ব্যতিক্রম নেই, একথা নিশ্চিত জানবি।
এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা একটা লম্বা হাই তুললেন। টান-টান করে পেতে দেওয়া পা-টা মুড়ে এবার বাবু হয়ে বসলেন শিরদাঁড়াটা টান-টান করে। চোখদুটো বুলিয়ে নিলেন ডাইনে বাঁয়ে সামনে। তারপর বললেন,
—এবার অনেকদিন আলাদাভাবে বা দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকার পর স্বামী ফিরে এলো ঘরে। এই ফিরে এসে একে অপরকে দেখার পর থেকে ধীরে ধীরে কামের ক্রিয়া শুরু হয়ে যায় উভয়ের দেহমনে। অপেক্ষা করতে থাকে উভয়েই মিলনের অপেক্ষায়। ঠিক একইভাবে সংযমী কোন সাধু-সন্ন্যাসীর কোনভাবে কোন নারীর প্রতি দুর্বলতা এলে এবং একইসঙ্গে মিলনের সুযোগ থাকলে যখনই তাকে দেখে, তখনই প্রবাসী স্বামী এবং স্ত্রীর মতো শুরু হয়ে যায় দেহমনে কামের ক্রিয়া। এবার আর দিন রাতের বা আলাদা কোন সময় অসময়ের অপেক্ষা করে না। দীর্ঘদিন আলাদাভাবে থাকা অথবা প্রবাসী স্বামী-স্ত্রীতে এবং স্ত্রী স্বামীতে প্রথম দিনের মিলনের সময় যেভাবে একে অপরকে গোগ্রাসে ভোগ করতে থাকে রুদ্ধশ্বাসে, ঠিক সেইরকম, একই অবস্থা হয় দীর্ঘদিনের দেহ ও মনের সংযমী সাধুদের, দীর্ঘ প্রবাসে থাকা স্বামীর মতো নারী ভোগের সুযোগ পেলে।
এমন আলোচনায় মাথায় প্রশ্ন এলো একটা। জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা, আপনি কি বিয়ের পর গৃহত্যাগ করেছিলেন ?
ফিক্ করে হেসে ফেললেন। বললেন,

—না বেটা, আমি বিয়ে করিনি।

সঙ্গে সঙ্গেই বললাম,

—বিয়ে যদি না-ই করে থাকবেন, তাহলে বিবাহিত নারীপুরুষের সঙ্গ-কথা এবং মানসিকতা জানলেন কি করে ?

উল্টে প্রশ্ন করলেন সাধুবাবা,

—আমি তোকে যেসব কথা বললাম, তুই কি তা বুঝতে পেরেছিস্ ?

ঘাড় নেড়েও মুখে বললাম, 'হ্যাঁ'। সাধুবাবা বললেন,

—তোর বয়েস এখন অল্প। আমি বললাম, তাতেই তুই কল্পনা আর সামান্য অনুভবের উপর বিষয়টা বুঝে ফেলেছিস্। অথচ দেখ্ তুই বিয়ে করিস্নি। মানুষ এমন অনেক কাজ না করলেও, অনেক কিছু চাক্ষুস না দেখলেও, বিষয়টা দেহ আর অনুভূতি শক্তির দ্বারা বুঝতে পারে। এ-ধারণা হয়েছে আমার দেহকে কেন্দ্র করেই।

এবার প্রশ্ন করলাম,

—বাবা, সাধু-সন্ন্যাসীরা দেহমনকে কিভাবে সংযত বা সংযম করেন ? রিপু তো সকলের ক্ষেত্রেই কাজ করে থাকে সমানভাবে।

সাধুবাবা বেশ খোস মেজাজেই বললেন,

—বেটা, এটার জন্যে পথচলতি সাধুদের আলাদাভাবে খুব বেশী একটা কসরৎ করতে হয় না। দেহমনের সংযম আপসেই আসে এ-পথে চলতে থাকলে। যেমন ধর, উত্তেজনা বাড়ে এমন খাদ্য সাধুরা প্রথমেই বর্জন করেন। বলতে পারিস্, পায়ই না। খাদ্যই প্রথম উত্তেজিত করে দেহকে। সুখাদ্য আমাদের কপালে প্রায় জোটেই না। ভিক্ষালব্ধ কিছু অর্থ বা অন্নই সাধুদের সম্বল। ওই অর্থ ও অন্নে বেঁচে থাকা যায় মাত্র। দেহের আর কিছু হয় না। এইভাবে দীর্ঘকাল, বছরের পর বছর চলতে থাকলে দেহরিপুর প্রভাব এমনিতেই ক্ষীণ হয়ে পড়ে। এতে কাম যেমন সংযত হয় তেমনই সংযত হয় লোভ। ভালো খাওয়া পরা না পেতে পেতে মনের এমন একটা অবস্থা আসে, যখন আর কোন কিছুতেই লোভ আসে না। মনটায় আর কোন টানই থাকে না।

একটু থামলেন। তারপর আবার বললেন,

—ক্রোধ আসে এমন কোন কাজ পথচলতি সাধু-সন্ন্যাসীরা প্রায় করেই না। ক্রোধের উৎপত্তি মানুষের অনেক কারণেই হতে পারে। যেমন ধর্ স্বার্থে আঘাত লাগলে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। প্রত্যাশিত বস্তু না পেলে ক্রোধ আসতে পারে। মান অভিমানের খেলা যেখানে, তার মধ্যে অলক্ষ্যে ক্রোধ বসে হাসতে থাকে। সুযোগ পেলেই কাঁদায়। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও ক্রোধ থাকে প্রকাশের অপেক্ষায়। আর মানুষ আত্মপ্রতিষ্ঠায় মানুষের কাছে বাধা পেলে ক্রোধ সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যেখানে সম্পর্ক, সেখানেই ক্রোধ। পথচলতি সাধু যারা—তারা নিঃসঙ্গ, একক জীবনযাপন করে। ফলে ক্রোধের উৎপত্তি হয় এমন কোন কারণে তারা লিপ্ত হয় না

বলেই ক্রোধ সংযত হয় আপ্‌সেই। সংসারে থাকলে এগুলো সহজে সংযত হওয়ার উপায় নেই। আর আমরা হলাম ভিখিরী সাধু, কি আছে আমাদের যে মোহ অহংকার ক্রোধ আসবে।

এবার লক্ষ্য করলাম, হঠাৎ সাধুবাবা কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। বসে রইলাম চুপ করে। কথা বলে আকর্ষণ করতে চাইলাম না নিজের দিকে। এইভাবে কাটলো কিছুক্ষণ। তারপর আবার ফিরে এলেন আগের ভাবে। বললাম,

—সারাজীবন ধরে তো অসংখ্য মানুষ দেখলেন। কথাও হয়েছে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে। মানুষ হয়ে মানুষ সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা কি হলো?

কথাটা শুনে হাসলেন। বললেন,

—এতক্ষণ পর তুই বেশ মজার প্রশ্ন করেছিস একটা।

একটু থামলেন। ভুরুও কোচকালেন একটু। তারপর বললেন,

—বেটা, সুখ আনন্দ আর প্রতিষ্ঠা—এই তিনটে চায় না এমন মানুষ সংসারে একটাও দেখিনি আমি। এগুলো কোন মানুষেরই হাতে নেই। রয়েছে ভগবানের হাতে। এর দাতাও একমাত্র তিনিই। দাতা ভগবানও বসে রয়েছেন মানুষকে দেবার জন্যে। অথচ দেখ্, মানুষ কত বোকা! এগুলো সব চায়—চায় না শান্তিটা। ভগবান শান্তিটা ছাড়া আর সবই দিয়ে দেয়। মানুষ যদি মনের শান্তি চায়, তাহলে কিন্তু ও-গুলো সবই পায়, শান্তিও পায়। কামনামনের শান্তির পরিপূরক তো ও-গুলোই কিন্তু মানুষ তা চায় না। এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা সারাজীবন তোদের মতো মানুষ দেখে।

জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, প্রতিটি মানুষেরই কমবেশী সুখ আছে দুঃখও আছে, সেটা আসে তাঁরই নিয়মানুসারে। আপনি তো সাধু। সুখ দুঃখ সবই তো আছে আপনারও। দুঃসময়ে কিভাবে কাটতো আপনার? কি করতেন তখন?

কথাটা শুনে হা-হা করে হেসে উঠলেন সাধুবাবা। প্রাণ খোলা হাসি। যুদ্ধজয়ী রাজার হাসি। হাসির রেশটা শেষ হতেই বললেন,

—বেটা, যেদিন সংসার ছেড়েছি, সেদিন থেকেই তো আমার সুসময়। দুঃসময় তো কাটে মানুষের সংসারে, আর সেটা সারাজীবনই। সাধুদের আবার দুঃসময় সুসময় বলে কিছু আছে নাকি? যে তাঁকে স্মরণ করতে ভুলে যাবে, যার তাঁর নামে প্রবৃত্তি হবে না, তখনই বুঝবি তার দুঃসময়। তবে এমনটা এপথে আসার পর হয়েছে বলে তো মনে পড়ে না।

প্রসঙ্গ পাল্টে বললাম,

—সংসারী আমরা। অনেক সময় অনেক কারণেই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। এমনটা অনেকেই করেন আমার মতো। অনেক সময়েই তা পূরণ হয় না। যেমন, রোগ ভোগ বা কোন কষ্টের থেকে মুক্তি পেতেই তাঁকে ডাকা। দেখেছি, অনেক সময়েই তা পূরণ হয় না। আমার জিজ্ঞাসা, ভগবান কি সে ডাক শোনেন না?

সঙ্গে সঙ্গেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সাধুবাবা বললেন,

—না না বেটা, সব কথাই তিনি শোনেন। অতিক্ষুদ্র পিঁপড়ের ডাকও তিনি শুনতে পান আর মানুষের ডাক শোনেন না, তাই কখনও হতে পারে? বিশ্বাস রাখবি, ভগবান বধির নন।

মুহূর্তমাত্র দেরী না করেই বললাম,

—তাই যদি হয়, তাহলে মানুষের প্রার্থনা মঞ্জুর হয় না কেন?

সাধুবাবা এবার বেশ জোর দিয়ে প্রতিবাদের সুরেই বললেন,

—কে বললো মঞ্জুর হয় না, 'জরুর' হয়। বিশ্বাসের অভাব আছে বলেই প্রার্থনা মঞ্জুর হয় না, আর হয় না কর্মফলে। আমরা যা প্রত্যাশা করি, তা নিশ্চিত হওয়ার নামই বিশ্বাস। অনিশ্চিত যা—তা কখনই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। মানুষ যা প্রার্থনা করে, তা নিশ্চিত হবেই—এই বিশ্বাসের উপর প্রার্থনা ধরে রাখলে ভগবান তা মঞ্জুর করেন। কোন প্রার্থনা করার সঙ্গে সঙ্গেই ভগবান তা শোনেন। প্রার্থনা থেকে ফলপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত—এই সময়কালটা ফললাভের ক্ষেত্রে নিশ্চিত হলেও প্রার্থনাকারীর কাছে তা অনিশ্চিত, যা বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না, যতক্ষণ না প্রত্যাশা পূরণ হচ্ছে। ফলে প্রার্থনা মঞ্জুর করছেন না ভগবান। প্রার্থনা থেকে প্রাপ্তি—এই ফলপ্রাপ্তির নিশ্চিত সময়কাল যদি প্রার্থনাকারীর কাছে নিশ্চিত হয়, তাহলে ফল সেখানে অবধারিত। বুঝলি বেটা, কেন ফল হয় না। বিশ্বাস—ধরে রাখাটাই মুশকিল। এটা ঈশ্বর প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও একই কথা জানবি। বিশ্বাসটা আমাদের সকলেরই আছে—খাঁটি বিশ্বাসটা নেই। আর প্রার্থনা মঞ্জুর হয় চিত্তশুদ্ধির উপরে। যার চিত্ত যত শুদ্ধ হবে, তার প্রার্থনা তত মঞ্জুর বেশী হবে। আবার কর্মফল খুব প্রতিকূলে থাকলেও প্রার্থনা মঞ্জুর হয় না।

এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন। তারপর আবার বললেন,

—বেটা, সংসার জীবনে গৃহীরা যা কিছু সুখ বা দুঃখ ভোগ করে, তার বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই করে। যেমন, সারাজীবনে কোন মানুষের নিজস্ব প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং বিশ্বাস—খুব, খু-উ-ব কমমাত্রায়ই কাজ করে। জীবনের প্রায় সবক্ষেত্রেই মানুষকে চলতে হয় অন্যের কথা আর কাজের উপর বিশ্বাস করে। আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষেত্রেও ওই একই কথা জানবি। সেখানেও বিশ্বাস। তবে সেখানে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে চলতে হয় অতিন্দ্রিয় জ্ঞানসম্পন্ন সাধক মহাপুরুষ ঋষি কিংবা ওই পর্যায় যাঁরা আছেন তাঁদের কথার উপরেই। তাতেই সব প্রাপ্তি।

পথে বেরোলে এমনিতে আমার কোন কাজ থাকে না। সাধু পেলে তাঁর কাছে হাজার প্রশ্ন করা ছাড়া। সেই সময় মনে যে প্রশ্ন আসে, তাই-ই করি। এবার জানতে চাইলাম,

—বাবা, এখনকার চেহারা দেখে মনে হয় এককালে রূপ যৌবন দুটোই বেশ ভালো ছিল আপনার। সংসারে এলেন অথচ সংসার করলেন না, কেন?

কথাটা শুনেই সাধুবাবার মুখখানা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এতক্ষণ বেশ ছিল। এ-প্রশ্নে চুপ করে রইলেন তিনি। লক্ষ্য করতে লাগলেন আমার মুখের দিকে। সাধুবাবার মুখের দিকে তাকালাম না। মাথাটা নিচু করেই বললাম,

—আপনি কোন অশান্তি করে বেরিয়েছিলেন সংসার থেকে?

কোন উত্তর না দিয়ে বসে রইলেন। কাটলো মিনিট পাঁচেক। এবার অনুরোধের সুরেই বললাম,

—বাবা, আমি জানি সাধু-সন্ন্যাসীদের পূর্বাশ্রমের কোন কথাই বলতে নেই। তবুও জানতে চাইছি কৌতূহলবশতঃ। দয়া করে বলুন না বাবা, কেন ঘর ছাড়লেন?

লক্ষ্য করলাম, সাধুবাবার চোখদুটো স্থির হয়ে গেল। মনেই হলো চলে গেলেন একেবারে ফেলে আসা অতীতে। কিছুক্ষণ। আবার সে ভাবটা কেটে গেল, এসে গেলেন আগের ভাবে। স্নেহের সুরেই বললেন,

—বেটা, সাধু হবো, এ-পথে আসবো—এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। মানুষের সাধারণ চিন্তা ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা যা কিছু, তার বাইরেও যে কিছু হয় এবং সেটা দিবারাত্রই যে হয়, তা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না কখনও। যতদূর আমার স্মৃতিতে আছে, তখন আমার বয়েস বছর আট-দশ হবে। গাঁয়ের নামধাম আমি কিছুই জানি না, বলতেও পারবো না। তবে বাড়ী যে আমার উত্তরপ্রদেশের কোথাও—এটা আমি নিশ্চিত জানি। বাবা-মা দুজনেই ছিলেন খুব ঈশ্বর ভক্তিপরায়ণ। আমরা এক ভাই এক বোন। আজ থেকে ধরু বছর ৬৫/৭০ আগের কথা। বাবা মা আমাকে আর ছোট বোনকে নিয়ে গেলেন বিশ্বনাথ দর্শনে। সেবার প্রচুর লোক সমাগম হয়েছে কাশীতে। দলে দলে আসছে তীর্থযাত্রী। মা অন্নপূর্ণার অন্নকুটের জন্যেই এত লোক সমাগম। আমরা চলেছি বিশ্বনাথ গলিতে। এত ভীড় যে কল্পনাই করতে পারবি না। ঠেলাঠেলি আর ভিড়ের চাপে মা-বাবার কাছ ছাড়া হয়ে গেলাম আমি। আর খুঁজেই পেলাম না বাবা মা আর বোনকে। তারাও পেল না আমাকে।

এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা একটু থামলেন। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,

—বেটা, মা বাবাকে না পেয়ে কাঁদতে শুরু করলাম। যাকে দেখছি, তাকেই জিজ্ঞাসা করছি, 'তোমরা আমার বাবা মাকে দেখেছো'। কে কার কথা শোনে। বাড়ীর ঠিকানাও জানি না। কাঁদছি আর পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। অনাহারে কেটে গেল একটা দিন। রাত কাটলো একটা দোকানের সিঁড়িতে শুয়ে। এমন অবস্থায় এক সাধু-বাবার সামনে পড়ে গেলাম। তিনি আমার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সব বললাম। সাধুবাবা বললেন, 'বেটা, তুই ঠিকানা জানিস না। জানলে তোকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে পারতাম।' অভুক্ত আছি শুনে তিনি কিছু খাবার কিনে দিলেন। তারপর আমাকে নিয়ে ঘুরতে লাগলেন কাশীর পথে পথে। খুঁজতে লাগলেন বাবা মায়ের হাতে তুলে দেবার জন্যে। ভগবানের ইচ্ছার বাইরে যাওয়ার উপায় তো কারও নেই। অদ্ভুত ব্যাপার। ওইটুকু জায়গায় কিছুতেই খুঁজে

পাওয়া গেল না তাঁদের। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো সাধুবাবার। এইভাবে কাটলো তিনটে দিন। থানায় নিয়ে গেলেন সাধুবাবা। সেখানেও মা বাবা যায়নি। ওখানে পুলিশ আমাকে রাখতে চাইলো। আমি কাঁদতে শুরু করলাম। বললাম, 'সাধুবাবার সঙ্গে খুঁজে বের করবো মা বাবাকে। এখানে থাকবো না।' তখন থানা থেকে পুলিশ সাধুবাবাকে বললো, 'দেখো খুঁজে। যদি পেয়ে যাও তো ভালো। নইলে ওকে এখানে দিয়ে যেও।' সাধুবাবা সম্মতি জানিয়ে আবার খুঁজতে লাগলেন আমাকে সঙ্গে নিয়ে। তারপর একসময় অন্নকূট উৎসব শেষ হলো। কাশীর পথ ঘাটও সব ফাঁকা হলো। তবুও পাওয়া গেল না বাবা মাকে। এইভাবে কেটে গেল প্রায় দিন সাতেক।

সাধুবাবার কথাগুলো শুনছি হাঁ করে। তিনিও বলে চলেছেন নির্বিকারভাবে। মুখের ভাবটা এখন বেশ প্রসন্ন। এবার সাধুবাবা কম্বলের উপর আধশোয়া হলেন। বাঁহাতটা দিয়ে গালে ঠেস্ দিলেন। তারপর আবার শুরু করলেন তাঁর জীবনকথা,

—সেই সাধুবাবা আমাকে বললেন, তোর বাবা মাকে তো আর পাওয়া গেল না। চল্, তোকে পুলিশে জমা করে দিয়ে আসি। আমি তখন বললাম, না বাবা ওখানে যাবো না। তুমি যেখানে যাবে, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। সাধুবাবা প্রথমে রাজী হলেন না। অনেক বোঝালেন। আমি সাধুবাবাকে ছাড়তে চাইলাম না। তারপর কি যেন অনেক ভেবে তিনি রাজী হলেন। তারপর আমার বাড়ীর পরা জামা কাপড় সব ফেলে দিলেন। নিজের গায়ে জড়ানো কাপড় থেকে ছিঁড়ে একটা টুকরো পরিয়ে দিলেন আমাকে। ব্যস, সেই থেকে শুরু হলো আমার সাধুজীবন। ঘুরতে লাগলাম পথে পথে, তীর্থে তীর্থে। একদিন শুভক্ষণে দীক্ষা দিলেন আমাকে। ধীরে ধীরে ভুলে গেলাম আমার বাবা মা আর ছোট্ট বোনটার কথা। দেখতে দেখতে কেটে গেল এতগুলো বছর। বেটা, বিধাতার যে কি 'খেল্' তা কারও বোঝার উপায় নেই।

এবার দুহাত জোড় করলেন। কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করে বললেন,

—বেটা, ওই গুরুজী সাধুবাবাই সেই থেকে আমার বাবা মা বোন, সবই। দয়া করে আমাকে না আশ্রয় দিলে এমন আনন্দময় জীবনটা আমি পেতাম না। সংসারে গেলে জীবনটাই হয়তো আমার 'বরবাদ্' হয়ে যেতো।

এবার আবেগে উচ্চৈস্বরে বলে উঠলেন,

—জয় গুরুমহারাজ কি জয়।

হঠাৎ এমন করে ওঠায় একটু চমকে উঠলাম আমি। আবেগভরা কণ্ঠে তিনি বললেন,

—বেটা, কত বড় ভাগ্য আমার। না চাইতেই গুরু পেয়েছি। সাধুজীবনে প্রথম অবস্থায় আমার এক একদিন পেট ভরে দুটো খাবারই জুটতো না সারাদিন রাতে। আর এখন বেটা, প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে অমৃত খাচ্ছি, মুখও ধুচ্ছি অমৃত দিয়ে।

হঠাৎ একটা কথা মনে এলো। সাধুবাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, আমার তো মনে হয় সাধুজীবনে এসে এমন কোন কাজ করেননি যাতে আপনার মনে ক্লেশ সৃষ্টি হয়। সেই ছোটবেলা থেকেই রয়েছেন এপথে। অন্যের অনিষ্ট আচরণও করেননি কখনও। তাহলে কেন এলাহাবাদে আপনার পা ভেঙে ছ-মাস বিছানায় পড়েছিলেন ?
একমুহূর্ত দেরী না করেই সাধুবাবা বললেন,
—বেটা, পাপ হোক আর পুণ্যই হোক, সেটা যদি উৎকটরূপে হয়, একেবারে নিশ্চিত জানবি, তার ফলভোগ তোকে এ-জন্মে করতেই হবে। এর কোন ব্যতিক্রম নেই। সে ফলটা দ্রুত ফলপ্রদ হয় এবং সেটা এ-জন্মেই হয়। যেমন ধর, আন্তরিকতা নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র জপ এবং ইষ্টের আরাধনার ফল সদ্যই পাওয়া যায়। উৎকট পাপের ফলও সদ্যভোগ করতে হয়। সংসারে যারা পীড়িত, ভীত কিংবা আর্ত, তাদের প্রতি আঘাত বা অত্যাচারের ফল সদ্য সদ্যই ভোগ করতে হয় মানুষকে। শুধু তাই নয় বেটা, সংসারে কিংবা সংসারের বাইরে থেকেও যারা দীনার্ত ও শরণাগত, সে সাধু কিংবা গৃহী যেই হোক না কেন, কোনভাবে তাদের অপকার কিংবা মনে আঘাত করলে তার পাপ ফলও ভোগ করতে হয় অল্পকালের মধ্যেই।
এই পর্যন্ত বলে থামলেন। আমি ধৈর্য ধরতে না পেরে বললাম,
—বাবা, আমার প্রশ্নের উত্তরটা ঠিক পেলাম না।
উত্তরে সাধুবাবা জানালেন,
—বেটা, এ-জন্মে জ্ঞানত পাপ করেছি একটা। তার ফলভোগ হয়েছে ঠ্যাং ভেঙে। কেমন জানিস্, সে-বার নেপালে পশুপতিনাথ দর্শন করে বেরিয়ে এসেছি রাস্তায়। হাঁটতে হাঁটতে চলেছি গুহ্যেশ্বরী দেবীর মন্দিরের দিকে। হঠাৎ কোথা থেকে এলো একটা কুকুর। চলতে লাগলো আমার সঙ্গে সঙ্গে। মাঝে মাঝেই পায়ের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে শুরু করলো কুকুরটা। অনেকবারই মুখে হেই হেই করলাম। কিছুতেই যায় না। হাতে লাঠি ছিল একটা। শেষে বিরক্ত হয়ে লাঠি দিয়ে পায়ে দিলাম এক ঘা। আঘাতটা এত জোরে হয়েছিল যে, কুকুরের পিছনের পা-টা বোধ হয় ভেঙেই গেছিলো। কারণ মারের পর কুকুরটা চিৎকার করতে করতে চলে গেল হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে। এমন একটা কাজ করার পর মনটা আমার খুব খারাপ হয়ে গেল। অবলা জীবকে আঘাত করলাম। দুঃখে লাঠিটা ফেলে দিলাম। এই ঘটনার দিন সাতেক পর ফিরে এলাম পশুপতিনাথ থেকে। তারপর এলাহাবাদেই তো ভাঙলো আমার ঠ্যাংটা। বেটা, সংসারে যে যা দুঃখ বা সুখভোগ করছে, জানবি তার পিছনে কোন কু-কর্ম বা সুকৃতি একটা আছেই। এ-জন্মে কৃত অতীত কর্মের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলে মানুষ দুঃখ বা সুখ ভোগের সবটা না হলেও অনেক কারণই জানতে পারে। আর কিছু কর্মফল ভোগ হয় পূর্বজন্মের সঞ্চিত পাপ বা পুণ্যের ফলে, এ-জন্মে সেটা আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় না। তবে সাধনজীবনে উচ্চাবস্থাপ্রাপ্ত হলে সঞ্চিত কি কর্মের কি ফল এবং তার স্বরূপ কি তা জানা যায়

অনায়াসে।
এই পর্যন্ত বলেই সাধুবাবা মুখের দিকে তাকালেন। বললেন,
—তোর কথা শেষ হয়েছে? এবার আমি উঠবো। যাবো একটু মন্দিরের দিকে।
এবার উঠতে হবে আমাকেও। বললাম,
—একটা কথা আছে বাবা। আপনি কি তার উত্তর দেবেন?
সাধুবাবা বললেন নির্বিকারভাবে,
—উত্তর যদি সাধ্যের মধ্যে থাকে তাহলে দেবো।
শেষ প্রশ্ন করলাম,
—বাবা, কি করলে মানুষ সংসারে থেকেও লাভ করতে পারবে ভগবানকে—বলতে পারেন?
এ-প্রশ্নে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো সাধুবাবার মুখখানা। আবেগভরা কণ্ঠে বললেন,
—বেটা, বাইরে যে ফকির, একেবারে নিশ্চিত জানবি মন তার বশে নেই। অন্তরে ফকির না হলে তাঁকে লাভ করা যায় না। প্রকৃত নিঃস্ব যে—মন তারই বশে, ভগবানও তার সহায়, সঙ্গী। মনটাকে নিঃস্ব করে ফেললেই লাভ করা যায় তাঁকে। আর এটা করতে হলে সবকিছুর মধ্যে থেকেও ছেড়ে দিতে হবে সব কিছুই, বুঝলি?
সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইলাম,
—আপনি কি তাঁকে লাভ করেছেন?
এ-কথার কোন উত্তরই দিলেন না। উঠে দাঁড়ালেন। মন্দিরের দিকে চোখের ইসারায় দেখিয়ে বললেন,
—তুই কি যাবি ওদিকে?
ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' বলে উঠে দাঁড়ালাম। প্রণাম করলাম সাধুবাবাকে। চলতে শুরু করলেন। আমিও। পাশাপাশি। দুজনে সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলাম কৃষ্ণ-মন্দির চত্বরে। দাঁড়ালেন। আমাকেও দাঁড়াতে হলো। তারপর আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন,
—বেটা, হ্যাঁ বা না—এই কথাটুকুই আমার সঙ্গী হয়ে থাক্—কেমন!
বলে সোজা চলে গেলেন বলরাম মন্দিরের দিকে। কোন কথা সরলো না মুখ থেকে। সাধুবাবার পিছন দিকে চেয়ে রইলাম হাঁ করে।

সাধুবাবার কথা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চললাম মন্দির ছেড়ে দ্বারকা শহরের মধ্যে দিয়ে। কিছুটা যেতেই পড়লো একটা সাধারণ মন্দির। কোন আড়ম্বর নেই। কেউ বলে না দিলে বোঝার উপায় নেই মন্দিরটি মহামায়ার মন্দির। কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলাম মন্দির চত্বরে। মন্দিরমধ্যে বেদীতে রয়েছে কালো পাথরের শুধু মুখমণ্ডল। মাঝারী আকারের। রুক্মিণী মন্দির থেকে খুব বেশী দূরে নয়, মাইলখানেক হবে।

মহামায়া প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেন, এটি একান্ন শক্তিপীঠের একটি। সতীর ডান পায়ের গোড়ালি পড়েছিল এখানে। কেউ বলেন, দ্বারকায় এ-মন্দির ভদ্রকালীর। তবে একান্ন পীঠের তালিকায় দ্বারকার কথা উল্লিখিত হয়নি। শ্রীশ্রীচণ্ডীর আদ্যাস্তোত্রে এর উল্লেখ আছে, 'দ্বারকায়াং মহামায়া মথুরায়াং মহেশ্বরী।'

ভদ্রকালী বা মহামায়ার দর্শন করে হাঁটতে হাঁটতে এলাম রামানুচার্য তোতাদ্রি মঠে। এর আগে যখন দ্বারকায় এসেছিলাম তখন ছিলাম এই মঠে। দ্বারকাধীশ মন্দির থেকে এই মঠ বেশ কিছুটা দূরে। যাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা আছে। বাঙালী তীর্থযাত্রীদের অধিকাংশই এসে ওঠেন এখানে। এই মঠে স্থাপিত আছে লক্ষ্মী-নারায়ণ, মহালক্ষ্মী, রাজগোপাল আর রামানুচার্যের বিগ্রহ।

তোতাদ্রি মঠ থেকে এলাম সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে। মহামায়ার মন্দির থেকে মাত্র মাইলখানেক পথ। পথের দুধারেই খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বিশাল একটা বটগাছ। তারই বাঁপাশে মন্দির। বাড়ীর শিশুরা যেমন ঘরের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে তেমনই এখানে একা গাছটাই বাড়িয়ে দিয়েছে সৌন্দর্য, রমণীয় করে তুলেছে পরিবেশও।

উঠে এসে দাঁড়ালাম মন্দিরচত্বরে। শ্বেত পাথরের নাটমন্দির। তার মাঝখানেই বসানো কালো পাথরের বৃষমূর্তি। নাটমন্দিরের পরেই শ্বেত পাথরে বাঁধানো গর্ভমন্দির। ভিতরে স্থাপিত রয়েছে সিদ্ধেশ্বর মহাদেব—শিবলিঙ্গ। পাশেই ফণাধর পিতলের সাপ। একটি কলসী ঝুলছে শিবলিঙ্গের উপর। টপ্‌টপ্‌ করে জল ঝরছে সিদ্ধেশ্বরের মাথায়।

প্রবাদ আছে, সনক ঋষি মোক্ষলাভের জন্যে মোক্ষভূমি দ্বারকার অন্তর্গত এই ক্ষেত্রটিতে একদা তপস্যা করে হয়েছিলেন সিদ্ধকাম।

সিদ্ধেশ্বর মহাদেব মন্দির থেকে সামান্য হেঁটে এলাম সমুদ্র তীরে গান্ধী ঘাটে। গোলাকার এই বাঁধানো ঘাটে একদা বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল মহাত্মা গান্ধীর চিতাভস্ম।

এখান থেকে একে একে গোবর্ধন মন্দির, মীরাবাঈ মন্দির, সিদ্ধ মহাত্মা নরসিং মেহতার স্মৃতিমন্দির এবং দামোদরজীর মন্দির দেখে আবার ফিরে এলাম দ্বারকাধীশ মন্দিরে।

তীর্থযাত্রী এবং পর্যটকদের থাকার জায়গার অভাব নেই এই দ্বারকায়। অসংখ্য হোটেল যেমন আছে, তেমনই ছড়াছড়ি আশ্রম ধর্মশালার। যাত্রীরা এখানে এসে ওঠেন তাদের আর্থিক সামর্থ্য অনুসারে। কেউ কোন ঠিকানা না নিয়ে এলেও থাকার কোন অসুবিধে হবে না শ্রীকৃষ্ণের এই রাজত্বে। তবে খাওয়াটা ঠিক মনের মতো হবে না হোটেলে খেলে, এ-আমি দেখেছি আগের অভিজ্ঞতায়।

শহর দ্বারকায় যাত্রী পরিবহনের বাস নেই, যেমন থাকে আর সব শহরে। টাঙ্গা আর রিক্সাই একমাত্র ভরসা। তবে দর্শনীয় স্থানগুলি সব শহরকেন্দ্রিক। তাই পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘুরে দেখে নেয়া যায় অনায়াসে। সময় কাটে, পয়সাও বাঁচে।

অতি প্রাচীন তীর্থ এই দ্বারকা। সাতটি মোক্ষভূমির মধ্যে একটি। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় আসার অনেক আগের থেকেই দ্বারকা ছিল দ্বারকাতেই। এটি বিষ্ণুর অবতার ত্রিবিক্রমের দেশ। মোক্ষতীর্থ হিসাবে গড়ে তোলার জন্যেই শেষনাগের সঙ্গে পাতাল থেকে উঠে এসেছিলেন বিষ্ণু। তারপর বসবাস করেন এখানে। সনক সনন্দ এবং অন্যান্য ঋষিদের বন্ধনমুক্ত হওয়ার জন্যেই দ্বারকা সাধনার স্থল, মোক্ষভূমি হিসাবে প্রসিদ্ধ। প্রবাদ আছে, দ্বারকার গোমতীতে স্নান করলেও মানুষ পার্থিব বন্ধন মুক্ত হয়।

মথুরা, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র এবং দ্বারকা—এই চারটি ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের লীলা ভিন্ন ভিন্ন রসমাধুর্যের। তার মধ্যে দ্বারকালীলাও বৈচিত্র্যময়। শ্রীমদ্ভাগবত মতে এখানে তিনি "ষোল হাজার একশো আট পত্নী প্রেয়সীর গৃহে এক এক কক্ষে বিরাজ করেছেন।"

একবার নারদ এসে উপস্থিত হলেন দ্বারকায়। উদ্দেশ্য, মানুষ একটা বউ নিয়ে ঘর করে হিমসিম খাচ্ছে, চিৎ হয়ে পড়ছে। নিত্য অশান্তি ভোগ করে থৈ পাচ্ছে না। আর বহুবল্লভ প্রভু আমার এতগুলো বউ নিয়ে ঘর করছে কিভাবে?

দেবর্ষি নারদ এসে প্রতিটি রাণীর মহলে এক একবার উঁকি দিয়ে দেখলেন, সব মহলেই কৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত, ব্যস্ত রয়েছেন কোন না কোন কাজে।

দ্বারকা ছেড়ে যাওয়ার সময় কৃষ্ণকে নারদ বললেন, প্রভু, তোমার যোগমায়ার বিচিত্র প্রভাব দেখে গেলাম নিজের চোখে। তোমার নামগানই করে বেড়াবো সারা ত্রিভুবনে। একটু হালকা হাসি হেসে কৃষ্ণ বললেন, লোকশিক্ষার জন্যে এরকমই আমি করে থাকি।

শ্রীমদ্ভাগবতের কথা। বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণী। যথা সময়ে রাজা বিবাহ স্থির করলেন চেদিরাজ শিশুপালের সঙ্গে। কিন্তু ইতিমধ্যেই রুক্মিণী শুনেছেন শ্রীকৃষ্ণের রূপ গুণ আর তাঁর মহাশক্তির কথা। মনে মনে স্থির করলেন, বিবাহ যদি করতেই হয় তাহলে করবেন কৃষ্ণকেই। মনের দিক থেকে তিনি এখানেই ইতি টানলেন না। চিঠি দিয়ে কৃষ্ণকে জানালেন অন্তরের কথা।

শেষে শ্রীকৃষ্ণ নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকে রুক্মিণীকে অপহরণ করে আনলেন দ্বারকায়। বিবাহ করলেন দ্বারকাতেই।

বিভিন্ন তীর্থ প্রসঙ্গে একসময় নারদ বলেছিলেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে, "যুধিষ্ঠির! তাহার পর দ্বারকাতীর্থে গমন করিবে। নিরামিষ একাহারাদি নিয়মযুক্ত হইয়া তত্রত্য পিণ্ডারক তীর্থে স্নান করিয়া মানুষ বহু সুবর্ণদানের ফললাভ করিবে॥"
(মহাভারত, বনপর্ব, সপ্তষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ পৃষ্ঠা-৭০৪)

একদা মথুরা থেকে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় আসা এবং দ্বারকা নগরী ও দুর্গ নির্মাণের পিছনে রয়েছে একটি কাহিনী ও কারণ। দ্বাপরযুগের শেষ ভাগের কথা। মথুরার দুর্জয় রাজা কংসকে বিনাশ করলেন কৃষ্ণ। তারপর তাঁরই শূন্য সিংহাসনে অভিষেক করলেন কংসের পিতা যাদবগণের রাজা উগ্রসেনকে। এতে দুঃখিত হলেন কংসের স্ত্রী অস্তি ও প্রাপ্তি। ক্রোধও হলো। তখন তাঁরা শরণাপন্ন হলেন পিতা মগধরাজ

জরাসন্ধের। কংসের মৃত্যু এবং উগ্রসেনের রাজ্যলাভের কথা শুনলেন কন্যাদের মুখে। ক্রোধে ফেটে পড়লেন তিনি। তখন যাদবদের সমূলে ধ্বংস করার জন্যে অন্যান্য রাজা আর আত্মীয়দের সাহায্য নিয়ে জরাসন্ধ আক্রমণ করলেন মথুরা। কিন্তু পরাজিত হলেন মহাবল কৃষ্ণের কাছে।

একজন প্রসিদ্ধ মহাবীর ছিলেন মগধরাজ জরাসন্ধ। এইভাবে প্রতিবারই তেইশ অক্ষৌহিনী সেনা সংগ্রহ করে মোট সতেরো বার যুদ্ধ করলেন যদুদের সঙ্গে। কিন্তু প্রত্যেকবারই শ্রীকৃষ্ণের তেজে সহজেই যদুরা জয়ী হলেন জরাসন্ধের সৈন্যদের সংহার করে।

( এক অক্ষৌহিনী হলো, রথ—২১,৮৭০, গজ—২১,৮৭০, পদাতিক—১,০৯,৩৫০, অশ্ব—৬৫,৬১০, মোট—২,১৮,৭০০। প্রতি রথে দুজন এবং প্রতি গজে দুজন ধরলে আরও ৪৩,৭৪০ জন। )

তারপর যখন আঠারো বার যুদ্ধ হবার উপক্রম হলো, তখন নারদের পাঠানো কালযবন নামে এক বীর এসে উপস্থিত হলো যুদ্ধ ক্ষেত্রে। পৃথিবীতে শুধুমাত্র বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণই তার সমকক্ষ—এ-কথা শুনে কালযবন মথুরা অবরোধ করলো তিন কোটি ম্লেচ্ছ সৈন্য নিয়ে।

"শ্রীকৃষ্ণ তাকে দেখে সংকর্ষণের সঙ্গে একত্র চিন্তা করে বললেন, দু'দিক থেকে যদুদের মহাদুঃখ উপস্থিত হল। মহাবল এই যবন আমাদের আক্রমণ করল আর আজ, কাল বা পরশু মগধরাজও আসবে। আমরা দু'জনই এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকলে মহাবলী জরাসন্ধ এসে নিশ্চয়ই আমাদের বন্ধুদের সংহার করবে বা বন্দী করে তার নগরীতে নিয়ে যাবে। এ রকম অবস্থায় এমন একটি দুর্গ তৈরী করা প্রয়োজন, যেখানে মানুষের গতিবিধি সম্ভব না হতে পারে। সেই দুর্গে জ্ঞাতিদের রেখে এসে আমরা কালযবনকে নিধন করব।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলরামের সঙ্গে এই মন্ত্রণা করে সমুদ্রের মধ্যে এক অদ্ভুত দুর্গ তৈরী করালেন এবং সেই দুর্গের বার যোজন বিস্তীর্ণ এক আশ্চর্য নগর নির্মাণ করালেন যাতে স্বয়ং বিশ্বকর্মার বিজ্ঞান ও শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পেতে লাগল। রাজপথ, প্রাঙ্গণ, উপপথ ও বাস্তুগৃহ নির্মাণের নির্দিষ্ট স্থান সুশৃঙ্খল ও অপূর্ব বলে মনে হতে লাগল। সেখানের উদ্যান ও উপবনগুলি স্বর্গীয় তরু ও লতায় শোভিত ছিল। স্বর্ণময় চূড়াবিশিষ্ট অতি উচ্চ স্ফটিক নির্মিত অট্টালিকাসমূহ পুরদ্বার নির্মিত হয়েছিল। রুপো ও পিতলের কলসের শোভিত রন্ধনশালা, অশ্বশালা প্রস্তুত হল। পদ্মরাগ প্রভৃতি বিচিত্র মণিতে খচিত চূড়াযুক্ত বাসগৃহ, মহা-মরকত প্রভৃতির গৃহতল নির্মিত হল। নগরের প্রত্যেক বাসভবন, দেবমন্দির ও চন্দ্রশালিকায় সুশোভিত হল। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চার বর্ণের লোকদের বাসভবন সব জায়গায় আলাদা আলাদা তৈরী হল। এ সবের মাঝখানে যদুপতি উগ্রসেন, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও বাসুদেবের জন্য আবার আলাদা করে এক একটি রাজপ্রাসাদ তৈরী হল। দেবরাজ ইন্দ্রও শ্রীকৃষ্ণের কাছে সুধর্মা সভা ( দেবসভা ) ও পারিজাত বৃক্ষ

পাঠালেন। ঐ সভায় থাকলে মর মানুষেরও ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধ থাকে না। বরুণদেব শ্রীকৃষ্ণকে মনের মত বেগশালী কতকগুলি সাদা রঙের ঘোড়া পাঠালেন, তাদের একটি করে কান শ্যামবর্ণ। নিধিপতি কুবের ভগবানকে অষ্টনিধি ( পদ্ম, মহাপদ্ম, মৎস্য, কুর্ম, উদক, নীল, মুকুন্দ ) দিলেন। আর অন্যান্য লোকপালরা নিজ নিজ বিভূতি পাঠিয়ে দিলেন। ভগবান শ্রীহরি নিজ নিজ অধিকার সিদ্ধির জন্য যে সিদ্ধদের যে যে আধিপত্য দিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই শ্রীহরিকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ দেখে তাঁকে নিজ নিজ বিভূতি প্রত্যার্পণ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের অচিন্ত্য শক্তি যোগমায়ার প্রভাবে সকলের অজ্ঞাতসারে স্বজনদের মথুরা থেকে সেই দুর্গে নিয়ে গেলেন।"...( শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্দ, পঞ্চাশতম অধ্যায়, পৃষ্ঠা-৬২২ )

আজকের দ্বারকা গুজরাটের জামনগর জেলার পশ্চিমপ্রান্তে সমুদ্র তীরে। বিশ্বকর্মা নির্মিত প্রাচীন দ্বারকা আজ আর নেই। জরার বাণে বিদ্ধ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার অবলুপ্তি প্রসঙ্গে সারথি দারুকে বলেছিলেন,

"সারথি, তুমি আপাতত দ্বারকায় ফিরে গিয়ে পরস্পর বিবাদে জ্ঞাতিধ্বংস, বলরামের স্বধামে গমন আর আমার এই অবস্থার কথা সেখানকার বন্ধুদের জানাও। তুমি তাঁদের বলবে যে তাঁরা যেন পরিবারবর্গ নিয়ে সেখানে আর না থাকেন। কারণ আমি দ্বারকা ছেড়ে চলে এসেছি বলে সমুদ্র অল্পকালের মধ্যেই তাকে প্লাবিত করে ফেলবে।"
( শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্কন্দ, ৩১শ অধ্যায়, পৃষ্ঠা-৮১৬, শ্লোক সংখ্যা ৪৪-৪৯ )

মহাভারতীয় যুগ এবং দ্বারকা নগরীর অস্তিত্ব আজ প্রমাণিত সত্য। যারা এতদিন মহাভারত, শ্রীকৃষ্ণ এবং দ্বারকার অস্তিত্বকে উড়িয়ে দিয়েছেন, তাদেরই মুখে ছাই দিয়ে দ্বারকা প্রসঙ্গে সর্বশেষ সংবাদ এইভাবে প্রকাশিত হয় ৭ই আগষ্ট, ১৯৯২, আনন্দবাজার পত্রিকায়, "দ্বারকায় সমুদ্রের নীচে খ্রীষ্ট পূর্বের বন্দর শহর—"

"নয়াদিল্লী, ৬ই আগষ্ট—দ্বারকার কাছে সমুদ্রের নীচ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছরের পুরোন নঙ্গর করার কাছি ও পাথর পাওয়া গিয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরের প্রতিমন্ত্রী পি আর কুমারমঙ্গলম আজ রাজ্যসভায় এই কথা জানান। সমুদ্রের সাড়ে বারো মিটার তলদেশ থেকে বেশ কিছু মুদ্রাঙ্কিত জালা, মাটির পাত্র, লোহা, ব্রোঞ্জ ও তামার তৈরী জিনিষও উদ্ধার করা হয়েছে। এ-ছাড়া একটা জাহাজঘাটা, খুঁটি ও দুর্গের ধ্বংসাবশেষ থেকে ওই অঞ্চলে যে একটা বন্দর শহর ছিল তার প্রমাণ মেলে।

ধাতু যুগের এই শহরটি ছিল লম্বায় ৪ কিলোমিটার। কুমারমঙ্গলম জানান, অনুমান অনুসারে, পুরাণবর্ণিত দ্বারকা ছিল এই রকমই এক দুর্গবেষ্টিত বন্দর শহর। পরে ওই শহর সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়। প্রাপ্ত জিনিষগুলি থেকে শহরটি ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বের বলে জানা গিয়েছে।"—পি. টি. আই।

মহাভারতে উল্লিখিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালীন আকাশের গ্রহাবস্থান হিসাব করলে সহজেই বোঝা যায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছে আনুমানিক ৪৪৩৮ বছর আগে। উক্ত সংবাদে সমুদ্রগর্ভ থেকে পাওয়া প্রাচীন দ্রব্যগুলি প্রায় ৩৫০০ বছর আগেকার।

সুতরাং এ-থেকে আমরা ধরে নিতে পারি, মহাভারতীয় যুগ-সভ্যতা তারও হাজার বছর আগে ছিল, যখন ছিল দ্বারকা এবং যার অস্তিত্বের কথা আজও ঘোষণা করছে সগর্বে। কারণ যে কোন সভ্যতা তো এক হাজার বছর থাকতেই পারে। এবং পরে সেই সভ্যতা লুপ্ত হয়ে নতুন সভ্যতার উন্মেষ ঘটতেই পারে। এ-থেকে অতীত কৃষ্ণ, দ্বারকা আর মহাভারতীয় যুগ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না, নেইও।

যাইহোক, শ্রীকৃষ্ণের 'বারো যোজন বিস্তীর্ণ আশ্চর্য নগর' চলে গেছে সমুদ্রগর্ভে। শ্রীকৃষ্ণ-রুক্মিণীর ছেলে প্রদ্যুম্ন। অনিরুদ্ধ হলো প্রদ্যুম্নর ছেলে। অনিরুদ্ধর ছেলে ব্রজনাথ। কথিত আছে, প্রাচীনকালে বৃন্দাবনের কয়েকটি মন্দির স্থাপন করেন ব্রজনাথ। পরে দ্বারকায় তিনি এই কৃষ্ণমন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। কালের নিয়মে সে মন্দির লুপ্ত হয়। ঐতিহাসিকদের একাংশের মত, বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করেন জনৈক গুপ্তরাজা। পরে দ্বারকাধীশ মন্দিরটি প্রায় ১২৩৬ বছর আগে উদ্ধার ও সংস্কার করেন আচার্য শংকর। একইসঙ্গে ব্যবস্থাদি করেন নিত্য সেবাকার্যের, যা আজও চলেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে।

অনেকের ধারণা, মথুরা থেকে কৃষ্ণ প্রথমে গির্ণারে (রৈবতক পার্বত্য অঞ্চল) আসেন এবং বসবাস করেন। তারপর রাজা রিভাত ব্রহ্মার নির্দেশে কন্যা রেবতীর সঙ্গে বিবাহ দেন বলরামের। তখন রেবত রাজার পত্তন করা একশো যোজন বিস্তৃত কুশস্থলী দ্বারকা আসে বলরামের হাতে। (উপদ্রবশূন্য কুশস্থলীর সন্ধান দেন গরুড়। তাঁরই পরামর্শে শ্রীকৃষ্ণ দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে দিয়ে নির্মাণ করান দুর্ভেদ্য, অসংখ্য দ্বারযুক্ত দ্বারকা নগরী।) ক্রমশ যদু বংশের অন্যান্যরা আসতে থাকেন কুশস্থলী-দ্বারকায়। একসময় সকলের আশ্রয়দানে অসমর্থ হলে পোরবন্দরের (প্রাচীন সুদামাপুরী) সমুদ্রোপকূলে যদুবংশীয় লোকেদের থাকার ব্যবস্থা করে দেন শ্রীকৃষ্ণ। ত্রিশ যোজন বিস্তৃত এই জায়গাটিতে তিনি থাকতেন বলে এই জায়গাটিকে মূল-দ্বারকা নামে অভিহিত করা হয়।

এরপর জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেলে বলরামের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ পরামর্শ করে বিশ্বকর্মার সহায়তায় সমুদ্রের মধ্যে একটি দ্বীপে গড়ে তোলেন দ্বারকা নগরী। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা থেকে আসেন কুশস্থলী-দ্বারকায়, তারপর মূল-দ্বারকায় এবং তারও পরে যান গোমতী-দ্বারকায়। বিস্তীর্ণ কুশস্থলীর অন্তর্গত এক একটি ক্ষেত্রের নাম হয়েছে বিভিন্ন, শ্রীকৃষ্ণের স্থান পরিবর্তনের কারণে। শেষ জীবন কাটে গোমতী-দ্বারকার অন্তর্গত কোন একটি ক্ষেত্রে, যে নগর সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে কয়েক হাজার বছর আগে।

অনেকে এ-মত পোষণ করেন, শ্রীকৃষ্ণের বসবাস ক্ষেত্রেই দ্বারকাধীশ মন্দির করেছেন ব্রজনাথ। এ-মত যুক্তিগ্রাহ্য নয় এই কারণে, শ্রীকৃষ্ণের কথায় দ্বারকা সমুদ্রগর্ভেই তলিয়ে গেছে। এ-কথা মানতে অসুবিধা নেই যে, শংকরাচার্যের সংস্কার করা মন্দিরক্ষেত্রে তিনি কোন এক সময় কৃষ্ণমন্দির নির্মাণ করেছিলেন কৃষ্ণের স্মৃতি রক্ষার্থে। সে মন্দির ধ্বংস হয়ে গিয়ে থাকলে তাঁরই চিহ্নিত স্থানে ক্রমান্বয়ে মন্দির হয়ে আসছে, এটা স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যায়।

ভারতের পুরাতাত্ত্বিক গবেষণায় বহু প্রশংসিত দ্বারকার উপস্থিতি সম্বন্ধে পাওয়া গেছে অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ তথ্য। পুরাতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে এখানে পাওয়া গেছে প্রথম, চতুর্থ ও অষ্টম শতকের মন্দিরের ভাঙা অনেক অংশ। তাতে আছে যুদ্ধরত হাতি, নৃত্যশিল্পী, গায়ক, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, বরাহ প্রভৃতির মূর্তি, যেগুলি মন্দির নির্মাণকারী শিল্পীদের শিল্পকলার উৎকর্ষতার সাক্ষী। চালুক্য-রাষ্ট্রকূট শিল্পের প্রভাবও পাওয়া গেছে এর মধ্যে।

মহাভারত, ভাগবত ছাড়াও প্রাচীন দ্বারকার কথা উল্লিখিত হয়েছে বায়ু পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, বরাহ পুরাণ, হরিবংশ, কালিকা পুরাণ এবং যোগিনী তন্ত্রে।

হরিবংশ অনুসারে দ্বারকা নগরী ছিল উদ্যানশোভিত এবং প্রাকারবেষ্টিত প্রাসাদ। ১৯৮৩ ও ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে জানা গেছে, ভেট দ্বারকার কাছের কোন অঞ্চলে ছিল শ্রীকৃষ্ণের প্রাচীন দ্বারকা নগরী যা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত। এখানে বড় বড় পাথর খণ্ডের দ্বারা নির্মিত প্রাকারবেষ্টিত যথাক্রমে খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ এবং খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০ অব্দের দুটি বন্দর নগরী আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে পাওয়া সিন্ধু-বাহরিণ গোত্রের শীলমোহর থেকে জানা গেছে, প্রাচীন দ্বারকার সঙ্গে পারস্য উপসাগরীয় বন্দর সমূহে বাণিজ্যিক আদান প্রদান ছিল।

আবার বর্তমান দ্বারকাধীশ মন্দিরের একটু দূরেই প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে দুই পর্যায়ে নির্মিত মন্দিরের নিদর্শন।

মোটের উপর আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে পৌরাণিক দ্বারকার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই তাদের—যাদের পুরাণে বিশ্বাস নেই।

## ভ্রমণের শেষপর্ব ও মুল দ্বারকা

আমাদের ভ্রমণপর্বের শেষ দর্শনীয় স্থানটি ছিল দ্বারকা। দেখা হলো। এবার এই দ্বারকা থেকেই বাড়ীর পথে যাত্রা শুরু। দুপুরের খাওয়া সেরে আবার সকলে উঠলাম বাসে। বেলা ঠিক একটা। রওনা দিলাম দ্বারকা থেকে। পোরবন্দর থেকে দ্বারকা—সেই একই পথ ধরে বাস চললো সীমিত গতিতে।

কখনও একটু কথা আবার কখনও চুপচাপ, এইভাবেই চলেছি সকলে। এক নাগাড়ে কথা হয় না বিশেষ করে বাসপথে। বাস চলার একটা আওয়াজ আছে তাই কথা বলতে হলে চেঁচিয়েই বলতে হয়। ফলে কিছুক্ষণ কথা বললে আপনা থেকেই বিরক্তি আর ক্লান্তি আসে। কথা থেমে যায় আপনা থেকেই। অতি বাচালও পারে না এই নিয়মের বাইরে যেতে যদি দূরপাল্লার বাস ভ্রমণ হয়। তাকেও থামতে হবে।

আমাদের বাসও থামলো একটা পাহাড়ের পাশে সমতলে। এখানে রয়েছে হর্ষদমাতার মন্দির। দ্বারকা থেকে এই পর্যন্ত এলাম ৪০ কি.মি.। পোরবন্দর থেকে এলে এই মন্দির পড়তো ৬০ কি.মি. এর মাথায়। কচ্ছের উপকূলে কইলা পাহাড়েই এই মন্দির। গ্রামের নাম মিয়ানী।

সকলেই নেমে এলাম বাস থেকে। সামান্য কিছুটা উঠে এলাম পাহাড় বেয়ে। মাঝারী

আকারের মন্দির। অস্পষ্ট পাথরের দেবীকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে মন্দিরে। এখানে দেবীর উদ্দেশ্যে অনেকেই নিবেদন করলেন নারকোল। স্থান আর অনাড়ম্বর মন্দির দুই-ই প্রাচীন। তবে মন্দির সংস্কার হয়েছে বহুবার, তাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। হর্ষদমাতা সম্পর্কে একটি বহুকালের প্রবাদ প্রচলিত আছে স্থানীয় মানুষের মধ্যে। মন্দিরের পূজারীও সে কথা জানিয়ে বললেন,

মহাভারতীয় যুগের কথা। শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের নাতিদের বধ করলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন জরাসন্ধ। ভাবলেন, যেকোন ভাবে সমূলে ধ্বংস করবেন যদুকুলকে। সেইমতো ব্যবস্থাও করলেন জরাসন্ধ। তখন অসুরদের হাত থেকে সকলকে রক্ষা করার জন্যে শ্রীকৃষ্ণ আরাধনা করলেন শক্তির। প্রীত হলেন দেবী। দেবী শক্তির সহায়তায় শ্রীকৃষ্ণ বধ করলেন অসুরদের। পূজারীর মতে, শ্রীকৃষ্ণ এখানে সমস্ত নিয়ম যথাযথভাবে পালন করে দেবী হর্ষদমাতার মূর্তি এবং মন্দির স্থাপন করলেন। তারপর আদি বা মূল দ্বারকা (পোরবন্দরের কাছে) থেকে চলে যান গোমতী-দ্বারকায়। আরও বললেন, এত জাগ্রত দেবী এই হর্ষদমাতা, যা বলা যায় তাই-ই শোনেন।

জামনগর থেকে দ্বারকা রেলপথে ভাতিয়া স্টেশনে নেমে আসা যায় এখানে। পোরবন্দর থেকেও সরাসরি আসে সরকারী বাস এই হর্ষদমাতার মন্দিরে। ছোট্ট জায়গা। দোকান-পাটও আছে তবে অল্প কয়েকটা। এদের চলে তীর্থযাত্রীদের উপর নির্ভর করে। এখানে সময় লাগলো মাত্র মিনিট কুড়ি। এখান থেকে আবার শুরু হলো চলা। দুপাশে ফাঁকা আবার কখনও লোকবসতি, এর মধ্যে দিয়েই রাস্তা। বাস টানা চললো ২০ কি.মি.। এসে থামলো একটা মাঝারী আকারের প্রাচীন মন্দিরের সামনে।

বাস থেকে নেমে এলাম সকলেই। কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলাম মন্দির চত্বরে। বাঁদিকে ছোট্ট একটা মন্দির। তাতে প্রতিষ্ঠা করা আছে কালো পাথরের শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ। ডানদিকেও রয়েছে একটি সাদামাটা মন্দির। এতে স্থাপিত আছে শিবলিঙ্গ। মন্দির চত্বরেই মহালক্ষ্মীর মন্দিরটি বড় সুন্দর।

এখানে আর দর্শনীয় কিছু নেই। পরিবেশটা নিরিবিলি। সময়ও লাগে না বেশী। মিনিট দশেকের মধ্যেই সব দেখা হলো। এটাই মূল বা আদি দ্বারকা। কথিত আছে, মথুরা থেকে শ্রীকৃষ্ণ এসে প্রথম বসবাস করেন এখানে। পরে তিনি চলে যান গোমতী দ্বারকায়। প্রবাদ আছে, মূল দ্বারকা দর্শন না করলে কোন ফল হয় না দ্বারকা দর্শনের।

আবার শুরু হলো চলা। ভ্রমণে চলা আর দেখাই তো ভ্রমণপিয়াসীদের কাজ। তবে এ-দেখার মধ্যে লুকিয়ে আছে নানা বৈচিত্র্য। বিষয় এক, তবে ভাবনা আর দেখার দৃষ্টিকোণটা আলাদা। এক একজনের দেখা এক এক রকম। প্রকৃত ভক্তের কাছে দ্বারকায় কৃষ্ণের বিগ্রহ জীবন্ত—ভগবান। ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে অথচ ঈশ্বরপ্রেমিক নয়, তারা দেখছে পাথরের মূর্তি আর মন্দির। প্রকৃতিপ্রেমিক দেখছে দ্বারকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। কেউ খুঁজছে এর প্রাচীন ইতিহাস। শিল্পী দেখছে বৈচিত্র্যময় শিল্পকর্ম। আবার একটা বিষয়কে ভেবে এসে কেউ ঢুকছে কাপড়ের দোকানে, কেউ কিনছে

পিতলের ঘটি, ধূপদানি। ওগুলো তো আর পাওয়া যায় না কোথাও, তাই!
দেখতে দেখতে এসে গেলাম পোরবন্দর স্টেশনে। দ্বারকা থেকে বেরিয়েছিলাম বেলা একটায়। পথে দু-জায়গায় হর্ষদমাতার মন্দির আর মূল দ্বারকা দেখে এখানে এলাম বেলা সাড়ে তিনটেয়। মূল বা আদি দ্বারকা থেকে এলাম ২০ কি. মি.। এবার প্যাটফরমে বসে শুরু হলো টানা বিশ্রাম।
ট্রেন ছাড়লো রাত ৮-টায়। বার্থ সংরক্ষণ করাই ছিল সৌরাষ্ট্র এক্সপ্রেসে। যাবে আমেদাবাদ হয়ে বোম্বাই। আমরা যাবো আমেদাবাদ হয়ে কলকাতা। ট্রেনের গতি বাড়লো ধীরে ধীরে—রাতও। রাতটা কেটে গেল যেন কেমন করে!
সকাল ৬/১৫ মিঃ। ট্রেন এসে থামলো আমেদাবাদ স্টেশনে। আমাদেরটা নিয়ে আর একটা কোচ রেখে সৌরাষ্ট্র এক্সপ্রেস চলে গেল বোম্বাই! এ-দুটো পোরবন্দর-হাওড়া কোচ। যথা সময়ে জুড়ে দেয়া হলো আমেদাবাদ এক্সপ্রেসে। ঠিক সকাল ৯/১৫ মিঃ। আমেদাবাদ এক্সপ্রেস ছাড়লো আমেদাবাদ থেকে।
ভ্রমণপথে আমাদের যাত্রা শুরু থেকে সস্ত্রীক আধাবয়েসী আর বৃদ্ধরা কেউই ট্রেন বাস আর ট্যাক্সী অটোতে বউকে ছেড়ে বসেননি, এমনকি খাননি পর্যন্ত। এ-কথা আগেও বলেছি। আজ ফেরার পথে দেখলাম এর ব্যতিক্রম। জাতবাবু বউকে ছেড়ে বসেছেন আমার ডানপাশে। বাঙালদিদি বাঁপাশে। সামনে আর পাশের সিটে যারা—তারা সকলেই আমার সহযাত্রিনী সধবাবিধবা। আমার সামনে বসা রোগাপাতলা সধবা দিদিকে জিজ্ঞাসা করলাম,
—আজ রাতটুকুই আছি আমরা একসঙ্গে। কাল থেকে আর কারও সঙ্গে দেখা হবে না কারও। কালের স্রোতে হারিয়ে যাবো সকলে। দেখা হলেও হতে পারে, সেটাও কালের হাতে। আমাদের চলমান এই সংসার ভেঙে যাবে কাল সকালে। তা দিদির তো দ্বারকা দর্শন হলো, কেমন লাগলো?
হাসি হাসি মুখ করে দিদি বললেন,
—আমার ভাই ভালোই লেগেছে। বহুদিনের আশা পূর্ণ করলেন ভগবান। তবে ঠাকুরকে বার বার করে বলে এসেছি আবার আসবো, যদি আমার ছেলেটার একটা সরকারী চাকরী হয়।
এবার পাশে বসা বাঙালদিদিকে জিজ্ঞাসা করলাম ওই একই প্রশ্ন,
—দ্বারকা আপনার কেমন লাগলো দিদি?
বেশ হাসিমাখা মুখেই বললেন,
—আমারও বেশ ভালো লেগেছে। কি সুন্দর মূর্তি! কি রূপ! অনেক দিনের আশা পূর্ণ হলো। পরিবেশটাও বেশ সুন্দর। পাণ্ডাদের জোরজুলুম নেই। শান্তিতে দর্শন করা যায়। পুজো দেয়া যায়। কালীঘাটের কথা ভাবলে, বাব্-বা—মনে হয় যেন আর ও-মুখোই হবো না। তবে এখান থেকে বাড়ী গিয়ে আবার ছুটতে হবে উকিলের বাড়ী। সম্পত্তি নিয়ে একটা মামলা চলছে। কি যে হবে তা একমাত্র কৃষ্ণই জানে!

ডানপাশে বসা জাতবাবুর মুখের দিকে তাকালাম একবার। জানতে চাইলাম,
—দাদা, দ্বারকা দর্শনের উদ্দেশ্যেই তো আপনার আসা। আসাও হলো। কেমন লাগলো দ্বারকা ?
বাঁধানো দাঁতে মুখ সিট্‌কে বললেন,
—দূর্‌ দূর্‌, একগাদা টাকা খরচা করে মানুষ এইসব দেখতে আসে ? টাকাগুলোই আমার জলে গেল। গোমতীর ছিরিটা দেখেছেন ? ওর চাইতে আমাদের বাড়ীর পাশের খালেও অনেক বেশী জল। নোংরা হাঁটু জলে চান করলে পুণ্যি হয় না কচু হয়! আর কি আছে ওই মন্দিরে ? অমন কেষ্টঠাকুর তো আমাদের পাড়ার গোপীনাথ মন্দিরে পড়ে আছে চিৎ হয়ে। এইসব দেখতে মানুষ এত দূরে আসে পয়সা খরচা করে!
কথা-কটা বলে বিরক্তিভরা মুখে তাকালেন বাইরের দিকে। আমি আর কোন কথা বাড়ালাম না। ট্রেন চলছে হু-হু করে। এইসময় ছোট্ট একটা প্রচলিত গল্প মনে পড়ে গেল। মুখে কাউকে কিছু না বলে ভাবতে লাগলাম,
কোন এক আশ্রমে থাকতেন এক সাধুবাবা। প্রতিদিন তাঁর কাছে যারা এসে যে বর প্রার্থনা করতো, তাকে সাধুবাবা সেই বরই দিতেন। এবং তার তাই-ই হতো। ওই আশ্রমেই থাকতো একটা কুকুর। একদিন পথে সেই রাজ্যের রাজকন্যাকে দেখে ইচ্ছে হলো বিয়ে করার। দেরী না করেই সাধুবাবার কাছে কুকুর গিয়ে বললো,
—বাবা, যে যা চাইছে তাকে আপনি সেই বরই দিচ্ছেন। আমার একান্ত ইচ্ছা রাজকন্যাকে বিয়ে করি। আপনি আমাকে এমন একটা বর দিন যাতে আমি খুব সুন্দর রাজপুত্র হই।
কথাটা শুনে সাধুবাবা একটু হাসলেন। তারপর দিলেন ইচ্ছাপূরণের বর। মুহূর্তে কুকুর রূপান্তরিত হলো সুন্দর এক রাজপুত্রে। কালক্রমে বিয়ে হলো সেই রাজ্যের রাজকন্যার সঙ্গে।
একদিন গভীর রাতের কথা। সুসজ্জিত রাজপ্রাসাদে শুয়ে আছে দুজনে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল রাজকন্যার। পাশে দেখলেন রাজপুত্র নেই। তাকালেন চারদিকে। দরজা বন্ধ। অথচ রাজপুত্র কোথায় ? এদিক ওদিক তাকাতেই চোখ পড়লো পালঙ্কের তলায়। দেখলেন, রাজপুত্র তার নীচে বসে একটা চটি চিবাচ্ছে। অবাক হয়ে গেলেন রাজকন্যা। বললেন,
—একি রাজকুমার! আমাদের প্রাসাদে অঢেল সুস্বাদু খাবার থাকতে তুমি এত রাতে ওখানে বসে চটি চিবাচ্ছো কেন ?
স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে পালঙ্কের তলা থেকে উত্তর দিলেন রাজকুমার,
—রাজকন্যা, তোমার হয়তো জানা নেই এক সাধুর আশ্রমের কুকুর ছিলাম আমি। তাঁরই দেয়া বরে কুকুর থেকে রূপান্তরিত হয়েছি রাজপুত্রে। বিয়ে করেছি তোমাকে। বাইরের চেহারায় সাজপোশাকে আমি রাজপুত্র, ঠিকই কিন্তু আসল স্বভাবটা আমার যাবে কোথায় ?

---